GIFT

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালী
এবং
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর কে. এম. মোহসীন
প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত)
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
466276

466276

গবেষক
মোঃ রইচ বিশ্বাস
এম. ফিল. প্রোগ্রাম
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪৭৪; সেশন ঃ ২০০৩-২০০৪ ইং
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট, ২০১১।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

M.

466276

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ রইচ বিশ্বাস কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক কর্তৃক কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করা হয় নি।

(ডক্টর কে. এম. মোহসীন)
প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত) ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

466276

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমার উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত) ডক্টর কে. এম. মোহসীন-এর তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ আমার দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করা হয় নি।

466276

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মো: রইচ বিশ্বাস
৭/৮/২০১১

(মোঃ রইচ বিশ্বাস)
গবেষক
এম. ফিল. প্রোগ্রাম
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪৭৪; সেশন ঃ ২০০৩-২০০৪ ইং
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০০০ সালে এম. এ. পাস করার পর থেকে আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক-এর সাথে এম. ফিল. গবেষণা বিষয়ে-আলাপ আলোচনা করি এবং ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ২০০৫ সালে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অবদান' শীর্ষক বিষয়ে অধ্যাপক ডক্টর মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজ শুরু করি। ইতোমধ্যে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ২০০৭ সালে আমি পুনঃভর্তি হই এবং তাঁর পরামর্শক্রমে ২০০৮ সালে আমার বর্তমান গবেষণা শিরোণাম 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা' হিসেবে পুনঃনির্ধারণ করি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা এবং অপূর্ণতা হলো আমার ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজটি শেষ করা সম্ভবপর হয় নি। তবে তাঁর 'সব সময় হাতের কাছে ডায়েরী রাখার' পরামর্শ আমার গবেষণার কাজে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

২০১০ সালে আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর কে. এম. মোহসীন-এর অধীনে গবেষণা কাজ শেষ করার সুযোগ লাভ করি। ২০১১ সালের মধ্যভাগেই কেবল এ অভিসন্দর্ভটিকে উপস্থাপনের পর্যায়ে নিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে আমি অনেকের কাছে ঋণী হয়েছি।

এক্ষেত্রে প্রথমেই আমার শিক্ষক ও তত্ত্বধায়ক প্রফেসর ডক্টর কে. এম. মোহসীন-এর নিকট আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর নিকট আমার ঋণ কেবল অপরিসীমই নয় বরং অপরিশোধনীয়। কারণ তাঁর তত্ত্বাবধানে আসার পর থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমা প্রদানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও পূর্ণমনোযোগ সহকারে অঢেল সময় তিনি আমাকে দিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করে দিয়েছে। অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত একাধিকবার পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শও তিনি আমাকে প্রদান করেছেন। তাছাড়া এ গবেষণাকর্মের পুরো সময়ই তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহ আমাকে ঘিরে রেখেছে। এমন কি তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস।

এ পর্যায়ে ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কারণ তিনি আমার বর্তমান গবেষণা শিরোণাম দেখে 'বাঙালি জাতিসত্ত্বা এবং ব্যক্তির সমন্বয়' ব্যাপারে ভূমিকায় একটি টীকা সংযোজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের, অপর অধ্যাপক ডক্টর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। কারণ গবেষণা কাজ শুরু করার প্রাক্কালে তথ্যের অপ্রতুলতা অনুভব করার প্রেক্ষিতে তিনি আমাকে তাঁর নিজের লেখা 'ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধঃ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ' পুস্তকটি উপহার হিসেবে প্রদান করেন এবং 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি'; এবং 'বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা' পুস্তক দু'টি সংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উল্লেখিত পুস্তক তিনটি গবেষণার ভূমিকা রচনাসহ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় তাঁর নিকট অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ডক্টর সিরাজুল ইসলাম, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর শরীফ উদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক ডক্টর এম. মোফাখখারুল ইসলাম মহোদয়বৃন্দ শিরোণামভুক্ত বিষয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা অপরিসীম ধৈর্য ও গভীর আন্তরিকতার সাথে আমাকে সাক্ষাৎকার
প্রদান করে আজীবন ঋণ ও কৃজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য স্বাক্ষাৎকার দাতাদের নিকটও আমি ঋণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের সম্পর্কে পরিশিষ্ট (i) সাক্ষাৎকার অংশে আরও বিস্তারিত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল মোমিন চৌধুরী, বিভাগীয় চেয়্যারম্যান, অধ্যাপক ডক্টর আবুল হোসেন আহমদ কামাল, সহকারী আধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন সাকী সহ অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকট তাঁদের বিভিন্ন সময়ের উপদেশ, প্রাজ্ঞ মূল্যায়ন ও জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ পেয়ে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। তাঁদের নিকট আমি ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইতিহাস বিভাগের জন্য নির্ধারিত 'শের-ই-বাংলা' এম. ফিল. বৃত্তি প্রদান করে আমাকে ঋণী করেছে। এ বৃত্তি অর্জন আমার গবেষণা কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং কাজকে সহজতর করে দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নূরুল ইসলাম, রতন কুমার দে ও মাসুদুর রহমানের ঋণ কোন দিনও শোধ হবার নয়।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও গবেষণাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আরকাইভস, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গ্রন্থাগার, ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর লাইব্রেরী, ঢাকা, সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড রিসার্চ সিলেট (সিআইআরএস), সিলেট,

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু মাজার কমপ্লেক্স লাইব্রেরী, টুংগীপাড়া থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষকদের সঙ্গে আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে আমি লাভবান হয়েছি। এদের মধ্যে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এম. ফিল. গবেষণারত আমার বন্ধু সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের প্রভাষক আবদুল গাফফার ও পটুয়াখালী সরকারী কলেজের প্রভাষক মোঃ আলমগীর হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক মোঃ হাবিবুল্লাহ্ বাহার-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগতভাবে পুস্তক উপহার দিয়ে আমার গবেষণা কাজে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করছি। এঁদের মধ্যে দিনাজপুর সরকারী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক আমার বন্ধু শরীফুল ইসলাম (বিপ্লব), সিলেটের সাক্ষাৎকারদাতা নূরুল ইসলাম, সিলেট মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম. এ. আজিজ, মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ঢাকার রাজিউল হাসান (রঞ্জু), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পুত্র দ্বয় আবুল হাসান চৌধুরী ও আবুল কাশেম চৌধুরী (খালেদ), ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এবং ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ঋণ শোধ হবার নয়।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সদ্য প্রয়াত আমার বড়ো মামা; যিনি আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রেরণাদাতা এবং অর্থ সাহায্যদাতা ছিলেন, আমার শ্রদ্ধাভাজন চাচাদ্বয় মরহুম লায়েক আলী বিশ্বাস এবং মরহুম বিশ্বাস মোত্তাইন বিল্লা (টুকু)-এঁর প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। সাক্ষাৎকারদাতা আমার শ্রদ্ধাভাজন চাচা হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, ভাই আক্তার মৌলভী এবং বর্তমান টুংগীপাড়া উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোলায়মান বিশ্বাস,আমার চাচাতো ভাই আমাকে সার্বক্ষনিক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং কাজ শেষ করার জন্য মাঝে মাঝে বকুনিও দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি।

বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীদের মধ্যে স্বর্ণা, বশীর, প্রদীপ, রত্না, লক্ষী, রেজাউল, শফিক, আনিস, রাজু, হানা, মিরাজ, মোমিন, মোস্তাফিজ, জাহিদ-এর নাম স্মরণ করতে হয়। এদের নিরন্তর কৌতূহল ও উৎসাহ আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমার সাথে এদের আজীবন বন্ধন হৃদয়ের, বন্ধুত্বের। প্রুফ রিডিং-এর একক কৃতিত্ব স্বর্ণার। পুরো অভিসন্দর্ভটির পান্ডুলিপি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে কম্পিউটারটাইপ করার জন্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মোঃ পান্না শেখ-এর প্রতি রইল গভীর ভালোবাসা ও শুভ কামনা এবং একই সাথে যাঁদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না তাঁদের সকলের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে আমার বাবা মোঃ মুনজুর বিশ্বাস এবং মা বিশ্বাস রিজিয়া বেগম এবং ভাই-বোন-ভাগ্নিপতি সকলের ত্যাগ, আশীর্বাদ ও স্নেহ-ভালোবাসা ছাড়া আমার এ পর্যায়ে আসা সম্ভব ছিল না। মায়ের দেয়া সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনাই হলো আমার-এ অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করার মূল চালিকা শক্তি। শেষ মুহূর্তে গবেষনায় সহায়তার জন্য আমার ছোট ভাই রিয়াজুল-মঈনূল একটা কম্পিউটার উপহার দিয়ে আমাকে করেছে ঋণী।

মোঃ রইচ বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

সারণির তালিকা

সারণি নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১-৫৪	মুক্তিযুদ্ধকালে যুক্তরাজ্যে গঠিত বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির তালিকা	৮৬-১০৭
৫৫	একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি ঃ সমৃদ্ধ স্মৃতিচারণকারীদের তালিকা	১০৬
৫৬	ঐতিহাসিক দলিল ঃ বিশ্বজনমত গঠনে মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে অধিকহারে ব্যবহৃত	১০৬
৫৭	যাঁদের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অত্র গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে	১০৭-১০৮
৫৮	কভেন্ট্রির প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের তালিকা	১২০
৫৯	বাংলাদেশ ফান্ড ঃ এলাকা ও দেশ ভিত্তিক অর্থ সংগ্রহ সংক্রান্ত তালিকা	১৭৩
৬০	বাংলাদেশ ফান্ড ঃ এ্যাকশন কমিটি ভিত্তিক অর্থ সংগ্রহ সংক্রান্ত তালিকা	১৭৩-১৭৬
৬১	বাংলাদেশ ফান্ড ঃ অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তালিকা	১৭৬

আলোকচিত্র সূচি

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রথমদিকের বিলাতে বসবাস স্থাপনকারী 'পূর্বসূরী'রা	৩০১
২	যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের ষাটের দশকের আন্দোলন	৩০২-৩০৬
৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	৩০৭
৪	১৯৭১ সালে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার চিত্র	৩০৮-৩০৯
৫	২৬ মার্চ, ১৯৭১ পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও বাংলাদেশে পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞ	৩১০
৬	ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের শরণার্থী ও দেশের অভ্যন্তরস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ তৎপরতা	৩১১
৭	বঙ্গবন্ধুর চার সারথী ও জাতীয় নেতা ঃ মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন ভূমিকার চিত্র ঃ যাঁরা ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঘাতকের নির্মম বুলেটের শিকা পরিণত হন।	৩১২
৮	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা	৩১৩
৯	মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন তৎপরতার চিত্র ও ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গ	৩১৪-৩২২
১০	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ নিয়াজির আত্মসমার্পণ	৩২৩
১২	লন্ডনে বঙ্গবন্ধু	৩২২
১৩	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করাচ্ছেন বিচারপতি চৌধুরী	৩২৪
১৪	রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর শপথ গ্রহণ এবং বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বিচারপতি চৌধুরী।	৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রত্যয়ন পত্র i-ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii-iv
সারণির তালিকা v
আলোকচিত্র সূচি vi

ভূমিকা
ক) গবেষণা শিরোণামের ব্যাখ্যা ১
খ) মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট ১
গ) গবেষণার সার-সংক্ষেপ ১৩
ঘ) গবেষণার যৌক্তিকতা ও পরিধি ১৪
ঙ) গবেষণার উপাদান ও পদ্ধতি ১৮
চ) অধ্যায় বিভাজন ১৯

প্রথম অধ্যায় ঃ যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি- অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী পটভূমি
(i) যুক্তরাজ্যে বাঙালিদের প্রবাস জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৪
(ii) যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি- সংগ্রামী পটভূমি ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন এবং ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গঃ পরিচয়
২.১ পটভূমি ৮৫
২.২ কেন্দ্রীয় সংগঠন ৮৫
২.৩ পেশাজীবী সংগঠনসমূহ ৮৮
২.৪ বিভিন্ন শহর কেন্দ্রিক এ্যাকশন কমিটিসমূহ ৯০
২.৫ যুক্তরাজ্যস্থ প্রবাসী বাঙালি রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিটিসমূহ ১০৩
২.৬ বৃটিশ নাগরিক প্রতিষ্ঠিত কমিটিসমূহ ১০৪
২.৭ যুক্তরাজ্যস্থ পাকিস্তানী বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দ ১০৫
২.৮ যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ১০৫
২.৯ যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন গণমাধ্যম ১০৬
২.১০ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন ১০৬
২.১১ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন ১০৬
২.১২ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় নাগরিক ও সংগঠন ১০৬
২.১৩ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি যাঁদের সম্মৃদ্ধ স্মৃতিচারণ পাওয়া গেছে ১০৬
২.১৪ ঐতিহাসিক দলিল ঃ যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা যেগুলো অধিকহারে ব্যবহার করতেন ১০৬
২.১৫ যাঁদের সংক্ষিপ্ত জবিনী ও সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অত্র গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে ১০৭

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক গৃহীত বিবিধ উদ্যোগ
৩.১ প্রতিরোধের সূচনা ১০৯
৩.২ কভেন্ট্রি সম্মেলন, সংগঠনসমূহের একতাবদ্ধতা এবং স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ১২৪
৩.৩ স্টিয়ারিং কমিটির অফিস স্থাপন ১২৬
৩.৪ বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল ১৬৮
৩.৬ অর্থ সংগ্রহ ঃ বাংলাদেশ ফান্ড ১৭২
৩.৭ লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন ১৭৮
৩.৮ নেকটাই, ব্যাজ, পতাকা ও বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশ ১৮০
৩.৯ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ ১৮৫
৩.১০ উদ্বুদ্ধকরণে সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা ১৮৬
৩.১১ যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ভূমিকা ১৮৮
৩.১২ যুক্তরাজ্যস্থ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তৎপরতা ১৯১
৩.১৩ যুক্তরাজ্যস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা ১৯৫
৩.১৪ যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা ১৯৭
৩.১৫ যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভূমিকা ১৯৮
৩.১৬ যুক্তরাজ্যস্থ বাম প্রগতিশীলদের ভূমিকা ২০০
৩.১৭ যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থকারী পাকিস্তানী ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ২০১
৩.১৮ প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা পুস্তিকার ভূমিকা ২০৩
৩.১৯ যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের তৎপরতা ২০৭
৩.২০ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রচেষ্টা ২১৮
৩.২১ বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ ঃ যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের কৃতিত্ব ২২১

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা ঃ যুক্তরাজ্যের ভূমিকাসহ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় নাগরিক ও অন্যান্য বিদেশীদের ভূমিকা
৪.১ পটভূমি ২২৯
৪.২ বৃটিশ পার্লামেন্টের ভূমিকা ২৩৯
৪.৩ বৃটিশ এম. পি.দের ভূমিকা ২৪৬
৪.৪ বৃটিশ গণমাধ্যম ২৫০
৪.৫ বৃটিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারী সংস্থা, সামাজিক ও মানবতাবাদী সংগঠনের ভূমিকা ২৭১
৪.৬ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় নাগরিকদের ভূমিকা ২৭৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা
৫.১ ভূমিকা ২৮২
৫.২ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৮২
৫.৩ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট ২৮৩
৫.৪ মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা ২৮৮
৫.৫ চরিত্র ও কৃতিত্ব ২৮৮
৫.৬ কৃতিত্ব মূল্যায়ন ২৯৭

ছ) উপসংহার ২৯৯
জ) একনজরে সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ৩২৬
ঝ) পরিশিষ্ট
(i) সাক্ষাৎকার ৩৪২
(ii) প্রকাশিত দলিল-পত্রাদি ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ

ক) গবেষণা শিরোণামের ব্যাখ্যা ঃ

সাধারণ অর্থে 'বাঙালি' বা 'বাঙালী' বলতে (বিশেষ্য অর্থে) বাঙালি জাতিসত্তাকে বুঝায়, আর বিশেষণ অর্থে বাঙালি বলতে ১) বাংলাভাষী, ২) বাংলাদেশী, বাংলাদেশ সংক্রান্ত ইত্যাদি অর্থ নির্দেশ করে। (সূত্রঃ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান', পৃষ্ঠা ঃ ৮৫০)। তবে বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬/(২) ধারা মোতাবেক বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেন বলে উল্লেখ ছিল। যদিও সংবিধানের ৫ম সংশোধনী দ্বারা ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ খ্রীঃ তারিখে 'বাঙালি' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' শব্দ প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তথাপি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড)-এর শিরোণামে 'বাঙালি' বা 'বাঙালী' বলতে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এবং অভিসন্দর্ভের গবেষণার সময়কালে অর্থাৎ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রচলিত অর্থে বাঙালি বলতে বাংলা ভাষা-ভাষি নাগরিকদের বুঝানো হত। সেই হিসেবে আলোচনার সুবিধার্থে এই অভিসন্দর্ভে বাঙালি বলতে (যেহেতু 'বাঙালী' ও বাঙালি' বানান একই অর্থ নির্দেশ করে) যে ভূখন্ডের স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন; কোথাও কোথাও যা পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হয়েছে (১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫৫ সাল এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের নাম ছিল যথাক্রমে পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান। আইনগত ও আন্তর্জাতিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৭১ সালে) সেই ভূ-খন্ডের নাগরিকদের বুঝাতে বাঙালি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিধায় এ অভিসন্দর্ভটির শিরোণামে 'যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি' বলতে তৎকালে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বর্তমান বাংলাদেশের নাগরিকদেরকেই বুঝানো হয়েছে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনায় পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান শব্দ বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য, এই অভিসন্দর্ভে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা একটু আলাদাভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া গেছে। কারণ তিনি প্রকৃত অর্থে প্রবাসী ছিলেন না। ২৬ মার্চ ১৯৭১ ইং তারিখ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভায় অবস্থান করছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঐদিনই তিনি লন্ডনে চলে আসেন এবং ২১ এপ্রিল ১৯৭১ ইং তারিখে মুজিবনগর সরকারের বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং ২৬ মার্চ থেকে ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ (বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ সংক্রান্ত পত্র হস্তগত হওয়া) পর্যন্ত তিনি যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের কোন সংগঠনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় তৎকালীন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক ও এ্যাকশন কমিটিসমূহের ঐক্যের মূলমন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। ফলে এই গবেষণার শিরোণাম **"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা"** নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং গবেষণাকর্ম লেখার ক্ষেত্রে **'বাঙালী'** বানানের স্থলে **'বাঙালি'** বানান ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মত এই বিশাল পরিসরের ঘটনার যে কোন শিরোণামে গবেষণা করার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জী, তথ্যকরণ, গবেষণা ও ইতিহাস রচনার অর্জন অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা আবশ্যক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়েছে কিনা, না হলে কেন হয় নি, হলেও কতটুকু হয়েছে-এ বিষয়ে তাত্ত্বিক পর্যায়ের বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয় নি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এ যাবৎ কতগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের তথ্যকরণের অগ্রগতি কতটুক, মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা বর্তমানে কোন পর্যায়ে, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রচনার প্রকৃতি কী- এই সকল বিষয় আর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব থেকেই বর্তমান গবেষণায় এ বিষয়ে জানার আমার আগ্রহ তৈরী হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের এ যাবৎ কৃত গবেষণা ও প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে হলে সর্ব প্রথম আসে গ্রন্থপঞ্জীর কথা। গ্রন্থপঞ্জী ছাড়া একটি জাতির ইতিহাস তথা বাঙালির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা বা নতুন করে কিছু রচনা করা বা গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়া কোন গবেষকের ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ মুনতাসীর মামুনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন "...মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান নেই। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীও নেই। অথচ এ ধরনের কাজ করতে পারে এমন ধরনের সরকারী সংস্থা আছে কয়েকটি, আছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী। এতেই জাতি হিসেবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের অন্যমনস্কতা, গৌরবে বলীয়ান না হওয়ার মানসিক দীনতাই প্রকাশিত হয়েছে। অথচ সামান্য একটি গ্রন্থপঞ্জী তুলে ধরে একটি জাতির পরিচয়, মানসিকতা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি।"[১]

গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, "এখনো পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোন গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয় নি। বাংলাদেশের কোন প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। যদিও জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করছে, কিন্তু সংগ্রহ পদ্ধতি, এক্ষেত্রে আইনগত দুর্বলতা ও উদ্যোগের অভাবে এ গ্রন্থপঞ্জী পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ নয়।"[২]

গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগ সম্পর্কে আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "সম্প্রতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কয়েকজন গবেষক ও লেখক মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে এগিয়ে এসেছেন : অধ্যাপক মেজবাহ কামাল ১৯৮৭ সালের 'বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা'য় 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' শিরোণামে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। .... ডঃ মুনতাসীর মামুন 'মুক্তিযুদ্ধের বই' শিরোণামে ১৯৯০ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত 'একুশের প্রবন্ধ' বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।" এছাড়া সাহিদা বেগমের 'মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহিত্য', ১৯৮৯ সালের জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশিত 'মাসিক বই' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'মুক্তিযুদ্ধ বিষায়ক বই' শিরোণামে প্রকাশিত বই-এর তালিকা এবং স্মৃতি সংসদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান "স্মৃতি" নামে একটি স্মরণিকায় 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থমালা' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেছেন।"[৩]

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ এই যে, শেষতক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন নিজে মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে এগিয়ে এসেছেন; যা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থসামগ্রীর একটি তালিকা, গ্রন্থের অবয়ব এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালে মূলধারা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বর্তমানে উল্লিখিত বইটির পরিমার্জনার কাজ চলছে ; প্রকাশিত হলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সর্বশেষ পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস।

গবেষকদের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্যকরণের অভাব এখনও ব্যাপক। মুক্তিযুদ্ধের তথ্যকরণ সম্পর্কে প্রফেসর ডঃ মুনতাসীর মামুন বলেন, "বিগত বছরগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতোটা লেখা উচিত ছিল ইতিহাসবিদ, গবেষক বা অংশগ্রহণকারীরা ততোটা লিখেন নি, তবে প্রতিবছর কিছু না কিছু লেখা হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, জড়ো হচ্ছে ইতিহাসের উপাদান।"[৪]

তথাপি মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, আন্তর্জাতিক, উপমহাদেশীয়, আইনগত, নারী ও শিশু-কিশোর বিষয়ক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অল্প বিস্তর তথ্য পাওয়া গেলেও বিশদ আকারে নয়। কোন কোন দিকের তথ্যের যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। যাও আছে, তাও সুসংবদ্ধ আকারে নেই। তথ্যকরণের অভাব উল্লেখ করে সুরাইয়া বেগম বলেন, "মুক্তিযুদ্ধ তাই এক বিশাল ক্যানভাস। কি ব্যাপ্তি এর প্রতিটি দিকে, কতই বা অন্বেষণের শাখা-প্রশাখা, মনে হয়েছে এক সামুদ্রিক বিশালতা ব্যাপ্ত এর ইতিহাসে। সেই ইতিহাসের সময় এসেছে এখন পিছনে ফিরে দেখার। ...... এই ফিরে দেখার ক্ষেত্রে যে বোধ প্রাথমিকভাবে জন্মলাভ করে তা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্যকরণের অভাব বড় তীব্র। ......কেননা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে গেলে তখনই মাঝপথে হোঁচাট খেতে হয়, আটকে যেতে হয়। তখনই মনে হয় আমাদের আরও অনেক কাজ করা দরকার ছিল। ..... মুক্তিযুদ্ধের পর তথ্যকরণ করা যতো বেশি সহজসাধ্য ছিল এখন তা অনেকটাই কঠিন তবে এখনও দুঃসাধ্য নয়।"[৫]

তথ্যকরণ প্রসঙ্গে গবেষণার প্রশ্ন এসে যায়। আর মুক্তিযুদ্ধের উপর পদ্ধতিগত গবেষণা অনুল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে আমিন ইসলামের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসমাপ্ত হলেও ইতিহাস লেখা হয়েছে, পাওয়া গেছে সমৃদ্ধ স্মৃতিচারণ, সৃষ্টি হয়েছে অবিনশ্বর কবিতা ও নাটক। সাহিত্য ও শিল্পে প্রজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ। শুধু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হয় নি কোন গভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। স্বাধীনতার এত বছর পরে সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করা যায়, কেন সমাজ বিজ্ঞান যে গুরুত্ব নিয়ে এই রক্তাক্ত অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল তা করে নি? সমাজ বিজ্ঞানীদের এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতেই হবে।"[৬] ঠিক অনুরূপ অভিমত দেখা যায় সুরাইয়া বেগমের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে মুক্তিযুদ্ধের উপর বেশ কিছু বই বের হয়েছে। যেগুলো বেশিরভাগই প্রকৃতির দিক দিয়ে স্মৃতিচারণমূলক। নব্বইতে যখন দেশের সামরিক প্রভাব কেটে গিয়ে গণতন্ত্রের সুবাতাস বওয়া শুরু হয়েছিল সে সময়ে মুক্তিযুদ্ধে উপর একঝাঁক বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু বই ব্যক্তিক অনুভূতির বাইরে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে লেখা। তবে অধিকাংশ বইতে আবেগ, অনুভূতির প্রকাশ যতো বেশি সেই তুলনায় গবেষণামূলক বা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে বই রচনার হার কম। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আবেগ অনুভূতি বোধের বিষয়টি যেমন সম্পৃক্ত তেমনি রয়েছে এর অন্তর্নিহিত দিক। সে অন্তর্নিহিত বা গভীরতর বিষয়গুলো উন্মোচনে কঠোর গবেষণা প্রয়োজন। যার অভাব খুব বেশিরকমভাবে প্রকট।"[৭] মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনায় বিষয়টি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় ঃ

(i) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পথে বাধাসমূহ

(ii) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

(iii) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ

(iv) সামগ্রিক রচনা

(v) মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

(i) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পথে বাধাসমূহ ঃ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পথে বাধাসমূহ খতিয়ে দেখলে নানাবিধ কারণ বেরিয়ে আসে । এ প্রসঙ্গে ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-এর মত হলোঃ

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এখনও রচিত হয় নি। কেননা পেশাদার ইতিহাসবিদগণ এখনও ইতিহাস রচনা করে নি। অপেশাদার কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র গবেষকবৃন্দ অল্প বিস্তর রচনা জাতিকে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু যথার্থ রচনাশৈলীর অভাবের কারণে তা ইতিহাস হয়ে উঠে নি। ইতিহাসবিদগণ এ সমস্ত রচনাকে ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।"[৮]

প্রথমত এটা ঠিক যে, পেশাগতভাবে যারা ইতিহাস চর্চা করেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন না। অন্যদিকে অপেশাদার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত বা অন্য শাস্ত্রের বিজ্ঞ গবেষকগণ যা রচনা করেছেন তা নেহাত কম নয়। কিন্তু এ ধরনের রচনা প্রয়োজনীয় শৈলীর অভাবে ইতিহাস হয়ে উঠছে না। ঐতিহাসিকদের এগিয়ে না আসার কারণ এটাও হতে পারে যে সমসাময়িক ইতিহাস প্রণয়নের কাজে ঝুঁকি অনেক। তারা সেই ঝুঁকিটি নিতে চান না। তবে সবচেয়ে বড় কথাটি হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ব্যাপক কর্মকান্ড যার পেছনে মদদ যুগিয়েছে ক্ষমতাসীন প্রশাসন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। '৭৫ পরবর্তীকালে ব্যাপক দল বা মতাদর্শ বদল, সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা বিরোধীদের উচ্চ পদে নিয়োগসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়।[৯] দ্বিতীয়ত মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব অনেক সময় একাত্তরের ঘাতক-দালালদের সঙ্গে একই সমতলে অবস্থান করেন। অপরপক্ষে স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতার বিপরীতে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও দলগুলো ঐক্যের ধারা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরকারী উদ্যোগ ও আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ খুব কমই নেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠানের অভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য কতজন প্রাণ দিয়েছেন বা নানাভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য যেমন পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি সরকারী উদ্যোগের অভাবে অনেক নেতা, সংগঠকের সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন আহম্মেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, মাওলানা ভাসানীসহ অনেক সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সাক্ষাৎকার নেই। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাঁদের গুলোও বিক্ষিপ্ত, পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া মুজিবনগরে রক্ষিত সরকারি কাগজপত্র সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সঠিক খবর পাওয়া যায় নি।[১০]

আরও একটি কারণে ইতিহাস রচনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে: স্বাধীনতার পর মানুষের মধ্যে এসেছে ব্যাপক হতাশা। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি, দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবহেলা, সুখ-সমৃদ্ধির যে আকাঙ্খা নিয়ে সবাই যুদ্ধ করেছিলেন, তার অপূর্ণতা ইত্যাদি কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে হতাশ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত সচেতনতার অভাবও কম দায়ী নয়। বিভিন্ন পর্যয়ের মুক্তিযোদ্ধা কিংবা অধিনায়ক মুক্তিযোদ্ধারা যে সাক্ষাৎকার বা লিখিত বিবরণ দিয়েছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণ সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার প্রমাণ রাখতে পারেন নি। অনেকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভিন্নমত পাওয়া গেছে এবং সেগুলো এসেছে সাক্ষাৎকারদাতাদের কোন সহযোদ্ধার দিক থেকে। এ ধরনের সমস্যা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও সংগঠকদের বেলায়ও প্রযোজ্য। যার ফলে মুজিবনগর সরকারের রাজনীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, মুজিব বাহিনী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কারো কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।[১১]

তাছাড়া জনসাধারণের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি হাতছাড়া করতে চান না। স্থায়ী প্রতিষ্ঠান না থাকায় তারা এসব দলিল নিজেদের কাছে রাখাই নিরাপদ মনে করেন। কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলপত্র পুরোনো হলে সে গুলো অনেক বেশি লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। যার ফলে তারা দলিল বের করছেন না ভবিষ্যতে উচ্চ মূল্যের আশায়। সরকারের এ বিষয়ে কোন তৎপরতা না থাকায় এবং দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস না হওয়ায় দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে আইনগত চাপ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।[১২]

দৃষ্টিভঙ্গিগত দিকের কথা বলতে গেলে সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মনোভাবের বিষয়টিও এসে পড়ে। সশস্ত্র বাহিনী থেকে অংশগ্রহণকারী বড় অংশ প্রায়ই যুদ্ধের রাজনৈতিক ভূমিকা ও নেতৃত্বকে স্বীকার করেন না। মুজিবনগর সরকার ও রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে তাদের অনেকে বিরূপ ও উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করেন। অন্যদিকে তারা মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্রকে গুরুত্ব দিতে চান না, সংগ্রামের দীর্ঘ পটভূমি তাদের কাছে গুরুত্বহীন। সাধারণভাবে তাদের ধারণা, তাদের যুদ্ধ করার ফলেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। '৭৫ পরবর্তী সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য এ বিষয়টিকে আরো প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় জনসমর্থন যে কেবলমাত্র রাজনীতিকরাই গড়ে তুলেছিলেন, সেটাই যে স্বাভাবিক এবং সত্যি এ কথাটি দুঃখজনকভাবে তারা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন।[১৩]

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অসচেতনতাও কম দায়ী নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারিত প্রচারপত্র, পুস্তিকা, কর্মসূচী ঘোষণাসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এ ব্যাপারে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ব্যর্থতা দেখিয়েছে। আর্কাইভস বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগ্রহ না থাকায় মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার জন্য শুধু সাক্ষাৎকার ও পত্র-পত্রিকায় উপর নির্ভর করতে হয়; যে তথ্য নিয়ে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলোর অনীহাও যোগ করা যায়। পত্রিকাগুলো সরবরাহ করতে পারে অনেক তথ্য। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ অবজারভার বাদে কোন পত্রিকার অফিসে কোন পত্রিকা সংরক্ষণ করা হয় নি।[১৪]

সর্বোপরি আর একটি কারণের কথা না বললেই নয়। এটি হচ্ছে অর্থ সংকট। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ১৯৭২ সালে গঠিত 'জাতীয় ইতিহাস পরিষদ' এবং জিয়ার আমলে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প' বার বার অর্থ সংকটে পতিত হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া এ ধরনের কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়।[১৫] সবশেষে এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন-হসিনা আহমেদ 'মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি-১' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "বিগত বছরগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হয়েছে এ বলে যে, বিষয়টি বিতর্কিত। এবং বৃহৎ দু'টি রাজনৈতিক দলের কোন এক পক্ষ হয়ে লিখতে হবে। অন্যদিকে অ্যাকাডেমিসিয়ানদের এ বিষয়ে অনাগ্রহ দেখার মতো। দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ আছে, কলেজ আছে, কিন্তু খুব কম শিক্ষক এসব উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন।[১৬]

(ii) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ঃ

স্বাধীনতার ৪০ বছর অতিবাহিত হচ্ছে অথচ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়নি। অপরিকল্পনা, ক্ষমতাসীনদের অনীহা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল ও বুদ্ধিজীবীদের অনীহা সর্বোপরি স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি তোষণনীতির কারণে এ কাজ বেশি দূর এগুতে পারে নি। কারণের ফর্দ সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও কিছুটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা ইতিহাস রচিত হয়নি। তবে এও ঠিক, উদ্যোগ সীমিত আকারে ১৯৭২ থেকেই নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আদেশবলে গঠিত হয় জাতীয় স্বাধীনতা ইতিহাস রচনা পরিষদ। এ পরিষদ এক বছর মেয়াদি ছিল এবং বাংলা একাডেমীর কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে পরিষদ কাজ বন্ধ করে দেয়। এ পরিষদের কাজ আর তেমন এগুতে পারেনি।

যথার্থ অর্থে এদেশে সরকারি পর্যায়ে প্রথমে ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে "স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প" ১৯৭৮ সাল থেকে কাজ শুরু করে। এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হন হাসান হাফিজুর রহমান। দলিলপত্র প্রামাণ্যকরণের জন্য প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবিরের সভাপতিত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠিত হয়। ৮১/বি, সেগুন বাগিচার একটি বাড়িতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ১৬ খন্ডে দলিলপত্র সঙ্কলনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৮-৮৫ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ১ম পর্ব, ১৯৮৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব স্থির হয়। অবশ্য প্রকল্প ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হয়। ১৯৮৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮৫ পর্যন্ত প্রফেসর ডঃ কে. এম. মোহসীন এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত এম. আর. আখতার মুকুল প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। এই প্রকল্প থেকে ১৫ খন্ড স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র এবং এক খন্ড আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ডঃ পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮), দ্বিতীয় খন্ডঃ পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১), তৃতীয় খন্ডঃ মুজিবনগর ঃ প্রশাসন, চতুর্থ খন্ডঃ মুজিবনগর ঃ প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা, পঞ্চম খন্ডঃ মুজিবনগর ঃ বেতার মাধ্যম, ষষ্ঠ খন্ডঃ মুজিবনগর ঃ গণমাধ্যম, সপ্তম খন্ডঃ পাকিস্তানী দলিলপত্র ঃ সরকারি ও বেসরকারি, অষ্টম খন্ডঃ গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা, নবম খন্ডঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (১), দশম খন্ডঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (২), একাদশ খন্ডঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (৩), দ্বাদশ খন্ডঃ বিদেশী প্রতিক্রিয়া ঃ ভারত, ত্রয়োদশ খন্ডঃ বিদেশী প্রতিক্রিয়া ঃ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র, চতুর্দশ খন্ডঃ বিশ্বজনমত, পঞ্চদশ খন্ডঃ সাক্ষাৎকার এবং ষোড়শ খন্ডঃ আলোকচিত্র (যদিও প্রকল্পের পরিকল্পনা মোতাবেক এ খন্ডটি কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট হওয়ার কথা ছিল)।

প্রকাশিত দলিলপত্রগুলোর তথ্য ও উপকরণ সম্পর্কে তেমন বড় ধরনের অভিযোগ আজও উত্থাপিত হয়নি। রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাসনামলে বড় অংশের কাজটি হলেও স্বাধীনতা ঘোষণা, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বসহ মুক্তিযুদ্ধের বড় বড় ইস্যুগুলোতে দলিলপত্রগুলোতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। যদিও এম. আর. আখতার মুকুল পরিচালক থাকাকালীন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত আলোকচিত্র খন্ডটি নিয়ে বহু সমালোচনা হয়েছে। আলোকচিত্রে প্রকাশিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের কয়েকটি আলোকচিত্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক কোথায়? এ্যালবামটি শুরু ও শেষ হয়েছে এরশাদের ছবি দিয়ে। কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এই প্রথম বারের মত একটি প্রকল্পে জনগণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় শেষ দিনগুলোতে প্রকল্পে এসেছে সংখ্যাহীন দলিল। প্রকল্পের সাফল্য হচ্ছে ১৬ খন্ড দলিলপত্র ও আলোকচিত্র প্রকাশের দ্বারা প্রথমবারের মত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার ভিত্তি নির্মিত হয়েছে। প্রকল্পের খরচ নির্বাহ ও মুদ্রণ খাতসহ প্রথম পর্যায়ে ৭২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪২ লাখ টাকা (শুধু আলোকচিত্র খাতে খরচ ২৬ লাখ) বরাদ্দ করা হয়। ১৯৮৮ সালের মধ্যে বিক্রয়কৃত ৫২ লাখ টাকা সরকারি তহবিলে জমা হয়েছে, এর পরও অর্থ সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

তহবিলে জমা হয়েছে। প্রকল্পের সংগৃহীত সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার অমূল্য দলিলও এর বড় সাফল্য। এই সাফল্য ও আরও বিস্তৃত কাজের সম্ভাবনাই একটি স্থায়ী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক ভিত্তি রচনা করেছে। ১৯৮৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর থেকে এ ধরনের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ. মজিদ খান একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেন। যাতে বলা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পকে ভিত্তি করে 'বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা' নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্থায়ী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। সংস্থাটি পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন ও ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন অনুদানের প্রস্তাবও করা হয়। সরকারি পর্যায়ে তৎপরতা এক ধাপ এগিয়ে যায় ১৯৮৪ সালে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ দলিলপত্রের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি একই সাথে গবেষণা সংস্থাটির কাজকে ত্বরান্বিত করতে নির্দেশ দেন। ১৯৮৫ সালের ৬ জানুয়ারি এ উদ্দেশ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ মজিদ খানের সভাপতিত্বে এ সভায় তথ্য, শিক্ষা, রাষ্ট্রপতির অর্থ উপদেষ্টা ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিবগণ অংশ নেন। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা' নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার পর ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তানুযায়ী খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্রপতি তাঁর রীতিগত অনুমোদন শেষে বিভিন্ন আইনগত দিক পরীক্ষার জন্য আইনমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করেন।[১৭]

স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের পূর্ব নির্ধারিত সময়সীমা ছিল ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। সে পরিস্থিতিতে সরকার গবেষণা সংস্থার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য ১ জুলাই থেকে দু'বছরের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করে। প্রকল্প দলিলের ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে, ইতিহাস সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইতিহাস প্রকল্পকে অধিগ্রহণ করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় এসে প্রকল্প বনাম মন্ত্রণালয়ের রশি টানাটানি ফলে স্থায়ী সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালগুলো তৎকালীন পরিচালকের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করে। ১৯৮৮ সালের ১৯ জুন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ ইতিহাস প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে তথ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় পর্যালোচনাকালে তথ্য সচিব আ. ন. ম. ইউসুফ অভিযোগ করেন, পরিচালককে তিনি বলেছিলেন তাঁর দিক থেকে দু'এক লাইনের কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব প্রেরিত হলে তথ্য মন্ত্রণালয় ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গঠনের কাজটি বাস্তাবায়ন করতে পারতো। অবশ্য এর সত্যতার জবাব দিতে পারতেন তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক এম. আর. আখতার মুকুল। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং প্রকল্প পরিচালকের সঠিক সময় যোগাযোগ না করার কারণে স্থায়ী ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ যদি প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েই থাকেন তবে কেন প্রকল্পটি স্থায়ী হলো না এটা রহস্যজনক। বাস্তব অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞাতানুসারে এবং পত্রিকায় বহু লেখালেখির পরও ১৯৮৮ সালের জুন মাসে প্রকল্প সমাপ্তি ঘটিয়ে সকল দলিল ও তথ্য বস্তাবন্দী করে ডিএফপি গ্যারেজে রাখা হয়। ১৯৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যায় অনেক দলিল নষ্ট হয়ে যায়। এ সময় তথ্যমন্ত্রী ছিলেন মাহবুবুর রহমান। কাজী জাফর আহমদ তথ্যমন্ত্রী হয়ে দলিলগুলো জাতীয় যাদুঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যদিও আর্কাইভস অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী এসব জাতীয় দলিল জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত হওয়ার কথা। জাতীয় যাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে দলিলগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলোর কোন তালিকা নেই, নেই গবেষকদের প্রবেশাধিকার। যাদুঘর থেকে দলিলগুলো হারানো গেলে কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে আমরা বঞ্চিত হব অমূল্য রত্ন থেকে।[১৮]

বর্তমান গনতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় ২ বছর পূর্ণ হলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যাপক প্রচারণা চালালেও এ যাবৎ সরকারের পক্ষ থেকে ইতিহাস গবেষণা সংস্থা বা মুক্তিযুদ্ধ প্রকল্প পুনরুজ্জীবিতকরণের কোন কথাবার্তা শোনা যায়নি। অথচ ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে। এ ব্যাপারে এরশাদ আমলের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রেখে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্ধন করে স্থায়ী ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গঠন করা যায়। স্থায়ী এ প্রতিষ্ঠানটি যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়-এর প্রক্রিয়া সাবলীল ও ফলপ্রসূ হবে। কেননা এ প্রকল্পের ৯৭% দলিল অপ্রকাশিত রয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। যদি এরশাদ আমলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এককালীন অনুদান দিয়ে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে সরকারি প্রভাবমুক্ত মুক্তিযুদ্ধ গবেষণার এ প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এখনই উদ্যোগ নেয়া হলে মুক্তিযুদ্ধের বহু অনাবিস্কৃত তথ্য বের করা সহজ হবে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির অস্তিত্বের অংশ। মুক্তিযুদ্ধ কোন দল বা ব্যক্তির নয়। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচিত হলে আমরা লাখ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা দেখাতে পারবো।[১৯]

Dakha University Institutional Repository

(iii) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ ঃ

বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস চর্চায় প্রাচীনকালের অধিবাসীদের ইতিহাস সচেতনতার অভাব সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিযোগের শেষ নেই। এই অসচেতনতা ও ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাবে আজ আমাদের এই ভূখণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস বহুলাংশে অনুদঘাটিত। এর ফলে এই সময়ের ইতিহাস রচনায় অনুমানকে বেছে নিতে হয়। কিন্তু প্রাচীনকাল অতিক্রম করে মধ্যযুগে বিশেষ করে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে এই অভিযোগটি অতিক্রম করে ইতিহাসচর্চার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। যা পরবর্তীকালে মোগল ও বৃটিশ শাসনামলে অব্যাহত থাকে, যদিও এই ইতিহাসচর্চায় রাজনৈতিক ইতিহাস যতটা গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক ইতিহাস ততটা গুরুত্ব পায় নি। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে জনসাধারণ প্রভাবিত হলেও ইতিহাসে তারা তেমন স্থান পায় নি। তাই গণমানুষ থেকেছে ইতিহাসের আলোচনার বাইরে। ইতিহাসের নায়ক হয়েছেন শাসক শ্রেণী। পাকিস্তান আমলে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ইতিহাস রচনায় বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। দীর্ঘদিন সামরিক ও আধাসামরিক শাসনাধীন রাষ্ট্র কাঠামোতে এমনি উদ্যোগ নেয়া হলেও তা যে আগের ধারারই অনুসরণ হতো তাতে সন্দেহ নেই।[২০]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধকে বাঙালি জাতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই যুদ্ধের ফলে গুটিকয়েক পরিবার ছাড়া বাংলাদেশের সকল পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যে কারণে জন্মলগ্ন থেকে প্রত্যেক বাঙালির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বীরগাঁথা ও ইতিহাস রচনার জন্য আগ্রহের কমতি ছিল না। যদিও বিভিন্ন সময় শাসক শ্রেণী ও কোন কোন মহল তাদের নিজেদের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতা বিরোধীরাও পিছিয়ে থাকেনি। বিগত কয়েক বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের নায়ক দল জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দল বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবস পালন করছে। আর বিকৃত করছে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য। নিজেদের ভূমিকার সাফাই গেয়ে তারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে জাতিকে।[২১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা ও মানুষের মধ্যে ব্যাপক হতাশা, সরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি, দালালদের সাধারণ ক্ষমা, '৭৫ পরবর্তীতে সরকারগুলোর স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবহেলার ফলে মুক্তিযুদ্ধচর্চা কখনো কখনো বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে বাঙালি জাতি আবার জেগে উঠেছে। শত বাধা সত্ত্বেও তাই মুক্তিযুদ্ধচর্চা এগিয়ে গিয়েছে। ১৯৯০ সালের পর মুক্তিযুদ্ধচর্চা অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের লেখালেখি পত্র-পত্রিকায় বেড়েছে বহুগুণ। কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত সপ্তাহে একদিন মুক্তিযুদ্ধের পাতা বেরুচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লেখা বের হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হচ্ছে ছোট-খাটো মুক্তিযুদ্ধচর্চা কেন্দ্র। জেলা থেকে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজয় মেলা হচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালিত হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে। প্রতিবছর গড়ে ৫০-৬০টি মুক্তিযুদ্ধের বই বেরুচ্ছে এবং বিগত ৪০ বছরে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় ১২০০০ বই বের হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে এগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তবে এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত জাতীয়, দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক এবং তৃতীয়ত পেশাভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধচর্চা ও ইতিহাস রচনার প্রয়াস।[২২]

স্বাধীনতার পর পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সরকারি মহল ও জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল প্রবল। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, পুনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি তাই জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয় 'জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদ'। সরকারের শিক্ষা, সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আদেশবলে এটি গঠিত হয় এবং পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় বাংলা একাডেমিকে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও তা প্রকাশ ছিল পরিষদের প্রধান দায়িত্ব। জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা প্রকল্পের তথ্য, উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য ৩৪ জনকে গবেষণা সহায়ক ও তথ্য সংগ্রাহক এবং তাদের কাজ তদারক করার জন্য দু'জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরিষদ গঠিত হওয়ার পর থেকেই দেশব্যাপী তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং এজন্য প্রাথমিকভাবে ৫ সদস্য বিশিষ্ট দল বিভাগীয় শহর, জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সফর করেন। জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদের মেয়াদ ছিল একবছর এবং ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে এর মেয়াদ শেষে ঐ পরিষদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বাংলা একাডেমির ওপর ন্যাস্ত হয়। পরে জাতীয় ইতিহাস রচনা পরিষদের দায়িত্ব ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমির নবগঠিত ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের ওপর অর্পিত হয়। এই অদল-বদল ও পর্যপ্ত অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত পরিষদের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি। তবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিষদ বেশ কিছু অগ্রগতি লাভ করে। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যাবলীর পরিমাণ হচ্ছে (১) মুক্তিযুদ্ধের সংশ্লিষ্ট সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সাক্ষাৎকার মোট ৪১৪১টি, (২) মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক ও অফিসারদের সাক্ষাৎকার ৩৫০টি, (৩) জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মী ইত্যাদির সাক্ষাৎকার ৪৯৫টি (৪) মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত আলোকচিত্র ৫১১টি এবং (৫) ১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বহু জাতীয় দৈনিক পত্রিকা। তথ্যগুলো প্রকাশনার কোন উদ্যোগ পরিষদ নেয়

Dhaka University Institutional Repository

নি। বলা যায়, বাংলা একাডেমির উদ্যোগটি প্রধানতঃ পৃষ্টপোষকতার অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে নি। প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রফেসর ডঃ কে. এম. মোহসীন বলেন ঃ

"অতি অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে গিয়ে বাংলা একাডেমি সফল হয় নি। তরুণ গবেষকদের মধ্যে অনেকেরই গবেষণা কর্মে অভিজ্ঞতা না থাকায় সাধারণত তাঁরা খবরের কাগজ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও যুদ্ধকালীন সময়ের মূলতঃ প্রচার গ্রন্থগুলো ও পুস্তিকা থেকে বেশি তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষাৎকারও অনেক সময় সঠিকভাবে নেয়া হয়নি। প্রশ্নমালার সাথে সাক্ষাৎকারদাতার প্রদত্ত বিবরণে সংগতি অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ২৫৬ পৃষ্ঠার সাক্ষাৎকার থেকে মাত্র ৩ পৃষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া তত্ত্বাবধানের দিক থেকে প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ছিল।"[২৩]

শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমি ১৯৭৫ সালের অক্টোবর থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদ এবং বাংলা একাডেমির ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য ও দলিলপত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে হস্তান্তর করা হয়। যথার্থ অর্থে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার এযাবৎ সবচেয়ে বড় উদ্যোগ নেয়া হয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭৭ সালের আগস্টে। প্রকল্পটির নামকরণ করা হয় 'স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প'। এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রকল্পের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন ঃ

"এই প্রকল্প ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মত একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দূরহ। এজন্য আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরস্পর সংহিত রক্ষা করবে।"[২৪]

এই প্রকল্প বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের দলিলপত্র ১৫ খন্ডে এবং ১৬ তম খন্ড এ্যালবাম প্রকাশ করেছে; যা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি ভিন্নধর্মী গবেষণা চালিয়েছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯৮৫ সালে ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং মূল গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে ৫ খন্ড বই। প্রথম খন্ড ঃ ভাষা আন্দোলন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, দ্বিতীয় খন্ড ঃ ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি, তৃতীয় খন্ডঃ ভাষা আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক পটভূমি, চতুর্থ খন্ডঃ ভাষা আন্দোলন ঃ আংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান এবং পঞ্চম খন্ডঃ ভাষা আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি। এই প্রকল্পের সাফল্যের পর বিআইডিএস "মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। এর প্রকল্প পরিচালক ছিলেন প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী ডঃ আতিউর রহমান। এর প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে ১৯৯২-এর মার্চ মাসে। এই প্রকল্পের গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ১০ খন্ড মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করার কথা। গবেষণা কাজটি প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।[২৫]

সরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধচর্চা তথা ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ নিয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র'। মুক্তিযুদ্ধের তথ্যাদি সংগ্রহ, গবেষণা ও প্রকাশনার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে ৯ মার্চ ঢাকার মতিঝিলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি-বেসরকারি দলিল-দস্তাবেজ, দেশী-বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ভাষ্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের রিপোর্ট, বিবৃতি, চিঠিপত্র, ইশতেহার, মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতার সংবাদ, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করছে। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা, পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, সেক্টর কমান্ডার ও আঞ্চলিক সংগঠক প্রমুখের বক্তৃতা, মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থভিত্তিক আলোচনা। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সেমিনার ও আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে কেন্দ্র 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ' (১৯৯৫) শীর্ষক একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছে। বিপুল সম্ভাবনা ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির যতটুকু সাফল্য লাভের সম্ভবনা ছিল তা কিন্তু অর্জিত হয়নি।[২৬]

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ঢাকার কাফরুলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'স্মৃতি সংসদ'। মূলতঃ ১৯৮৪ সাল থেকে সংসদের কাজ শুরু হয়। সংসদ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ ৭টি ভাগে বিভক্ত করেছে ঃ ১। যুদ্ধক্ষেত্র, ২। স্মৃতিচারণ, ৩। শহীদদের ইতিহাস, ৪। বিরোধী শক্তির ভূমিকা, ৫। স্বাধীনতা যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, ৬। স্বাধীনতা ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন এবং ৭। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা। স্মৃতি সংসদ 'স্মৃতি' নামে দু'টো সংকলন ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালে প্রকাশ করে। সংসদের প্রধান উদ্যোক্তা মেজর এ. এস. এম সামছুল আরেফিনের বড় সাফল্য 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান গ্রন্থ' (১৯৯৫)। বইটি মূলত সংসদের দীর্ঘ গবেষণার ফসল। এতে মুক্তিযুদ্ধের,প্রেক্ষাপটে ৩,৫০০ জন ব্যক্তির অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষত, মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা কে, কোথায় এবং কী

Dhaka University Institutional Repository

কাজে নিয়োজিত ছিলেন তা গ্রন্থ থেকে জানা যাবে। বইটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের গবেষক ও ঐতিহাসিকদের গাইড বই হিসেবে সাহায্য করবে। এই উদ্যোগের দ্বিতীয় পর্বের কাজও এগিয়ে চলছে।[২৭]

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাড়াও সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন চরিত ও তাদের অবদান সংক্রান্ত দু'টো পৃথক সেল গঠন ও একটি যাদুঘর এবং একটি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে।[২৮]

আঞ্চলিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধচর্চা কয়েক বছর ধরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেক গবেষকই অনুভব করেছেন কোনো দেশ ও সমাজের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার আগে সেই দেশ ও সমাজের স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাসকে উদঘাটন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে রচিত হবে জাতীয় ইতিহাস। খানিকটা পরিকল্পিত এবং খানিকটা পরিকল্পনাহীন এসব প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রামের 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র'। ১৯৮৫ সালে এর কার্যক্রম শুরু হলেও মূলত ১৯৯০ সাল থেকে কাজের অগ্রগতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের কাজের সীমারেখা হিসেবে বাঙালি জাতীয়বাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশের বিভিন্ন দিক গবেষণা ও প্রকাশের অভিমত ব্যক্ত করেছে। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাঁদের উদ্দেশ্য। যদিও এযাবৎ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ৬টি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামই প্রাধান্য পেয়েছে। কেন্দ্রের সবচেয়ে বড়মাপের কাজ ৫১২ পৃষ্ঠার প্রকাশিত 'বাঙালির জাতীয়বাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম গ্রন্থ' (১৯৯৩)। এছাড়া বাঙালির 'মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন অপারেশন' সিরিজের ৫ খন্ড বই প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্র থেকে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডো', মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরী' এবং '১৯৭১ চট্টগ্রাম' শীর্ষক এলবাম গ্রন্থ।[২৯]

অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল দিনাজপুর। মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুরের ভূমিকা রচনার জন্য ১৯৭২ সালের ২৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুক্তিসংগ্রামে দিনাজপুরের ভূমিকার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ পরিষদ'। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী এমসিএ। পরিষদ ১২ পৃষ্ঠার একটি আবেদন পুস্তিকাও প্রকাশ করে তাতে পরিষদের উদ্দেশ্য, প্রশ্নমালাসহ যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত ছিল। অবশ্য এ উদ্যোগটি সফল হয় নি। এর উদ্যোক্তাদের অনেকে নতুনভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। দিনাজপুরে এ উদ্দেশে গঠিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা' কমিটি। এ কমিটির অবদান 'মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা' গঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। এ কমিটি দিনাজপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা নিয়েছে। বেশ কিছু তথ্যও ইতিমধ্যে জমা হয়েছে।[৩০] তাছাড়া বাংলা একাডেমীর একটি প্রকল্পের আওতায় গতিধারা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ড ঃ মাসুদুল হক ও শাহজাহান আলীর "মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর" গ্রন্থ।

স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্য বড় ও সফল উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তি সংগ্রাম স্মৃতি ট্রাস্ট, সুনামগঞ্জ। ১৯৭২ সালে ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। ১৯৭৯ সালের ৩০ মে ট্রাস্ট গঠিত হয়। ট্রাস্টের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জেলা প্রশাসক এর সভাপতি এবং ৯ জন সদস্য ৩ বছরের জন্য মনোনীত হন। এই ট্রাস্ট তখন থেকে তাদের প্রধান কর্মসূচি হিসেবে সুনামগঞ্জ (বর্তমানে জেলা) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার প্রয়াস নেয়। ট্রাস্ট আরো যে সকল কাজ করে থাকে তাহলো (১) জেলার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলে-মেয়েদের বৃত্তি প্রদান, (২) যুদ্ধাহত ও অক্ষম মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, (৩) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সভা/ সেমিনার করা ও এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা। ১৯৯০ সালে ট্রাস্ট প্রকাশ করেছে 'মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ' গ্রন্থ।[৩১]

স্থানীয় ইতিহাস রচনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য আরো কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। 'শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ উদ্দেশ্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে। চুয়াডাংগা ইতিহাস পরিষদ প্রকাশ করেছে 'মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা' বই (১৯৮৯)।

মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের কাজও উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০ সালে আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রতিষ্ঠা করেন 'মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস প্রকল্প'। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এমন এলাকা থেকে এ সংক্রান্ত নানান তথ্য সংগ্রহ, জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং শহীদদের তালিকা প্রণয়নের ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা। বিভিন্ন থানায় প্রায় ২০০ কর্মী নিরলসভাবে ইতিহাস উদঘাটনের কাজে নিয়োজিত আছেন। এই প্রকল্পের প্রথম গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস-১ম খন্ড' ২০টি এলাকার ইতিহাস নিয়ে লেখা; যা ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি খন্ডে ২০টি থানার ইতিহাস বর্ণিত হবে এবং মোট ১০ খন্ডে তা প্রকাশিত হবে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ মাঝ পথে।[৩২]

মুক্তিযুদ্ধের চর্চার তৃতীয় ধারা হচ্ছে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়া। এ ধারার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সাফল্য লাভ করেছে এবং সমাপ্তির পথে। প্রথম উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি ইতিহাস প্রকল্প গ্রহণ করে। তিন সদস্যবিশিষ্ট এ প্রকল্পের সভাপতি ছিলেন মেজর জেনারেল আমিন আহমদ চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রিপোর্ট, অপরেশন অর্ডার, নির্দেশাবলী, নিয়মিত সৈনিদের তালিকা এবং যুদ্ধের তৎপরতার বেশ কিছু মূল্যবান দলিল সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলো প্রায় ৩০ খন্ডে প্রকাশ করার

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ সময় সৈনিকদের অনেক সাক্ষাৎকার ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করারও উদ্যোগ নেয়া হয়। এ প্রকল্প বছর খানেকের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। এখান থেকে কিছু দলিল ও তথ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে দিয়ে দেয়া হয় বলে মেজর জেনারেল আমিন আহমদ চৌধুরী পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে জানান।[৩৩]

পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন, তাদের জীবন বৃত্তান্ত, যেমন- বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। সেনাবাহিনীর যারা যুদ্ধ করেছিল এমন ১৮,০০০ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬১ হাজার ৫শ ৬২ জন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা ও তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত দলিল সেনাবাহিনীর রেকর্ডরুম থেকে পাওয়া যায়। তবে ৯,০০০ দলিল নষ্ট হয়ে গেছে; যা উদ্ধার করা যায় নি। প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রমাণ্য দলিলগুলো পরে ২০৮টি খন্ডে সংরক্ষিত হয় প্রকাশের জন্য। ময়মনসিংহ জেলা ট্রাস্ট ও ভানকান বাংলাদেশের উদ্যোগে সেসব দলিলের মধ্যে ২৬০৬টি দলিল প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে ৫০০ শহীদের জীবন চরিত দিয়ে 'যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ' বই। এটি ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রথম খন্ড বই। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কয়েক খন্ড বই প্রকাশের ইচ্ছে ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লে. কর্নেল (অব.) জয়নুল আবেদীন বইয়ের ভূমিকায় ব্যক্ত করেন। বইটিতে ট্রাস্টের তালিকাভূক্ত শহীদদের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে। ট্রাস্ট যদি তার উদ্যোগ অব্যাহত রাখে এবং বাকি খন্ডগুলো প্রকাশ করে তাহলে শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাবে।[৩৪]

বাংলাদেশ রাইফেলস থেকে অনুরূপ একটি উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন প্রবীণ রাইফেলস সদস্য, ২ জন তরুণ অফিসার ও সাহিত্যিক ডঃ সুকুমার বিশ্বাসকে নিয়ে পিলখানায় একটি 'ইতিহাস সেল' গঠন করা হয়। ১৯৭৭ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস' বই প্রকাশিত হয়। ৫৪২ পৃষ্ঠার এই বইয়ের ৫টি অধ্যায়। বইটিতে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ভূমিকা রণাংগণের চিত্র বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ৩৪ জন অফিসার ও বাংলাদেশ রাইফেলস-এ কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের ১২২৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাক্ষাৎকারও এতে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর শহীদ ৬৭৯ সদস্যের তালিকাও রয়েছে। কিন্তু বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছার আগেই ১৯৭৭ সালের মে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার উপর রচিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ' শীর্ষক গ্রন্থ।[৩৫]

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা উদ্‌ঘাটনের উদ্যোগ নেয়। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র ১৯৮৬ সালে প্রকাশ করেছে 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়' বই। তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ১৫ খন্ডের দলিলপত্রে ঘাতক দালালদের সম্পর্কে বা তাদের নাম-ভূমিকা ছাপা হয় নি। তাই বলা যায়, বইটি নিঃসন্দেহে গুরুপূর্ণ উদ্যোগ। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র বইটিকে প্রথম খন্ড হিসেবে উল্লেখ করে। আগামীতে ৩ খন্ডে একাত্তরের দালালদের ভূমিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র ১৯৮৯ সালে 'একাত্তরের ঘাতক জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক একটি বইও প্রকাশ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি জরিপের কাজও ১৯৯১ সালে হাতে নিয়েছে। জরিপের ফল কেন্দ্র থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। যদিও ১৯৯১ সালের পর কেন্দ্রের কাজ চোখে পড়ছে না।[৩৬]

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের অনুরূপ একটি উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ। শফিক আহমদের সম্পাদনায় প্রথম খন্ড 'একাত্তরের দালালেরা' বইটিতে ৬০০ দালালের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিভাগ এবং বিশেষ বিভাগ ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইন ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৮) জারি হওয়ার পর থেকে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এই তালিকা প্রকাশ করে। এটি ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে দালাল আইনে অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট আদালতে হাজির হওয়ার সরকারি নোটিস। বাংলাদেশ গেজেটে এই নোটিশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের ৩৭,০০০ অভিযুক্তের নাম ও বিবরণ প্রকাশের ইচ্ছা আছে সংহতি পরিষদের।[৩৭]

এছাড়া ঢাকার সেগুন বাগিচায় অবস্থিত 'মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর' গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে; এর রয়েছে নিয়মিত প্রকাশনা। বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে 'স্মৃতি-৭১' নামে ১৩ খন্ড বই এবং বাংলাদেশ চর্চা প্রকাশ করেছে 'গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' নামে তিন খন্ডের বই।

স্বাধীনতার পর মানুষের চরম হতাশা, '৭৫ পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংকট এবং ইতিহাসের তথ্য বিকৃতি সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধচর্চা অব্যাহত থেকেছে। প্রত্যেক সচেতন বাঙালিমাত্রই চান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হোক। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে বহু উদ্যোগ নেয়া হলেও কাজটি তেমন অগ্রসর হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে মুক্তিযুদ্ধচর্চা হলেও কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠানের অভাবে এই চর্চা একটি বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে। আজ তাই স্পষ্ট, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পূর্বশর্ত। অনেক মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক এখানো জীবিত আছেন। তাছাড়া এখনো অনেকের সংগ্রহ ভান্ডারে প্রচুর ইতিহাসের মাল-মসলা সংরক্ষিত আছে। এভাবে মৌখিক বিবরণী ও তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তথ্যভান্ডারকে যদি জড়ো করা যায় এবং একে কাজে লাগানো যায় তবে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা এখনো কঠিন নয়।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী সরকারি উদ্যোগে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঃ দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ' প্রকল্প গ্রহণ করে। এটিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণ ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হাসান হাফিজুর রহমানের কাজের পরে সর্ববৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিলো সর্বমোট ৯১টি গ্রন্থ প্রকাশ করা। এগুলো হলো- ইতোপূর্বে প্রকাশিত ১৫ খন্ডের দলিলপত্রের বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ও নতুন ৪টি দলিল খন্ড প্রণয়ন ও প্রকাশ, জেলা ভিত্তিক ৬৪টি ইতিহাস গ্রন্থ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী ও নৌ কমান্ডো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিশু ও কিশোর, বাংলাদেশের প্রথম সরকার ঃ মুজিবনগর সরকার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বহির্বিশ্ব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর সচিত্র দ্বিভাষিক এ্যালবাম। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১৬ জন গবেষণা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।[৩৯]

এ প্রকল্পের কাজ অনেক দূর এগোয়। ১৫ খন্ডের দলিলগ্রন্থ পরিমার্জনের জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা গবেষকবৃন্দের সহায়তায় পরিমার্জনের কাজ প্রায় শেষ করেন। এছাড়া 'কাটলা যুব অভ্যর্থনা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প' শীর্ষক আরো একটি নতুন দলিল খন্ড চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়। ৬৪টি জেলার ভেতর ৫০টির বেশি পান্ডুলিপি জমা হয়। এছাড়া নৌবাহিনী ও নৌকমান্ডো, মুক্তিযুদ্ধে নারী, মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি-পান্ডুলিপিগুলিও চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন হয়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। সরকারের রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী তখন এ প্রকল্প স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিসহ ২০০২ সালের জুন মাসে নবগঠিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হয়।[৪০]

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পের পিপি (Project Proforma) সংশোধন করার সময় নতুনভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। পূর্বের ৯১টি গ্রন্থ প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে ২৮টি গ্রন্থ প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণপূর্বক পিপি সংশোধন করা হয়। নতুন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৫ খন্ডের দলিলপত্র পরিমার্জনের পরিবর্তে কেবল পুনর্মুদ্রণ, সেক্টরভিত্তিক ১১টি ও ব্রিগেডভিত্তিক ১টি এবং মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি এ্যালবাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৫ খন্ডের দলিল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণসহ সেক্টরভিত্তিক ১১টি ও ব্রিগেডভিত্তিক এসব গ্রন্থে সামরিকবাহিনীর কার্যক্রমই বেশি স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি। এ সমস্ত গ্রন্থে নারী ও শিশু-কিশোরদের এবং বাংলার কৃষকদের মুক্তিযুদ্ধের তথ্যের অনুপস্থিতি দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নারী, শিশু-কিশোর ও কৃষকদের তথ্য ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্ত অন্যান্য দেশের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য, তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক কর্মকান্ড ও তৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ে এখনও তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।[৪১]

(iv) <u>মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রণীত সামগ্রিক রচনার বিষয়ে বলা যায় যে</u>, স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিলো। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৫ সময়কালে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশকিছু লেখালেখি হয়। ১৯৭৫-৯০ সামরিক শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশনা কমে যায়। নব্বইয়ের পর লেখালেখি আবার শুরু হয় এবং ১৯৯৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে কম-বেশি মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশনা পাওয়া যেতে থাকে। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী আয়োজিত একুশের আলোচনা অনুষ্ঠানে এক তথ্যে আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন জানান যে, ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১২০০।[৪২] 'বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী'-তে প্রায় ৯০০ বইয়ের তালিকা এবং বেশ কিছু বইয়ের আলোচনা আছে। এছাড়া "A Select Biblography of English Language Periodical Literature" গ্রন্থে ইংরেজিতে ৩৪১টি প্রবন্ধের পঞ্জি তৈরি করেন জায়েদ এল. রহিম ও এনায়েতুর রহিম। ২০১০ সালে এসে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা যে কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৬শে মার্চ ২০০৮-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আলোচনা সভায় অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম সভাপতির ভাষণে জানান যে, মুক্তিযুদ্ধের ওপর ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক প্রায় বার হাজারের মতো।[৪৩] এ সকল বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন, প্রবাসী সরকার ও প্রবাসে বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশের প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তানপন্থিদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ, সশস্ত্র সংগ্রাম, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ, দলিলপত্র ও আলোকচিত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, সঙ্গীত ও নাটক অন্তর্গত। এছাড়া শিশু-কিশোর রচনাবলি রয়েছে। এ সমস্ত বইয়ের কিছু সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে মুক্তিযুদ্ধের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত এই সকল গ্রন্থকে প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ১০টি শ্রেণীতে বিভাজিত করেছেন ঃ

১. বৈশ্বিক প্রেক্ষপটে মুক্তিযুদ্ধ
২. মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

৩. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীর ভূমিকা
৪. বিদেশীর দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ
৬. মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন
৭. অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ
৮. জেলা বা শহর পর্যায় মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা
৯. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
১০. মুক্তিযুদ্ধের রচনাবলি সংক্রান্ত[৪৪]

প্রফেসর ডঃ মুনতাসীর মামুন এই বিভাজন করেছেন ৮টি ভাগে ঃ

১. মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন
২. অবরুদ্ধ দেশ
৩. ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার (সংগঠন)
৪. রণাঙ্গন
৫. আঞ্চলিক ইতিহাস
৬. জনপ্রতিক্রিয়া
৭. শত্রু কথন
৮. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ

অবশ্য এ বিভাজনকে তিনি খুব একটা বিজ্ঞানসম্মত নয় বলেও উল্লেখ করেছেন।[৪৫]

অন্যদিকে প্রফেসর ডঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জিকে ১১টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি
২. মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস
৩. প্রবাসী সরকার ও প্রবাসে বাঙালির প্রতিক্রিয়া
৪. মুক্তিযুদ্ধে বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া
৫. পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থিদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ
৬. মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রাম
৭. অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ
৮. দলিলপত্র ও আলোকচিত্র
৯. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ
১০. সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ
১১. মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য বই

উল্লেখিত বিভাজন বইগুলোর প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে হয়েছে। এটা নির্দিষ্টভাবে হয়তো বিজ্ঞানসম্মত নয়। এ বিভাজন বা শিরোণাম নির্বাচন ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হচ্ছে বইটি পড়ে বা মোটামুটি ধারণা নিয়ে বইটির চরিত্র বা প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এমন বই আছে যেটা একই সঙ্গে একাধিক শিরোণামভূক্ত হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বেশিরভাগ বই-ই বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণ বিশেষ নেই বললেই চলে। স্মৃতিচারণ বা ধারাবিবরণীমূলক বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। স্মৃতিচারণকারী বা ধারাবর্ণনাকারীর অধিকাংশই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন, প্রবাসী সরকার কিংবা প্রবাসে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা অনেকে স্মৃতি তুলে ধরেছেন গ্রন্থাকারে। তাই এ বইগুলো থেকে সমকালীন রাজনীতি, যুদ্ধের অবস্থা, সাংগঠনিক দিকের বিবরণ ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবে স্মৃতিচারণমূলক লেখার ক্ষেত্রে কিছুটা সচেতন থাকতে হয়। কারণ লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা পক্ষপাতের বিষয়গুলোও কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আবার এ ধারার কিছু কিছু বইয়ে ব্যক্তিগত আবেদন যতোটা ফুটে উঠেছে বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক তথ্য ততোটা স্থান পায় নি। কোন কোন লেখকের নিজস্ব 'আমিত্ব' বা নিজস্ব ভূমিকার অতিরঞ্জণ প্রকাশ প্রবণতাও লক্ষণীয়। কোন কোন বই একপেশে, ঘটনার বিবরণ পরিবেশনার ক্ষেত্রে শৃংখলা ও বিন্যাসের অভাবদুষ্ট। তবে স্মৃতিচারণমূলক বইগুলোর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে এবং সচেতনতার সঙ্গে গ্রহণ করলে মূল্যবান তথ্যাবলী পাওয়া যাবে।[৪৬]

(v) মূল্যায়ন ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর এ পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে তাকে পর্যাপ্ত বলা না গেলেও নেহাত সামান্য এটাও বলা যাবে না। এর ভেতর মানসম্মত লেখার সংখ্যা অবশ্য কমই বলা চলে। তাছাড়া অনেক লেখারই নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ হল একটা দিক। অন্যদিকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এসব লেখাকে বিশেষজ্ঞরা ইতিহাস হিসেবে গ্রহণের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে বিতর্ক করে থাকেন। একাংশ মনে করেন এই লেখাগুলো আসলে ইতিহাস নয় বরং ইতিহাসের উৎস মাত্র। আবার অনেকে মনে করেন এ লেখাগুলোর সবক'টি হয়ত ইতিহাস নয় কিন্তু অনেকগুলোকেই ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায়। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মুক্তিযুদ্ধের উপর লিখিত সব গ্রন্থকে ইতিহাসের মর্যাদা দেয়া সম্ভব নয় একারণে যে ইতিহাস হতে গেলে কিছু নিয়ম-কানুনের ভেতর দিয়ে যাবার প্রশ্ন আছে। এর ভেতর সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতা। নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব কিন্তু এসব গ্রন্থের ভেতর প্রায়ই প্রকটভাবে চোখে পড়ে। এ হিসেবে এটাও মেনে নিতে হয় যে এখন পর্যন্ত এ মানদন্ডে বিচার করার মতো কোন ইতিহাস রচিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞ এমন অভিমতই দিয়ে থাকেন। তবে এ প্রসঙ্গে এটাও বলে নেয়া দরকার যে, কোন ব্যক্তি লেখকের পক্ষেই ইতিহাস তত্ত্বের দাবি অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব নয়। এতটুকু সতর্ক থাকলে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের উপর ভাল গ্রন্থ কিংবা গবেষণা কর্ম লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের কোন ইতিহাস এখন পর্যন্ত লেখাই হয়নি ধরনের বক্তব্য খুব গ্রহণযোগ্য নয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লেখালেখির কারণে এর ইতিহাস যেমন অল্পবিস্তর হলেও পুনর্গঠিত হয়েছে তেমন অনেক কিছুই বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অনেক পেশাদার ঐতিহাসিক এবং গবেষকও এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত আছেন। এ পর্যায়ে এই সঙ্গে যে কথাটি বলা দরকার সেটা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। খন্ড কাজের ভেতরই এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছে। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। এখন দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত কতদিনে মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়।

মুক্তিযুদ্ধের উপর কৃত গবেষণা এবং প্রকাশিত গ্রন্থগুলো বিচার করে দেখা যায়, এক একজন লেখক-গবেষক এক একটি দিকের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন হবার কারণও বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধ একটি বিরাট প্রেক্ষাপটের উপর সৃষ্ট বিষয়। এটার শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক বিষয়ই নয় বরং একই সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক প্রভৃতিসহ আরো অনেক কারণ বিদ্যমান। এর একটি বা কয়েকটি বিষয় লেখকদের নিকট প্রাধান্য পেয়েছে। যে লেখক যে বিষয়ে অভিজ্ঞ বা যে বিষয়টির তিনি বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন সেটাই মুখ্য বিষয় হিসেবে তাঁর লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে। একজন লেখক এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধকে একটি অখন্ড ইতিহাস পুনর্গঠনের আওতায় আনতে পারেন নি।

সারা বিশ্বে যত ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা করেছেন তারা সবাই এই যুদ্ধকে একই দৃষ্টিতে বিচার করেন নি। দেশী বা বিদেশী যারাই এ বিষয়ে কাজ করেছেন তারা সবাই একটি নির্দিষ্ট দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এঁদের সবাই মুক্তিযুদ্ধের উপর একই রকম মনোভাব পোষণ করেন নি। বাংলাদেশের লেখকরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একে ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। শুধু বাংলাদেশী লেখকরা নয় একই সঙ্গে ভারতীয় এবং অন্যান্য বিদেশী লেখকদের ভেতরও মুক্তিযুদ্ধকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করতে দেখা যায়। একমাত্র পাকিস্তানি লেখকরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করে থাকেন। তারা অনেকটা আত্মরক্ষার আকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠন করেছেন।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠন সম্ভব হয়নি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া কঠিন। প্রথমত মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের দায় এদেশের মানুষের। অন্য কোন দেশের লেখকদের এ বিষয়ে দায় নেই। তাদের নিকট থেকে যতোটা পাওয়া যায় ততোটা তাঁরা করেছেন নিজেদের প্রয়োজনে বা গবেষণার স্বার্থে। অতএব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রশ্নে বিদেশীদের প্রচেষ্টার বিষয়টিকে আমাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা চলবে না। দ্বিতীয়ত এখন পর্যন্ত সেই অর্থে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের তেমন কোন উদ্যোগ কেউই গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এমন একটা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠিত না হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির প্রশ্ন ওঠে সেটারও কারণ ঐ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠিত না হওয়া। বিভিন্ন ব্যক্তির লেখায় প্রায়ই তথ্য বিকৃতি অথবা নিরপেক্ষতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। বিদেশী লেখকদের লেখায় বিকৃতির প্রশ্নটি ক্ষেত্র বিশেষ দেখা যায়। পাকিস্তানী লেখকদের লেখায় বলাই বাহুল্য প্রচুর বিকৃতি বিদ্যমান। এদের লেখার মাধ্যমে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়াটাও অসম্ভব নয়। পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি পাকিস্তানী লেখকদের লেখার মাধ্যমে ক্ষুন্ন হতে পারে। তাছাড়া এসব গ্রন্থ পশ্চিমা বিশ্বের লেখকরা তাদের গবেষণায় যথেষ্টভাবে ব্যবহার করলে বড় ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া সম্ভব। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠন যেমন প্রয়োজন, তেমনি এর ইংরেজি সংস্করণও তৈরি করা দরকার। এতে করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অনেক জটিলতা থেকে আমরা বাঁচতে পারব।

মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস চর্চা হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকটাই ব্যক্তি উদ্যোগে। এ কারণে এসব ইতিহাস চর্চার ভেতর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ফুটে উঠছে না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য ব্যক্তি উদ্যোগের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও প্রয়োজন। আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে এই শব্দটি যত ব্যবহার হয়েছে এর ইতিহাস পুনর্গঠনের ততটা প্রয়াস কখনোই চালানো হয় নি। এদেশে ইতিহাসবিদদের সংখ্যা কম নয়। তারাও এক্ষেত্রে খুব একটা কিছু করতে পেয়েছেন এখন পর্যন্ত সেটা বলা কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ এদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে। অথচ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুক্তিযুদ্ধের উপর এখন পর্যন্ত কোন স্মরণীয় গবেষণা হয়েছে তেমন শোনা যায় নি। পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় যতটা স্থান পেয়েছে বা যেভাবে পড়ানো হয় সেটাকে খুব সাধুবাদ জানানো যাবে কি না সন্দেহ আছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় আরো গুরুত্বের সাথে পড়ানো দরকার ছিল। আমাদের প্রয়োজনের নিরিখে মুক্তিযুদ্ধের ভেতরের বিষয়গুলো গবেষণামূলকভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। মুক্তিযুদ্ধের তাত্ত্বিক দিক, ব্যবস্থাপনাগত বিষয়, কৌশলগত দিক, রাজনৈতিক ঘটনা ধারায়, আন্তর্জাতিক মেরুকরণ গবেষণামূলকভাবে তুলে ধরার অবকাশ আছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বার্থে এর প্রয়োজনীয়তা অসীম।

আবার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রশ্নে আসা যাক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য একটি বড় অন্তরায় হচ্ছে অর্থ এবং যথার্থ অবকাঠামোর অপ্রতুলতা। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বা কোন ছোট ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অসম্ভব। এজন্য যে বিশাল ব্যয়, লোকবল এবং অবকাঠামোগত সুবিধার প্রয়োজন তা কেবল একটি বড় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সরবরাহ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরী। একটি শক্তিশালী মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে এ পথে যাত্রা হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প এমন একটা প্রচেষ্টা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের কাজ দলিলপত্র সংকলনের ভেতরই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটিও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। এটা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে ভাল হত। এখন দ্রুত একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এ সম্পর্কে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। দেরি হলে অনেক তথ্য, সাক্ষী, অনেক কিছুই বিস্মৃতির অতলে চলে যেতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার যে গতিধারা এখন পর্যন্ত প্রবহমান সেটা নানাভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কে উন্মোচিত করেছে। এর ভেতর জটিলতা, নিরপেক্ষতার অভাব, তথ্য-উপাত্তের বিকৃতির বিষয়ও যে নেই, তা নয়। এখন প্রয়োজন একটি গঠনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সব গবেষণা কর্ম, প্রকাশিত গ্রন্থ, নানা তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠন করা।

গ) গবেষণার সার-সংক্ষেপ ঃ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অতর্কিত নিধনযজ্ঞ শুরু হলে কাল বিলম্ব না করে স্বদেশের মত প্রবাসে অবস্থানরত বাঙালিরা প্রতিবাদে মেতে ওঠেন দেশ মাতৃকার মুক্তি কামনায়। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিরা সর্ব প্রথম এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। হাজার হাজার বাঙালি শত শত সমিতি গঠন, পত্রিকা প্রকাশ, প্লাকার্ড প্রদর্শন, অবস্থান ধর্মঘট, সভা-সমিতি, বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস, জাতিসংঘ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সাথে মত বিনিময়, বিভিন্ন দেশের পালার্মেন্ট সদস্যদের নিয়ে সমিতি গঠন, বিভিন্ন পেশাজীবী- ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, আইনজীবী ইত্যাদির সমন্বয়ে সমিতি গঠনপূর্বক প্রতিবাদে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, জনমত গঠন করে তৎকালীন পাক-শাসকদের নিন্দা ও সমালোচনার মাধ্যমে ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছেন। আর এ সকল কর্ম সম্পাদনে তৎকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত প্রায় দুই শতাধিক বাঙালি নিজ নিজ পেশা ছেড়ে জড়ো হয়েছেন দেশ মাতৃকার মুক্তিকামনার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে। তাদের অপরিসীম ত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টায় সারা বিশ্বে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। স্ব-মহিমায় তারা পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন, আদায় করেছেন বিভিন্ন দেশের মৌণ সমর্থন যা পরবর্তীকালে স্বীকৃতিতে রূপ নিয়েছে।

আর এসব নেতৃবৃন্দের মাঝে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তৎকালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক মানবধিকার কমিশনে যোগদানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রখ্যাত আইনজীবী পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বেই অপরিসীম ধৈর্য্য ও সাহসিকতায় গঠিত হয়েছে প্রবাসে (যুক্তরাজ্যে) বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তিনি গঠন করেছেন অত্যন্ত সুসংগঠিত পরিচালনা কমিটি। যুক্তরাজ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাজের দু'টি ধারা উপলব্ধি করা যায়। একদিকে যুক্তরাজ্যে নানা দলমতে বিভক্ত বাঙালি জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন; মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তেমনি করে প্রত্যয় ও ঐক্যের মন্ত্রে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের। ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে তিনি প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন এবং ২৭ আগষ্ট, ১৯৭১ সালে লন্ডনে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করেন। এর ফলে তাঁর সমগ্র কর্মধারাও একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ লাভ করে। তাঁর কর্মের দ্বিতীয় ধারায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি রূপে তিনি যুক্তরাজ্য ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও ডেনমার্কে গিয়ে সেসব দেশের সরকার, জনপ্রতিনিধি, বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির দূতাবাস এবং সাইপ্রাস, যুগোস্লোভাকিয়া ও আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস এসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ, অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, সোসালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্ট, এইড কনসোর্টিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব সোসালিস্ট ইয়থ ও কমনওয়েলথ সচিবালয়ের মতো আন্তর্জাতিক সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে প্রচার চালাতে পনের সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতারূপে জাতিসংঘে গমন করেন। জাতিসংঘে এই প্রচেষ্টা চালাবার সময়েই বাংলাদেশের মুক্তিলাভের সংবাদ সেখানে পৌঁছায়।

ঘ) গবেষণার যৌক্তিকতা ও পরিধি ঃ

বাঙালি জাতির রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের পেছনে প্রবাসী বাঙালি বিশেষ করে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালিদের অবদান কতখানি, লন্ডনে ঘাঁটি করে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রবাসে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন-এই সত্য জানার আগ্রহ আজ ও আগামী প্রজন্মের পাঠক, গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের নিকট গবেষণালব্ধ ও ঐতিহাসিক বিশেষণপূর্বক বর্ণনা পৌঁছে দেবার অবকাশ আছে; যা এতকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাছাড়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে স্নায়ুযুদ্ধের ফলে সমগ্র বিশ্ব 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'পুঁজিবাদী' ব্লকে বিভক্ত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট মিত্র এবং পুজিঁবাদী ব্লকের রাষ্ট্র হয়েও যুক্তরাজ্য কোন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্দোলনের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাতি লাভ করলো? কোন অবস্থায় বৃটেনের সরকার পাকিস্তানের ঘনিষ্ট মিত্র হয়েও বাঙালির মুক্তি আন্দোলন স্তব্দ না করে বরং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারীদের বিভিন্নভাবে সুরক্ষা করেছেন। কোন যুক্তিতে ১৯৭১ সাল জুড়ে বৃটিশ গণমাধ্যমের প্রধান শিরোণাম হয়ে ওঠে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ? কোন আকর্ষণে বৃটেনের জনসাধারণ বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে সর্বত্র সাহায্যের জন্য রাস্তায় নেমেছিল? এ প্রশ্নগুলোর জবাব বের হয়ে আসবে এ গবেষণা কাজ থেকে। এই গবেষণার ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে কী কী যুক্তিতে কতিপয় ব্যক্তি বাঙালি হয়েও পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন? পাকিস্তানিদের সে আগ্রাসন বাঙালি মুক্তিকামী মানুষ কোন কৌশলে মোকাবেলা করে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিক দাবী সফলভাবে প্রচারলাভে সক্ষম হয়েছিলেন? সর্বোপরি সহায়-সম্বলহীন অসহায় বাঙালি প্রবাসীরা নানা দলমত ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকেও কোন মন্ত্রবলে মুহূর্তের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, শত-সহস্র বাঁধা ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাঁদের ক্লান্ত করতে পারেনি বরং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত তাঁরা ব্যক্তি স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন? যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ভারতীয় ও সোভিয়েত নাগরিকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তরাজ্যস্থ চীনাপন্থী বাঙালি এবং চীনের নাগরিক ও পাকিস্তানপন্থী মার্কিনীদের যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা কিভাবে মোকাবেলা করেছিলেন ইত্যাদি বিষয় এ গবেষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা সম্পর্কেও জানা যাবে আলোচিত গবেষণা থেকে।

এছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার মূল্যায়ন আজো হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ১৯৭১ সালে যখন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই সময় ক্ষেপণ না করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ ত্যাগ করে স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন হয়ে উঠেন-তাঁর এ মানবিকতার স্বরূপ উৎঘাটিত হওয়া দরকার। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বিলেতে প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি, বিদেশে জনমত গঠন করেছিলেন, প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রবাসে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের; তাঁর সেই ভূমিকাই তাঁকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে দেবার জন্য যথেষ্ট। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিপক্ষ তাঁর জীবননাশের হুমকি প্রদর্শন করেছে, দেখিয়েছে নানা রকম লোভ-লালসা, প্রহরায় রয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। জীবন যার ছিল বিপদ সংকুল, কর্তব্য যার ছিল গুরুগম্ভীর, ব্যক্তিত্ব যার ছিল এমন সংগ্রামী-তাঁর নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে অনুজ্জ্বল রয়ে গেছে। বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে একজন নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবদান সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে গবেষণার বিকল্প নেই। এ সকল প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণ কয়েকটি গবেষণাকর্মে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ সব গবেষণাকর্ম পূর্ণাঙ্গ নয়। কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১' (তিন খন্ড বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭) বাংলাদেশের অধুনিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ১৭০৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিন খন্ডে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক খন্ডে 'মুক্তিযুদ্ধঃ বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজিত আছে। এই সাথে মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা শীর্ষক একটি অধ্যায় থাকা উচিৎ ছিল বলে মনে করি বিধায় শিরোণামভূক্ত বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ প্রকাশ করি। এ গবেষণায় গ্রন্থখানি মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২। আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর গ্রন্থ "স্মৃতি অম্লান ১৯৭১" (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৬) প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন সুপন্ডিত লেখক উন্নয়ন, জনপ্রশাসন, অর্থ এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ লিখে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভকালে

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে তিনি ছিলেন ইকোনমিক কাউন্সিলার। একজন পদস্থ আমলা হিসেবে পাকিস্তানের প্রখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে এসে পাকিস্তানের রাজনীতির অভ্যন্তরীণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত হয়েছেন; যা এ গ্রন্থে বিধৃত করেছেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সপক্ষে বিভিন্ন জন ও সংস্থার সক্রিয়তা, জাতিসংঘ, শরণার্থী, হাইকমিশনে জড়িত থাকা ও মুক্তিযুদ্ধের আট মাস একজন কংগ্রেসনেল লবিস্ট থাকাবস্থায় তাঁর অভিজ্ঞতা এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। অকপটে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ওয়াশিংটনে বাঙালি সমিতির উদ্যোগ, আমেরিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঞ্চয়ন, ফিলাডেলফিয়ার ফ্রেন্ডস অব ইষ্ট বেঙ্গল এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারের কার্যকলাপও লিবিবদ্ধ করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ব্যাখ্যাসহ প্রবাসে আন্দোলনকারী বাঙালি সমাজের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কূটনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের তথ্যে ভরপুর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণের অজস্র উপাত্ত তাঁর বর্ণনায় থাকলেও শিরোণামভূক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে খুবই সামান্য। তাঁর অপর গ্রন্থ 'বাংলাদেশঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব' (ঢাকা, জানুয়ারী-২০০০ইং) গ্রন্থেও শিরোণামভূক্ত বিষয়ে মাত্র একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন যা আরো গভীর অনুসন্ধান এবং বিস্তারিত গবেষণার দাবী রাখে।

৩। মওদুদ আহমদ-এর গ্রন্থ 'বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা' (ঢাকা ১৯৭৬, অনুবাদক জগলুল আলম) ইংরেজীতে লেখা এ গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মওদুদ আহমদ একজন বিখ্যাত আইনজীবী। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আইনজীবীই শুধু ছিলেন না, একই সঙ্গে ডিফেন্স টিম গঠনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ষাটের দশকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সমালোচকদের মতে তাঁর গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা তথ্য হিসেবে নতুন এবং প্রথম প্রকাশিত হল। গ্রন্থের সময়কাল ১৯৪৭-৭১। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এদেশের মানুষ তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তান আমলে মুক্তিযুদ্ধের যে বিরাট প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল, আর এর সাথে রাজনীতির যে জটিল গতিপ্রকৃতি ছিল সেটা এ গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংকটের সূচনা, ১৯৫৬ সালের সংবিধান, ১৯৬২ সালের সংবিধান, ছয়দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর মহা গণঅভ্যূত্থান এবং '৭০ সালের নির্বাচন যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধসহ অনেক বিষয় গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করালেও বর্তমান গবেষণার শিরোণামভূক্ত বিষয় সম্পর্কে আলাদা কোন বর্ণনা না থাকায় এ বিষয়ে গবেষণার অবকাশ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি এ গবেষণার পটভূমি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। মঈদুল হাসান-এর গ্রন্থ 'মূলধারা-৭১' (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬)। সমালোচকরা অভিমত দিয়ে থাকেন মুক্তিযুদ্ধের উপর এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। লেখক মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন সুযোগে তিনি মুজিবনগর সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী- প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, ভারতের সাথে বিভিন্ন দেন-দরবার প্রভৃতিও কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। পুরো গ্রন্থ জুড়ে গবেষণার ছাপ স্পষ্টতই চোখে পড়ে। গ্রন্থটি শুরু হয়েছে বাংলাদেশের সমসাময়িক সময়কে কেন্দ্র করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখেছেন তিনি। গ্রন্থটিতে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংকট ও সংঘাত, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা, স্নায়ুযুদ্ধকালীন দ্বিকেন্দ্রিক বিশ্বের আন্তর্জাতিক জটিল রাজনীতির মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। লেখক প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদের ব্যক্তিগত সহকারী থাকার সুবাদে অনেক গোপন তথ্য গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত করেছেন; যা আগে কোন গ্রন্থে পরিবেশিত হয় নি। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকারের মনোভাবকে যেমন বাংলাদেশের অনুকূলে রাখতে হয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনমত সৃষ্টি, রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ, তাদের মনোভাব, মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল করার উদ্যোগ নিতে হয়েছে। এর সবক'টি বিষয়ই মঈদুল হাসানের লেখার ভেতর উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভারত ও রাশিয়ার ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণার শিরোনামভূক্ত বিষয় 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা না থাকায় শিরোণামভূক্ত বিষয়ে গবেষণার দাবীর যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গ্রন্থটিকে এ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-এর গ্রন্থ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা' মুক্তিযুদ্ধের একটি আকর গ্রন্থ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়টা ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন সময়ের ভেতর। সে সময় পৃথিবী ছিল পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভক্ত। এ কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপরও এই বিশ্ব রাজনীতির প্রভাব পড়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অভিজ্ঞ লেখক এই সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারত এবং তার সাথে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমিকা রেখেছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল চীন, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তিগুলো। সে সময় পরাশক্তিগুলোর ভেতর রাজনীতির যে জটিল হিসেব-নিকেশ চলছিল মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তার বাইরে থাকতে পারেনি। ভূ-রাজনীতির হিসেব এবং আপন প্রভাব রক্ষার প্রশ্নছিল ছিল পরাশক্তিগুলোর সামনে। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

পরাশক্তিগুলোর জটিল অবস্থান সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। বর্তমান গবেষণায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় রেখেছেন অনবদ্য অবদান। তাঁদের সেই ভূমিকা বিশ্লেষণে গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৬। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' (ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা ১৯৯০) একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। লেখক মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত ছিলেন। লন্ডনে তিনি বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত করেন এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের মুক্তির আকাঙ্খা ও পকবাহিনীর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে লেখকের যথেষ্ট অবদান ছিলো। গ্রন্থটিতে লন্ডনভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে লেখক ও প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে অবদান ছিল তার বিবরণে ভরপুর। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন নি। ফলে শিরোনামভূক্ত বিষয়ের গবেষণার যৌক্তিকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ গ্রন্থটি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। ডঃ খন্দোকার মোশারফ হোসেন-এর গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান' (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, বাংলা বাজার ঢাকা, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮)। লেখক মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যস্থ বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সদস্য ছিলেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অন্যতম সহযোগী হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। গ্রন্থে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনলাভে এবং বাঙালিদের ন্যায্য দাবির প্রতি বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে যে বিশাল অবদান রেখেছিল তার একটি প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবাসী বাঙালিদের পাশাপাশি বিলাতের পত্র-পত্রিকা, বৃটিশ পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের এবং বৃটিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদানের বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু লন্ডন আন্দোলনে বিলাত প্রবাসী বাঙালি ও বৃটিশ সমর্থকদের কর্মকান্ড, আন্তর্জার্তিক সমর্থন লাভের কৌশল, লবিং, ধর্ণা, বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ এবং কূটনৈতিক কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় বাঙালিদের ন্যায্য দাবির সমর্থন এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট বাংলাদেশ ইস্যুকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছে তা এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কঠিন জীবন ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল তা এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে শিরোণামভূক্ত বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতার দাবী জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থটি এ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। শেখ আবদুল মান্নানের গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালির অবদান' (জ্যোৎস্না পাবলিসার্স, ঢাকা-১৯৯৮) মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখকের জন্মস্থান টুংগীপাড়ায় হওয়ায় বাল্যকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহচার্য লাভ করেছেন। কলেজ জীবনে ঢাকায় প্রগতি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী লেখক ষাটের দশকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যুক্তরাজ্য গমন করেন। প্রথম জীবনে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও যুক্তরাজ্যে গমনের পর প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৬১-৬২ সালে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ; লন্ডনে পাকিস্তান স্টাডি সার্কেলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সভাপতি, 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউকে'-এর সাধারণ সম্পাদক; ১৯৭১ সালে কভেন্ট্রি সম্মেলনে গঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্য; লন্ডনে প্রকাশিত অর্ধ-সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'মশাল'-এর প্রধান সম্পাদক (১৯৬৯-৭০); মাসিক পত্রিকা 'পদ্মা'র প্রধান সম্পাদক (১৯৬৯-৭১), কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সবচেয়ে ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে লন্ডন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত সু-নিপুণভাবে বর্ণনা করায় বর্তমান গবেষণায় গ্রন্থটিকে শিরোণামভূক্ত বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৯। অধ্যাপক রেহমান সোবহান-এর গ্রন্থ 'বাংলাদেশের অভ্যূদয়ঃ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য' (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-দ্বিতীয় মূদ্রণ-২০০৮) মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচারণ। লেখক বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ। ষাটের দশকের গোড়ায় অকাট্য যুক্তি ও তথ্য সহকারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের উপনিবেশবাদী আচরণ, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের স্বরূপ যারা উদঘাটন করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যমত। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাসকেই লেখক অত্যন্ত যত্ন ও প্রচুর তথ্য সহযোগে তুলে ধরেছেন। এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে তুলে ধরেছেন তাঁর সেই অভিজ্ঞতা যা তিনি অর্জন করেছিলেন অন্যান্য অনেকের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন দিনগুলোতে বিদেশে জনমত সংগঠনে অংশ গ্রহণ করে। ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে, জাতিসংঘে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি একদিকে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও

বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেছেন অন্যদিকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ও সেখানকার প্রেসের মোকাবেলা করেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর সেই ভূমিকার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন শিরোণামভুক্ত বিষয়ে গবেষণা কতখানি আবশ্যক। ফলে এ বিষয়ে গবেষণা হতে পারে।

১০। তাজুল মোহাম্মদ-এর গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ' (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-২০০১ইং)-মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ভূমিকা বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধীমান গবেষক লেখক তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমসাপেক্ষে তথ্যানুসন্ধানের কাজে একনিষ্ঠভাবে ব্রতী থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশ কিছু স্মরণীয় গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। সম্প্রতি প্রবাসী জীবন বরণ করলেও তাঁর সেই অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক শ্রমশীলতায় যে কোন ঘাটতি দেখা দেয় নি, সেই প্রমাণ বহন করছে গ্রন্থখানি। মুক্তিযুদ্ধের বহুধা বিস্তৃত মাত্রা অনুভবের জন্য লেখক একদা সিলেটের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন, সেই একই তাগিদ থেকে এবার তিনি প্রবাসী বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রবাসী বাঙালি সমাজের কর্মকান্ডের একটি মূল্যবান বিবরণী এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন যা বর্তমান গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। আবদুল মতিনের গ্রন্থ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি বাংলাদেশঃ ১৯৭১' (র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন-ঢাকা, ১৯৮৯) এবং 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিঃ যুক্তরাজ্য' (গ্রন্থস্বত্ব মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, ঢাকা- সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-২০০৫) গ্রন্থ দু'টি মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ। লন্ডন প্রবাসী বাঙালি সাংবাদিক আবদুল মতিনের গ্রন্থ দু'টিতে মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা কী ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। উভয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'পূর্বাভাস' শিরোণামে একটি করে অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ষাটের দশক থেকে বিশেষ করে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী বাংলাদেশের আন্দোলনের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালির একাত্মতা ঘোষণার চিত্র তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রবাসী বাঙালিরা কিভাবে চাঁদা সংগ্রহ, পত্রিকা-লিফলেট প্রকাশ, মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ প্রদর্শন দ্বারা জনমত সৃষ্টির তথ্যাদির কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থ দু'টির আরো একটি মূল্যবান দিক হচ্ছে কোন কোন প্রগতিশীল পাকিস্তানী বিশেষ করে সাংবাদিক সাদেক জাফরী এবং প্রাক্তন এয়ার কমোডোর জানুজুয়ারের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন, অন্যদিকে কতিপয় বাঙালি বিশেষ করে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ও ডঃ মোহর আলীর স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা বিষয়ও আলোচনায় এনেছেন। তবে তিনি সাংবাদিকের মনোভঙ্গির উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। বর্তমান গবেষণায় গ্রন্থ দু'টিকে মূল্যবান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১২। নুরুল ইসলাম-এর 'প্রবাসীর কথা' (প্রবাসী পাবলিকেশনস, সুরমা ম্যানশন, সিলেট) বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের অভিবাসন-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কারণ সহ জীবন-মান, প্রবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং তার-ই পটভূমিকায় প্রবাসী বাঙালিদের জীবন সংগ্রাম ও স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত কাহিনীতে ভরপুর যেন এক বিশ্বকোষ। সুদীর্ঘ এক যুগের সাধনায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থের লেখক নুরুল ইসলাম সিলেটের পূণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করা আজীবন সংগ্রামী এক বীরপুরুষ। হযরত শাহ জালাল (রঃ) এর অধস্তন উত্তর পুরুষ সিলেটের এম. সি. কলেজের বি. এ. শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি হয়। তিনি বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এঁর একই এলাকার, সহপাঠি ও ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র অবস্থায় 'ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল' ডিগ্রির জন্য তিনি বিলাত গমন করেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এক দশক ব্যাপী বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি অগ্র সৈনিকের মত সংগঠিত করেছেন প্রবাসী বাঙালিদের। আয়ুব বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তানি এ্যাসোসিয়েশনস ইন গ্রেট বৃটেন'-এর জেনারেল সেক্রেটারী, ১৯৬৩ সালে রাওয়াল পিন্ডিতে প্রবাসীদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও 'বোনাস ভাউচার স্কীম' প্রবর্তনে সাফল্য জনক ভূমিকা পালনকারী লেখক-১৯৬৪ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ' প্রতিষ্ঠার ছিলেন কান্ডারী। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী এবং বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাঙালি নেতৃত্বের যাঁরাই ষাটের দশকে বিলাতের মাটিতে পা রেখেছেন সকলের জন্যই হাজার সহকর্মী সহ লাল গালিচা পেতে রেখেছেন নুরুল ইসলাম। ১৯৬৬ সালে মায়ের অসুস্থতার সংবাদে সল্পকালীন সফরে এদেশে এসে আইয়ুব খানের সিলেট সফরের এক দিন পূর্বে কারান্তরীণ হয়ে পাসপোর্ট হারিয়ে দুই বছর দেশে থাকতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সিলেটে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে অনবদ্য ভূমিকা পালনকারী লেখক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে শুরু হয় গণহত্যা। সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের সুচনা করে বিলাত প্রবাসীদের

Dhaka University Institutional Repository

চাপে আগস্ট মাসে তিনি বিলাতে গিয়ে প্রধানত 'বাংলাদেশ ফান্ড' গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ফ্রান্স ও যুগস্লাভিয়া সফর করেন। উপরোক্ত সকল স্মৃতিসহ পাঁচ খন্ডে তাঁর রচনাবলীতে উঠে এসেছে শতাব্দীকাল ধরে বাঙালিদের অধিবাসনের খুঁটি-নাটি বিষয়। তাঁদের সংগ্রামমুখর ইতিহাস দেশ-বিদেশে তাঁদের সমস্যা, কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক বহির্গমণের প্রেক্ষাপটে তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এ গবেষণায় গ্রন্থটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া বেলাল মোহাম্মদের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', মোহাম্মদ আবদুল মোহাইমেনের 'ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর', শামসুল হুদা চৌধুরীর 'মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর', অরুণ ভট্টাচার্যের 'ডেড লাইন মুজিবনগর', আলমগীর কবিরের 'দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ', সাইফুল ইসলামের 'স্বাধীনতা ভাসানী ভারত', মিজানুর রহমান শেলীর 'ইমারজেনেস অব এ নেশন ইন এ মাল্টিপোলার ওয়ার্ডঃ বাংলাদেশ', জি. ডাব্লিউ. চৌধুরীর 'ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ এন্ড মেজর পাওয়ার পলিটিক্স অব এ ডিভাইডিং সাবকন্টিনেন্ট', আবদুল মান্নান খান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা', এম, আর, আক্তার মুকুলের 'আমি বিজয় দেখেছি', মাসুদুল হকের 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং 'সিআইএ', নিয়াজির 'নিয়াজীর জবানবন্ধী' (অনুবাদঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান), মোহাম্মদ আজগর খান-এর 'জেনারেল ইন পলিটিক্স, পাকিস্তান ১৯৫৮-৮২', রাও ফরমান আলীর 'ভূট্টো মুজিব বাংলাদেশ', সিদ্দিক সালিকের 'নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল', জেনারেল জ্যাকবের 'সারেন্ডার এ্যাট ঢাকা, বার্থ অব এ নেশন', মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং-এর 'দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ', এ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণান-এর 'নো ওয়ে বাট সারেন্ডার', মেজর জেনারেল ফজলে মুকিম খানের 'পাকিস্তান ক্রাইসিস ইন লিডারশীপ', জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'দি গ্রেট ট্রাজেডী', এন্থনী মাসকারেনহাসের 'দি রেপ অব বাংলাদেশ', রবার্ট পেইন-এর 'ম্যাসাকার', ভ্যান হীল-এর 'দি প্রসেস অব প্রায়রিটি ফরমুলেশন, ইউ. এস. ফরেন পলিসি ইন দি ইন্দোপাকিস্তান ওয়ার অব ১৯৭১', হেনরী কিসিঞ্জারের 'দি হোয়াইট হাউজ ইয়ার্স', কবির বিন আনোয়ারের 'বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা' (দুই খন্ড), মোঃ এমরান জাহানের 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ ইতিহাস ও সংবাদপত্র', বাংলাদেশ চর্চা প্রকাশিত 'গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', মুনতাসীর মামুন-হাসিনা আহমদের 'মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি' (১-৬ খন্ড), মুনতাসীর মামুন-মহিউদ্দিন আহমদের 'পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ', মুনতাসীর মামুনের 'সেই সব পাকিস্তানী', এবং 'রাজাকারের মন', কুতুব আজাদ-সাহেদ মন্তাজ-এর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ পত্রিকাপঞ্জি', আশফাক হোসেনের 'বাংলাদেশের অভ্যূদয় ও জাতিসংঘ', সুরাইয়া বেগমের 'নারী মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ অন্তর্লোক অন্বেষণ', বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'ইতিহাস নির্মানের ধারা', এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ', আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি'। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খন্ড), আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর 'আমেরিকান রেসপন্স টু বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার', ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-এর 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি', রশীদ হায়দার (সম্পাদিত) 'স্মৃতি ১৯৭১' (১-১৩ খন্ড), আবুল মনসুর আহমদ-এর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', বদরুদ্দিন উমর-এর 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', তালুকদার মনিরুজ্জামানের 'র‍্যাডিক্যাল পলিটিক্স এন্ড এমারজেন্স অব বাংলাদেশ', এ. ডাব্লিউ. ভুঁইয়ার 'এমারজেন্স অব বাংলাদেশ এন্ড দি রোল অব আওয়ামী লীগ', শ্যামলী ঘোষ-এর 'আওয়ামী লীগঃ ১৯৪৯-১৯৭১', মুহাম্মদ ফায়েকুজ্জামান-এর 'মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', আবদুল মতিন-এর 'প্রবাসীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ', এইচ, টি, ইমাম-এর 'বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১', আর্চার কে ব্লাড-এর 'দি ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ', রাও ফরমান আলীর 'হাউ পাকিস্তান গড ডিভাইডেড', আবুল কালাম আজাদ-এর 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম', যশোবন্ত সিংহ-এর 'জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা', গোলাম মুরশিদ-এর 'কালাপানির হাতছানিঃ বিলেতে বাঙালির ইতিহাস', আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন-এর 'ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ', মাসুদা ভাট্টির 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ঃ বৃটিশ দলিলপত্র', সোহরাব হাসান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা', ডঃ মোঃ নূরুল্লাহ সম্পাদিত 'যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ আবদুল মান্নান স্মারক গ্রন্থ', আবদুল মতিন-এর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়' এবং 'স্মৃতিচারণঃ পাঁচ অধ্যায়', মজনু-নুল হক-এর 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', শশাংক এস. ব্যানার্জীর 'এ লং জার্নি টুগেদারঃ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ' এবং 'ইন্ডিয়া'স সিকিউরিটি ডিলেমাস ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ', ঊর্মি রহমান, 'বিলেতে বাঙালি সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী' এবং 'ব্রিকলেনঃ বিলেতের বাঙালিটোলা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে শিরোণামভূক্ত বিষয়ে ধারণা নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ঙ) গবেষণার উপাদান ও পদ্ধতি ঃ

এ অভিসন্দর্ভটির রচনায় প্রাথমিক ও গৌণ উপাদান ব্যাবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাদান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আর্কাইভস, শেরে বাংলা নগর ঢাকায় রক্ষিত তৎকালীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক সরকারের সরকারি দলিলপত্র ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ, পরিকল্পনা, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ বিতর্কের সরকারী প্রকাশনা, সম্প্রতি প্রকাশিত বৃটিশ দলিলপত্র এবং তৎকালীন ঢাকা, করাচী ও লন্ডন

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাসমূহ-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে গৌণ উপাদান হিসেবে দেশ ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ধারণে অজ্ঞতার কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি। তবে কিছু প্রশ্ন এখানে থেকে যায়। তা'হলো এই রচনা কি কেবল একটি পুনর্বিবরণ? যা ঘটেছিল, তার সময়ানুক্রমিক কাহিনী? না ব্যাখ্যা বিশেষণ ? ইতিহাস রচনায় দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির চিন্তাধারা আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস ইতিহাস রচনায় গ্রহণ করেছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, ইতিহাস হল নিয়মানুসারে পরীক্ষিত নানা তথ্যের সমাহার।[৪৭] আবার বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন 'দ্যা মুকাদ্দিমা'[৪৮]-তে ইতিহাস কী, বা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে যা বলেছেন- (ইতিহাস রচনা) বহু উৎস এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞান দাবি করে। তার জন্য কল্পনাপ্রবণ মন এবং সর্বাত্মক চিন্তা চাই, যাতে ঐতিহাসিক সত্যের কাছে পৌঁছাতে পারে, এবং তার ভুলচুক না হয়। যদি, যেভাবে ইতিহাস বাহিত হয়ে এসেছে তাকেই সে বিশ্বাস করে, পরম্পরা থেকে যে সব নীতি তৈরী হয়েছে তার পরিষ্কার ধারণা যদি তার না থাকে, রাজনীতির মৌলিক তথ্য, সভ্যতার প্রকৃতি, মানবসমাজ গঠনের শর্ত যদি সে না জানে, অধিকন্তু প্রাচীন বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমকালীন বিষয়ের তুলনামূলক মূল্যায়ন যদি সে না করে, তবে সে হোঁচট খাবে, পিছনে যাবে, সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হবে। ঐতিহাসিকরা , কোরানের টীকাকাররা, জ্ঞানী মানুষেরা প্রায়ই তাদের কাহিনী এবং ঘটনার বিবরণে ভুল করেছেন। তারা যা শুনেছেন তাকেই গ্রহণ করেছেন, তার মূল্যায়ন করেন নি। তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তর্নিহিত নীতিগুলোর সঙ্গে ঘটনাগুলি মিলিয়ে নেন নি, একই ধরনের বিষয়ের সঙ্গে তারা তুলনা করেন নি। তারা দর্শনের নিরিখেও অনুসন্ধান করেন নি, বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, কিংবা ইতিহাসের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাননি। সেই জন্য তারা সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত ধারণার মরুভূমিতে পথ হারিয়েছেন।[৪৯]

অর্থাৎ এ গবেষণায় আমাকে থাকতে হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট নির্দেশনাবলির মধ্যে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই শর্তগুলিই পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পদ্ধতি তত্ত্ব ঃ

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারকে প্রাথমিক উপদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; যা এ গবেষণার পরিসর বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী অন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িত উত্তরদাতাদের ষাটের দশকের তরুণ ছাত্র-নেতাদের মাধ্যমে নমুনায়ন করা হয়েছে। একটি বিষয় উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের নিকট-আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব; ১৯৭১ সালে বৃটেনে উপস্থিত ছিলেন না অথচ সেখানকার অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবগত আছেন এরকম কয়েক জন বাংলাদেশী নাগরিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব সাক্ষাৎকরের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকাসহ মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য বের হয়ে আসে; যা এ গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে সাক্ষাৎকার ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা এ সম্পর্কে গবেষণা ও লেখালেখি পর্যালোচনা এ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ আধার (Content) হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রেও যাঁরা ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য (লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ); যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষদর্শীর অংশগ্রহণের প্রেক্ষিত, অন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ পেয়েছে তা এ গবেষণায় প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চ) অধ্যায় বিভাজন ঃ

১. প্রথম অধ্যায় ঃ যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি- অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী পটভূমি ঃ

(i) যুক্তরাজ্যে বাঙালিদের অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কোন প্রেক্ষাপটে, কীভাবে প্রথম বাঙালিরা যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান, তথায় বাঙালিদের স্থায়ী আবাস গড়নের সূত্রপাত থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকাল পর্যন্ত তাদের জীবনচিত্র, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা; এক কথায় যুক্তরাজ্যে বাঙালির অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও বাঙালির স্বরূপ-সংস্কৃতির চিত্র বর্ণণা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

(ii) যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি- মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী পটভূমি ঃ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনের কাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা যাবতীয় আন্দোলন সংগ্রামে স্বদেশবাসীর সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের শেখ মুজিবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবেলা, ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান হাউজ প্রতিষ্ঠা, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে সহায়তাদান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, মোটকথা ষাটের দশকের বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা দেখিয়েছেন অনন্য ভূমিকা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাঙালির নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণহত্যা শুরু এবং ২৬ মার্চ অতিপ্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিলাতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত লন্ডন আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রাথমিক সূত্রপাত পর্যন্ত সকল ঘটনার অত্যন্ত সুটোল বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে আলোচিত অধ্যায়ে।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন ঃ পরিচয়

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অতর্কিত নিধনযজ্ঞ শুরু হলে ২৬ মার্চ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে স্বদেশের মতো প্রবাসে অবস্থানরত বাঙালিরা প্রতিবাদে মেতে ওঠেন দেশ মাতৃকার মুক্তিকামনায়। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা সর্ব প্রথম এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। হাজার হাজার বাঙালি সমবেত হয়ে পুরো ১৯৭১ সাল জুড়ে গঠন করেন শতাধিক এ্যাকশন কমিটি। আর এসব এ্যাকশন কমিটি গঠনে তৎকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত দুই শতাধিক প্রবাসী বাঙালি নিজ নিজ পেশা ছেড়ে অগ্র সৈনিকের মতো এগিয়ে এসেছেন এ্যাকশন কমিটিগুলোর নেতৃত্ব দিতে। এসব মুক্তিপাগল ব্যক্তি ও সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে আলোচিত অধ্যায়ে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পত্র-পত্রিকা যেমন এগিয়ে এসেছেন, তেমনি এসেছেন ঘরকন্না ছেড়ে নারী সমাজসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন; তাঁদের পরিচয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে। প্রবাসী বাঙালিরা যেভাবে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, তা দেখে চুপকরে থাকতে পারেন নি খোদ বৃটিশ সরকার, পার্লামেন্ট, পার্লামেন্টের বিরোধী দলসমূহ, ব্রিটিশ গণমাধ্যম, সাহায্য সংস্থা ও আপামর জনসাধারণ। এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে সে সব মহামানবদের পরিচয়, যেমন তুলে ধরা হয়েছে যুক্তরাজ্যস্থ সাধারণ ভারতবাসীর, ভারতীয় হাই কমিশন ও যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর পরিচয়সহ অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী মুষ্টিমেয় পাকিস্তানীদের কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না এখানে। সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তান পন্থী প্রবাসী বাঙালি এবং পিকিং পন্থী প্রবাসী বাঙালিদের পরিচয় উল্লেখ করা অবশ্যক হয়েছে।

৩. তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক গৃহীত বিবিধ উদ্যোগ ঃ

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হত্যাযজ্ঞের খবর বিলাতে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে লক্ষাধিক প্রবাসী বাঙালির চেতনাবোধে প্রচন্ড ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তৎক্ষণাৎ রাস্তায় নেমে আসেন হাজার হাজার প্রবাসী বাঙালি, সুদীর্ঘ নয় মাসে গঠন করেন শতাধিক এ্যাকশন কমিটি। যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিরা পত্র-পত্রিকা-পুস্তক প্রকাশ, প্ল্যাকার্ড-ব্যানার-পোস্টার প্রদর্শন, অবস্থান ধর্মঘট, সভা-সমাবেশ-শোভাযাত্রা-মিছিল-বিক্ষোভ-প্রদর্শন করে, বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস, জাতিসংঘ, বৃটিশ সরকার ও জনগণ, বৃটিশ গণমাধ্যম, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সাথে মতবিনিময়, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে সমিতি গঠন, বিভিন্ন পেশাজীবী- ছাত্র, শিক্ষক, গৃহিণী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমিতি গঠনপূর্বক প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। জনমত গঠন করে তৎকালীন পাক-শাসকদের নিন্দা ও সমালোচনার মাধ্যমে ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছেন। আর এ সকল কর্ম সম্পাদনে তৎকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত লক্ষাধিক প্রবাসী বাঙালি নিজ নিজ পেশা ছেড়ে জড়ো হয়েছেন দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় সংগ্রামে অংশ নিতে। অর্থাৎ বিলাতের পত্র পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হত্যাকান্ডের কথা ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাসী বাঙালিরা পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হাজার হাজার লন্ডন প্রবাসী পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে হাজির হয়ে বিক্ষুব্ধ বাঙালি জনতা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের নিন্দা, ইয়াহিয়ার পতন কামনা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে শ্লোগানের মাধ্যমে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তখন থেকে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লন্ডন আগমন পর্যন্ত গঠিত শতাধিক এ্যাকশন কমিটিসহ এসব মুক্তিআকাঙ্খী ব্যক্তি ও সংগঠনের সুদীর্ঘ নয় মাসের সার্বিক কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছে আলোচিত অধ্যায়ে। তাছাড়া ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে লন্ডনের কভেন্ট্রি সম্মেলন একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। বহু দলমতে বিভক্ত যুক্তরাজ প্রবাসী বাঙালিরা স্বাধীনতার প্রশ্নে সম্মিলনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন মহারণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে। ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে কভেন্ট্রিতে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল। একদিকে ঐ দিনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্ব আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা প্রাণ পুরুষ বিচারপতি আবু

Dhaka University Institutional Repository

সাঈদ চৌধুরীর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের একমাত্র দূত হিসেবে ঘোষণা; অন্যদিকে বহুধাবিভক্ত যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের ফ্রেমে বেঁধে দেওয়া হয়। গঠিত হয় 'এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউকে' নামের সংগঠন ; যার কার্য-পরিচালনা ও বৃহত্তর কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ষ্টিয়ারিং কমিটির উপর। যুক্তরাজ্যস্থ "ষ্টিয়ারিং কমিটি অফ দ্যা এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ'-এর ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আনুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। একই সাথে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠনসমূহ ও নারী সমাজের ভূমিকাসহ বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতা, যুক্তরাজ্যস্থ বামপন্থী বাঙালি রাজনীতিক, সাধারণ বাঙালি জনসাধারণের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে আলোচিত অধ্যায়ে।

৪. চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিদেশীদের ভূমিকা ঃ যুক্তরাজ্যের ভূমিকাসহ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশীদের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত নিঃসন্দেহে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় ব্যক্তিবর্গ, হাইকমিশন ও পত্র-পত্রিকাগুলো এই আন্দোলনে শামিল ছিল স্পষ্টভাবে, ভূমিকা রেখেছে সারা বিশ্বের সাথে সেতুবন্ধ হিসেবে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে আগলে রেখেছিল বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ার মতো। কিন্তু বৃটেনের ভূমিকা নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন উপমহাদেশে ব্রিটিশ দূতাবাসগুলো থেকে লন্ডনে ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসে পাঠানো প্রতিদিনকার "পাকিস্তান পরিস্থিতি রিপোর্ট "; ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসসমূহে পাঠানো "পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ পরিস্থিতি" বিষয়ক নির্দেশাবলী; ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস, কেবিনেট অফিস এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে উপমহাদেশ সম্পর্কে গৃহীত বিভিন্ন নীতি; উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব লাভের পথে বৃহৎ শক্তিবর্গের টানাপোড়েনের মাঝে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বৃটেনের ভূমিকা ছিলো ঘনোকালো মেঘের আড়ালে ঢেকে থাকা সূর্যের মেঘ ভেদ করে চারিদিকে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মতো। ফলে এ অধ্যায়ের আলোচনায় বৃটেনের ভূমিকা প্রশ্নে অবসান হয়ে যাবে সকল সন্দেহের এবং মিলে যাবে সকল প্রশ্নের জবাব। লন্ডনকে কেন্দ্র করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যৎকার বিশ্লেষণে পাকিস্তান সামরিক সরকারের কূট রাজনীতির স্বরূপও বেরিয়ে আসবে এ অধ্যায়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রথধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম যে সব গোপন কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছিলেন- তার বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য। এতে বৃটেনের মনোভাবের দু'টি বিষয় বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ ক) পূর্ববঙ্গের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যায় সমাধান করতে হবে এবং খ) সামরিক আদালতে গোপন বিচারের পর পাকিস্তান গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাণদন্ড দানের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হবে। এ অধ্যায়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এসব কূটনৈতিক বার্তায় সুপ্ত বিষয়টি ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনিবার্য এবং তা যতো কম রক্তক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় ততোটাই মঙ্গলকর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক জটিল কূটনীতিতে চীনের ভূমিকার সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে ফুটে উঠবে যে, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতবিরোধ ঘটতে দেখা গেছে এবং এই প্রথম কোনো 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন নিয়ে ব্রিটিশ-মার্কিন অবস্থানের ভিন্নতা দেখা গেছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ও বিশিষ্ট এম.পি. ও ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এবং ব্রিটিশ আপামর জনসাধারণের সহায়ক ভূমিকাও ফুটে উঠবে আলোচিত অধ্যায়ে।

৫. পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা ঃ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত বিলাত আন্দোলনে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠিত করতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তৎকালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনে যোগদানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত আইনজীবী পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। স্বধীনতা যুদ্ধের সূচনাকালেই সময় ক্ষেপণ না করে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিকামনায় আপোষহীন হয়ে ওঠেন; শুরু হয় সুদীর্ঘ নয় মাসের কর্ম প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ; একদিকে ব্যক্তিগতভাবে বৃটিশ সরকার, পার্লামেন্ট, বিরোধীদল, বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিদেশী কূটনীতিক ও যুক্তরাজ্যস্থ বেসরকারী সংস্থাসহ বৃটিশ গণমাধ্যমসমূহে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। এবং অন্যদিকে অপরিসীম ত্যাগ ও ক্যারিসম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা তৎকালীন যুক্তরাজ্যে নানা দলমতে বিভক্ত বাঙালি জাতিকে প্রত্যয় ও ঐক্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বহির্বিশ্বে একমাত্র দূত হিসেবে মনোনীত হন। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডন কেন্দ্রিক সমগ্র ইউরোপ তথা বহির্বিশ্ব জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল; তার প্রাণ পুরুষ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম, শিক্ষালাভ এবং বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে। অন্যদিকে বিশেষ দূত হিসেবে যাঁর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বহির্বিশ্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তীন হয়েছে, গঠিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, প্রচার পেয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস, সংকটাপন্ন জীবনের হুমকিতেও যিনি অকুতোভয়, পর্বত প্রমাণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ, কর্মে অবিচল, হৃদয়ে মানবতাবাদী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বহির্বিশ্ব আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক প্রাণ-পুরুষ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে আলোচিত অধ্যায়ে। একই সাথে তাঁর চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো উদঘাটনপূর্বক যুক্তিসংগত সমালোচনা সহ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

টীকা ও তথ্য সূত্র ঃ

১। ডঃ মুনতাসীর মামুন-প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন রচিত 'বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী'র ভূমিকা- পৃষ্ঠা-১-এ বলেছেন।

২। প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৪।

৩। ঐ।

৪। ডঃ মুনতাসীর মামুন- প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ঐ, পৃষ্ঠা-২-এ বলেছেন।

৫। সুরাইয়া বেগমের উদ্ধৃতি কুতুব আজাদ-সাহেদ মন্তাজ-এর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ পত্রিকাপঞ্জি'র ভূমিকা-পৃষ্ঠা-৫ থেকে নেয়া হয়েছে।

৬। আমিন ইসলামের উদ্ধৃতি কুতুব আজাদ-সাহেদ মন্তাজ-এর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ পত্রিকাপঞ্জি'র ভূমিকা- পৃষ্ঠা-৬ থেকে নেয়া হয়েছে ।

৭। সুরাইয়া বেগমের উদ্ধৃতি কুতুব আজাদ-সাহেদ মন্তাজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬ থেকে নেয়া হয়েছে ।

৮। ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের উদ্ধৃতি কুতুব আজাদ-সাহেদ মন্তাজ- এর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ পত্রিকাপঞ্জি'র ভূমিকা- পৃষ্ঠা-৭ থেকে নেয়া হয়েছে ।

৯। প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, 'ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ', ঢাকা- ১৮৯৮, পৃষ্ঠা-১১।

১০। ঐ।

১১। ঐ।

১২। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র', তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ-২০০৩, ভূমিকাংশ- পৃষ্ঠা-৬।

১৩। প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, 'ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ', পৃষ্ঠা-১৩।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ।

১৬। মুনতাসীর মামুন- হাসিনা আহমেদ, 'মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি-১', বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা-৬।

১৭। প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা-১৭।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা-১৭।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা-১৬।

২১। ঐ, পৃষ্ঠা-১৮।

২২। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯।

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২০।

২৪। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র', ১ম খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩।

২৫। প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০।

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা-২১।

২৭। ঐ, পৃষ্ঠা-২২।

২৮। ঐ।

২৯। ঐ।

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা-২৩।

৩১। ঐ।

৩২। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। ঐ।

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৪।

৩৫। ঐ।

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা-২৫।

৩৭। ঐ।

৩৮। ঐ।

৩৯। কুতুব আজাদ-সাহেদ মন্তাজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮।

৪০। ঐ।

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা-৯।

৪২। ঐ।

৪৩। ঐ।

৪৪। ডঃ মুনতাসীর মামুনের 'মুক্তিযুদ্ধের বই' প্রবন্ধের উল্লেখ করে প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থ 'বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী', পৃষ্ঠা-১৬- এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

৪৫। ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' প্রবন্ধের উল্লেখ করে প্রফেসর আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পৃষ্ঠা-১৬- এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

৪৬। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭।

৪৭। ডঃ এম. দেলোয়ার হোসেন, 'ইতিহাসতত্ত্ব', পৃষ্ঠা -৬১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩।

৪৮। আরবি শব্দ, যার অর্থ মুখবন্ধ (প্রিফেস) বা ভূমিকা (ইন্ট্রোডাকশন) ইবনে খালদুন কৃত বিশ্ব ইতিহাস "কিতাব আল-ইবর" (বুক অফ এ্যাডভাইস); যে গ্রন্থে 'ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি' বিষয়ে মুসলিমদের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়।

৪৯। যশোবন্ত সিংহ, 'জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা', পৃষ্ঠা-৩, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২য় সংস্করণ (বাংলা), ২০০৯।

ছ) উপসংহার

জ) এক নজরে সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

ঝ) পরিশিষ্ট ঃ

(i) সাক্ষাৎকার

(ii) প্রকাশিত দলিল-পত্রাদি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি- অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী পটভূমি ঃ

(i) যুক্তরাজ্যে বাঙালিদের প্রবাস জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

১.১ সূচনা ঃ

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা আর আসামের বাইরে সবচেয়ে বেশি বাঙালি বাস করেন ইংল্যান্ডে। এককালে সমুদ্র পার হওয়া ছিল ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। তা সত্ত্বেও বাঙালিরা ইংল্যান্ডে যেতে আরম্ভ করেন ইংরেজরা বঙ্গদেশ জয় করার আগে থেকেই। প্রথমে গৃহভৃত্য, তারপরে ভদ্র লোকেরা- ইতেশাম উদ্দিন, ঘনশ্যাম দাস, রামমোহন রায়, আনন্দ চন্দ্র মজুমদার আর দ্বারকানাথ ঠাকুর -এ রকমের কয়েকটি নাম। তারপর গোটা উনিশ শতক ধরে বিলেতে যান অসংখ্য ছাত্র- কেউ চিকিৎসা বিদ্যা, কেউ আইন, কেউ নানাবিধ বিদ্যার অন্বেষণে। প্রথম দেড় শো বছর তাঁরা যেতেন দেশে ফিরে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু গত এক শো বছর অনেকে যেতে আরম্ভ করেন সেই দেশেই বসবাস করার জন্য।

যে সব বাঙালি বসতি স্থাপন করেছেন বিলেতে তাঁরা একটি বিশেষ অঞ্চলের নন; এক শ্রেণীর নন, অভিন্ন পারিবারিক পটভূমির নন, এক ধর্মের নন, এমন কি এক ধরনের জীবিকাও নয় তাঁদের। তাঁদের বর্তমান শিক্ষা, জীবিকা, সাংস্কৃতিক জীবন এবং স্বরূপের মধ্যেও কি রয়ে গেছে বিস্তর ব্যবধান? তাঁদের বর্তমানের উন্নততর আধুনিক শিক্ষা কি পেরেছে জীবিকার পরিবর্তন আনতে এবং জীবনাচার, স্বরূপ ও সংকৃতিক ব্যবধান ঘোচাতে, গ্লোবালাইজেশন আর মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগেও কি তাঁরা অটুট রাখতে পেরেছেন বঙ্গমাতার প্রতি তাঁদের আজন্মকালের আকর্ষণ? নাকি গাঁ ভাসিয়ে দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে? এই বাঙালিরা কতটুকু বাঙালি, কতটুকু বিলেতি? তাঁদের নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদানই বা কতোখানি ? ইংরেজ সমাজে বাস করে তাঁরা কি শুধু ইংরেজ সংস্কৃতি দিয়েই প্রভাবিত হয়েছেন, নাকি ইংরেজী সংস্কৃতির ওপরও কোন প্রভাব ফেলতে পেরেছেন তাঁরা?

বাঙালিরা ঘরকুনো এ অপবাদ এমন বহুল প্রচলিত ছিল যে কবি বাংলা মায়ের কাছে আহবান জানিয়েছিলেন, তাঁদের লক্ষী ছাড়া করে ঘর থকে বের করে দিতে; যাতে তারা বহির্বিশ্বে গিয়ে অকর্মন্য নাম ঘোচাতে পারেন। বহু প্রার্থণা ব্যর্থ হয়েছে কবির। কিন্তু বঙ্গমাতা তার সন্তানদের ঘর-ছাড়া করেছেন ঠিকই। এখন শতকরা প্রায় পাঁচ জন বাঙালি বাস করেন মূল বাংলাভাষী অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বাইরে। উত্তর আর দক্ষিণ মেরু বাদ দিলে পৃথিবীর অন্য সব জায়গাতেই বোধ হয় বাঙালিরা বাস করেন। অনেকের মতে এখন আশি লাখ বাঙালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বঙ্গের বাইরে- পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মধ্য প্রাচ্যে, পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকায়, এমন কি গহিন অরণ্যের বিস্তির্ণ ভূখন্ড আফ্রিকায়।

বহির্বিশ্বে বাঙালিদের এই যাত্রা শুরু হয়েছিলো বিলেতের পথ ধরে। কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ ভয়ছিল কালাপানির। সে কেবল কূলহীন অতলান্ত নীল সাগরের ভীতি নয়। সে দেশের মানুষ এতো বড় নিষেধ অমান্য করে কিভাবে অজানা কূলের উদ্দেশ্যে কালাপানিতে ভাসলেন সেই কাহিনী একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, অন্যদিকে তেমনি দারুণ কৌতূহলোদ্দিপক।

এখন বিলেতের সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি হলো বাঙালিদের। ইংরেজরা বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন, দুশো বছর ধরে শাসন-শোষণ করেছিলেন। তারপর ইংরেজরা যখন ফিরে গেলেন, বাঙালিরা যেন তাঁদের তাড়া করে পেছনে পেছনে বিলেতে গেলেন। তাঁরা বিলেত শাসন করতে পারলেন না, শোষণও নয়। কিন্তু তাঁরাও ইংরেজদের আংশিকভাবে জয় করলেন। বিলাতি সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ হলেন তাঁরা। তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে ফেললেন অবিচ্ছেদ্য প্রভাব। ভেতো বাঙালিদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজরাও ভেতো হলেন।

গৃহভৃত্য হিসেবে বাঙালিরা বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন সতেরো শতক থেকে। সেই কাহিনী থেকে শুরু করে বিংশ শতকের সত্তরের দশক বিশেষ করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিলেতি বাঙালিদের জীবন চিত্র পর্যন্ত সংক্ষেপে প্রায় সবই আলোচনা করার প্রয়াস রয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। প্রসঙ্গক্রমে আজকের দিন পর্যন্ত আলোচনায় উঠে এসেছে গবেষণার স্বার্থে। এ বিষয়ে গবেষণার যে সুযোগ এবং উপকরণ আছে, তার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র নেড়েচেড়ে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কারণ শিরোণামভূক্ত বিষয়ে গবেষণা কাজ শেষ করতে গিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই শুধু এই অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে। তথাপি আমাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের বাঙালিদের জীবন চিত্র আলোচনার গন্ডির মধ্যে। পশ্চিম বঙ্গ ও অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালিদের আলোচনা এসেছে এ অধ্যায়ের আলোচনাকে যতোটুকু সম্ভব ফলপ্রসূ করতে।

প্রারম্ভিক কথা ঃ

রামায়নের কাহিনীতে আছে বটে, কিন্তু রামচন্দ্র সত্যি সত্যি লঙ্কা জয় করেছিলেন কিনা, ইতহাস সে সম্পর্কে কিছু বলে না। আর, সেটা প্রাসঙ্গিক নয় আমাদের এ আলোচনার জন্য। কারণ, শাস্ত্রের বয়ান অনুযায়ী রামচন্দ্র দেবতা হতে পারেন, কিন্তু তিনি বাঙালি ছিলেন না।[১] অপর পক্ষে, প্রচলিত ইতিহাসের মতে বিজয়সিংহ নামে এক বাঙালি নৃপতি নাকি সিংহল জয় করেছিলেন। অন্তত এ নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্য রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন।[২] আর একজন কবি তো

Dhaka University Institutional Repository
উনিশ শতকের শেষে এ নিয়ে রীতিমতো একটি কাব্যই লিখে ফেলেছিলেন। বিজয় সিংহের কাহিনী ছাড়া, মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে জানা যায় চাঁদ সদাগর আর শ্রীমন্তের কাহিনী। তাঁরা রাজ্য জয় করতে যান নি, সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে।[৩] মোট কথা খানিকটা ইতিহাস থেকে, খানিকটা সাহিত্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রচীন এবং মধ্যযুগে বাঙালিরা কালাপানি পার হতেন; সে কালে সমুদ্র যাত্রার ঐতিহ্য যে জোরালো ছিল- এটা প্রমাণ করার জন্যে অক্ষয় কুমার দত্ত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি বইও লিখেছিলেন। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, সাগরে যাবার মতো নৌকাও তৈরী হতো বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি এ ঐতিহ্য ইংরেজ আমলেও প্রচলিত ছিলো। ইবনে বতুতা তেমনি একটি নৌকায় করেই এই বঙ্গদেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ায়।[৪]

কিন্তু আঠারো উনিশ শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কালাপানি পাড়ি দেওয়া ততোদিনে বঙ্গদেশে কেবল অবাঞ্ছিত কাজ বলে গণ্য হয় নি, রীতিমতো নিষিদ্ধ হয়েছিল। এর কারণ কী ? ধারণা করা হয়, ষোলো শতক থেকে পর্তুগীজ দস্যুদের হামলা বাঙালিদের সমুদ্র যাত্রার উৎসাহে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিয়েছিলো। জলদস্যুতা গোড়ার দিকে ইংরেজরাও করেছে, তারও প্রমাণ আছে।[৫] এই জলদস্যুতার ভীতি থেকে সমুদ্রযাত্রা এতোই অপ্রচালিত হয়ে যায় যে, কিছুকালের মধ্যেই সাগর পাড়ি দেওয়া গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হয়। এমন কি, ধীরে ধীরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় একটা ধর্মীয় অনুসঙ্গ। এভাবে কালে কালে সমুদ্র পার হওয়াই নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[৬]

অবশ্য এই নিষেধ অমান্য করে সমাজের নিচের তলার অল্প কিছু নারী-পুরুষ সতেরো শতকের গোড়ার দিক থেকেই বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন। ১৬৭৪ সালে পীটার লেলির আঁকা একটি চিত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সতেরো শতকে ভারত থেকে যারা বিলেতে গিয়েছিলেন তারা ছবিটিতে অংকিত মেয়েটির মতো ইংরেজ পরিবারের আয়া, নয়তো ভৃত্য। আরও এক শ্রেণীর লোকেরা গিয়েছিলেন, তারা জাহাজের লস্কর।[৭]

এছাড়া, কোন কোন ইংরেজ ভারতে থাকার সময়ে ভারতীয় নারীদের বিয়ে করেছিলেন। যেমন এক ভারতীয় মা এবং ইংরেজ পিতার সন্তান ছিলেন অ্যামেলিয়া জেনকিন্সন। তিনি ১৭৬৯ সালে বিলেতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন অ্যার্ল অব লিভারপুলকে। তাঁর পুত্র রবার্ট প্রথমে পার্লামেন্টের সদস্য হন এং তারপর ১৮১২ সাল থেকে পনেরো বছরের জন্য ইংল্যান্ডের প্রাধানমন্ত্রী হন। আর একটি দৃষ্টান্ত হলো: পূর্ণিয়ার মহারাজার এক বিধবা কন্যা। তিনি ১৭৮০ সালের দিকে বিয়ে করেন জেরার্ড ডুকারেল নামে এক ফরাসি ভদ্রলোককে। ডুকারেল ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। মীর্জা আবু তালিব খানের ভ্রমনকাহিনীতে এর উল্লেখ আছে।[৮]

এরকম বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া, রক্ষিতা ছিলেন আরও বেশি লোকের। উনিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে কলকাতা থেকে এক ইংরেজ স্বদেশের আর এক ইংরেজকে লিখেছিলেন যে, একটা কমবয়সী ইংরেজ মেয়েকে বিলেত থেকে বঙ্গদেশে নিয়ে আসার কোন মানে হয় না। কারণ, বছরে ষাট পাউন্ড ব্যয় করলেই এখানে চলনসই দেশীয় রমণীকে রক্ষিতা রাখা সম্ভব। উইলিয়ম জোনস কেবল ভারত বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, ভারতীয় নারীদের প্রতিও বোধ হয় তাঁর একটু বেশী আকর্ষণ ছিলো। জানা যায়, তিনি একবারে কলকাতার দাস বাজার থেকে ছ'টি সুন্দরী ক্রীতদাসী কিনেছিলেন। ইংরেজদের এই রক্ষিতা অথবা দেশীয় স্ত্রীরা অনেকে তাঁদের স্বামী অথবা 'রক্ষিত' এর সঙ্গে বিলেতে যেতেন। এভাবে ভারতীদের সংখ্যা আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই ইংরেজ সমাজে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে।[৯]

এই ভৃত্যরা বিলেতের লোকদের চোখে তাঁদের চেহারা এবং আচার-আচরণের জন্য বেশ কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হন। ফলে ভারত ফেরত ইংরেজ 'নবাব'দের পক্ষে একজন ভারতীয় ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ধীরে ধীরে ফ্যাশনের এবং সম্মানের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। দীর্ঘ দিন একই পরিবারে কাজ করার পর সে পরিবারের প্রতি স্বাভাবিক কারণে মায়া সৃষ্টি হবার ফলে ভারতীয় আয়া অথবা গৃহভৃত্যরাও কেউ কেউ তাঁদের সাহেবদের সঙ্গে বিলেতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতেন এই শর্তে যে, তাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু কার্যকালে তাঁদের মুনিবরা অনেক খরচ দিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠোতেন না। এঁরা কেউ কেউ বিনা বেতনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতে আগমণকারী ইংরেজ যাত্রীর ভৃত্য হিসেবে কাজ জুটিয়ে দেশে ফিরতেন। যাঁরা কোন উপায়ে দেশে ফিরতে পারতেন না, তাঁরা করুণ অবস্থায় শহরের রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষা অথবা ফেরি করতেন। ১৮৪৯ সালে 'টাইমস' পত্রিকায় একজন ভারতীয় ভ্রমনকারী চিঠি লিখে এরকম ভিখারি এবং তাঁদের দূরাবস্থার কথা জানিয়েছিলেন।[১০] হেনরি মেহিউ 'Landon Labour and the Landon poor' 4 Vols London: Griffin Bhon and Co. (১৮৬১-৬২) এবং জোসেফ সল্টার তাঁর 'Asiatics in England : Sketches of Sixteen Years' Work among Orientals', London: Seely, Jakson and Halliday, (১৮৭৩) গ্রন্থ এবং ১৮৫২ সালে লন্ডনের 'দৈনিক টাইমস' পত্রিকায় জনৈক প্রবাসী ভারতীয় ভদ্রলোকের একটি প্রতিবেদনে এর এক করুণ চিত্র ধরা পড়ে।

লন্ডনের তখনকার রাস্তায় ভারতীয় লোকেরা ঝাঁট দিচ্ছে এবং ভিক্ষে করছে এরকমের কয়েকটি চিত্রও পাওয়া যায়। কোন কোন সময়ে এই অসহায় ভৃত্য অথবা আয়ারা অন্য কোন মুনিবও জুটিয়ে নিতেন। কিংবা খ্রিষ্টান হয়ে অন্যকে বিয়ে করতেন অথবা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতেন। মোট কথা এই নারী ও পুরুষ ভৃত্যদের বেশিরভাগেরই হতো শোচনীয় পরিণতি।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

আয়া এবং ভৃত্যদের তুলনায় ভারতীয়রা বেশি যেতেন খালসি, সারেং ইত্যাদি নানা কাজে জাহাজের লস্কর অর্থাৎ নাবিক হয়ে। কলকাতা থেকে যাত্রা করলেও, এদের বেশিরভাগই ছিলেন নদী প্রধান পূর্ব বাংলার লোক। ১৮০৩ সাল থেকে কয়েক বছরের লস্করদের যে হিসেব পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে, ১৮০৩ সালে ইংল্যান্ডে দু'শোর বেশী লস্কর ছিলেন। আর পরের বছর চার শোরও বেশি। ১৮০৭ সালে এদের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যায়। তবে নূরুল ইসলামের মতে এই সংখ্যা ছিল ১৮৬৮ সালে। এই লস্করদের অনেকে বিলেত থেকে ফিরতে পারতেন না টাকার অভাবে। কোন কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন লস্করদের মেরে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। অত্যাচার এড়ানোর জন্য লস্কররা কখনও কখনও জাহাজ থেকে পালিয়েও বিলেতের মাটিতে থেকে ভিক্ষা ও ফেরি করে কায়ক্লেসে বেঁচে থাকতেন। লস্করদের এই সমস্যা উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এমন ব্যাপকভাবে দেখা যায় যে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজের মালিক এবং লস্করদের জন্য কোম্পানী আইন করে বন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং লস্করদের থাকা-খাওয়ার জন্য লন্ডনসহ একাধিক জায়গায় আশ্রমও তৈরী হয়েছিল।[১২]

বহুজনের করুণ পরিণতি সত্ত্বেও লস্কররা যে গুরুতর ঝুঁকি নিয়ে বিলেতে যেতেন, বিশ্লেষণ করলে তার কারণও বের হয়ে আসে। তখনকার দলিলপত্র থেকে দেখা যায় যে, চাষী এবং সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় লস্করদের বেতন ছিল যথেষ্ট বেশি, তবে তা ছিলো শেতাঙ্গ লস্করদের তুলনায় অনেক কম। আমরা পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখতে পাবো।[১৩]

যে আয়া আর লস্করা তখন বিলেতে যেতেন তাদের নামধাম এমন কি সাধারণ পরিচিতির কথা সমসাময়িক সূত্র থেকে তেমন জানা না গেলেও আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরবি ফারসি শেখানোর মতো কোন বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়ে যাঁরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এমনকি তাঁদের কার্যকলাপেরও খানিকটা সংবাদ জানা যায়। এ রকমের একজন ছিলেন মীর জাফরের এক কর্মচারী আব্দুল্লাহ। ঐতিহাসিক মাইকেল ফিসারের দেয়া তথ্যমতে লর্ড ক্লাইভকে খুশি করতে মীর জাফর তাঁকে মধ্য এশিয়ার স্যায়গুশ নামে একটি খুব হিংস্র বন-বিড়াল উপহার দিয়েছিলেন। ক্লাইভ আবার রাজা দ্বিতীয় জর্জের এক মন্ত্রীকে খুশি করার জন্য সেটি পাঠান লন্ডনে। এবং সেটি দেখাশুনা করার জন্য সঙ্গে পাঠান আব্দুল্লাহ এবং তার একাধিক ভৃত্যকে। জন্তুটি শেষ পর্যন্ত রাজার দূর্গ 'টাওয়ার অব লন্ডন'-এ জায়গা পায়। হাতি নিয়েও এবাধিকবার মাহুত গিয়েছেন বলে জানা যায়।[১৪]

তবে অনেক বেশি জানা যায় আরবি ফরাসি শেখাতে আসা মুনশিদের কথা। এ রকমের একজন মুনশি ছিলেন মুহাম্মদ সাঈদ। ১৭৭৬ সালে মোহাম্মাদ হোসেন গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানের উন্নতি দেখতে এবং সম্ভব হলে সেখানে বিজ্ঞান শিখতে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, এঁদের কেউ কেউ কলকাতা থেকে গেলেও এবং বঙ্গবাসী হলেও, এঁরা বেশিরভাগই বাংলাভাষী ছিলেন না। তবে কোনো বাংলাভাষী আঠারো শতকে বিলেতে যান নি, তা নয়। অন্তত দু-তিনজন বাংলাভাষীর কথা জানা যায় যাঁরা আঠারো শতকের তৃতীয় পাদে বিলেতে গিয়েছিলেন।[১৫]

এ ধারায় সর্ব প্রথম যাঁর নাম আসে তিনি হলেন একজন বিশিষ্ট মুসলিম পর্যটক ইতেশাম উদ্দীন। তাঁর জন্মস্থান নদীয়ার কাঁচনুরে। অর্থাৎ তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন। দেশে ফেরার পনের বছর পরে ১৭৭৮-৮৫ সালে 'শিগরিফি-ই- বিলায়েত' অর্থাৎ 'বিলাতের আশ্চার্য জনক গল্প' নামে তিনি তাঁর ভ্রমন কাহিনী রচনা করেন। তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে তিনি লিখেছেন যে, বিলেতের লোকেরা হিন্দুস্তানী অর্থাৎ ভারতীয় বললে বুঝতেন চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা থেকে যাওয়া জাহাজের খালাসিদের, কিন্তু তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, অন্য ধরনের ভারতীয়ও আছেন।[১৬]

আঠারো শতকের শেষে ১৭৯৯ সালে মীর্জা আবুতালিব খান নামে উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পর্যটক বিলেতে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম বঙ্গদেশে নয়, লক্ষৌতে (১৭৫২ সালে)। বোম্বাই হয়ে ১৮০৩ সালের ৪ আগষ্ট তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তারপর মুর্শিদাবাদে গিয়ে দুই খন্ডে তিনি তাঁর ভ্রমন কাহিনী এবং ইউরোপীয় জীবন যাত্রার বিবরণী লিখেন। বিলেত ফেরত বলে তিনি নিজেকে মীর্জা আবু তালিব লন্ডনী বলে ডাকা পছন্দ করতেন।[১৭]

উনিশ শতকে বিলেতযাত্রীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমন কি এই নতুন যাত্রীদের কেউ কেউ বিলেতেই থেকে যান। যাঁরা একবারে প্রথম দিকে বিলেতে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে একজন খুব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন শেখ দীন মহাম্মাদ এবং তিনিই সম্ভবত ভারতীদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইংল্যান্ডের ভোটার হওয়ার সম্মান অর্জন করেন এবং ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৭৯৪ সালে তিনি কর্ক থেকে ইংরেজীতে তাঁরা একটি ভ্রমন কাহিনী প্রকাশ করেন। মির্জা আবু তালিব তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে দীন মহাম্মাদকে মুর্শিদাবাদের লোক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি জন্মেছিলেন পাটনায়। তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে তিনি ঢাকার যে ঘনিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম ধারণা করেন যে, একজন সৈন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয় বরং তিনি বাঙালিই ছিলেন।[১৮]

বঙ্গদেশ থেকে যে আয়া এবং ক্রীত দাস-দাসী ইংল্যান্ডে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং নামগুলোকে যদ্দুর সম্ভব ইংরেজী বানানে লিখেছিলেন বলে জানা যায়। যেমন উইলিয়াম হিকির ভৃত্য Munnow ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করে সেখানে থেকে যান এবং পরিচিত হন William Munnow নামে। তাঁর দশ সন্তানের বংশ নামই হয়ে যায় Munnow নামে। এছাড়া হেইলবেরী কলেজের শিক্ষক Moolvy Abdool Alee-এর ইংরেজ স্ত্রী Mrs Moolvy নামে পরিচিতি হন। বিউটি টিমস নামে তাঁর স্ত্রী অনেক বছর ভারতবর্ষে বাস করার পর স্বদেশে ফিরে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় মুসলিমদের নিয়ে 'Observations on the Mussulmans of India' (১৮৩২) নামে দুই খণ্ডে একটি বই লিখেছিলেন এবং লেখিকা হিসেবে নাম দেন মিসেস মীর হাসান আলী।[১৯]

ইতেশাম উদ্দিন, শেখ দীন মহাম্মদ, মীর্জা আবু তালিব প্রমুখ যে বিলেতে যেতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ মুসলমানদের মধ্যে কালাপানি পার হওয়ায় কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তাছাড়া, লেখাপড়া জানা মুসলমানদের ভাষা শিখানোর কাজে চাহিদাও ছিল। অপর দিকে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষে লোকাচার অমান্য করে কালাপানি পার হওয়া আদৌ সহজ ছিল না। তাই আঠারো শতকের শেষে অথবা উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে বলতে গেলে ঘনশ্যাম দাস (১৭৭৩ সালে পার্লামেন্টের সিলেক্ট সাক্ষ্য দিয়েছিলেন) ছাড়া কোন বাঙালি বিলেতে যাননি। এবং লোকাচার অমান্য করার জন্য তাকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছিল।[২০]

কালাপানির পার হওয়ার ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এ রকমের তীব্র বিরোধীতা থাকলেও, পশ্চিম ভারত থেকে একাধিক হিন্দু প্রতিনিধি দল রাজা-মহারাজার ভাতা বৃদ্ধির উদেশ্যে অথবা অন্যান্য অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন; যেমন ১৭৮০ সালের দিকে মারাঠারাজ রঘুনাথ রাও পাঠিয়েছিলেন হনমন্ত রাওকে। স্বদেশে ফিরে তিনি অবশ্য ঘনশ্যাম দাসের মতো জাত হারান নি। বরং অনেক বছর পর্যন্ত অন্যরা তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে, কালাপানি পার হওয়া নিষিদ্ধ নয়।[২১]

রাজা-মহারাজা এবং নবাব-সুলতানদের তরফ থেকে এরকম প্রতিনিধি দল পাঠানোর উদ্যোগ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বরং অনেক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ১৮৩০-এর দশক থেকে। সিপাহী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যাঁরা কোন না কোন অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে বিলেতে যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন টিপু সুলতানের দুই পুত্র প্রিন্স জামাহুদ্দীন এবং গোলাম মোহাম্মদ, কুর্গের মহারাজার প্রতিনিধিদল, নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর রাণা, রামপুরের নবাব, সুরাটের নবাব এবং অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের প্রতিনিধিরা। বঙ্গদেশের কোন প্রতিনিধি দল যায় নি। এ থেকে মনে হয়, কালাপানি পার হওয়ার ব্যাপারে বঙ্গদেশের মতো ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের মনোভাব অতো প্রতিকূল ছিল না।[২২]

কালাপানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিলেতে যাওয়ার ব্যাপারে বাঙালিদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। এ সময়ে কলকাতা নগরীতে হিন্দু কলেজ এবং অন্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। তাছাড়া কলকাতায় রাজধানী ছিলো বলে চাকরি এবং ব্যবসা সূত্রে অনেকেরই যোগাযোগ ঘটে ইংরেজদের সঙ্গে। এর ফলে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি লোকাচারের প্রতি কারো কারো আনুগত্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। অনেকে আবার একই সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং একই সাথে জাত রাখতে চেষ্টা করেন। কারণ ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের সুফল এবং ইংরেজী শিক্ষার ইহলৌকিক সুবিধাগুলোর প্রতি তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে, সমাজের প্রতি তাঁদের আনুগত্যও তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই দিনের বেলা ইংরেজদের অফিসে চাকরি করে বাড়িতে ফেরার সময় গঙ্গায় স্নান করে 'পবিত্র' হয়ে বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করতেন অনেকেই।[২৩]

ইহলৌকিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া, ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতা কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গিতেই মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল। যে কূপমন্ডূকতা বাঙালিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম আচ্ছন্ন করে রেখেছিল নতুন যুগের জোরে তা কেটে যেতে আরম্ভ করে। বাঙালি ঐতিহাসিকরা এ বিস্ফোরণকে সীমিত অর্থে রেঁনেসা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই রেঁনেসার আলো বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে সময় লেগেছিল ঠিকই; কিন্তু সমাজের শিখরে তার আলো পড়তে আরম্ভ করেছিল আগেই। এই পরিবেশে আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত রাজা রামমোহন রায়ের মতো কোন কোন মুক্তমনা মানুষ স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন কালাপানি পার হয়ে বিলেতে যাওয়ার। কেবল স্বপ্নই নয়, কিছুকালের মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে এবং জাত যাওয়ার ঝুকি নিয়েই দু'একজন করে সমুদ্র যাত্রার কথা ভাবতে শুরু করেন। এ রকম দু'জন দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন বিলেতযাত্রা করেন ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সালের ৯ জানুয়ারী তাঁর নিজের জাহাজ ইন্ডিয়াতে করে। একই পথ ধরে মাইকেল মধু সূদন দত্ত, গিরিশ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমূখ বিলেতে গমণ করেন।[২৪]

এখানে একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেকালে প্রবাসে যাওয়াকে কেবল লোকাচার বিরোধী বলে মনে করা হতো না, একে গণ্য করা হতো চরম দূর্ভাগ্য হিসেবে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রেও প্রবাস আর মৃত্যুকে সমান করে দেখা হতো। হয়তো এ জন্যেই ভারতীয়দের মধ্যে কোন হিউয়েন সাং, ইবনে বতুতা, মার্কোপোলো, কলম্বাস অথবা ভাস্কো-দা-গামার জন্ম হয় নি। প্রাচীনকালে যে কয়জন বাঙালি তিব্বত অথবা তিব্বত পার হয়ে চীনে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ এবং গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। ধারণা করা হয়, বৌদ্ধদের মধ্যে কালাপানি পার হওয়া বা দূরদেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার করার একটা রীতি সম্রাট অশোকের সময় থেকেই চালু হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম সেভাবেই দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২৫] অপরপক্ষে হিন্দুদের মধ্যে কঠোর বিধান থাকা সত্ত্বেও রামমোহন-এর মতো কিছু সাহসী মহামানব, সংস্কারক ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ স্বদেশের সীমানা অতিক্রম করেন একাধিক বার।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

মোট কথা, যে-বাংলাভাষীরা প্রথম বিলেতে যান, তাঁদের মধ্যে রামমোহন এবং দ্বারকানাথের মতো দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং অভিজাত ব্যক্তি থাকার ফলে বাঙালি এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে সেখানকার সমাজের বিশেষ করে সমাজের উঁচু তলার লোকদের মধ্যে উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ভারতীদের প্রতি ইংরেজ সমাজের বিশেষ করে সমাজের নিচের তলার লোকদের বর্ণবাদী মনোভাব অনেক দিনই বজায় ছিল। একুশ শতকের গোড়ায় এসেও যে সেই ধারণা একেবারে লোপ পেয়েছে, তা নয়। সে জন্য আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইতেশাম উদ্দিনকে বহু বার 'কালুয়া' গাল শুনতে হয়েছিল। ১৮৩০ এর দশকে রামমোহন রায়কে এক সভায় দেখে "এই কালুয়া এই সভায় কী করছে ?" বলে কোম্পানীর ভারত ফেরত এক সাবেক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন। ১৮৮০ এর দশকে এ রকম মন্তব্য দ্বারকানাথকেও শুনতে হয়েছিল। এমন কি, তার প্রায় চল্লিশ বছর পরে রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রানাথকে দেখেও, "দেখো, দেখো, এই ব্লাকীকে দেখো" বলেও মন্তব্য করেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা কৌতুকের সঙ্গে লিখেছিলেন।[২৭] মাইকেল মধুসূদন দত্তও (১৮৬৪) মনের দুঃখে গৌরদাসকে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের তুলনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, "এ দেশে (ফ্রান্সে) কেউ তোমাকে কালো নিগার বলে অপমান করবে না।" এমন কি, ১৮৮০ দশকের গোড়ায় বিলেতের পত্রে গিরিশ চন্দ্র বসুও একই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। তাঁর বিশ বছর পরে ব্রম্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও ভিন্ন রকমের ছিল না।[২৮]

১.২ বিদ্যার সন্ধানে যুক্তরাজ্যে বাঙালি ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৭৭৪-৭৫ সালে মীর মোহাম্মদ হোসেন বিলেতে গিয়েছিলেন সেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি নিজের চোখে দেখার জন্যে। রামমোহনও গিয়েছিলেন কেবল মুঘল সম্রাটের দৌত্য করা জন্যে নয় বরং তাঁর যাওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা। তেমনি দ্বারকানাথ ঠাকুরও গিয়েছিলেন পশ্চিমা জগৎ কেমন নিজের চোখে তা দেখার জন্যে এবং সেই সঙ্গে জীবনের স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে। তাঁর ইউরোপ ভ্রমন করার লক্ষ্য ছিল নিজের দেশের যুবকদের বিলেতি শিক্ষা দিয়ে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তোলা। সে জন্যে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে যাতে তাঁরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারে, যা পরবর্তীকালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারার সৃষ্টি করে।

রামমোহন এবং দ্বারকানাথ পরবর্তী কয়েক দশক যে বাঙালিরা বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউই এঁদের মতো প্রৌঢ় বা অবস্থাপন্ন ছিলেন না। কেবল দেশ ভ্রমনের জন্যে বা উপভোগ করার জন্যে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তাঁরা প্রায় সবাই গিয়েছিলেন সেখানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়েই।

কলকাতার মেডিকেল কলেজ স্থপিত হয়েছিল ১৮৩৫ সালে। বছর পাঁচেকের মধ্যে কলেজের অধ্যাপক এবং পরিচালকেরা অনুভব করেছিলেন যে, কয়েকজন ভারতীয়কে বিলেত থেকে চিকিৎসা বিদ্যা পড়িয়ে না আনলে কলেজের বিকাশ ঘটবে না বা বিলেতি চিকিৎসার দিকে দেশীয়দের আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। সে কারণে দ্বারকানাথের সঙ্গে চার জন ছাত্রকে পাঠানো হয়।

লেখাপড়া শিখতে যাওয়ার মতো মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও হিন্দু সমাজের কারো পক্ষেই কালাপানি পার হওয়া সহজ ছিল না। তার ওপর এঁরা গিয়েছিলেন চিকিৎসা বিদ্যা শেখার জন্যে। এ উদ্দেশ্য তাঁদের যাত্রাকে আরও কঠিন করেছিল নিঃসন্দেহে। তাই দেখা যায়, ১৮৩৬ সালের ২৮ অক্টোবর 'প্রথম মড়া কাটার দিন' এটা এমন অসাধরণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয় যে, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি করে এর প্রতি সম্মান জানানো হয়েছিল।[২৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কালাপানির নিষেধ না তাকলেও তাঁদের মধ্যে প্রথম দিকে যারা বিলেত গিয়েছিলেন তারা ছিলেন আয়া, ভৃত্য অথবা জাহাজের লস্কর। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠতে আরম্ভ করে মুসলমানরা ছিলেন তা থেকে অনেক দূরে। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করা দূরে থাক তাঁদের মধ্যে সাধারণ অধুনিক শিক্ষারই সূত্রপাতই তখনো হয় নি। চিকিৎসা বিদ্যার দিকে তারা কতো দেরিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, ১৮৭০ সাল নাগাদ কলকাতা মেডিকেল কলেজে যখন অনেক হিন্দু অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন তখন কর্মচারীদের তালিকায় নাম ছিল মাত্র দু'জন মুসলমানের।[৩০]

বাঙালি ছাত্ররা প্রথমে বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন চিকিৎসা বিদ্যা শেখার জন্যে এবং যে পাঁচজন গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের লেখাপড়া শেষ করেছিলেন। দেশে এসে তাঁরা ভালো চাকুরীও করেছিলেন। সুতারাং তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রের বিলেতে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এঁরা দেশে ফেরার পর ১৭৬০ এর দশকে মুষ্টিমেয় ছাত্রই চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতে যান। প্রথম পাঁচজনের মতো সুযোগ এবং সরকারি আনুকূল্য সম্ভবত তাঁরা পান নি এবং নিজেদের ব্যয়ে যাওয়ার মতো অর্থও সবার ছিল না। তা ছাড়া লোকাচারের বাঁধাতো ছিলই। এর পরে বরং অনেক বেশি ছাত্র যেতে আরম্ভ করেন ব্যরিস্টার হবার জন্যে। তাছাড়া চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ ছিল ইংল্যান্ডের তুলনায় অনেক বেশি। এক সমীক্ষায় দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে বিলেত থেকে যে ডাক্তাররা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্কটিশ ডাক্তারের সংখ্যা ইংলিশ

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তারদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তথাপিও দেড় শতক বছর পরে এখনও ব্রিটেনই হলো চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের প্রধান লক্ষ্য।[৩১]

১৮৫৯ সাল থেকে যাঁরা বিলেতে লেখাপড়া করতে যান তাঁরা যান প্রধানত আইন অধ্যয়ন করার জন্যে। কেউ কেউ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যেও গিয়েছিলেন। কেউ কেউ গিয়েছিলেন উভয় উদ্দেশ্যে। এই ছাত্রদের মধ্যে সবার আগে নাম উল্লেখ করতে হয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের। মাইকেল মধুসুধন দত্ত ছিলেন তাঁর সহপাঠী। তাঁদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব না থাকলেও কতগুলো ব্যাপারে তাদের মধ্যে ছিল আশ্চর্য রকমের মিল। জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের পিতা প্রসন্ন কুমারের মতো বিখ্যাত উকিল বা ধনী ছিলেন না মধুর পিতা-রাজ নারায়ন দত্ত। কিন্তু তিনিও উকিল ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র মোহনের প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী কমলমনির সঙ্গে আইনের কোন যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু তাঁর কথাও বিশেষ উল্লেখ করে বলতে হয় এই জন্যে যে শিক্ষিত বাঙালি নারীদের মধ্যে তিনিই সবার আগে বিলেতে গিয়েছিলেন।[৩২]

জ্ঞানেন্দ্র মোহন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। দু'জনই ইংরেজিয়না দিয়ে প্রভাবিত হয়ে খৃষ্টান হয়েছিলেন। ধর্ম হিসেবে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বেও দু'জন বিশ্বাসী ছিলেন। মাইকেলের "The Anilo saxon and the Hindu'' বক্তৃতায় এবং জ্ঞানেন্দ্র মোহনের 'Thoughts by a Christian Brahmin on the position and prospects of Religion in India' পুস্তিকায় খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁদের মনোভাব প্রকাশ পায়।[৩৩]

জ্ঞানেন্দ্র মোহন এবং মধু সূদন দত্তের পশ্চাৎপদ হয়ে প্রথমত আট-দশজন ব্যারিস্টার হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৭০-এর দশকেও আরও বেশি সংখ্যক বাঙালি ছাত্র ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেতে যেতে থাকেন। আর ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া যে সমস্ত ছাত্র বিলেতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-এর সূত্রপাত করে ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই আইনের ছাত্র ছিলেন (পরবর্তী পর্যায়ে-এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। বস্তুত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র ধরে বঙ্গদেশে মামলা মকদ্দমা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৪] এ জন্যে ওকালতিকে সবচেয়ে দ্রুত ধনী হওয়ার একটি পথ বলে বিবেচনা করা হতো। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববদ্যালয় থেকে প্রায় সাড়ে সাতশো পরীক্ষার্থী বি, এ. এম, এ. এবং বি, এল. পাশ করেন। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এঁদের মধ্যে যারা বেঁচেছিলেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনেরও বেশি ওকালতি করতেন এবং চাকুরী করতেন আইন বিভাগে।[৩৫]

১৮৮০ সালের পর মুসলমানদের মধ্যেও ব্যারিস্টারি পড়া এতো আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে চালু হয় যে, ধনী পরিবারের ছেলেরা অনেকেই ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। তৎকালে মুসলমান ব্যারিস্টারদের মধ্যে যে তিনজন খ্যাতি লাভ করেন, সৈয়দ আমীর আলী ছাড়া তাঁদের অন্য দু'জনের নাম আবদুর রহিম এবং আবদুর রসুল। তাঁরা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশি খ্যাতি লাভ করেন।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা জরুরী যে, তখন বিলেতে গেলে জাত যেতো কেবল কালাপানি পার হওয়ার কারণেই নয়, তার পেছনে আর একটা বড়ো কারণ ছিল বিদেশে নিষিদ্ধ খাবার এবং পানীয় গ্রহণ। রাখালদাস হালদার তাঁর ডাইরি "The English Diary of an Iadian student''-এ লিখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা লন্ডনে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তম মুদালিয়ার নামে এক ভদ্রলোক খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে জাত বাজায় রাখার 'ভান' করতেন। যে যুগের কথা আলোচিত হচ্ছে, সে কালে বিলেতে ভাত আর মাছের ঝোল জুটতো না। আবার সাধারণ লোকের পক্ষে ইতেশাম উদ্দীন, আবু তালিব, রামমোহন অথবা দ্বারকানাথের মতো নিজেদের রাঁধুণী নিয়েও যাওয়ার উপায় ছিল না। সুতরাং ইংরেজদের বাড়ীতে অতিথি হয়ে তাঁদের খাদ্য- ঠান্ডা গরুর মাংস আর শুয়েরের মাংসই খেতে হতো রোজ রোজ। মনোমোহন ঘোষও একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, শুয়োর আর গরুর মাংস খেতে অরুচি ধরে গেছে। দেশে গিয়ে ভাত আর মাছের ঝোল খাবেন, তার জন্যে দিন গুণছেন। মনোমোহনের বিশ বছর পরে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু। তিনিও দেশী খাবারের জন্যে হাপিত্যেশ করেছিলেন।[৩৬]

শুধু ডাক্তার আর ব্যারিস্টারই নয়; যারা তারো ছাত্র ছিলেন, তাঁদের সামনে আর একটা প্রলোভন ছিল আইসিএস হওয়ার। যে দু'জন বাঙালি প্রথম বিলেতে যান এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্যে তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন ঘোষ। তখন যাঁরা বিলেতে যেতে পারতেন, আগের অনেকগুলো উদাহরণ থেকে আমরা তা' লক্ষ্য করেছি। সত্যেন্দ্র নাথ ও মনোমোহনও পড়েন এই শ্রেণীতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রথমবার বিলেতে গিয়েছিলেন বিলেতি শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আইসিএস হবার আশায়। ১৮৯০-এর দশকে সিলেটের অধিবাসী গজনফর আলী খান আইসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে যান। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি কেমব্রিজ বিশ্বদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে বি,এস,সি পাশ করে অনন্দ মোহন বসুর পরে দ্বিতীয় বাঙালি হিসেবে র‍্যাংলারও হন।[৩৭]

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, বাঙালি ছাত্ররা প্রথমে বিলেতে যেতে আরম্ভ করেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে। বিলেতে যাওয়া এবং সেখানে আইসিএস প্রতিযোগিতা ছিল তার চেয়েও শক্ত। তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল ব্যারিস্টারি পড়া। অপর পক্ষে, সাধারণ বি.এ.-এম. এ. পাশ করার প্রতি কারো তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর থেকে আনন্দ মোহন বসুর মতো দু-একজন করে যেতে আরম্ভ করেন এ্যাকাডেমিক শিক্ষার জন্যে। ১৮৬৮ সাল থেকে বিলেতে গিয়ে উচ্চ শক্ষা লাভের জন্যে সরকারও কয়েটি বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে মেধাবী অথবা দরিদ্র ছাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিলেতে যাওয়া খানিকটা সহজও হয়েছিল। বস্তুত এই সুযোগ পেয়ে এমন কেউ কেউ যেতে পেরেছিলেন, যাঁদের পক্ষে অন্যথায় কখনোই বিলেত যাওয়া সম্ভব হতো না।[৩৮]

এ ধারার প্রথম দিকে যাঁরা উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়েছিলেন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইংরেজী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে। এমনকি ১৮৮০-এর দশকের গোড়ার দিক কেউ কেউ কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্যেও যান। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্ন কুমার রায়, প্রমথ নাথ বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশ চন্দ্র বসু এবং সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।[৩৯]

উপরোক্ত যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে নিশিকান্ত চট্টোপধ্যায় ছাড়া অন্য সবাই যান বিজ্ঞান পড়তে যার ব্যবস্থা স্বদেশে খুব কমই ছিল। কিন্তু এরপর অনেকে যেতে আরম্ভ করেন সাহিত্য ও মানবিক বিদ্যায় শিক্ষা নেওয়ার জন্যে। এমন কি যাঁদের টাকা পয়সা ছিল তারা সাধারণ শিক্ষার জন্যেও বিলেত গিয়েছিলেন। যেমন, তারকনাথ পালিত শিক্ষার জন্যে তাঁর কন্যা লিলিয়ান, পুত্র লোকেন এবং স্ত্রীকে বিলেতে রেখে এসেছিলেন। তেমনি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জিও তাঁর কম বয়সী ছেলেমেয়েদের একে একে বিলেতে রেখে এসেছিলেন সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বড়ো করেযেন বলে। এ ধারাটি পরে ধীরে ধীরে জোরালো হয়েছিল।[৪০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষার জন্যে না হলেও অন্য কাজ নিয়ে অথবা ভ্রমনের জন্যে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে গোঁড়াতে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অগ্রণী ছিলেন, কারণ কালাপানি পাড়ি দেওয়ার ফলে তাঁদের জাত যাওয়ার অশংকা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, সূর্য গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখ একবার কালাপানি পার হওয়ার বাঁধা দূর করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্যে হিন্দুরাই আগে বিলেত যেতে আরম্ভ করেন এবং তাঁরা যান প্রধানত লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে। মুসলমানরা তখন থাকেন পিছিয়ে। প্রথমদিকে যে মুসলমানরা বিলেত গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান অথবা অন্য কোন সূত্রে ধনী।[৪১]

১৮৬০ সালের পর থেকে ছাত্রদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডেভিড কফ-এর মতে ১৮১৫ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে প্রায় আটশত বাঙালি ছাত্র বিলেতে গিয়েছিলেন।[৪২]

ডাক্তারি, আইন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে সেকালে যারা বিলেতে যেতেন, তাঁরা সাধারণত যেতেন দেশে ফিরে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ধনী হবার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু অসাধারণ উদ্দেশ্যে নিয়েও কেউ কেউ অন্যান্য বিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতের পথে যাত্রা করেছিলেন। যেমন শশী কুমার হেশ। তিনি গিয়েছিলেন চিত্রাঙ্কন শিখতে। শিল্পকলায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে কৌশল মুখার্জী বিলেতে গিয়েছিলেন ১৯১০ সালের দিকে। ফটোগ্রাফি এবং ১৯১১ সালে ছাপার কাজ শিখতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায়। এছাড়া, নানা কাজের সূত্রে বিশ শতকের গোড়ায় শত শত লোক বিলেত যেতে আরম্ভ করেন। এভাবে একদিকে বিলেতযাত্রীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় ইউরোপের সাথে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।[৪৩]

প্রসঙ্গক্রমে বিলেতে বঙ্গ মহিলা সম্পর্কে উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। আগেই লক্ষ্য করেছি, বাঙালি মহিলাদের মধ্যে সবার আগে-১৮৫৯ সালে বিলেতে গিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের স্ত্রী কমলমনি। এর পর (১৮৬৩-৬৬) সপরিবারে বিলেত এবং ফ্রান্সে বসবাস করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হেনরিয়েটা বাঙালি না হলেও বাঙালি স্বামীর সূত্রে তাঁর নাম এসে যায়। বিলেত যাত্রী তৃতীয় বাঙালি মহিলা হলেন ক্ষেত্র মোহিনী দত্ত। অন্য যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন শশী পদ বন্দোপাধ্যায়ের স্ত্রী রাজ কুমারী বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর সন্তানেরা। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী স্বর্ণলতা, রমেশ চন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা সরলতা, তিনি একই সাথে আইসিএস জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্তের স্ত্রী ছিলেন, ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জুবলীতে যোগদান করতে লন্ডনে যান কুচবিহারের রাজা নরেন্দ্র নাথ ভূপের স্ত্রী সুনীতি দেবী। এছাড়া যান উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জির স্ত্রী ও সন্তান এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিকা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দী দেবী। শিক্ষা এবং আধুনিকতা অর্জন করে জ্ঞানদানন্দী দেবী বাঙালি নারিদের কাছে পর্দা ভাঙ্গা, পোষাক-আশাক এবং আধুনিকতার অনেক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন গোলাম মুরশিদ তাঁর "Reluctant debutante : Response of Bengali Women towards Modernization'' নামক গ্রন্থে।

বস্তুত, বহু বাঙালি নারীই নানা কারণে উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশকে বিলেতে গিয়েছিলেন। যাঁরা লেখাপড়া শিখতে যান, তাঁদের মধ্যে অরু ও তরু দত্তকে বলতে পারি নিতান্তই ব্যতিক্রম। কারণ তাঁরা সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও একটা ধারার পত্তন করতে পারেন নি। তাছাড়া মেয়েদের বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে পাঠানোর ব্যাপারে কেবল লোকচারের বাঁধাই নয়, বড়ো বাঁধা আসতো অভিভাবক এবং আত্মীয়দের তরফ থেকে। এসব কারণে মহিলাদের নিজেদের মনেই যথেষ্ট সংকোচ এবং ভয় ছিল। নূরুল ইসলামের মতে অন্ততঃ বর্তমান যুগের প্রবাসী বাঙালি মেয়েদের মতো আত্মবিশ্বাস তাঁরা অর্জন করেন নি। ফলে কেবল উনিশ নয়, বিশ শতকেও যে-দুঃসাহসী নারীরা উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁদের সাধারণ না বলে অসাধারণ বলাই সঙ্গত।

Dhaka University Institutional Repository

নানা রকমের বাঁধা সত্বেও শুধু লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে বাঙালি নারীরা বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন ১৮৯০-এর দশক থেকে। এ রকমের একজন ডাক্তার ছিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। বাঙালি মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে এর পর বিলেতে যান কবি কামিনী রায়ের ছোট বোন যামিনী রায়। অন্য যে নারীরা প্রথম দিকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেত যান তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন সরোজিনী নাইডু (চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫)। কয়েক বছর পর তাঁর ছোট বোন মৃণালিনীও কেমব্রিজে পড়তে যান। সরোজিনী দাস গিয়েছিলেন ১৯০৮ সালে। মুসলমান নারীদের মধ্যে কে বা কারা প্রথম বিলেতে লেখাপড়া শিখতে যান, তা জানা না গেলেও ১৯২৮/২৯ সালে গণিত অধ্যায়ন করতে বিলেতে গিয়েছিলেন ফজিলাতুন নেছা এটা জানা যায়।[৪৪]

১.৩ যুক্তরাজ্যে বাঙালির কর্ম ও বসতি স্থাপন ঃ

উনিশ শতকের প্রথম দিকেও সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র বিরোধী ব্যাপার বলে গণ্য হলেও শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমাজের চোখে তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এর চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো; শুধু লেখাপড়া করার জন্যে নয়, বরং অনেকে তাদের কাঙ্খিত ভূস্বর্গে যেতে আরম্ভ করেন একবার তা দেখার জন্যে অথবা সেখানে গিয়ে জীবনটা উপভোগ করার জন্যে।[৪৫]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বিলেতে থেকেই যান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কিছু লস্কর শ্রেণীর লোক ছাড়া প্রথম দিকের বসতি স্থাপন কারীরা প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত লোক- ডাক্তার, ব্যারিস্টার, আইনজীবী ইত্যাদি। শিক্ষা গ্রহণ করতে এসে তাঁরা ইংরেজ রমণী বিয়ে করে সেখানেই থেকে যান। যেমন উপেন্দ্র কৃষ্ণ, অরুণ দত্ত প্রমুখ। অথবা শিক্ষা গ্রহণের পর দেশে ফিরে গেলেও শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সূত্রেই অনেকে আবার বিলেতে ফিরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। যেমন রাজেন্দ্র চন্দ্র, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। মোটকথা উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে বাঙালিদের মধ্যে এমন একটা নতুন, সৃষ্টিশীল ও প্রগতিবাদী মনোভাবের জন্ম নেয় কেবল বিলেত গিয়ে শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে আসার মনোভাব নয় অর্থাৎ বিলেত ফেরত হওয়ার বাসনা নয়, বরং বিলেতবাসী হওয়ার মনোভাব। এভাবেই অত্যন্ত ধীর গতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিলেতে বাঙালিদের বসতি গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং বিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই মূল বঙ্গভূমি, ত্রিপুরা এবং আসামের পরে সবচেয়ে বড়ো বাঙালি বসতি গড়ে ওঠে সুদূর বিলেতের শীতল মাটিতে যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বাংলাদেশ ভূখন্ডের বাইরে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ হয়েছিল এই বিলেতের মাটিতেই; যাকে মাইকেল মধুসূদন একদিন বলেছিলেন, “Far away,...far away... the land... beneath the colder ray.’’[৪৬] কিন্তু কী করে ঘটলো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এই পরিবর্তন?

সূত্রপাত ঃ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কারা ব্রিটেনে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের তথ্য খুব সামান্যই জানা যায়। একটি বিষয় পরিস্কারভাবে জানা যায় তা হলো; প্রথম দিকে যে বাঙালিরা আসতেন, তাঁদের জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন, তাঁরা আসতেন কলকাতা থেকে। কারণ সেখানেই ছিল শিক্ষার কেন্দ্র এবং জাহাজের ঘাঁটি। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন ধনী অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর ধর্মীয় পটিয়ে প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চ বর্ণের হিন্দু। শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁরাই তখন এগিয়ে ছিলেন। উচ্চতর শিক্ষ গ্রহণের জন্যে এঁরা সাগর পাড়ি দিতেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা আরও ধনী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হতেন। কিন্তু বিশ শতকে কেউ কেউ আসতে আরম্ভ করেন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে নয়, বরং বিলেতে স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে। যে বাঙালিরা কখনো প্রবাসকে শ্রেয় বলে গণ্য করেন নি, সেই বাঙালিরাই প্রবাসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার যে মনোভাব দেখাতে আরম্ভ করেন তাকে বশ্যই প্রসংশণীয় ও অসাধারণ বলে বিবেচনা করতে হয়। আর এ মনোভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের হয়ে বরিশালের ইন্দ্রলাল রায় (বিমান বাহিনী), উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জির পৌত্র ফিউ ব্যানার্জী (বিমান বাহিনী) এবং ভাগ্নে কল্যাণ ব্যানার্জী (ডাক্তার হিসেবে) লন্ডন থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন।[৪৭]

পেশাদারদের মধ্যে প্রথম যাঁরা বিলেতে বসতি স্থাপনের জন্যে যান তাঁরা হচ্ছেন ডাক্তার শ্রেণী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত অর্ধ শতাব্দীতে উপমহাদেশ থেকে এতো ডাক্তার এসেছেন যে, ব্রিটেনের বর্তমান জাতীয় স্বাস্থ্য সার্ভিসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ডাক্তারই ভারতীয় উপমহাদেশের। ব্রিটেনে পূর্ব বঙ্গের ডাক্তাররা আসতে আরম্ভ করেন ১৯৬০-এর দশক থেকে।[৪৮]

অন্যান্য পেশাদারদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় এই সংখ্যা ছিলো প্রায় হাতে গোণা। যেমন দ'জন বাঙালি সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করেছেন রোজিনা বিশ্রাম।[৪৯] তাঁরা হলেন কেমব্রিজ থেকে গণিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত পুলিন বিহারী শীল এবং বি, বি, রায় চৌধুরী। গণিতে ডিগ্রী করেও পুলিন বিহারী সাংবাদিকতায় নামেন -এ থেকে বোঝা যায় যে, বিলেতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যেই নিজের বিদ্যাকে কাজে না লাগিয়ে অন্য পেশায় ঢুকেছিলেন। এ রকমের আর একজন তারাপদ বসু পিএইচ. ডি করে ছিলেন ইতিহাসে। কিন্তু লন্ডনে থেকে যান আনন্দ বাজার পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে। কমল বসুও লন্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। তারপর বিবিসি বাংলা বিভাগে যোগদান করেন ১৯৪২ সালে। ডঃ সেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই পিএইচ. ডি করেছিলেন জার্মানী থেকে। তারপর একজন জার্মান মহিলাকে বিয়ে করে লন্ডনে চলে এসে উত্তর লন্ডনের টেফনাল পার্কে পাশাপাশি দুটি বাড়ী কিনে পেশাদার বাড়ীওয়ালা বলে যান তিনি। তাঁর এই বাড়ীতে

Dhaka University Institutional Repository
তখনকার অনেক ভারতীয় ছাত্রই বসবাস করেছিলেন। এস. এ. হক ও নীরেন্দ্র দত্ত মজুমদার নামে দু'জন হাইডপার্কের বক্তৃতায় অংশ নিতেন বলে জানা যায়, কিন্তু তাঁরা পেশায় কী ছিলেন তা জানা যায় না। কোরেশী নিসার আলি এবং আবদুল হামিদ নামে দু'জন ব্যারিস্টার ১৯৪০-এর দশকে লন্ডনে কাজ করতেন বলে জানা যায়। উক্ত দশকের আরও বাঙালি আইনজীবী থাকা সম্ভব বলেও অনুমান করা যায়।[৫০]

লস্কর থেকে লন্ডনী ঃ

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিলেতগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছিলেন জাহাজের লস্কর। এঁদের মধ্যে বাঙালিও ছিলেন অনেক। লস্করা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যোগ দিয়েছিলেন মার্চেন্ট নেভিতে। জাহাজ ডুবিতে জীবন দেন অসংখ্য নাবিক। যুদ্ধের পর এদের কেউ কেউ বিলেতে থেকে গিয়েছিলেন। লিখিত সূত্রের অভাবে লস্করদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবশ্য বেশি জানা যায় না। যে কয়জন বাঙালি লস্করের কথা 'Across Seven Seas and Thirteen Rivers' (Adams caroline, London ; Thap Books, 1987) গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁরা হলেন আইয়ুব আলী মাষ্টার, মুনশী, নানা, মারুফা খান ও নাইম উল্লাহ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে তখন সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন আইয়ুব আলী মাষ্টার। তিনি ১৯১৯ সালে জাহাজের লস্কর হিসেবে আমেরিকায় যান। সেখান থেকে পালিয়ে পরের বছর লন্ডনে আসেন। আফতাব আলী নামে আরও একজন লস্কর একই প্রক্রিয়ায় ১৯২৩ সালে লন্ডনে আসেন। পরবর্তীকালে অগ্রপথিক নাবিক আফতাব আলী লন্ডনে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

১৯৩০ এর দশকে বাঙালি লস্করদের সংখ্যা বেশ বাড়তে থাকে। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, এই দশকের শেষে এক লন্ডনেই লস্করদের সংখ্যা দাঁড়ায় দেড় শো'তে। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার সংগৃহীত হয়েছে উপরের গ্রন্থে। এঁদের মধ্যে ময়না মিয়া আসেন ১৯৩৬ সালের শুরুতে, ইসরাইল মিয়া ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে এবং নোয়াব আলী আসেন ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে। সাক্ষাৎকার নেই এরকম একজন হলেন আশকের মিয়া আখনজি। তাঁর পুত্রের মতে তিনি আসেন ১৯৩৩ সালে।[৫১]

পেশাদারদের সঙ্গে এই অপেশাদার লস্করদের ছিল নানা ধরণের পার্থক্য। যেমন, ধর্মীয় পরিচয়ে এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলমান। তাঁরা করতেন জাহাজের বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। একটা দিকে পেশাদারদের সঙ্গে লস্করদের অবশ্য মিল ছিল- তাঁরাও আসতেন কলকাতা থেকে আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে কলকাতার ডক থেকে। আগের অভিবাসীরা ব্রিটেনে বিয়ে করে সংসার গড়ে তুলেন। কিন্তু নতুন অভিবাসীরা আসেন অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে অর্থ উপার্জন কর দেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ব্রিটেনের অভিবাসন আইনে একের পর এক পরিবর্তন আসে। তাছাড়া, এসব শ্রমিকরা উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি করে। ফলশ্রুতিতে সময়ের প্রয়োজনে তাঁদের অনেকে ব্রিটেনের পরিবার নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। এভাবে বিলেতে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এবং বর্তমানে তিন লাখ বা তার চেয়েও বেশি বাঙালির একটি বড়ো সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। সেই সম্প্রদায়ের ইতিহাস, তাঁদের আঞ্চলিক পরিচয়, তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের সংস্কৃতি, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের আদান-প্রদান এবং বাঙালি তথা বাংলাদেশের ক্রান্তিকালীন সময়ে তাঁদের সম্মিলিতভাবে জেগে ওঠা ইত্যাদি খুবই কৌতূহলের বিষয়।[৫২]

লস্করাই যেহেতু ব্রিটেনে বাঙালি বসতি স্থাপন করেছেন, সে জন্যে তাঁরা কোথা থেকে এবং কী কারণ ও উদ্দেশ্যে আসেন তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সেই সঙ্গে দেখা যেতে পারে তাঁরা কী উপায়ে এদেশে ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করেন এবং বাঙালি বসতিকে একটা জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য দান করেন এবং সর্বোপরি বাঙালির সকল আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রসৈনিকের মতো এগিয়ে এসে বিশ্বব্যপী তোলপাড় সৃষ্টি (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) করেন।

লস্কররা এতো সাধারণ মানুষ ছিলেন যে, তাঁদের নাম ধাম কেউ লিখে রাখেন নি। তাঁদের সম্পর্কে সে জন্যে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইতেশাম উদ্দীন ১৭৮০-এর দশকে লেখা তাঁর ভ্রমন কাহিনী[৫৩] তে এমন একটি মন্তব্য করেন যে, তা থেকে এই লস্কররা সাধারণত বঙ্গদেশের কোন এলাকা থেকে আসতেন, সে বিষয়ে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, তিনি বিলেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিলেতের লোকেরা ভারতীয় বললে বুঝতেন চট্টগ্রাম আর জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে আগত লস্করদের। কিন্তু তিনি যাওয়াতে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, অন্য রকম ভারতীয়ও আছেন। ইতেশাম উদ্দীনের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, লস্করা সবাই না হলেও বেশির ভাগই ছিলেন পূর্ব বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। ইতেশাম নিজে ছিলেন নদীয়ার মানুষ। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি পূর্ববঙ্গ প্রীতি থেকে একথা বলেন নি।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, লস্কররা কেবল ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে আসেন নি। তাঁরা অন্যান্য এলাকা থেকেও কম বেশি এসেছেন। এমন কি, এসেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকেও। আর প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০০১ সালের ব্রিটেনে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসা লোকদের সংখ্যা হলো বিশ লাখ দশ হাজার পাঁচশো একচল্লিশ জন। এঁদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ।[৫৪]

এই যে ভারতীয় উপমহাদেশের বিশ লাখ লোক এদেশে বসবাস করছেন তাঁদের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা আসেন উপমহাদেশের প্রধানত চারটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ড থেকে। এগুলো হলো পশ্চিম পাঞ্জাবের মিরপুর অঞ্চল, পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাবের জলন্ধর, পশ্চিম ভারতের গুজরাট আর বঙ্গদেশের সিলেট। কিন্তু অভিবাসীরা বিশেষ করে এই চারটি অঞ্চল থেকে এলেন কেন, তার কোন বস্তুনিষ্ঠ উত্তর নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই চারটি অঞ্চলের সঙ্গেই সমুদ্রের যোগাযোগ রয়েছে। বলা বাহুল্য, তা ঠিক নয়। কারণ পাঞ্জাব থেকে সমুদ্র অনেক দূরে। অথচ ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবীদের সংখ্যা মোট ভারতীয় অভিবাসীদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের চেয়ে বেশি (৫১%)। তাছাড়া আরও মনে রাখা যেতে পারে যে, পাঞ্জাবীদের পরে গুজরাটীদের সংখ্যাই বেশি হলেও, তাঁদের অধিকাংশ খোদ গুজরাট থেকে আসেন নি, তারা এসেছিলেন পূর্ব আফ্রিকা থেকে। যারা সমুদ্র উপকূলবর্তী গুজরাট থেকে এসেছিলেন, তাঁরা আসতে আরম্ভ করেন পাঞ্জাবীদের পরে।

পাঞ্জাবীদের তুলনায় সমুদ্রতীরবর্তী বাঙালিদের সংখ্যাও অনেক কম, যদিও তাঁরা বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন পাঞ্জাবীদের অনেক আগে থেকে। যে-বাঙালি লস্কররা প্রথম দিকে বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার সিলেট থেকে নয়, তাঁরা যেতেন সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত চট্টগ্রাম আর ঢাকা থেকে। তুলনামূলকভাবে সাগর থেকে সিলেট অনেকটা দূরে। অথচ ব্রিটেনে সিলেটী অভিবাসীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর লোকদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এরও ব্যাখ্যা সহজে মেলে না।[৫৫]

এ প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম লিখেছেন যে, তবে এ পর্যন্ত যা জানা যায় তা হচ্ছে এই ঃ "তদানিন্তন সমুদ্র বন্দর কলকাতা হতে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে পাহাড়ঘেঁষা এই অঞ্চলটি আদিকালে সমুদ্র পাড়েই ছিল। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউ- এন-সাঙয়ের বর্ণনার সূত্র উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তিনি (হিউ- এন-সাঙ) সাগর পাড়ে পর্বত ও উপত্যকায় ঘেরা শিলিচট্টল বা সিলেটে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে নৌকাযোগে তিনি আসামের কামরূপ যান।' এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, 'সিলেটের উত্তর দিগবর্তী পর্বতের পাদদেশে সামুদ্রিক শম্বুকের নিদর্শন দৃষ্টে প্রমানিত হয় যে পূর্বকালে ঐ পর্বতের পাদদেশে সমুদ্রবারি প্রবাহিত ছিল।' ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে আগত সিলেট জেলার কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে-এর আত্মজীবনীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সিলেট জেলা অভ্যন্তরে তাঁর (লিন্ডসে-এর) নৌকা শত মাইল বিস্তৃত এক হ্রদে প্রবেশ করেন এবং ৪০০ টন বোঝাই হতে পারে এরকম একটি জাহাজও তিনি সিলেটে বসে নির্মাণ করেন।' এছাড়া ইতোপূর্বে ১৩০৪ খৃঃ হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর ৩৬০ আউলিয়াসহ নৌকাযোগে আগমন ও তাঁর আরব দেশের সাথে নৌ-যোগাযোগের সূত্র উল্লেখ করে বলেন, 'সিলেটের আজও বিদ্যমান অসংখ্য হাওর; যা সাগর শব্দেরই অপভ্রংশ।' উল্লেখিত বিখ্যাত ব্যক্তির্গের যোগাযোগের স্বার্থেই প্রয়োজন পড়ে স্থানীয় মাঝি-মাল্লার; যাঁরা কালের আবর্তে এবং জীবনের প্রয়োজনে হয়ে ওঠে সমুদ্র যাত্রায় পারদর্শী নাবিক এবং প্রয়োজনের তাগিতে সলিল সমাধিও বরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি যার প্রমাণ আমরা পাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ২০/২৫ হাজার সিলেটবাসী পূর্বসূরীর নীল অতলান্ত সাগরে আত্মাহুতীর মাধ্যমে।"

তিনি আরও লিখেছেন যে, '১৮৫৬ সালে সিলেটের বনজঙ্গলে চায়ের গাছ আবিস্কারের পর কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে চায়ের বাগান গড়ে ওঠে। সিলেট এবং আসামের বাগান থেকে চা রপ্তানি করার জন্যে ইঞ্জিন-চালিত জাহাজ যেতে আরম্ভ করলো সিলেটে। এই জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ, ইঞ্জিন রুম এবং ডেকের কাজ ইত্যাদির জন্যে জাহাজের কোম্পানিগুলো চাকরি দিতো সিলেটের সাধারণ লোকদের। এই খালাসি এবং লস্কররা প্রথমে জাহাজে করে আসতেন কলকাতায়। তারপর সেখান থেকে কেউ কেউ আসতেন বিলেত পর্যন্ত। চায়ের জাহাজে সিলেট থেকে কতো লোক কাজ নিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, তৎকালীন কলকাতার খিদিরপুরের লক্ষাধিক জাহাজীদের মধ্যে শতকরা পচাঁত্তর ভাগই ছিলেন সিলেটী লস্কর। সিলেটী লস্কররা বিলেতে এসে তাঁদের বর্ধিত আয় দিয়ে ভাগ্যোন্নতি করেছিলেন। এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেখে অন্যরাও আগ্রহী হয়েছিলেন এ কাজ করার জন্যে। তবে সিলেটের মানুষ কবে থেকে ইউরোপগামী জাহাজে নাবিক জীবন গ্রহণ করলো তার কোন নিশ্চিত ইতিহাস জানা যায় না।'[৫৬]

জাহাজের এই নাবিকদের মধ্যে বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে যাঁরা স্থায়ীভাবে বিলেতে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ বিষয় লিখেছেন ক্যারোলাইন অ্যাডামস (Across Seven Seas and Thirteen Rivers, ১৯৮৭) এবং ইউসুফ চৌধুরী (Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers in Britain, ১৯৯৩), Tales of Three Generations of Bengalis in Britain (২০০৬) গ্রন্থেও এ রকম বসতি স্থাপনকারীদের কয়েকটি সাক্ষাৎকার আছে। তা ছাড়া, রোজিনা বিশ্রাম ইন্ডিয়া অফিসের কাগজপত্র ঘেঁটেও অনেক মূল্যবান তথ্য জোগাড় করেছেন (Asians in Britain : 400 Years of History, ২০০২)। কেটি গার্ডনারও খোদ সিলেটে গিয়ে লস্করদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেছেন।[৫৭] তাছাড়া, সম্প্রতিককালে অনেকেই লস্করদের নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে সিলেটের নূরুল ইসলামের 'প্রবাসীর কথা' অন্যতম। এসব তথ্য থেকে সিলেটি লস্করদের আসার কারণ এবং তাঁদের পটভূমি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হয়।

জাহাজের কাজ ছিলো দারুণ কঠিন। বিশেষ করে ভয়াবহ গরমের মধ্যে বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ। এ কাজ শ্বেতাঙ্গরা করতে চাইতেন না। তা ছাড়া, শ্বেতাঙ্গদের বেতনও দিতে হতো অনেক বেশি। অপর পক্ষে, অনেক কম টাকার বিনিময়ে লস্কররা এই হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের কাজ করতেন। ক্যারোলাইন অ্যাডামসের গ্রন্থে সংগৃহীত ইসরাইল মিয়া, নওয়াব আলি আর ময়না মিয়া ওরফে শাহ আবদুল মজিদ কোরেশীর সাক্ষাৎকার-এর ভিত্তিতে জানা যায়। জাহাজের মালিকরা

Dhaka University Institutional Repository

লস্করদের বেতন কম দিতে পারতেন, আবার তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারও করতে পারতেন দাসদের মতো এমন ঘটনাও জানা যায় যে, লস্করদের মেরে তাঁদের মৃতদেহ সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৫৮]

তবে এ থেকে লস্কর নিয়োগের কারণ বোঝা গেলেও লস্কর হওয়ার কারণ বোঝা যায় না। আগে যে-চারটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, অনেক ছোটখাটো জোৎদার এবং জমিদার থাকলেও সিলেটের লোকেরা ছিলেন সাধারণভাবে গরিব। অনেকেরই কোনো জমিজমা অথবা কাজ ছিলো না। এ জন্যেই তাঁরা জাহাজের চাকরি নিতে আগ্রহ দেখাতেন। নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের লোকেরাও কমবেশি একই কারণে চাকরি করতেন লস্করের। তারপরও প্রশ্ন ওঠে: সিলেট থেকে অতো বেশি সংখ্যক লস্কর এলেন কেন? এবং নোয়াখালী অথবা চট্টগ্রামের উপনিবেশ গড়ে না-উঠে বিলেতে সিলেটীদের বসতি গড়ে উঠলো কেন? বিশ্লেষণ করলে এ প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়।

সিলেটের লস্করেরা গিয়ে উনিশ শতক থেকেই আস্তানা গেড়েছিলেন কলকাতার ডক এলাকায়, অর্থাৎ খিদিরপুর অঞ্চলে। এই ডকেই জাহাজ এসে ভিড়তো আবার এখান থেকেই যাত্রী, মালামাল এবং লস্কর নিয়ে জাহাজগুলো সাগর পাড়ি দিতো। জাহাজের চাকরি ছিলো অস্থায়ী। তা ছাড়া, সব সময়ে সে কাজ জুটতোও না। অধিকাংশ লস্করই বেশির ভাগ সময় বেকার থাকতেন। একটি হিসেব অনুযায়ী বেকার থাকতেন দুই-তৃতীয়াংশ লোক। জাহাজের কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ঘাট সারেংদের জানাতো, তাদের কতোজন লস্করের প্রয়োজন হবে। চাকুরির জন্যে অপেক্ষমাণ লস্করদের কাজ ভাগ করে দিতেন এই সারেংরা। তার বিনিময়ে লস্করদের আয়ের একটা অংশ দাবি করতেন তাঁরা। আর, একটা বড়ো অংশ দাবি করতেন বাড়িওয়ালারা। কাজের জন্যে যে লস্কররা অপেক্ষা করে থাকতেন, তাঁরা বাস করতেন এবং খেতেন বাড়িওয়ালাদের আশ্রয়ে। তার বিনিময়ে বাড়িওয়ালারা লস্করদের বেতনের চার ভাগের এক ভাগ কেটে নিতেন।

ওদিকে, লস্কররা চাকরি নিয়ে যখন জাহাজে যেতেন, তখনই তাঁরা বেতন পেতেন না। জাহাজের মালিকরা বেতন দিতেন লস্কররা অন্য বন্দর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে বেতন পেয়ে তাঁরা বাড়িওয়ালা আর ঘাট সারেং-এর পাওনা শোধ করে বাকি টাকা নিয়ে আবার খেপ ধরার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেন অথবা গ্রামে গিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। তেমন টাকাপয়সা হাতে থাকলে জমিও কিনতেন ভবিষ্যতের জন্যে। জমির মালিক হওয়ার সঙ্গে একটা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত ছিলো। তাঁদের উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত এবং প্রলুব্ধ হতেন তাঁদের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা। ময়না মিয়া লিখেছেন যে, এই প্রলোভন থেকেই লস্করের কাজ পাওয়ার জন্যে খিদিরপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এভাবে খিদিরপুরে ছুটে গিয়েছিলেন শত শত, হাজার হাজার সিলেটের লোক।

এখানে সিলেটের লোকেদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা এবং স্বজনের বন্ধন-যাকে ইংরেজিতে বলে কিনশিপ-তা খুবই জোরালো। তাঁরা আত্মীয়স্বজনের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে সব সময়ে প্রস্তুত। এমন কি, যাঁরা সরাসরি আত্মীয় নন, গ্রাম সুবাদে যাঁরা আত্মীয় অথবা পরিচিত, তাঁদের উপকার করার জন্যেও তাঁরা পিছ পা হন না। গোটা সিলেটের লোকেরা একটা বড়ো পরিবারের মতো। তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠি চেতনা এবং আঞ্চলিকতা খুবই প্রবল এবং আন্তরিক। এমন কি, নিজেদের মধ্যে কথাও বলেন সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়। এই কিনশিপ বন্ড এবং ভাষিক পরিচয় চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর লোকেদের মধ্যেও বেশ লক্ষ্য করা যায়।

খিদিরপুরের বাড়িওয়ালারা অনেকেই ছিলেন সিলেটের। তাঁরা লস্করদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিতেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন অথবা নিজেদের অঞ্চলের লোকেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে সাহায্য করতেও চেষ্টা করতেন। অন্য অঞ্চলের লোকেদের তাঁরা তাঁদের "বাড়িতে" কম আশ্রয় দিতেন। সারেংদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন সিলেটের। তাঁরাও অন্য অঞ্চলের লোকেদের কাজ দেওয়ার আগে নিজেদের অঞ্চলের লোকেদের কাজ দেওয়ার কথা ভাবতেন। এভাবেই খিদিরপুরের সিলেটী বাড়িওয়ালা এবং সারেংদের দৌলতে ধীরে ধীরে সিলেটীদের মধ্যে লস্করের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি বিলেতে বসতি স্থাপন করার ব্যাপারেও। ১৯১৪ সাল নাগাদ বিলেত লস্করের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১৫১৬ জনে। যে-লস্কররা জাহাজ থেকে পালিয়ে এসে লন্ডনসহ বিলেতের বন্দর এবং শিল্পনগরীগুলোতে বাস করতে আরম্ভ করতেন, তাঁরাও নবাগতদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন, কাজ জুটিয়ে দিতেন। এভাবে ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিলেতে গড়ে উঠেছিলো সিলেটী বাঙালিদের বসতি ।[৫৯]

ইসরাইল মিয়া জাহাজের কাজ পেয়েছিলেন তাঁর এলাকার একজন সারেং-এর সূত্রে। তিনি যখন জাহাজ থেকে পালিয়ে লন্ডনে নামেন তখন অপ্রত্যাশিভাবে দেখা হয় সিলেটেরই একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে। অতঃপর সেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে যান মুনশির মেসে, যেখানে তিনি নিজে থাকতেন। ইসলাম, মারুফা খান, আইয়ুব আলী মাষ্টার, আফতাব আলি প্রমুখ ব্যক্তির মেস ছিল, যেখানে তাঁরা লস্করদের খুব কম খরচে থাকতে দিতেন। নওয়াব আলিও কার্ডিফ বন্দরে জাহাজ থেকে পালিয়ে তাঁর পরিচিত এক লস্করের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কোনা মিয়া কলকাতায় আসেন তাঁর পাশের গ্রামের এক সারেং-এর সঙ্গে। কলকাতারও ছিলেন গ্রামের এক বাড়িওয়ালার আশ্রয়ে। এমন কি, কাজও পান পরিচিত এক সারেং-এর অনুগ্রহে।[৬০]

আমরা 'Tales of Three Generations of Bengalis in Britian' গ্রন্থ থেকে এ রকম সাহায্য লাভ করে বসতি স্থাপনের দৃষ্টান্ত জানা যায়। আবদুস সামি বিলেতে এসেছিলেন জাহাজের যাত্রী হয়ে। তার অর্থ ১৯৬০-এর দশকের

Dhaka University Institutional Repository

আগে। আবদুল গাফফার নাসির মিয়া আসেন ১৯৬৩ সালে। তিনি এসেছিলেন এক আত্মীয়ের ভরসায়, জব ভাউচার নিয়ে। জাহাজে নয়, ২৪ ঘন্টায় তিনি বিমানে করে করাচি থেকে আসেন। লন্ডনে এসে তিনি প্রথম তিন মাস কাজ করেন একটি নাম-করা হোটেল, মেফেয়ারে।[৬১] 'Roots and Tales of the Bangladesh Settlers in Britain' গ্রন্থ অনুযায়ী, আবদুস সামি অথবা নাসির মিয়ার প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৩৮ সালে আমেরিকা থেকে লন্ডনে এসেছিলেন আইয়ুব আলী মাষ্টার। লেখাপড়া জানতেন বলে তাঁর পরিচিতরা তাঁকে সম্মান দেখিয়ে বলতেন, "মাষ্টার"। অল্ডগেইট অঞ্চলে ১৩ নম্বর স্যান্ডি রো-তে তিনি একটি আস্তানা গড়ে তোলেন যেখানে আশ্রয় দিতেন যে-কোনো সিলেটী লস্করকে।[৬২]

মোহাম্মদ আশকের আকনজি আসেন ১৯৩৩ সালে। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে তিনি লন্ডনে স্থায়ীভাবে বাস করেন। নওয়াব আলির বর্ণাঢ্য জীবনের কাহিনী আছে ক্যারোলাইন অ্যাডামসের- 'Across Seven Seans and Thriteen Rivers'- তিনি কাজের খোঁজে কলকাতায় আসেন ১৯৩০-এর দশকে। তারপর খোলেন হালাল মাংসের দোকান। তিনি দাবি করেছেন যে, তিনিই এ দেশে প্রথম হালাল মাংসের দোকান করেন। ইংল্যান্ডের একাধিক শহরে বেশ কয়েকটা রেষ্টুরেন্টও খুলেছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, সেকালে লন্ডনেও সমুদ্রগামী জাহাজ আসতো এবং সেগুলো ভিড়তো পূব লন্ডনের ডকে। অল্ডগেইট, লাইম হাউস, ক্যানিং টাউন ইত্যাদি এলাকা সেই ডকল্যান্ডেরই কাছাকাছি। জাহাজ থেকে পালিয়ে লস্কররা তাই বাসা বেঁধেছিলেন অল্ডগেইট এলাকায়।[৬৩]

পাঞ্জাবের শিখদের সঙ্গে এর তুলনা চলে। পার্থক্য এই যে, শিখ এবং পাঞ্জবী মুসলমানরা বিলেতে আসতে আরম্ভ করেন সিলেটী লস্করদের যথেষ্ট পরে। কিন্তু ব্যাপক হারে শিখরা বিলেতে আসেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। যুদ্ধের পর এঁরা অনেকে এ দেশেই থেকে যান এবং চেষ্টা করেন ভাগ্য গড়ে তুলতে। বর্ণবিদ্বেষের কারণে তাঁদের পক্ষে টিকে থাকা অবশ্য সহজ ছিলো না। টিকেছিলেন আত্মীয়তা, ধর্মীয় স্বরূপ এবং ভাষার নিবিড় বন্ধনের কারণে। কেবল তাই নয়, নিজেরা একবার এদেশে বসতি স্থাপন করার পর পাঞ্জাব থেকে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এসে তাঁরা তাঁদেরও উপকার করতে চেষ্টা করেন।[৬৪]

১৯৪৭ সালের পর শিখ এবং পাঞ্জাবী মুসলমানরা আসেন আরও একটা কারণে। দেশ বিভাগের পর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তখন লাখ লাখ পাঞ্জাবী গৃহহীন হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে শিখ এবং হিন্দুরা ব্যাপক হারে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে চলে যেতে বাধ্য হন ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে। আর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে যান মুসলমানরা। এই বাস্তুহারা লোকেদের অনেকে নতুন করে ভাগ্য গড়ে তোলার উদ্দেশে পূর্ব-পরিচিতদের সাহায্য নিয়ে বিলেতে আসেন। নতুন স্বাধীনতা-পাওয়া পূর্ব আফ্রিকা থেকেও বিরাট সংখ্যক শিখ ব্রিটেনে আগমন করেছিলেন ১৯৬০ সালের পর।

পাঞ্জাবী মুসলমান এবং শিখদের মধ্যে যে-আত্মীয়তা, ধর্মীয় এবং ভাষিক বন্ধন রয়েছে, সেই একই রকমের বন্ধন রয়েছে সিলেটের লোকেদের মধ্যে। এই তিন সম্প্রদায়ের ভাগ্যান্বেষী লোকেরা যাঁরা প্রথম দিকে ব্রিটেনে এসে সাফল্য অর্জন করেন, তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্য নিয়ে তৃপ্ত থাকেননি, বরং তাঁরা তাঁদের আত্মীয়দেরও নিয়ে এসেছেন। এমন কি, যাঁরা তাঁদের আত্মীয় নন, তাঁদেরও আসতে তাঁরা সাহায্য করেছেন। এভাবে একটা ইমিগ্রেশন চেইন তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে পাঞ্জাবী শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান এবং সিলেটী মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং তিনটি বড়ো ভাষিক-ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ব্রিটেনে।

প্রসঙ্গত গুজরাটী হিন্দুদের কথাও বলা যায়। তাঁরা অবশ্য ব্যাপক সংখ্যায় আসেন অন্য তিন সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরে এবং তাঁরা অনেকেই আসেন পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়া এবং উগান্ডা থেকে। কেনিয়া থেকে তাঁরা আসতে শুরু করেন ১৯৬০-এর দশকে। আর ফৌজী একনায়ক ইদি আমীন যখন মাত্র নব্বই দিনের মধ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দেন, তখন উগান্ডার ভারতীয়রা বেশির ভাগই ইংল্যান্ডে চলে আসেন।

এভাবে দেখা যায়, দেশ-বিভাগের আগেকার লস্কররা যাঁরা অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে আসতেন, তাঁদের পক্ষে এ দেশে টিকে থাকা সহজ কাজ ছিলো না। কারণ, জাহাজ থেকে পালিয়ে ডাঙায় নামলেই দু'টো মস্ত বড়ো সমস্যা দেখা দিতো তাঁদের সামনে- থাকার আর খাওয়ার। তারপরই সমস্যা দেখা দিতো একটা চাকরি জোটানো এবং পুলিশের কাছ থেকে থাকার পরিচয়পত্র। তাছাড়া, ইন্ডিয়া অফিসে নিজেদের নাম নিবন্ধন করাও ছিলো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। পূর্বোক্ত নওয়াব আলির কাহিনী থেকে এসবের একটা চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইন্ডিয়া অফিস থেকে কাগজপত্র জোটানোর জন্যে তাঁকে হাতাহাতিও করতে হয়েছিলো। তবে একাজে আইয়ুব আলি মাষ্টারের মতো কয়েক ব্যক্তি নবাগতদের সাহায্য করতেন। যতো দিন এঁরা কাজ না-পেতেন, ততোদিন তাঁদের কাছ থেকে টাকা-পয়সাও নিতেন না আইয়ুব আলি, সুরত আলি, সৈয়দ তফাজ্জিল আলি, আবদুল মান্নান প্রমুখ পুরোনো অভিবাসীরা। অন্যদের সাহায্য করার ব্যাপারে বিশেষ করে আইয়ুব আলির খুব সুনাম ছিল। তাঁর এই ভূমিকার জন্যে তিনি পরে-১৯৪০-এর দশকে- লন্ডনে মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছিলেন। মরনা মিয়াও অন্যদের সাহায্য করতেন। তিনিও নানা রকমের সাংগঠনিক কাজে অংশ নিয়েছিলেন। দেশ-বিভাগের সময়ে দেশে ফিরেও তিনি রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন।[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিলেতে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে অভিবাসীদের আরও দু'টো গুরুতর সমস্যা ছিল। একটা সরকারের তরফ থেকে, অন্যটা স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অভিবাসীদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পরিবেশে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে অভিবাসীদের সম্পর্ক এতটাই তিক্ত হয়ে ওঠে যে, ১৯১৯ সালে অভিবাসীদের ওপর বর্ণবাদী হামলা হয় এবং তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর জোর দাবি ওঠে। এই দাবি এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ১৯২১ সালে সরকার ভারতবর্ষীয়দের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্যে জাহাজের ভাড়া-সহ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে এই সুবিধা নিয়ে অল্প সংখ্যক অভিবাসীই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, বাকিরা থেকে যান এ দেশে। তাই সমস্যার সমাধান না-হয়ে বরং ১৯২০-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দার পটভূমিতে এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

ভারতীয় অভিবাসীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশে ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার আরও একবার পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ভারতীয় অভিবাসীদের আগমন বন্ধ করার চেষ্টা হলেও ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে তাঁদের সংখ্যা বরং বৃদ্ধি পায়।[৬৬] এই সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে নানা পেশার লোক থাকলেও প্রধান ভূমিকাই ছিলো লস্করদের। প্রথম মহাযুদ্ধে একমাত্র মার্চেন্ট নেভিতে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের শতকরা ২০ ভাগই ছিলেন ভারতীয়। ১৯৩৮ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৬-এ। লস্করদের সংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ হাজারে পৌঁছে। এঁদের মধ্যে অনেক বাঙালি ছিলেন, একাধিক সূত্র থেকে তা জানা যায়। যেমন, ১৯৪৩ সালে লন্ডনে ইন্ডিয়ান সীম্যানস এ্যাসোসিয়েশন নামে লস্করদের যে-সমিতি স্থাপিত হয়, তাঁর প্রায় তাবৎ সদস্যই ছিলেন সিলেটী লস্কর।[৬৭]

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত যে-লস্কররা এসেছিলেন তাঁদের পক্ষে সরকারী চাকরি জোটানো সম্ভব ছিল না। এমন কি, বর্ণবাদী কারণে কলকারখানাতেও চাকরি পেতেন না তাঁরা। টিকে থাকার জন্যে তাঁরা প্রধানত ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। পুলিশের কাছ থেকে এই ফেরিওয়ালাদের একটি পেডলার্স লাইসেন্স নিতে হতো। তাছাড়া, লাইসেন্সের মাধ্যমে ফেরিওয়ালাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করারও চেষ্টা হয়েছে। যে-কাজই লস্কররা করেন না কেন, তাঁরা আসতেন কয়েক বছর এখানে কাজ করে আয়-উপার্জন করে সেই টাকাপয়সা নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে সচ্ছলতার মধ্যে বাকি জীবন কাটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এই অভিবাসীদের এক কথায় বলা যায় অর্থনৈতিক অভিবাসী। কিন্তু কার্যকারণে তাঁরা অনেকে এখানেই বসতি স্থাপন করে থেকে যান, অথবা যেতে বাধ্য হন। কেউ কেউ কয়েকবার করে এখানকার বাড়িঘর এবং ব্যবসা বিক্রি করে দেশে ফিরেও গেছেন। তার পর আবার ফিরে এসেছেন সেখানে সুবিধা করতে না পেরে।[৬৮]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরীর কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন বাঙালি শ্রমিকরা শুধু লন্ডন নয় মফস্বল শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েন। এঁরা ইংরেজি না-জানলেও এঁদের স্বাগত জানানো হতো। কারণ এঁরা কম বেতনে কাজ করতে তৈরি থাকতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেও রাজি হতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বার্মিংহাম এবং কভেন্ট্রির কলকারখানায় কয়েক হাজার ভারতীয় শ্রমিক ছিলেন। ব্রিটেনের বিভিন্ন শিল্প ও বন্দর-নগরীতে যেমন- বেডফোর্ড, ম্যানচেষ্টার, নটিংহ্যাম, এডিনবরা, লিভারপুর এবং গ্লাসগোতেও বহু ভারতীয় শ্রমিক কাজ করতেন।[৬৯]

মোট কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বাঙালি অভিবাসীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। তবে ব্রিটেনে ব্যাপক হারে অভিবাসী আসতে আরম্ভ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙে পড়েছিল। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন তাদের উপনিবেশ থেকে শ্রমিক আনার ঘোষাণা দেয় তখন অভিবাসীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৯ সালের আইন অনুসারে 'কমনওয়েলথ-নাগরিক' হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিলেতে আসার জন্যে হয় ভারত, নয়তো পাকিস্তানের পাসপোর্ট লাগতো। পাকিস্তান সরকার এই পাসপোর্টকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া, স্টেট ব্যাংকের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারেও বৈষম্য করা হতো। এর ফলে বাঙালি অভিবাসীদের পক্ষে ব্রিটেনে আসা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও সিলেটী অভিবাসীদের আগমন খানিকটা বৃদ্ধি পায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। তিনি ব্রিটেন সফরে এলে বাঙালি সম্প্রদায় তাঁর কাছে পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানী কর্মচারীরা যে-বৈষম্য দেখান, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সোহরাওয়ার্দী তখন এই বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লন্ডনে তিনি বাঙালি অভিবাসীদের কাছে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তিনি যতো খুশি পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে সে কারণে সিলেট থেকে অনেক শ্রমিক আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ফৌজী একনায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর পূর্ব পাকিস্তানী শ্রমিকদের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে আবার কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।[৭০] তথাপি ষাটের দশকে বিপুলসংখ্যক ছাত্র এবং পুরোনো অভিবাসীরা পরিবার নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় ১৯৭১ সাল নাগাদ বিলাতে বাঙালিদের সংখ্যা এক লক্ষ ছাঁড়িয়ে যায়।[৭১]

সিলেটের লস্কর এবং সাধারণ শ্রমিকরা যাতে ব্রিটেনে আসতে পারেন, তার জন্যে ১৯৫০-এর দশকে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন আফতাব আলী। তিনি নিজে যখন লস্কর হিসেবে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন লস্করদের খাওয়া-দাওয়া, থাকার জায়গা, বেতন এবং তাঁদের প্রতি জাহাজের কর্মকর্তাদের আচরণ ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি লস্করদের অবস্থার উন্নতি এবং চাকরিক্ষেত্রে তাঁদের আরও অধিকার রক্ষার জন্যে রীতিমতো আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি কেবল লস্করদের সমিতি গঠন করেন নি, বরং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। ১৯২৯ সালে তিনি সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মকর্তা মনোনীত হন। পরে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (আইএলও) কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। এই সংগঠনের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি জেনেভা, লন্ডন এবং আমেরিকায় বেশ কয়েকবার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ভারতীয় লস্করদের অধিকার রক্ষার জন্যে জোরালো দাবি উপস্থাপন করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তিনি শ্রমিকদের পাসপোর্ট দেওয়া এবং ব্রিটেনে যাওয়ার ব্যাপারে দেন-দরবার করেন। তিনি শ্রমিকদের আসার সুবিধে করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সিলেট এবং ঢাকায় একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিও খুলেছিলেন। তছাড়া, লন্ডনে ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলেছিলেন আইয়ুব আলী মাষ্টার। সেকালে সিলেট থেকে লন্ডন আসা সহজ ছিলো না। জাহাজে আসতে অনেক দিন লাগতো। সেই অসুবিধে দূর করার জন্যে ইসরাইল মিয়ার ভাই জরিফ মিয়া ভাড়া-করা বিমানে শ্রমিকদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আফতাব আলী লস্কর এবং শ্রমিকদের কল্যাণ এবং ব্রিটেনে আসার ব্যাপারে আজীবন যে-সংগ্রাম চালান, তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৭২]

তাসাদ্দুক আহমদ বিলেতে আসেন ১৯৫০ সালে। তিনিও সিলেটী সম্প্রদায়ের জন্যে কল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছিলেন। সিলেট থেকে আগতরা যাতে এ দেশে এসে শিক্ষা এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নিজেদের ভাগ্যোন্নতি করতে পারেন, তার জন্যে তিনি প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ব্রিটেনে বাংলা শিক্ষা এবং বয়স্ক নারীদের শিক্ষার জন্যেও তিনি যত্ন নিয়েছিলেন। তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন।[৭৩]

কিভাবে ব্রিটেনে বাঙালি অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা স্বদেশে ফিরে না গিয়ে ব্রিটেনেই থেকে যান, এমন কি, তাঁদের পরিবার নিয়ে আসেন, এবার সেই প্রক্রিয়ার দিকে তাকানো যাক।

১৯৪৮ সালের পর উপমহাদেশ এবং তার চেয়েও বেশি- ওয়েষ্ট ইন্ডিজ এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে লাখ লাখ শ্রমিক আসার ফলে ব্রিটেনে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। তাই ১৯৬২ সালে অদক্ষ শ্রমিকদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার নতুন অভিবাসন আইন প্রবর্তন করে।[৭৪] এর আগে পর্যন্ত ওয়েষ্ট ইন্ডিজ থেকে যে-শ্রমিকরা এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বাঙালি শ্রমিকদের মতো- প্রায় সবাই পুরুষ। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো, সাময়িকভাবে ব্রিটেনে বাস করে আয়-উপার্জন করে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার। কিন্তু আইনী কড়াকড়ি দেখা দেওয়ার পর তাঁরা স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন।[৭৫]

কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় ১৯৬০-এর দশকে উপমহাদেশ থেকে খুব সামান্য সংখ্যক পরিবারই এ দেশে এসেছিল। কিন্তু বাঙালি অভিবাসীরা পরিবার না- এনে বরং জব ভাউচার পাঠিয়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত ব্যক্তিদের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন যথেষ্ঠ সংখ্যায়। 'Across Seven Seas and Thriteen Rivers' গ্রন্থে যে-অভিবাসীদের জীবনকাহীনী তুলে ধরা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন- নওয়াব আলি- একাই এই দশকে বিশ জনকে জব ভাইচার দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এমনি করে ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে বাঙালি অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।[৭৬]

বস্তুত, জব ভাউচারের মাধ্যমে অভিবাসীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে-উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকার নিয়েছিল, তা দিয়ে শ্রমিক আগমন খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও অন্য অভিবাসীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ, যে-অভিবাসীরা আগে থেকে ব্রিটেনে কাজ করছিলেন এবং ব্রিটেনের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁরা যখন দেখলেন যে, এ দেশে পরিবার নিয়ে আসার ব্যাপারে ধীরে ধীরে আইনী বাঁধা দেখা দিতে পারে, তখন তাঁরা সে রকমের বাঁধা আরোপের আগেই তাড়াতাড়ি করে স্ত্রী এবং পরিবার এ দেশে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন।

১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত বাঙালিরা স্বদেশ থেকে তাঁদের স্ত্রী এবং পরিবার বলতে গেলে নিয়েই আসেন নি। তখন যে-সামান্য সংখ্যক বাঙালি এ দেশে পরিবার গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা এ দেশেই বিয়ে করেছিলেন। অন্যরা টাকা-পয়সা আয় করে দেশে গিয়ে বিয়ে করতেন। পুরোনো অভিবাসীদের কেউ কেউ দু'টি বিয়েও করতেন। 'Across Seven Seas and Thriteen Rivers' গ্রন্থে আমরা এ রকমের একাধিক দৃষ্টান্ত দেখেতে পাই।

যাঁরা এ দেশে আয়-উন্নতি করে দেশে গিয়ে বিয়ে করতেন, তাঁরা সাধারণত একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করতেন। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী বয়সের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ রকমের ব্যাপক ব্যবধানের ফলে অনেক সময়ে পারিবারিক সমস্যাও সৃষ্টি হতো এবং এখনো হয়। এ বিষয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি পুব লন্ডনে জরিপ করে দেখতে পান যে, বৃদ্ধদের তরুণী স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ মানসিকভাবে অসুখী। নূরুল ইসলাম এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, পূর্বের অভিবাসীরা স্বল্পশিক্ষিত হওয়ার কারনে এমনটা হতো, কিন্তু বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের বাঙালি অভিবাসীদের শতকরা নব্বই ভাগ শিক্ষার দিকে ঝুঁকি পড়ায় এ সমস্যা এখন আর তেমনটা চোখে পড়ে না।[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত আমরা বাঙালিদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনীদের সম্পর্ক নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারি। উনিশ শতক থেকে বঙ্গদেশ থেকে যাঁরা বিলেতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীর্জা আবু তালিব এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে অনেকেই শ্বেতাঙ্গ নারীদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে যা লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, এ ধরনের সম্পর্ক সেকালে বেশ ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। তিনি নিন্দা করে লিখেছেন যে, এই প্রবাসী বাঙালিরা যে-নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন, তাঁরা সাধারণত গৃহভৃত্যের মতো সমাজের নিম্ন শ্রেণীর নারী। বাড়িওয়ালি অথবা তাঁদের কন্যাদের সঙ্গেও বাঙালি বাবুরা সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রথমত ঠাট্টা রসিকতা করে তাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতেন, তারপর তাঁদের মধ্যে তৈরি হতো ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক।

এ ধরনের বন্ধুত্ব থেকে বিয়েও হতো। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত হল ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্তের। তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁর বাড়িওয়ালির কন্যাকে (১৮৬৬)। তাছাড়া, রাজেন্দ্র চন্দ্র, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, অরুণ দত্ত, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক গোলাম হায়দার, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রসুল-সহ সুপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বিলেতে বিয়ে করেছিলেন। ১৮৮০-এর দশকের গোড়ায় গিরিশচন্দ্র বসুর এক বন্ধু ইংরেজ পরিবারে কিছুকাল বাস করার ইচ্ছা জানিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং তার উত্তরে প্রায় ১৫০টি চিঠি পেয়েছিলেন। অনেক চিঠিই মেয়েদের লেখা। এসব চিঠিতে বাড়িতে কোন কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা বাস করেন এবং তাঁদের বয়স কতো ইত্যাদিরও উল্লেখ ছিল।[৭৮]

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শতকরা দু'ভাগের বেশি বাঙালি অভিবাসীরা তাঁদের পরিবার নিয়ে আসেন নি। 'Across Seven Seas and Thriteen Rivers' এবং 'Roots and Tales of the Bengali Settlers in Britain' উভয় গ্রন্থ থেকেই জানা যায়, অভিবাসীরা শ্বেতাঙ্গিনী রূপজীবনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ইউসুফ চৌধুরীও তাঁর গ্রন্থে এ রকমের তথ্য উল্লেখ করেছেন।

কেবল লস্কররা নন অথবা কেবল উনিশ শতকেই নয়, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যেও অনেকে শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যেমন, বেতার-সাংবাদিক শ্যামল লোধ বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে, তবে দেশে তাঁর কোনো স্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু ইদানীং কালে শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করার ঘটনা কমে গেছে বলে মনে হয়। এর একটা কারণ স্বদেশের সঙ্গে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে। যাঁরা দেশ থেকে আসেন, তাঁরা স্ত্রীদের নিয়ে আসতে পারেন অথবা দেশে গিয়ে বিয়ে করতে পারেন। তা ছাড়া বাঙালি সম্প্রদায় এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এখানেই পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বিয়ে হচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে একত্রে বাস অথবা অস্থায়ী বিয়ের ফলে সমাজে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৮৫৭ সালে 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে এটাকে একটা বড়ো সামাজিক সমস্যা বলে কড়া সমালোচনা করা হয়। আসলে শ্বেতাঙ্গিনীরা ভারতীয় লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করে লস্করদের সঙ্গে একত্রে বাস করছেন, এটাকে সমাজ আদৌ সহ্য করতে পারত না।[৭৯]

বাংলাদেশ থেকে পরিবার নিয়ে আসার ফলে শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে দীর্ঘ অথবা সাময়িক সম্পর্ক রাখার ঘটনা এখন অনেক কমে এসেছে। কখন থেকে বাঙালি স্ত্রীরা এ দেশে আসতে আরম্ভ করেন, তার আভাস পাওয়া যায় আবদুল মজিদ কোরেশীর কথা থেকে। তাঁর মতে, প্রথম যে-বাঙালি তাঁর স্ত্রীকে বিলেতে নিয়ে আসেন, তিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন বাঙালি সৈন্য। ইউসুফ চৌধুরীর মতে (Roots and Tales of the Bengali Settlers in Britain), আবদুল হাকিম নামে বার্মিংহ্যামের এক দোকানদার ১৯৫৭ সালে সবার আগে বাংলাদেশ থেকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন এটা ছিলো একটা অসাধারণ ঘটনা। নয়তো বাঙালি শ্রমিকরা তাঁদের পরিবার বাংলাদেশেই রাখতেন আর নিজেরা এ দেশে বাস করতেন অবিবাহিত লোকের মতো, অন্য পুরুষদের সঙ্গে। ইউসুফ চৌধুরী আরও লিখেছেন যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অভিবাসীদের পুত্ররা বড়ো হলে, তাঁদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেশ থেকে এ দেশে নিয়ে আসতেন এবং কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দিতেন। তখন নিয়ম ছিল যে, সন্তানদের বয়স আঠারোর বেশি হলে, তাঁদের আর এ দেশে আসার অধিকার থাকবে না। সিলেটী অভিবাসীরা ব্যাপক সংখ্যায় স্ত্রী এবং পরিবার নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর।[৮০]

এদিকে, কমনওয়েলথ-দেশগুলো থেকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিক আসার ফলে, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গরা উৎকণ্ঠা বোধ করেন। তাঁদের অনেকে আশঙ্কা করেন যে, এর দরুন তাঁদের চাকরি-বাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। তা ছাড়া, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ অথবা ভীতি থেকেও অনেকে বর্ণবাদী প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন। "ব্রিটেন শ্বেতাঙ্গ ব্রিটনদের জন্যে" এবং "কৃষ্ণাঙ্গদের এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে"- এই নীতির উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) গঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। এই দল তারপর থেকে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিতে আরম্ভ করে এবং কোনো কোনো এলাকায় খানিকটা জনসমর্থনও লাভ করে।

অভিবাসন-বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জোগান ইনক পাওয়েল। ১৯৬৮ সালে বার্মিংহামে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, একদিন কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের সহিংসতার ফলে ব্রিটেনে "রক্ত নদী"[৮১] বয়ে যাবে। অনেকটা তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬৮ সালে তড়িঘড়ি করে পার্লামেন্টে মাত্র তিন দিনের বিতর্কের পর একটি আইন প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

কেনিয়া থেকে উপমহাদেশের অভিবাসীদের আগমনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। তাঁর বর্ণবাদী বক্তৃতার ফলে ইনক পাওয়েল রক্ষণশীল দলের শ্যাডো মন্ত্রীসভায় তাঁর পদ হারান। কিন্তু তিনি যে-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সরকার তা একবারে উড়িয়ে দিতে পারে নি। তারই ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে নতুন আইন প্রণীত হয় যে, এক মাত্র কাজের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে অভিবাসীরা ব্রিটেনে আসতে পারবেন। তা ছাড়া, মা সঙ্গে না-থাকলে পুরোনো অভিবাসীরাও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আসতে পারবেন না- এমন আইনও হয়। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিবাসীরা অনেকেই স্ত্রী-সহ গোটা পরিবার এ দেশে নিয়ে আসতে বাধ্য হন।

১৯৭১ সালকে একটা মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নত করলে বলা যায় যে, তখন পর্যন্ত সিলেটী অভিবাসীরা কার্যত দুটি সংসার করতেন- একটি বিলেতে, অন্যটি দেশে। এখানে বাস করতেন কয়েকজন পুরুষ মিলে একটা বাড়ি ভাড়া করে। আর সিলেটে থাকতেন তাঁদের স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা। কিন্তু তারপর থেকে এই চিত্র বেশ দ্রুত গতিতে পাল্টে যেতে আরম্ভ করে।

১৯৭১-এ এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, যা এই পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। এই বছর এক দিকে কঠোর অভিবাসন আইন প্রণীত হয়, অন্য দিকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। অভিবাসন আইন কঠোর হওয়ায় আরও বেশি অভিবাসী বাংলাদেশ থেকে তাঁদের পরিবার নিয়ে আসার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। আর, স্বাধীন বাংলাদেশে পাসপোর্ট পেতেও তাঁদের আর কোনো বাঁধা ছিলো না। এভাবে ১৯৭০-এর দশকে বাঙালিদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। এই ধারা এর পরেও অক্ষুণ্ন থাকে। সে জন্যে, ১৯৮১ সালে বাঙালিদের সংখ্যা যা ছিল, পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে তা আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায় (২৪৪%)। ধরে নিতে পারি, ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর শতকে বাঙালিদের বৃদ্ধির হার ছিলো শতকরা ৩০০ বা তার চেয়েও বেশি।[৮২]

ব্রিটেনে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা, বিশেষ করে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে আসা অভিবাসীদের তুলনায় বাঙালিদের সংখ্যা কম হওয়ায় একটা কারণ হলোঃ বাঙালিরা প্রায় সবাই আসেন শ্রমিক হিসেবে এবং আসেন পূর্ব পাকিস্তানের একটা বিশেষ অঞ্চল থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা থেকে তখন খুব কম লোকই এসেছিলেন। তাছাড়া, পশ্চিম বাংলা থেকেও যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা শ্রমিক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রধানত শিক্ষার্থী অথবা চাকরি সন্ধানী।[৮৩]

আর-একটা প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারেঃ আগে অভিবাসীরা আয়-উন্নতি করে দেশে ফিরে যেতেন, কিন্তু এখন এখানেই থেকে যায়। এর কারণ কি?[৮৪]

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বিলেতে থেকে লেখাপড়া শিখে দেশে ফিরে লোকেরা ভালো কাজ পেতেন। কোনো কোনো সময় একঘরে হলেও অথবা সাময়িকভাবে একঘরে হলেও তারপর সমাজে গৃহীত হতেন এবং মর্যাদা লাভ করতেন। 'অমুক বিলেতফেরত' এ কথাটার মধ্য দিয়ে সেই 'অমুকে'র প্রতিই সম্মান দেখানো হতো। কিন্তু বিশ শতকের শেষ তিন দশকে অবস্থার ধীর ধীর পরিবর্তন হতে আরম্ভ করল। বিলেতে শিক্ষা থাকলেই যে দেশে ভালো কাজ জুটবে- এর সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া, দেশে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার বিকাশের ফলে এখন আগের তুলনায় বেকারত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির কল্যাণে কী পশ্চিম বাংলায়, কী বাংলাদেশে বর্তমানে যতো শিক্ষিত লোক জোটে, চাকরির সংখ্যা তার ঢের কম। এর দরুন যারা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেছেন, তাঁরা অনেকে দেশে ফেরার প্রতি আগ্রহ দেখান না। কোনো মতে, দরকার হলে নিম্নতর পেশার কাজ করে, বিদেশের মাটিই আঁকড়ে ধরতে চান। এমন কি, যাঁরা অনেক দিন বিদেশে বাস করে সচ্ছল জীবনের স্বাদ পেয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন, তাঁরা দ্বিতীয় বার বিদেশে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের একজন অধ্যাপক পিএইচ. ডি. করে দেশে ফিরে না-গিয়ে এখন লন্ডনে পাতালরেল চালান। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বর্তমানে লন্ডনে ট্রাফিক ওয়ার্ডেন -এর কাজ করছেন। নিউ ইয়র্কেও বহু শিক্ষিত বাঙালি অন্য কাজের অভাবে ভাড়ায় ট্যাক্সি চালানোর কাজ করেন।

দেশে শিক্ষা লাভ করে যাঁরা ছোটোখাটো কাজ করছিলেন, অথবা পুরোপুরি বেকার ছিলেন, তাঁর বিদেশে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করেন। তার জন্যে জমি-জমা বিক্রি করে আদম ব্যাপারীকে টাকা দেন। এমন কি, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাহারা মরুভূমি পার হতে, ডিঙিতে করে সাগর পাড়ি দিতে, অথবা ট্রাকের মালের তলায় শুয়ে থেকে আধ-মরা হতেও এই ভাবী অভিবাসীরা রাজি হন। বিদেশে যাওয়ার পথে বহু বাঙালিই প্রাণ হারিয়েছেন বলে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়। তা সত্ত্বেও এক মাত্র বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ-আমেরিকায় আশি লাখ শ্রমিক গিয়েছেন বলে বেসরকারী হিসেবে বলা হয়। এই সংখ্যায় অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যিকার সংখ্যা এর অর্ধেক হলেও বলতে হবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা তিন ভাগ বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। কেবল অর্থনৈতিক কারণে এ রকম ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের ঘটনাকে বিরল বলে আখ্যায়িত করতে হবে।

অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের দরুন এক সময়ে কালাপানি পাড়ি দেওয়া পাপের কাজ বলে বিবেচিত হত। অপরিচয়ের কারণে তখন বিদেশ সম্পর্কে একটা ভীতিও কাজ করতো অনেকের মনে। তা ছাড়া, পারিবারিক বন্ধন এমন দৃঢ় ছিলো যে, ইচ্ছে করলেই কেউ পরিবার ছেড়ে দূরে যেতে পারত না। কিন্তু কালে কালে একান্নবর্তিতা তো ভেঙে গেছেই, পারিবারিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসন এবং বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়েছে। সুযোগ পেলে বিদেশ গমনে কেউ বাঁধা দেয় না। বরং পরিবারের বয়স্করাও তরুণদের বিদেশে যেতে উৎসাহিত করেন। তরুণরাও বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শেখার এবং চাকরি করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। উভয় বঙ্গেই সাধারণ লোকেরা বিদেশে কাজ করাকে এখন সম্মানের চোখেই- বিদেশে আয় বেশি বলে।

বিলেতে সবচেয়ে সহজে কাজ মেলে নানা দেশের রেস্টুরেন্টে- খুব কম বেতনে। পূর্ব ইউরোপ থেকে যাঁরা বিলেতে আসেন, তাঁরা বেশির ভাগই দক্ষ শ্রমিক। তাঁরা বাড়ি তৈরি, বৈদ্যুতিক কাজ, কারখানার কাজ ইত্যাদি করেন। এমন কি, অদক্ষ শ্রমিকরা বাড়ি পরিষ্কার করার কাজও ঘৃণা করেন না। তাঁরা অনেক পরিশ্রমীও। অপর পক্ষে, বাঙালিরা সাধারণত এসব কাজে আগ্রহী নন অথবা এসব কাজের দক্ষতা নেই তাঁদের। তাঁদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা খুব কমই। তা ছাড়া, তাঁরা পরিশ্রমের কাজ সহজে করতে চান না। অনেক রেস্টুরেন্টের মালিকই অবশ্য বাঙালিদের নিয়োগ দিতে আগ্রহী থাকেন। কারণ, ঘন্টায় ন্যূনতম বেতন দেওয়ার যে-সরকারী আইন আছে এঁদের তার চেয়েও কম বেতনে নিয়োগ করা যায়। অনেক মালিক কম বেতনের কর্মচারীদের কোনো নথিও রাখেন না বলে শোনা যায়।

এখন যে অনেক বিদেশে এসে বিদেশেই থেকে যান, তার পেছনে আরও কতোগুলো কারণ কাজ করে। আগে বিদেশে থাকতে গেলে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধে স্বীকার করেই থাকতে হত। যেমন, দেশীয় লোকেদের অভাবে অনেক সময় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হতো। কিন্তু এখন লন্ডন অথবা নিউ ইয়র্কের মতো জায়গায় ছোটো ছোটো বাংলাস্তান গড়ে উঠেছে। বাংলাস্তান বলার কারণ এই সম্প্রদায়গুলোর বিশাল ভাগই মুসলমানদের এবং এঁরা বেশির ভাগই ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতি পাকিস্তানীদের মতো খুব অনুগত। নিজেদের স্বরূপের ব্যাপারেও তাঁরা পাকিস্তানীদের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য অনুভব করেন। এই বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করায় এখন আর তাঁরা দেশের অভাব অথবা দেশে যাওয়ার তাগিদ বেশি অনুভব করেন না।

বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাঁরা আসতেন, তাঁরা দেশীয় খাবারের অভাবও খুব অনুভব করতেন। এসব খাবার তখন কালে-ভদ্রে পাওয়া যেত। ভাতের প্রতি বাঙালিদের আকর্ষণ এতো প্রবল যে, যে-কালে লন্ডনে চাল খুব কম পাওয়া যেতো অথবা মাঝেমধ্যে পাওয়া যেতো, সেই সময়ে- ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি মোহাম্মদ আশকের আবনজিকে তাঁর ভাই কলকাতা থেকে পার্সেল করে একটি থলিতে চাল পাঠিয়েছিলেন। আথনজির পুত্র সেই থলি এখনো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। ক্যারোলাইন অ্যাডামসের বই-এ সংগৃহীত সাক্ষাৎকারগুলোর একটিতে আবদুল মান্নান (চানু মিয়া) বলেছেন যে, তাঁর ৩৬ নম্বর প্যার্সি স্ট্রীটের রেস্টুরেন্টে যখন চাল থাকতো না, তখন স্পেগিটি টুকরো টুকরো করে অনেকটা ভাতের চেহারা দেওয়া হতো। লস্কররা সেই স্পেগিটি খেয়েই ভাতের স্বাদ মেটাতেন। মোট কথা, দেশী খাবার তখন পাওয়া যেতো না এবং সেটাও দেশে ফিরে যাওয়ার একটা কারণ হিসেবে কাজ করত। কিন্তু এখন লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, এডিনবরা-সহ ব্রিটেনের এমন কোনো শহর নেই, যেখানে বাঙালি-চালিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খুজলে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, বাংলাদেশী খাবার বাংলাদেশী অথবা পাকিস্তানীদের গ্রোসারি শপেও পাওয়া যায়। এসব দোকানে চাল, ডাল, মশলা, দেশী মাছ, তরকারি-সহ সব রকমের দেশী খাবার কেনা যায়। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলোঃ বড়ো সুপারমার্কেটগুলোতেও চাল এবং উপমহাদেশের খাবার পাওয়া যায়। এমন কি, সুপারমার্কেটে ভারতীয় তৈরি খাবারও বিক্রি হয়। কাজেই দেশী খাবারের সরবরাহ সম্পর্কে স্বামীদের প্রতি গৃহিণীদের কোনো অভিযোগ নেই।

দেশের অভাব মানুষ আরও অনুভব করে সাংস্কৃতিক কারণে, দেশীয় আমোদ-প্রমোদের জন্যে। এখন তারও এন্তার ব্যবস্থা রয়েছে। লন্ডনে বাংলা টেলিভিশনের একাধিক চ্যানেল আছে। নিউ ইয়র্কে আছে তার চেয়েও বেশি। ইটালির মতো ইউরোপের কোনো কোনো দেশেও এসব বাংলা চ্যানেল দেখা যায়। তা ছাড়া, বাঙালিরা নিজেরাও মাঝেমধ্যে গান-বাজনা এবং নাচের অনুষ্ঠান করেন। বাংলা পত্রপত্রিকাও আছে অনেকগুলো। সেসব পত্রিকায় দেশের বাসী খবর ছাপা হয়। তা পড়েও অনেকে দেশেও খানিকটা স্বাদ পান। মোট কথা, লন্ডন, রোম, নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি জায়গায় ছোটো ছোটো বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। সেই বাংলাদেশে বাস করে এখন কেউ আর বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম অথবা সিলেটের জন্যে উতলা হয়ে ওঠেন না।

আগে দেশে ফিরে যাওয়ার আর-একটা কারণ ছিলো বর্ণবাদ এবং বর্ণবৈষম্য। তখন বাঙালি অথবা ভারতীয়রা যোগ্যতা থাকলেও ভালো অথবা ভদ্র চাকরি পেতেন না। কিন্তু, আগেই বলেছি, এখন ডাক্তারদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই ভারতীয় এবং বাঙালি। নার্সদের মধ্যেও আছেন অনেক ভারতীয়, বাংলাদেশী তেমন না-থাকলেও। উপমহাদেশের লোকেরা অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে বড়ো চাকরির জন্যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শিক্ষিত এবং যোগ্য লোক দেখে দেখেও ইংরেজ এবং অন্য বিদেশীরা এখন বাঙালিদের প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাশীল হচ্ছে। তা ছাড়া, বাঙালি, ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা দেশের কোনো জায়গায় তাঁদের সংখ্যার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। ফলে চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকারের আইন আগের তুলনায় কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এখন বৈষম্য করার খুব বেশি উপায় নাই।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বিলেত এখন বাঙালিদের বাসের জন্যে বেশ অনুকূল জায়গাতে পরিণত হয়েছে। একটা সময় ছিলো যখন ভাষার জন্যে অনেক লোক এ দেশে বাস করতে গিয়ে অসুবিধের মুখোমুখি হতেন অথবা কোনো চাকরি পেতেন না। কিন্তু এখন বাঙালি পরিবারে উচ্চ শিক্ষা ও ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে, তাছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি না-জানা একজন লোক এদেশে এলেও নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজ জুটিয়ে নিয়ে বছরের পর বছর ইংরেজি না-শিখে বাস করতে পারেন। এসব বাঙালি-পাড়াকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশেরই সম্প্রসারণ।

১.৪ যুক্তরাজ্যে বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্বরূপ-সংস্কৃতি ঃ

১৯৭১ সালকে মাইলফলক হিসেবে ধরে যুক্তরাজ্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্বরূপ সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ ১৯৭১ সালের পূর্বে তাঁরা পূর্ব বঙ্গের বাঙালি হলেও নাগরিক হিসেবে ছিলেন পূর্বপাকিস্তানী। তাঁদের তখনকার চিন্তা -চেতনা, ধ্যান-ধারণা একাত্তর পরবর্তী চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও এক ছিল না। তখন একই সাথে তাঁদের দুটো পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করে অর্থ আয় করতে হয়েছে, আবার সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিতে হয়েছে। এর একটি প্রতিপক্ষ ছিল বৃটেনের বর্ণবাদী সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন অভিবাসী আইন ; আর অন্যটি ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী নাগরিকগণ। তথাপি প্রবাসী বাঙালিরা শুধু জীবিকার সন্ধানে সুদুর যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমালেও এবং সেখানে তাঁরা অবহেলিত সাধারণ শ্রমিক হলেও পূর্ববঙ্গের সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের আয়ের তুলনায় তাদের আয় বেশি ছিল। তাছাড়া স্বাভাবিক একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে ধরা দিয়েছিল যে, বিদেশের মাটিতে গেলে স্বদেশের প্রতি মায়ার টান একটু বেশি অনুভূতি হয়। তদুপরি ষাটের দশকে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন তাদের প্রগতিবাদী মনোভাব সমগ্র বাংলাভাষী মানুষকে একত্রিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রথমত আর্থিক সঙ্গতি, দ্বিতীয়ত পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবহেলা যুক্তরাজ্য প্রবাসী সকল পেশার মানুষকে একই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় সহজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফলে তাঁদের তখনকার চিন্তা চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল একরকম। আর ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ব্রিটেনে বেশি সংখ্যায় যাওয়ার সুযোগ, তথায় সমৃদ্ধশালী হওয়া এবং বাঙালি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস লক্ষ্যণীয় পর্যায়ে পৌছেছে। ১৯৭১ পূর্ববর্তী সময়ে তাঁরা তাঁদের অর্জিত অর্থের সিংহভাগই দেশে পাঠাতেন; কিন্তু বর্তমানে সন্তানের শিক্ষা ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্জিত আয়ের সিংহভাগ সেখানেই ব্যয় করেন। এবং ব্রিটেনেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটেনের সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলার এবং বাঙালি সংস্কৃতির আলাদা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সংগ্রামে রত আছেন। তাই এবিষয়ে আলোচনায় ১৯৭১ একাত্তর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দ দু'টোকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এই পূর্বাপর তুলনা করা আবশ্যক।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

শিক্ষা ঃ

একজন-দু'জন করে বাঙালিরা বিলেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন প্রায় দেড় শো বছর আগ থেকে। কিন্তু এতো দীর্ঘকাল ধরে এ দেশে বসবাস করলেও শিক্ষা, সম্পদ এবং সামাজিকভাবে এ দেশের সঙ্গে সামান্যই সমন্বিত হয়েছেন। বরং তাঁদের অনেক পরে যে অভিবাসীরা অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসেছেন, তুলনামূলকভাবে তাঁরা এ সব বিষয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৯০ এর দশকের বেশ কয়েকটি জরিপ থেকে দেখো গিয়েছিল যে, ইংল্যান্ডে যেসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে, শিক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশী বাঙালিরা। অপর পক্ষে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল ভারতীয় সম্প্রদায়। কিন্তু ২০০১ সালের লোক গণনা এবং তার পরবর্তী একাধিক জরিপ[৮৫] থেকে বাংলাদেশী বাঙালিদের অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এখন আর স্কুলের শিক্ষায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান অন্য সবগুলো সম্প্রদায়ের নিচে নয়। বরং তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশী মেয়েরা।

'Across Seven Seas and Thirteen Rivers' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, ১৯৭০ এর দশকেও চিঠিপত্র পড়া অথবা লেখার জন্য তারা এক পাউন্ড করে দাবি করতেন। কিন্তু এখন পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া শেখার ফলে চিঠিপত্র পড়া অথবা লেখার জন্য বাইরের লোকের সাহায্য নিতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। সে হলোঃ অভিবাসীদের মধ্যে মাতৃভাষা এবং ধর্মীয় ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঙালি পাড়ার অনেক স্কুলেই বাংলা শেখার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে পিতা-মাতারা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে এখন বেশি উদ্যোগ নিচ্ছেন, এটা একটা বিশেষ দিক। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি অথবা বাংলাদেশের বাঙালি বিশেষ করে যে সব পিতা-মাতা প্রথমদিকের অভিবাসী এবং স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষার ব্যাপারে তাঁদের পূর্বতন বদনাম ঘোঁচাতে এবং অত্যাধুনিক জগতের সাথে তাল-মেলানোর অভিপ্রায়ে তাঁরা এখন সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছেন। বস্তুত, বর্তমানে সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া এবং পেশাদার হিসেবে দেখা পিতা-মাতাদের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য, সম্ভবত সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বাঙালিরা উনিশ শতক থেকে পরিশ্রমের কাজ এবং লেখাপড়ার কাজ দিয়ে সাধারণ লোক এবং ভদ্রলোকের পার্থক্য নির্ণয় করতে আরম্ভ করেন। ফলে প্রথমদিকের অভিবাসীরা অর্থ আয়ের দিকে ব্যস্ত থাকলেও বর্তমানে তাঁরা সমভাবে সন্তানদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। (সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম)

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিদের জীবিকা উপার্জন ঃ

আগেই লক্ষ্য করেছি, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে-লস্করর‍া জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে অথবা জাহাজ থেকে পালিয়ে বিলেতে থেকে যেতেন, তাঁরা অনেকে পেডলার অর্থাৎ ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। এই কাজকে লিভারপুলের পুলিশ দপ্তর থেকে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান "অশুভ উৎপাত" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। কিন্তু এটাই তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল না। জীবিকার জন্য তাঁরা অন্যান্য পথও খুঁজে নেন। 'Across Seven Seas and Thirteen Rivers'; 'The Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers'; 'Tales of Three Generations of Bengalis in Britain' ইত্যাদি গ্রন্থে গোড়ার দিকের অভিবাসীদের যেসব জীবন-কাহিনী লেখা হয়েছে, তা থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায় জীবিকা উপার্জনের জন্য তাঁদের কী কঠোর সংগ্রাম করতে হতো।[৮৬]

অনেকেই অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতেন রেষ্টুরেন্টে। তখন ভারতীয় রেষ্টুরেন্ট ছিল না। সুতরাং তাঁদের কাজ করতে হতো গ্রীক, ইতালিয়ান, মিশরীয়, আরব অথবা ইংরেজদের রেষ্টুরেন্টে। রোজিনা বিশ্রাম ১৯৪৪ সালের একটি জরিপের কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৭] তাতে বলা হয়েছে যে, তখন পুব লন্ডনে একমাত্র ষ্টেপনি এলাকায় অশ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত ৩২ টি ক্যাফে ছিল। সে সময়ে হোটেলগুলোতে ঘর গরম রাখার জন্যে গরম পানির বয়লার রাখা হতো। এই বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ ছিলো অনেকটা জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়ার মতো। সাবেক লস্কররা অনেকে তাই এ কাজও করতেন। কারণ এ কাজে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা- উভয়ই ছিল। কিছুকাল অন্যদের রেস্টুরেন্টে কাজ করে অভিজ্ঞতা এবং টাকাপয়সা সংগ্রহ করে এই অভিবাসীরা কেউ কেউ কিভাবে নিজেরাই রেস্টুরেন্ট স্থাপন করেন, সেই আগ্রহব্যঞ্জক খবর জানা যায় অভিবাসীদের কাহিনী থেকে। ক্যারোলাইন আডামস এবং ইউসুফ চৌধুরী- উভয়ের গ্রন্থ থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আবদুল মান্নান ওরফে ছানু মিয়া এবং নওয়াব আলির জীবন সগ্রামের কাহিনীকে আমরা বলতে পারি টিপিক্যাল, অর্থাৎ কমবেশি এ রকম ঘটেছিল অনেকেরই জীবনে।

এখানে রেষ্টুরেন্ট সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।[৮৮] আমরা যাকে ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট বলছি, লস্কররাই অবশ্য তা প্রথমে আরম্ভ করেন নি। তা খোলা হয়েছিল বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। ১৯০৫ সালের আগেই মধ্য লন্ডনের শ্যাফ্‌টবেরি অ্যাভেনিউতে একটি, এবং হোবর্নে আর-একটি ভারতীয় রেষ্টুরেন্ট ছিল বলে উল্লেখ করেছেন রোজিনা বিশ্রাম। তবে এগুলোর মালিক কারা ছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু ১৯১১ সালে গ্রেজ ইন রোডে যে-ভারতীয় রেষ্টুরেন্ট খোলা হয়েছিল, তার মালিক ছিলেন একজন বাঙালি-কে এন দাশগুপ্ত। এসব রেস্টুরেন্টের অবস্থা ভালো ছিলো না। কারণ, ভারতীয় রেস্টুরেন্টে খাওয়ার মতো বেশি লোক তখন ছিলেন না। এগুলো তাই দীর্ঘদিন টিকে ছিল বলেও মনে হয় না অথবা এগুলো ভারতীয় খাদ্যকেও এদেশের লোকদের কাছে জনপ্রিয় করতে পারেনি। প্রথম দিকের যে দু'টি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে টিকে ছিলো, সে দু'টি খোলা হয়েছিল ১৯২০-এর দশকে। এ দু'টির নাম শাফি আর বীরস্বামী। ১৯২০ সালে যাত্রা শুরু হয় শাফি রেস্টুরেন্টের। এ দু'টির মালিক ছিলেন দু'জন উত্তর ভারতীয় লোক-মোহাম্মাদ ওয়াসিম আর মোহাম্মাদ রহিম। অচিরেই শাফি ভারতীয় ছাত্রদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, বীরস্বামী রেস্টুরেন্ট নামে ভারতীয় হলেও এটি খুলেছিলেন এডওয়ার্ড পামার নামের একজন ইংরেজ। পুরোপুরি ইংরেজ না-বলে বরং বলা উচিত, আধা-ইংরেজ, কারণ তাঁর মা ছিলেন ভারতীয়। পামার এই রেস্টুরেন্টে ভরতীয় পরিবেশ তৈরি করেছিলেন এবং রান্নার জন্য লোক এনেছিলেন ভারত থেকে। ১৯৬৫ সালে এই রেস্টুরেন্ট কিনে নেন স্যার উইলিয়ম স্টুয়ার্ট নামে একজন পার্লামেন্ট সদস্য। তারপর আরও চল্লিশ বছর এই রেস্টুরেন্ট টিকে ছিল। এটি পরিণত হয়েছিল সেকালের সবচেয়ে বড়ো এং সবচেয়ে সফল ভারতীয় রেস্টুরেন্ট হিসেবে। যাঁরা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রেস্টুরেন্ট করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই কাজ শিখেছিলেন এখানে।

বাঙালি লস্করদের মধ্যে সবার আগে কে রেস্টুরেন্ট স্থাপন করেন, সে ইতিহাস ঠিক পরিস্কার নয়। একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, ভিক্টোরিয়া ডক রোডে আবদুর রহিম আর কনি (গনি?) খান মিলে একটি কফি হাউস খুলেছিলেন ১৯২০ সালে। এখানে কেবল কফি নয়, ভাত আর ঝোলও পাওয়া যেতো। আইয়ুব আলি মাস্টারও মোটামুটি একই সময়ে আমেরিকা থেকে লন্ডনে এসে কমার্শিয়াল স্ট্রীটে 'শাহ্ জাজাল' নামে তাঁর কফি হাউস খুলেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে কলকাতার অশোক মুখার্জি এবং নগেন্দ্রনাথ ঘোষ যথাক্রমে প্যার্সি স্ট্রীটে 'দরবার' এবং উইন্ডমিল স্ট্রীটে 'দিলখুশ' নামে দুটি রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। তাঁরা অবশ্য লস্কর ছিলেন না। তবে লস্করদেরই একজন ময়না মিয়া ওরফে আবদুল মজিদ কোরেশী ১৯৩৮ সালে 'দিলখুশ' রেস্টুরেন্টের মালিকানা কিনে নেন নগেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তার অর্থ এক বাঙালির কাছ থেকে আর এক বাঙালি এ রেস্টুরেন্ট কিনে নিয়েছিলেন। কোরেশীর পরিচালনায় রেস্টুরেন্টটি খুব ভালোভাবেই চলছিল, কিন্তু বেশি দিন টিকে থাকেনি। কারণ ১৯৪০ সালে বোমার আঘাতে এটি ধ্বংস হয়েছিল। কোরেশী দাবি করেছেন যে, তাঁর আগে অন্য কোন সিলেটী রেস্টুরেন্ট ছিল না।

আবদুল মজিদ কোরেশীর দাবি সঠিক হলেও, বাংলাদেশী বাঙালিদের পরিচালিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল মোশাররফ আলী আর তাঁর বন্ধু ইসরাইল মিয়ার। ক্যারলাইন অ্যাডামস তাঁর গ্রন্থে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার পথিকৃৎ হিসেবে এই দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন। এই দুই বন্ধুই এসেছিলেন মৌলভীবাজার থেকে। জাহাজের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ থেকে যা সঞ্চয় করেছিলেন এবং পরিচিতদের কাছ থেকে ধার নিয়ে তাঁরা দু'জনে মিলে ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রম্পটন রোডে অ্যালো- এশিয়া নামে একটি রেস্টুরেন্ট খোলেন। নাম থেকে বোঝা যায়, এখানে ভারতীয় এবং বিলেতি-দু ধরনের খাবারই পাওয়া যেতো।[৮৯]

লস্করদের যেসব রেস্টুরেন্ট টিকেছিল, তার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। যেমন, সেগুলো অনেক রাত অবধি এবং সপ্তাহে সাত দিনই খোলা রাখা হতো। তা ছাড়া, প্রথম দিকের ভারতীয় রেস্টুরেন্টে কেবল রাইস-কারি নয়, বিলেতি এবং ইউরোপীয় খাবারও থাকতো। কারণ, এসব রেস্টুরেন্টে যাঁরা খেতেন, তাদের অনেকে তখনো ঝাল এবং মশলাওয়ালা খাবার খেতে অভ্যস্ত হন নি। রাইস-কারি খেতেন সাধারণত ভারতীয়রা। খাবারের দামও ছিল ইংরেজদের রেস্টুরেন্টের তুলনায় শস্তা। যেসব বিলেতি লোকেরা এক সময়ে ভারতে চাকরি করেছেন, তাঁরাও অনেক মশলাওয়ালা খাবারের স্মৃতি থেকে এসব রেস্টুরেন্টে যেতেন। তারপর ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গরাও কেউ কেউ ঝালওয়ালা খাবার চেখে দেখতে আরম্ভ করেন এবং একবার স্বাদ পাওয়ার পর ভারতীয় খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ এখানে খেতে পছন্দ করতেন এবং প্রথম দিকে যে-শেতাঙ্গরা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খেতে আরম্ভ করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।[৯০]

অন্যান্য পেশা ঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এবং ঠিক পরে পুব লন্ডনে, বিশেষ করে ব্রিক লেইন, তখন ছিল ইহুদীদের এলাকা। তাঁদের একটা প্রধান ব্যবসা ছিল কাপড়ের এবং পোশাক তৈরির। লস্কররা অনেকে ইহুদীদের পোশাক তৈরির দোকানে সেলাই করার কাজ পেয়েছিলেন। সেলাইয়ের কল দিয়ে নয়, তাঁরা সেলাই করতেন হাত দিয়ে। দর্জির কাজে বেতন ছিল রেস্টুরেন্টের কাজের চেয়ে বেশি। সুরতাং যাঁরা সেলাইয়ে দক্ষতা দেখাতে পারতেন, তাঁরা এই কাজ থেকে বেশ ভালো আয় করতে পারতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো: বাঙালি অভিবাসীরা সাধারণত আয়-উপার্জন করে সেই টাকা দিয়ে পোশাকের ব্যবসা না-করে বরং রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। আশেক আলি এবং আয়না মিয়ার মতো দু-একজন বাঙালি পুব লন্ডনে দর্জির দোকান করলেও, তা ছিলো নিতান্তই ব্যতিক্রম। সাম্প্রতি বাঙালিরা তৈরি পোশাকের কয়েকটি শিল্প নির্মাণ করেছেন। এঁরা নিজেরা বিক্রি করার পরিবর্তে বড়ো বড়ো দোকানে তাঁদের চাহিদা মতো পোশাক সরবরাহ করেন। চামড়ার পোশাক তৈরি করার কয়েকটি কারখানাও আছে বাঙালিদের। রেস্টুরেন্ট ছাড়া, খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে মিষ্টি এবং তৈরি খাবার বিক্রির দোকানও লন্ডনে অনেকগুলোই আছে।[৯১]

বাংলাদেশী বাঙালিরা এখন ছোটখাটো অনেক চাকরি করেন। আগেই দেখেছি, মোশাররফ আলি এবং ইসরাইল মিয়া-সহ পথিকৃৎরা একটার পর একটা রেস্টুরেন্ট করেছেন, অন্য দিকে যান নি। বাংলাদেশী বাঙালিরা সে ধারা থেকে বর্তমানে যুগের সাথে তাল-মিলিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টারত আছেন বলে মনে হয়। রেস্টুরেন্টের ব্যবসার পরেই বাংলাদেশী বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ব্যবসা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দোকান অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য, বাড়িতে ব্যবহৃত প্রাত্যহিক জিনিস-পত্র এবং কাপড়ের দোকান। বাংলাদেশী বাঙালিদের আর-একটা ব্যবসা হলো ট্র্যাভেল এজেন্টের ব্যবসা। বাড়ি কেনার জন্য মর্টগেইজ কোম্পানির দলিল, বীমা কোম্পানির এজেন্সি, রেস্টুরেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ, গাড়ি মেরামতের কারখানা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক ব্যবসাও আছে বাংলাদেশী বাঙালিদের।

এছাড়া, বাঙালিদের আর- একটা ব্যবসা আছে পাড়ার 'কর্নার শপের'। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সংখ্যা খুব কম থাকলেও, এখন স্কুলে বাঙালি শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ছে। বস্তুত যাঁরা ১৯৭০-এর দশকে এবং এর পরে এদেশে এসেছেন। এঁরা এ দেশেই লেখাপড়া শিখে এখন নানা বিষয়ে পড়াচ্ছেন।

মোট কথা, বাংলাদেশী বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষার হার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁরা আগের চেয়ে বেশি উদ্যোগ নিচ্ছেন, কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে এখনো তাঁরা ব্রিটেনের মধ্যে পিছিয়ে আছেন। তবে আশার কথা হলো দক্ষ শ্রমিক হওয়ার মতো শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণ নিতে বর্তমানে তাঁরা বেশ আগ্রহ প্রবণতা দেখাচ্ছেন। (সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম)

বিলেতে বাঙালির স্বরূপ-সংস্কৃতি ঃ

বিলেতি বাঙালিদের সিংহ ভাগ- আনুমানিক শতকরা আশি ভাগই-বাংলাদেশের একটি জেলা সিলেট থেকে আসা। দশ ভাগ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ। আর দশ ভাগ পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি যাঁদের এক কথায় পরিচয় 'ইন্ডিয়ান' হিসেবে। এই তিন শ্রেণীর বাঙালিদের মাতৃভাষা এক। শিক্ষা, জীবিকা, জীবনযাত্রা, স্বরূপ এবং সংস্কৃতিতেও যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়; আবার কিছু বিষয়ে স্বাভাবিক কারণে জীবনযাত্রার মানের বিচারে এবং চাল-চলনে ভিন্নতা দেখা যায়। তাছাড়া, বিলেতি বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে তাঁদের ধর্মীয়, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভেদাভেদও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে গোলাম মোরশেদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর গ্রন্থসমূহে এবং নূরুল ইসলামও এ বিষয়ে বেশ খোলামেলা কথা বলেছেন। তবে দু'জনার বক্তব্যে কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। তথাপি নূরুল ইসলাম এর সাক্ষাৎকার এবং গোলাম মুরশিদ-এর গ্রন্থসমূহের সহায়তা নিয়ে এ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা করা যায়।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

বিলেতের দূরত্ব বঙ্গভূমি থেকে ছ'হাজার মাইল। যে-বাঙালিরা স্থায়ীভাবে বিলেতে বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদের অনেকে এসেছেনও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। তা সত্ত্বেও তাঁদের একটা বড়ো অংশই মনের দিক থেকে এখনো বাস করেন বঙ্গদেশে-স্বদেশ থেকে নিয়ে-আসা মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। এটা পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনের আর-পাঁচটা জিনিশ থেকে। যেমন, ডাল-ভাত-মাছ ছাড়া বয়স্কদের এখনো পেট, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মন ভরে না। খাবার নিয়ে বাড়িতে মায়েদের সঙ্গে সন্তানদের প্রায়ই দেখা দেয় মতানৈক্য। সন্তানরা খেতে চায় পশ্চিমা খাবার-ব্যর্গার, ব্রেড, রোল, পিৎসা, স্যান্ডউইচ; অপর পক্ষে, মা তাদের দিতে চান দেশী খাবার - মাছ অথবা মাংসের ঝোল এবং ভাত। এছাড়া ভেতরে বয়স্করা যেসব অভ্যাস উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন, তাতেও প্রতিফলিত হয় বঙ্গদেশ থেকে আয়ত্ত করে আসা ভালো-মন্দ অভ্যাস এবং আচার-আচারণ। পোশাকের ক্ষেত্রেও এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নীরদ চৌধুরীর মতো চলেন-বলনে, জীবনাচরণে ইংরেজ হয়েছিলেন এমন বাঙালি খুঁজলে কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু একাধিক সূত্র থেকে শুনেছি, তিনিও নাকি তাঁর ট্রাউজারের তলায় কাছা দিয়ে একটা ধুতি পরতেন।[১৩]

এটা একটা প্রতীকী দৃষ্টান্ত। বেশির ভাগ বাঙালি নীরদ চৌধুরীর মতো আধুনিক নন। তাই তাঁরা দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেক বেশি মাত্রায় বিদেশের মূল্যবোধের মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেন।

সন্তানদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাঙালি পিতা-মাতাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলোঃ তাঁরা অনেকে বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার পাত্র অথবা পাত্রীর সঙ্গে নিজেদের মেয়ে অথবা ছেলের বিয়ে দিতে চান। যে-মেয়েরা বিলেতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বড়ো হয়েছে, তাদের বেলাতে বাংলাদেশ থেকে আনা পাত্রের সঙ্গে অমিল বেশি দেখা যায়। কারণ এই মেয়েরা স্বামী-স্ত্রীর কমবেশি সমান মর্যাদা সম্পর্কে বেশ সচেতন। তাঁদের মধ্যে, বিশেষ করে, মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট মানসিক অশান্তি থাকে। 'Women in Transition' গ্রন্থে[১৪] বাংলাদেশী যে-মহিলাদের জরিপ করা হয়েছে, তাতে পরিপূর্ণ চিত্র উঠে আসে নি বলে নূরুল ইসলাম মনে করেন।

মনিকা আলির 'Brick Lane' উপন্যাস[১৫] সম্পর্কে পুব লন্ডনের বাংলাদেশীরা অনেকেই প্রতিকূল মনোভাব দেখিয়েছেন, এমন কি, কেউ কেউ বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। এখানে নাজনীনের যে-চিত্র লেখিকা অঙ্কন করেছেন, তাকে কল্পিত ও অবাস্তব মনে করেন নুরুল ইসলাম।

পশ্চিমা সভ্যতার একটা বড়ো দিকই হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সন্তানরা যেহেতু জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিলেতের জীবন এবং মূল্যবোধ দিয়ে অনেকটাই প্রভাবিত হয়, সে জন্যে পিতামাতাদের সঙ্গে তাদের ঠিক বোঝাপড়া হয় না। অনেক সময়ে পরিবারের ভিতরে এ নিয়ে অশান্তি বিরাজ করে।

স্বদেশ থেকে এত দূরে বসবাস করলেও, বাঙালিদের মধ্যে আঞ্চলিকতাও বেশ প্রবল। এর কারণ কেবল বর্ণবাদ নয়। চারদিকে প্রচুর বাঙালি থাকায় তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকেই বন্ধু খুঁজে নেন। তা ছাড়া, বাঙালিরা নিজেদের বাঙালি বলেই বিবেচনা করেন। যতো আগেই তাঁরা এ দেশে এসে থাকেন না কেন, যে-দেশ থেকে এসেছিলেন, এখনো নিজেদের সে দেশের লোক বলেই গণ্য করেন।

লন্ডনসহ বড়ো নগরীগুলোতে বাঙালিদের সংখ্যা বেশি বলে এসব জায়গায় তাঁদের মধ্যে সংগঠিত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। এসবের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে নাচ-গান, নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শন-সবই আছে। হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক কম হলেও, এক লন্ডনেই বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায়, ১৯৬৩ সাল থেকে এখানে দুর্গাপূজা পালিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্মে সমবেতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়। দু'জন হলেও তাঁরা সমবেতভাবে প্রার্থনা করেন। এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এবনে মা-জ লিখিত একটি পুরোনো পুস্তিকা[১৬] থেকে। এই রচনায় এবনে মা-জ দাবি করেছেন যে, মুসলমানরা বিধর্মীদের মধ্যে তাঁদের ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়াকে বিশেষ পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধনও খুবই জোরালো। ২০০১ সালের লোকগণনার হিসেব[১৭] অনুযায়ী ব্রিটেনে নানা দেশের প্রায় ষোলো লাখ মুসলমান আছেন। এদের মধ্যে পাকিস্তানী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সাত লাখ, বাংলাদেশের দু লাখ ষাট হাজার এবং ভারতের এক লাখ বত্রিশ হাজার। লন্ডনে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে আবার পুব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এবং নিউহ্যামেই সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করেন। একটি সূত্রের দাবি অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় এক হাজার মসজিদ আছে।[১৮] কোনো কোনো মসজিদে কেবল প্রার্থনা করা হয় না, সেই সঙ্গে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং ধর্মীয়-রাজনীতিও প্রচার করা হয়।

লন্ডনে বাঙালি মুসলমানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন রীতিমতো উৎসাহ ও আড়ম্বরের সঙ্গে। ১৯৬০-এর দশক থেকেই যখন বাঙালিদের সংখ্যা কম ছিল, তখন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব ব্যাপারে পারস্পরিক আদান-প্রদান হতো বলে ক্যারোলাইন অ্যাডামসের গ্রন্থে[১৯] সংগৃহীত সাক্ষাৎকারে আগেকার অভিবাসীরা উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান-উৎসবে হিন্দুরাও নিমন্ত্রিত হতেন এবং একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতেন। যেসব জায়গায় বাঙালিদের সংখ্যা বেশি নয়, সেসব জায়গাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আন্তঃসাম্প্রদায়িক যোগাযোগ বেশি। তবে বর্তমানে এ যোগাযোগ একটু কমেছে বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিরা কখনো কখনো নাচ-গানের বড়ো রকমের কনসার্টের আয়োজন করেন। পয়লা বৈশাখ এবং একুশে ফেব্রুয়ারির মতো সেক্যুলার উৎসব বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলমানরা একত্রিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী স্বরূপ জোরদার হতে থাকলেও, পয়লা বৈশাখ এবং একুশে ফেব্রুয়ারি মতো উৎসব পালনের উৎসাহে তাঁটা পড়েনি। বরং এসব অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং তাতে অংশগ্রহণের মাত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১০০] ক্রিসমাস এবং নববর্ষ ব্রিটেনের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। বাঙালিরা অনেকে পরিচিতদের কার্ড দেন- ইংরেজ এবং বাঙালি উভয়কেই। পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান যথাসাধ্য আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেন বাঙালিরা।[১০১]

বিলেতে বাঙালির ধর্ম ঃ

ধর্ম বলতে আমরা এখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই বোঝাচ্ছি। এ দেশে বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানদের অনুপাত কতো, সে বিষয়ে কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ২০০১ সালের লোকগণনার হিসেবে[১০২] বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশীদের শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমান। বাকি ন ভাগ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান।

ব্রিটেনের একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম আছে। কিন্তু এ দেশের সমাজ খুবই সেক্যুলার। কিন্তু বাঙালিরা সেই পরিবেশে বসবাস করেও মানব ধর্মের আদর্শ অথবা ইহলৌকিকতা স্বীকরণ করতে পারেন নি। বেশির ভাগ বাঙালি, বস্তুত, এতো দূরে এসেও তাঁরা তাঁদের বিবিধ পরিচয়ের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়কেও জোরেশোরে আঁকড়ে ধরেন। এটা তাঁদের স্বাভাবিক মনোভাবেরই প্রতিফলন বলে নূরুল ইসলাম মনে করেন।

আগেরকার অভিবাসীদের সম্পর্কে যেসব তথ্য জানা যায়, তাতে এসব প্রতীক এমনভাবে চোখে পড়ে না। মুসলমান-প্রধান এলাকায় গেলে এখন গোল টুপি মাথায় দিয়ে বহু লোককেই ঘুরতে দেখা যায়। কোনো কোনো দোকান থেকে ধর্মীয় উপদেশের ওয়াজের ক্যাসেট-রেকর্ডিং বেশ জোরেশোরে বাজানো হয়। যাঁরা এই ওয়াজ করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে নানাভাবে তার বিরোধিতা করেছেন, এমন কি, খুন-খারাবিতে লিপ্ত ছিলেন- এ কথা জানা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি শ্রোতাদের ভক্তি এবং আনুগত্য বিচলিত হয় বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থ[১০৩] থেকে এবং ব্রিটেনের বাণিজ্যিক টেলিভিশন- চ্যানেল ফোরের একটি ডকুমেন্টারি[১০৪] থেকে দেখা যায় যে, এই ঘাতক-দালালদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এসে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এমন কি, তাঁরা কেউ কেউ মসজিদের ইমামও হয়েছেন। বিলেতে, বিশেষ করে লন্ডনে, ইসলাম ধর্ম শেখানোর জন্যে কয়েকটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খাদ্য এবং পানীয়র ব্যাপারেও ইসলামী চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাঙালি হিন্দুরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনে মুসলমানদের মতো অতোটা উৎসাহী নন। তার একটা কারণ এই যে, তাঁরা অনেকে কয়েক পুরুষ ধরে সেক্যুলার শিক্ষার মধ্যে বড়ো হয়েছেন। তা সত্ত্বেও সম্প্রতি তাঁদের মধ্যেও পুজো করার প্রবণতা বাড়ছে। এখন লন্ডনে দুর্গাপূজা এবং সরস্বতী পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব পুজোর সঙ্গে ধর্মের চেয়ে স্বরূপের প্রশ্ন বেশি জড়িয়ে আছে বলে মনে হয়।

সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো, বেশির ভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন বাংলাদেশী বাঙালিরাই। পূর্ব লন্ডনে প্রধানত বাংলাদেশী বাঙালিদের একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে। যে-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো লন্ডনের বাইরেও পালিত হয়, সেগুলোর মধ্যে আছে একুশে ফেব্রুয়ারি, নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী।

১.৫ মূল্যায়ন ঃ

উপরোক্ত বর্ণনা শেষে একথা বলা যায় যে, বঙ্গসমাজে পশ্চিমা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রভাব এতো গভীর এবং স্পষ্ট যে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। বাঙালি সংস্কৃতিতে বহু নতুন উপকরণই এসেছিল বিলেতফেরতদের সঙ্গে। অপর পক্ষে, অনেকে মনে করেন যে, বাঙালিরা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করলেও বিলেতি সংস্কৃতিকে তাঁরা কিছুই দান করতে পারেন নি। সম্ভবত, এটা ভ্রান্ত ধারণা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙালিরা বর্তমান ইংরেজি সভ্যতায় বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় তাঁদের অবদান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের বিধ্বস্ত অর্থনীতি এবং তার অবকাঠামো নির্মাণে বাঙালি শ্রমিকদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর থেকে অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বাঙালিদের শস্তা শ্রম এ দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু বাঙালিরা তার চেয়েও বড়ো ভূমিকা রেখেছেন বিলেতি সংস্কৃতিতে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্রিটেনের শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি লোক এ দেশেরই শ্বেতাঙ্গ। বাইরে থেকে এসেছেন মাত্র শতকরা দশ ভাগ লোক। তা সত্ত্বেও এ সমাজকে এখন বলা হয়, মাল্টি-কালচারাল সোসায়েটি। এই যে-বহুবাচনিক সমাজ ব্রিটেনে গড়ে উঠেছে, তার গোড়াপত্তন করেছিলেন বাঙালিরা। এ কথা বলার কারণ, ব্রিটেনে সতেরো-আঠারো শতকে যে-অভিবাসীরা আসতে আরম্ভ করেন তাঁরা এসেছিলেন প্রধানত কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকা থেকে। বিশেষ করে ১৭৫৭ সালে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ার পর বাঙালিদের সঙ্গেই সবচেয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর কলকাতা অথবা তার আশেপাশের লোকেরাই প্রথমে ইংরেজদের আয়া এবং গৃহভৃত্য হয়ে বিলেতে আসতে আরম্ভ করেন। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ,

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা, পাঞ্জাব এবং গুজরাট থেকে বাঙালিদের তুলনায় বেশি লোক এসেছেন, কিন্তু বাঙালিরা এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ব্রিটেনের সমাজে এখন বিচিত্র ভাষাভাষী, বিচিত্র পোশাকের, বহু ধর্মের এবং বহু দেশের লোক দেখা যায়। এই লোকেরা ব্রিটিশ সংস্কৃতি দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন, কিন্তু এই অভিবাসীদের সংস্কৃতি দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি মোটেই প্রভাবিত হয়নি অথবা হচ্ছে না, এটা মনে করার কারণ নেই। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভিনদেশীদের সংস্কৃতির এক-একটা উপাদান তাঁরা মেনে নিচ্ছেন, এমন কি, গ্রহণ করছেন।

একটি প্রতীকী দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঙালি বাস করেন। সে জন্যে এখানে গড়ে উঠেছে 'বাংলা টাউন', যেমন সোহোতে আছে চায়না টাউন, অথবা সাউথ হলে আছে শিখদের ঘনবসতি। ব্রিক লেইন এলাকায় ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলা-ইংরেজি দু' ভষায় রাস্তার নাম-ফলক। এমন কি, কোনো কোনো রাস্তার নাম লেখা আছে কেবল বাংলায়।

বহু দোকানের ফলকও বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা আছে। পুব লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো হসপিটাল হলো রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল। হসপিটালের নাম এবং বিভিন্ন শাখা- যেমন, জরুরী বিভাগ- কোন দিকে, তার ফলক লেখা ছিল বাংলা এবং ইংরেজিতে। হসপিটালের উল্টো দিকে হোয়াইটচ্যাপল স্টেশনের সামনে বিরাট খোলা বাজার। সে বাজারের বহু দোকান বাঙালিদের এবং ক্রেতারা পনেরো আনাই বাঙালি। ব্রিক লেইন ধরে হাঁটার সময়ে দু' পাশে বাংলায় কথাবার্তা এবং অনেক দোকান থেকে বাংলা গান শোনা যায়। রেস্টুরেন্ট থেকে ভেসে আসে মশলার গন্ধ। অনেককে দেখা যায়, লম্বা পাঞ্জাবী এবং টুপি-পরা, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অন্যের সঙ্গে পান খেতে খেতে গল্প করছেন। হঠাৎ একে ঢাকার রাস্তা বলে মনে হলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। মোট কথা, এ রকমের বাঙালি পাড়াকে এখন আর বিশুদ্ধ ইংলিশ শহর নয়, বরং লন্ডনের কেন্দ্রেই এক টুকরো বাংলাদেশ বলে মনে হবে। অথবা, অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, ভিন্ন সংস্কৃতির রঙে রাঙানো আর-এক লন্ডন বলে মনে হবে। এরকমের বাহ্যিক প্রভাবের চেয়ে বাঙালিরা অনেক সূক্ষ্ম প্রভাব ফেলেছেন ব্রিটেনের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এ প্রভাব পড়ে প্রধানত রবিশঙ্কর, আলি আকবর এবং বিলায়েত খানের মাধ্যমে। বিশেষ করে জর্জ হ্যারিসন রবিশঙ্করের বলতে গেলে শিস্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া, সামগ্রিকভাবে আলি আকবর এবং বিলায়েত খানও ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। এই তিন জনই বাঙালি। তার চেয়েও তাঁদের যে-প্রভাব পড়েছে পশ্চিমা সঙ্গীতে, তা হলো পরোক্ষ। এখন পশ্চিমা ঐকতানে অনেক সময়েই সেতার এবং তবলা ব্যবহার করা হয়। এও এসেছে পূর্বোক্ত শিল্পীদের প্রভাব।

ব্রিটেনের রাজনীতিতেও প্রভাব পড়েছে বাঙালিদের। রজনী পম দত্তের জন্ম বঙ্গে নয়; কিন্তু তাঁর পিতা প্রথম দিকের একজন বাঙালি অভিবাসী- উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। কার্ল মার্কস তাঁর দর্শন খাড়া করেছিলেন লন্ডনে বসে, কিন্তু খোদ ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম তিনি দিতে পারেন নি। সেই কাজ ১৯১৫ সালে করেছিলেন রজনী পাম দত্ত। রাজনৈতিক দল হিসেবে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই প্রত্যক্ষ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু এ দলের নীতিমালা দিয়ে লিবারেল দল এবং লেবার দল -উভয়ই পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তা ছাড়া, বর্তমানে বাঙালিরা তাঁদের সংখ্যার কারণে, বিশেষ করে পূর্ব লন্ডনে, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। ব্রিটেনের একজন সহকারী মন্ত্রীকে সিলেটী উপভাষায় বক্তৃতা করতে শোনা যায়। এ ভাষা তাঁর শিখতে হয়েছে বাঙালিদের সংখ্যার কথা বিবেচনা করে।[১২৬]

ইংরেজদের বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী নারীদের পোশাক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাতে ভারতীয় তথা বাঙালি পোশাক বেশ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে ফতুয়া এবং পাঞ্জাবী এখন অনেকেই পরেন। এছাড়া সালোয়ার-কামিজ, এমন কি, বিশেষ উপলক্ষ্যে শাড়ি পরাও বিরল নয়। এখন ইংরেজ তরুণীরা এমন ট্রাউজার এবং টী-শার্ট পরেন, যাতে তাঁদের পেট এবং কোমর বেরিয়ে থাকে। এই ঢং আগে কখনো ইংরেজ সমাজে ছিল না।

পোশাকে বাঙালিদের প্রভাব কতোটা পড়েছে, অথবা আদৌ পড়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বিতর্কাতীত বাঙালিদের যে-প্রভাব পড়েছে ইংরেজ সমাজের ওপর, তা হলো এ দেশের খাদ্যাভ্যাসে। ভেতো বাঙালিদের ওপর দীর্ঘদিন শাসন এবং শোষণ চালালেও, ইংরেজ সমাজে ভাত খাওয়ার কোনো ইতিহাস নেই। ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকের আগে পর্যন্ত বিদেশীদের জন্যে চালও এদেশের দোকানে পাওয়া যেতো না, অথবা বলা যেতে পারে, পাওয়া যেতো খুবই কম। বাঙালি লস্কররা যে-ভাত খেতেন, সে চাল তাঁরা নিয়ে আসতেন যে-জাহাজে তাঁরা আসতেন, সেই জাহাজে করে। কিন্তু এখন সাধারণ এবং অভিজাত সব ইংরেজ পরিবারেই ভাত খাওয়ার রীতি কমবেশি চালু হয়েছে। বাড়িতে না-খেলেও রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভাত খান। সুপারমার্কেট থেকে আধা-রান্না করা ভাত নিয়ে আসেন। বাঙালিদের মতো ভাত তাঁদের প্রধান খাদ্য নয়, কিন্তু কোনো দিন ভাতের স্বাদ নেন নি, অথবা কী করে ভাত রান্না করতে হয়, তা মোটেই জানেন না এমন লোক কমই আছেন। কেবল ভাত নয়, সেই সঙ্গে চালু হয়েছে ঝোল, যাকে এ দেশে বলা হয় কারি।

বর্তমানে বিলেতে ইন্ডিয়ান খাবার এতো জনপ্রিয় হয়েছে যে, এসব এখন কেবল রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না, বরং সুপারমার্কেটেও অর্ধ-রান্না অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। যাঁরা বাড়িতে রান্না করতে চান, তাঁদের জন্যে প্রতিটা খাবারের আলাদা আলাদা মশলাও বিক্রি হয়। বাঙালিদের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের তুলনায় বিলেতে চীনা, গ্রীক এবং আরবদের

Dhaka University Institutional Repository

রেস্টুরেন্ট আরও পুরোনো। কিন্তু পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের রেস্টুরেন্টই বাঙালিদের 'ইন্ডিয়ান' রেস্টুরেন্টের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। এমন কি, ভারতের অন্যান্য এলাকার, যেমন পাঞ্জাবী অথবা দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্যও ইংরেজ সমাজে এতো বহুলভাবে গৃহীত হয় নি।

বাঙালিরা রাইস, কারি এবং চিকিন টিক্কা মসলা দিয়ে বস্তুত ব্রিটেনের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিয়েছেন। এবং এটা এ দেশের সংস্কৃতির ওপর বাঙালিদের একটা বিশাল প্রভাব। অনেকটা বাঙালিদের ওপর পর্তুগীজ প্রভাবের মতো। পর্তুগীজ বণিকরা বাংলাদেশে ঝাল মরিচ, আলু, তামাক, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি খাদ্য প্রবর্তন করেছিলেন, যদিও চিন্তার জগতে কোনো বিপ্লব আনতে পারেন নি- যেমনটা এনেছিলেন ইংরেজরা। বাঙালিরাও তেমনি। তাঁরা ইংরেজদের ভাব-জগতে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। বলা যেতে পারে যে, প্রায় দু' শো বছর বাংলাদেশের ওপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে ইংরেজরা যখন তাঁদের স্বদেশে ফিরে এলেন, তখন বাঙালিরা এলেন তাঁদের পেছনে-পেছনে। তাঁরা ইংরেজদের ওপর শাসন ও শোষণ করে প্রতিশোধ নিতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে- সুইট রেভেঞ্জ, মধুর প্রতিশোধ। ইংরেজদের প্রতি বাঙালিদের প্রতিশোধ সুইট রেভেঞ্জ নয়, বরং হট কারি রেভেঞ্জ।[১০৫]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। গোলাম মুরশিদ 'বিলেতে বাঙালি ইতিহাস', অবসর প্রকাশন, সূত্রাপুর, ঢাকা, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১১।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যগ্রন্থের নাম 'মেঘনাদ বধ', এটি বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

৩। চাঁদ সদাগরের কাহিনী জানা যায় 'মনসা মঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ থেকে। কোথাও তা 'পদ্মপুরাণ' নামেও অভিহিত হয়েছে। এর আদি কবি কানা হরিদত্ত। অন্যান্যের মধ্যে নারায়ন দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। ডঃ আবদুল মোমিন চৌধুরীর ' Dynestic History of Bengal', Dhaka: 1967. গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

৫। ডঃ সিরাজুল ইসলাম, ডঃ মোমিন চৌধুরী ও অন্যান্য.... পরিশিষ্ট 'ক'-'বাংলায় পর্তুগীজ জাতি'-অধ্যায়ে-পৃষ্টা-৪২৬, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ১৯৮১। এছাড়া এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে- Sukumar Bhattacharya, 'The East India Company and the Economy of Bengal' 1704-1740 (London: 1954) এবং ' Murshid Quli Khan and His Times (Dhaka-1963) গ্রন্থদ্বয়েও।

৬। গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা-১১ এবং সিলেটে এক সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

৭। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১২ এবং সাক্ষাৎকার ঐ।

৮। Mirza Abu Talib, 'Westward Bound: Travels of Mirza Abu Talib', ed. by Mushirul Hasan, New Delhi: Oxford University Press, 2005. (অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ভ্রমন কাহিনী। ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে অকপট এবং সুন্দর মন্তব্যে পরিপূর্ণ)।

৯। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৩।

১০। নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', প্রবাসী পাবলিকেশন্স, সুরমা ম্যানশন, সিলেট, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪; গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৪।

১১। নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-৭৫; গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৫।

১২। নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-৭৫; গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬।

১৩। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬।

১৪। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭। Michael H. Fisher-এর গ্রন্থের নাম 'Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settelers in Britain 1600-1857'. Delhi: Permanent Black, 2004.

১৫। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮।

১৬। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২০। Mirza Sheikh I'teshamuddin -এর ভ্রমন বৃত্তান্ত : 'The Wonders of Vilayet: Being the Memoir, Originally in Persian, of A Visit to France and Britain in 1765. tr. by Kaisar Haq. Leeds; Peepal Tress, 2001.

১৭। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮। Mirza Abu Talib- প্রাগুক্ত।

১৮। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২১। ডঃ সিরাজুল ইসলামের মন্তব্য সর্ম্পকে তিনি কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নি, তবে ডঃ সিরাজুল ইসলাম বর্তমান গবেষকের এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ সূচক" জবাব দিয়েছেন। দীন মহাম্মাদ-এর ভ্রমন বৃত্তান্ত সম্পর্কে Michael H. Fisher –এর 'Travels of Dean Mohamet: An

Dhaka University Institutional Repository

Eighteenth Century through India.' Berkeley, University of California Press, 1997. গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

১৯। গোলাম মুরশিদ- ঐ, পৃষ্ঠা-৩০।

২০। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬৭; গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৩১। ঘনশ্যাম দাস ১৭৭৩ সালে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে মহারাজা নন্দ কুমারের মামলা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'House of Commons, Sessional Papers, Vol. 135, Fifth Riport from the Committee Appointed to enquire into Nature, state, Conditionof the East India Company and the British Affairs in the East Indis, 18^{th} of June, 1773'. এবং Sir Elijah Impay, ' Memories of Sir Elijah Impay', London: 1886. গ্রন্থে।

২১। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৩১।

২২। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪।

২৩। ঐ,।

২৪। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Surendranath Banarjea, 'A Nation in the Making', London: Oxford University Press, 1925. গ্রন্থে। তাছাড়া স্বপন বসু'র 'বাংলার নব চেতনার ইতিহাস' (১৯২৬-১৮৬৫), সুসোভন সরকার-এর 'বাংলার রেঁনেসা', বিনয় ঘোষ-এর 'বাংলার নবজাগৃতি', অমলেশ ত্রিপাঠী'র 'ইতালীর রেনেসাঁস ও বাঙালি সংস্কৃতি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়', কলাকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৪র্থ সং, ১৯৬৩ এবং কৃষ্ণ কৃপলনীর 'দ্বারকানাথ ঠাকুরঃ বিস্মৃতি পথিকৃৎ (ক্ষিতিশ রায় অনূভূতি) নয়াদিল্লী: ১৯৮৪ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

২৫। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৭।

২৬। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬৭; গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৭।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ইউরোপযাত্রীর পত্র' (জীবনস্মৃতি) এ-এর সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

২৮। Ghulam Murshid, 'The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudhan Dutt'. New Delhi: Oxford University Press, 2005. গিরিশচন্দ্র বসু'র 'বিলাতের পত্র' (দুইখন্ড), দ্বিতীয় সং, কলিকাতা: বঙ্গবাসী প্রেস, ১৮৮৭, 'ইউরোপ ভ্রমন', দ্বিতীয় সং, কলিকাতা: ১২৯২ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর 'বিলাত যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', কলিকাতা: ১৯০৬-গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

২৯। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯।

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা-৬০। প্রথমদিকের বিলেতগামী বাঙালিদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Michael H. Fisher তাঁর 'Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settelers in Britain 1600-1857'. Delhi: Permanent Black, 2004. গ্রন্থে। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সম্পের্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে 'Selecting From the Records of Bengal Government Vol. 14': Papers Relating to Presidency College, 10-11. এবং Fazlur Rahman, 'The Bengal Muslims and English Education, 1765-1835', (Dhaka-1973)-গ্রন্থে- পৃষ্টা-৯৬-৯৮।

৩১। গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত-৭২ নং পৃষ্ঠায় উক্ত তালিকা দিয়েছেন। ব্রিটেনে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে যাওয়া ভারতীয়দের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্যে D. G. Craford-এর 'History of Indian Medical Service', 2 Vols. London: W. Tacker and Co. 1914. এবং 'Role of the Indian Medical Service', London: 1930 গ্রন্থদ্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর স্কটল্যান্ডের ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে জানার জন্যে গুরুত্বপূণ হল Bashir Mann-এর 'The New Scots: History of Asians in Scotland', Edinburgh: John Donald Publishers, 1992 গ্রন্থ। (তবে শেষোক্ত গ্রন্থে ভুল তথ্যও আছে বলে গোলাম মুরশিদ মন্তব্য করছেন)।

৩২। গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪। প্রথম দিকে ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে জানার জন্যে F. H. Brown 'Indian Students in Britain', Edinburg Review, January, 1913. Rakhal Das Haldar-এর লেখা 'The Diary of an Indian Student', Dhaka: Ashutosh Library, 1903. গ্রন্থদ্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Ghulam Murshid, 'Lured by Hope : A Biography of Michael Madhusudan Dutt' tr. by Gopa Majuumdar New Delhi: Oxford University press-2004.

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫।

৩৪। ডঃ সিরাজুল ইসলাম, দশম অধ্যায়- 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষক অর্থনীতি', 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১' (তৃতীয় খন্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৭ খ্রিঃ- পৃষ্টা-২০৯-২২৭। এবং ডঃ মুনতাসীর মামুন রচিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে -এর বিস্তারিত ও গবেষণালব্ধ বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া Sirajul Islam-এর 'Permanent Settelment in Bengal: A Study of it's Operation 1790-1819' (Dhaka-1978) তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা।

৩৫। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮।

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা-৯০। সৈয়দ আমীর আলী ও তৎকালীন মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ও বিশিষ্ট মুসলিম মনীষীদের সম্পের্কে জানার জন্যে Syed Razi Wasti, 'Memoirs and Other Writings of Syed Ameer Ali', Delhi: 1985, Reprint. গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান।

৩৭। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১০৩-১০৪। ভারতীয় আইসিএসদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্যে Brajendranath De-এর 'Reminiscences of an Indian Member of the Indian Civil Service', Calcutta Review, April, 1953- Aug. 1955. এবং Shaibal K. Gupta-এর 'A Foot in the Door of the Indian Civil Service', Calcutta: Papyrus, 1996. গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

৩৮। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১০৪ এবং সাক্ষাৎকারে নুরুল ইসলাম ও জাকারিয়া খান চৌধুরী।

৩৯। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১০৫-১১১।

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা-১১৪।

৪১। P. Hardy. 'The Muslims of British India' (Cambridge-1972), -পৃষ্ঠা-৫৮।

৪২। গোলাম মুরশিদ ঐ, পৃষ্ঠা-১১৭-এ উক্ত তালিকা প্রদান করেছেন।

৪৩। Simonti Sen, 'Travels to Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives, 1870-1910', New Delhi: Orient Longman, 2001, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮। এছাড়া Rozina Visram-এর 'Asians in Britain: 400Years of History' (London-2002)-এ এ সম্পর্কে গবেষণাসমৃদ্ধ তথ্য রয়েছে।

৪৪। গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৯-১৩৪ এবং সাক্ষাৎকারে নুরুল ইসলাম। Harihar Das-এর 'Life and Letters of Toru Dutt.' Oxford University Press, 1921-এ প্রসঙ্গে লেখা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এছাড়া Geraldine Forbes-এর 'Women in Modern India', (Cambridge-1996), কৃষ্ণভাবিনী দাস-এর 'ইংল্যন্ড বঙ্গমহিলা' কলিকাতাঃ ব্যানার্জি এন্ড সন্স, ১৮৮৫, জগৎ মোহিনী চৌধুরী'র 'ইংলন্ডে সাত মাস', কলিকাতাঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও ইন্দিরা দেবী'র, 'পুরাতনী', কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭ গ্রন্থসমূহ তথ্যপূর্ণ।

৪৫। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬৪।

৪৬। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬৫-১৬৬ এবং নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৫৬১। এ সম্পের্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে Ghulam Murshid-এর 'Lured by Hope: A Biography of Michael Madhusudan Dutt' tr. by Gopa Majuumdar New Delhi: Oxford University press-2004 গ্রন্থে।

৪৭। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬৩-৬৫, ৪৮৪; গোলাম মুরশিদ, 'বিলেতে বাঙালির ইতিহাস', পৃষ্ঠা- ১৭১।

৪৮। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭২-৭৪ এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম। তাছাড়া এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে- D. G. Crawford -এর 'History of Indian Medical Service'- 2 Vols. London: W. Tacker & Co. 1914 গ্রন্থে।

৪৯। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৪। Rozina Visram-এর গ্রন্থের নাম 'Asians in Britain: 400 Years of History'. London: Pluto press, 2002.

৫০। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৪।

৫১। Caroline Adams -এর 'Across Seven Seas and Thirteen Rivers'- গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করে গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭৫ এবং নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮৫।

৫২। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬২-৪৬৩ এবং গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭২।

৫৩। ইতেশাম উদ্দীন, ঐ, (টীকা ১৬ দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৭।

৫৫। ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৭-১৭৮।

৫৬। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬২-৪৬৩।

৫৭। 'Tales of Three Generations of Bengalis in Britain'- গ্রন্থের লেখকের নাম John Eade, Ansar Ahmed Ullah, Jamil Iqbal & Marissa Hey; যা ২০০৬ সালে London: Nirmul committee থকে প্রকাশিত হয় এবং Katy Gardner- এর গ্রন্থেদ্বয়ের নাম 'Global Migrants, Local Lives: Travel and Transformation in Rural Bangladesh'. Oxford University press-1995. and 'Mullahs, Migrants, Miracles: Travel and Transformation in Sylhet', Contributions to Indian Sociology, Vol. 27 No. 2 (1993).

৫৮। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৯ এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

৫৯। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৫৯৭।

৬০। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮১-১৮২ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৬১। 'Tales of Three Generations of Bengalis in Britain'- গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮২-৮৩ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৬২। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৩ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৬৩। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৫ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৬৪। গোলাম মুরশিদ, ঐ।

৬৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৫-১৮৭।

৬৬। ঐ, পৃষ্ঠ-১৮৮।

৬৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৯ এবং নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-৫৬৭, ৫৯৫।

৬৮। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৯০ এবং নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৫-১৫৫।

৬৯। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯১ এবং ঐ, পৃষ্ঠা-৮৩।

৭০। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯২ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৭১। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৯৭১।

৭২। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৩ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৭৩। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৪ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৭৪। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৪।

৭৫। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৫-এ।

৭৬। ঐ।

৭৭। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৭-১৯৮ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৭৮। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর- 'ইউরোপযাত্রীর পত্র' (জীবন স্মৃতি), এবং গিরিশ চন্দ্র বসুর গ্রন্থ সমূহ, 'বিলাতের পত্র প্রথম ভাগ' দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: বঙ্গবাসী প্রেস, ১৮৮৭, 'বিলাতের পত্র দ্বিতীয় ভাগ' কলিকাতা: ১২৯৩, 'ইউরোপ ভ্রমন', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: বঙ্গবাসী প্রেস, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

৭৯। Caroline Adams - এর 'Across Seven Seas and Thirteen Rivers' (London: 1987), Yousuf Chowdhury'র 'The Roots and Tales of Bangladeshi Settlers', Barmingham (1993) এবং Rozina Visram –এর 'Indians in Britain', London: B. T. Batsford, 1987. গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে উক্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৯-২০০ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৮০। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ২০১।

৮১। ঐ, পৃষ্ঠা-২০২ এবং নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬০-১৭০।

৮২। ঐ, পৃষ্ঠা-২০৩ এবং সাক্ষাৎকারে ঐ।

৮৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২০৫।

৮৪। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গোলাম মুরশিদ, 'বিলেতে বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখিত কারণ ও এর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন- পৃষ্ঠা-২০৫-২০৯ ; নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা- ১০৫-১৯৭ এবং সাক্ষাৎকার।

৮৫। ব্রিটেনে বাঙালির শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ সূত্র উল্লেখ করে গোলাম মুরশিদ 'বিলেতে বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী তথ্য তুলে ধরেছেন, পৃষ্ঠা-২১১-২২০; নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা- ৩১৫-৩৪৪ এবং সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

৮৬। 'Across Seven Seas and Thirteen Rivers', London- 1987 গ্রন্থের রচয়িতা, প্রাগুক্ত; 'The Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers', Birminghham: প্রাগুক্ত, 1993 গ্রন্থের লেখক Yusuf Chowdhury. এবং 'Tales of Three Generations of Bengalis in Britain', London: Nirmul Committee, 2006 গ্রন্থের লেখক, প্রাগুক্ত।

৮৭। Rozina Visram-এর গ্রন্থ 'The of History the Asian Community in Britain', London: Whyland, 2007. -এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২২১।

৮৮। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২২৩-২৩০-এ অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন এবং নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৬২৩-৬৫১, ১০৫৩-১০৭৯-এ এবং সাক্ষাৎকারে, ঐ, ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টের ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন।

৮৯। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২২৭।

৯০। ঐ, পৃষ্ঠা-২২৮।

৯১। রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ছাড়া বাঙালিদের জীবিকা উপার্জনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ সূত্র উল্লেখ করে তুলে ধরেছেন গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২৩১-২৪৪ এবং সাক্ষাৎকারে, ঐ।

৯২। গোলাম মুরশিদ-এর গ্রন্থসমূহ 'বিলেতে বাঙালির ইতিহাস', সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ' ঢাকা-এপ্রিল-২০০৮,পৃষ্ঠা-২৪৫-২৯৩; 'আশার ছলনে ভুলি', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ২০০৬; 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারী প্রগতির এক শো বছর', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ইং; 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', ঢাকা: অবসর প্রকাশন, ২০০৫ইং এবং 'Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization', Rajshahi: Shahitya Samsad, 1983 A. D.

৯৩। গোলাম মুরশিদ 'বিলেতে বাঙালির ইতিহাস', পৃষ্ঠা-২৪৮।

৯৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৫৫। 'Women in Transition: A Study of the Experiences of Bangladeshi Women Living in Tower Hamlets'. Bristol: The Policy Press, 2003. Chris Philipson, Nilufar Ahmen & Joanna Latimer.

৯৫। Monika Ali, 'Brick Lane', London: Black Swan, 2007.(First ed. 2003)-(সাড়া জাগানো উপন্যাস); সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম এবং ঊর্মি রহমান, 'বিলেতে বাঙালি সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী', সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০১০।

৯৬। এবনে মা-জ, 'বিলেতি মোসলমান অর্থাৎ ইংল্যান্ডের অন্তর্গত লিভারপুল নগরীর নবদীক্ষিত মুসলমানগণের বিশেষ বিবরণ', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)।

৯৭। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২৬১।

৯৮। ঐ, পৃষ্ঠা-২৬২।

৯৯। Caroline Adams-এর গ্রন্থ 'Across Seven Seas and Thirteen Rivers', London, Thap Books, 1987. বেশ কয়েকজন বসতিস্থাপনকারীর নিজেদের জবানীতে লেখা তাঁদের কাহিনী। সেই সঙ্গে লেখকের তথ্য এবং বিশ্লেষণপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত খুবই মূল্যবান গ্রন্থ।

১০০। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২৬৫।

১০১। ঐ, পৃষ্ঠা-২৬৭।

১০২। ঐ।

১০৩। 'একাত্তরের দালালেরা কে কোথায়', ঢাকা:মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র (মুচেবিকে), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রিঃ।

১০৪। গোলাম মুরশিদ, ঐ, পৃষ্ঠা-২৬৯।

১০৫। সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

(ii) যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি সংগ্রামী পটভূমি ঃ

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে হাজার বছরের এক গৌরবোজ্জল ঘটনা। আর এ মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অংশগ্রহণ ছিল বিরল সৌভাগ্য ও আত্মসম্মানের ব্যাপার। আবার মুক্তিযুদ্ধে স্বদেশ-বিদেশে অবস্থান করে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ অন্যতম নিয়মকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন; তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে। বাঙালির অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে সুদীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পেছনে প্রবাসে তৎকালে অবস্থানরত বাঙালিরা রেখেছেন এক অনবদ্য অবদান। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য[১] প্রবাসী বাঙালিরা লন্ডনে সদর দফতর স্থাপন করে সমগ্র ইউরোপ তোলপাড় করেছেন[২], পৃথিবীর দেশে দেশে প্রাবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি রূপে ছুটে বেড়িয়েছেন, সম্পন্ন করেছেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ;[৩] যার অজানা অধ্যায় গবেষণালব্ধ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণপূর্বক উন্মোচিত হওয়া উচিৎ।

বাঙালি জাতির এ রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের পেছনে প্রবাসী বাঙালি বিশেষ করে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা কতখানি, লন্ডনে ঘাঁটি করে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী[৪] এবং তাঁর সহকর্মীরা[৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ক্রান্তিকালীন সময়ে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে[৬], আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভে গণআন্দোলন ও বাঙালিদের ন্যায্য দাবির প্রতি বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে[৭], বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থসহ সার্বিক সহয়তা ও তীব্র গণহত্যা[৮] বন্ধ করতে এবং বঙ্গবন্ধু[৯] শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির[১০] দাবিতে প্রবাসে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বোপরি যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে উন্মেষ ঘটেছিল তার স্বরূপ উৎঘাটন করতে হলে প্রথমে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক[১১], রাজনৈতিক ও সংগ্রামী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সাথে সাথে বৃটেনে তাৎক্ষণিক এমনি প্রতিবাদী কর্মতৎপরতার কারণ ছিল দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনেও প্রবাসী বাঙালিরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। সে সময় ভারতীয় রাজনীতির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণ মেনন লন্ডনে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তুললে অনেক বাঙালি তাঁর ঘনিষ্ট সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুল মান্নান, আয়ুব আলী মাষ্টার, শাহ আবদুল মজিদ কোরেশী ও মিনহাজ উদ্দিন প্রমুখ।[১২]

চল্লিশের দশকে লন্ডনে গড়ে ওঠে মুসলিম লীগের শাখা। প্রবাসী বাঙালির অনেকেই তখন যুক্ত হন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার আবদুল গফুর, আব্বাস আলী (ব্যারিস্টার), সাইদুর রহমান (ব্যারিস্টার), আবদুল হামিদ (ব্যারিস্টার), আবু সাঈদ চৌধুরী (বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি), আয়ুব আলী মাষ্টার , আবদুল মান্নান, আবদুল মজিদ কোরেশী, দেওয়ান মনসুর আলী, ছুরত মিয়া, মুক্তার মিয়া, আবদুল মুতালিব চৌধুরী, আজমান আলী, আবদুল লতিফ (সোলজার), তাহির আলী, জরিফ মিয়া, ইসরাইল আলী, সালামত মিয়া, ইসমাইল মিয়া, নূর মিয়া (সার্জন) প্রমূখ। যুক্তরাজ্য শাখা মুসলিম লীগের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে আব্বাস আলী, আবদুল মজিদ কোরেশী ও আয়ুব আলী মাষ্টার।[১৩] এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক অভ্যুদয় সম্পর্কে বাঙালিদের মনোভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম তাঁর সম্পাদিত "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বিতর্ক আছে। অনেক অত্যুৎসাহী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে, পাকিস্তানের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তাঁদের মতে পাকিস্তানের উৎপত্তি সন্ধান করতে প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক যুগে গমণ না করলেও অন্তত সিন্ধু সভ্যতা অব্দি পেছনে যেতে হবে। তবে নমনীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, পাকিস্তানের উৎস হচ্ছে আট শতকে 'সিন্ধুতে' আরবদের উপস্থিতি। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবরা এদেশে এসে ইসলাম প্রবর্তন না করলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতো না- এই তাঁদের যুক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শেকড়ের গভীরতা সম্বন্ধে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করলেও একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ছিল অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ রাজ যতোই ভুল ভ্রান্তি বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিক না কেন, পাকিস্তানের উদ্ভব ছিল অপ্রতিরোধ্য। অপরদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবিতা তত্ত্বের উল্টোপিঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি বড় ধস এবং এই ধস ঠেকানো যেতো যদি রাজনিতিকগণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন।[১৪] অবশ্য তিনি এ ধরণের মনোভঙ্গি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নেতিবাচক বলে মনে করেন।

অতিসম্প্রতি যশোবন্ত সিংহ তাঁর 'জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে পাকিস্তানের উৎপত্তি, জন্মলগ্ন ত্রুটিসমূহ, এর প্রকৃতি, স্বতন্ত্র জাতি গঠনে ব্যর্থতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন যে, কয়েদ-এ-আজম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ'র 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ধারণার ভিত্তিতে ১৯৪০ সালের 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর মাধ্যমে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের ভাষায় এক "ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্ট দানব"-এর তান্ডবে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেনের ভাষায় "অস্ত্রোপচার করে" "পোকায় খাওয়া" পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়;[১৫] ব্রিটিশরা যার মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজ করে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আর নবজাতক পাকিস্তানকে তার জীবন শুরুই করতে হয় প্রশাসনিক নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে। ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হলেও ভারতের ধারাবাহিক আত্মপরিচয়ের সুবিধা ছিল, ছিল কার্যকর একটি প্রশাসনিক কাঠামো এবং এই যে বিশাল ভূখন্ডে ছড়িয়ে থাকা বিপুল জনসমষ্টি, যার বারংবার নানা অভিঘাত সহ্য করার ও আত্মস্থ করার ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তানের অনুরূপ কোন সুবিধাই ছিল না। জন্মলগ্ন থেকেই তার সামনের চ্যালেঞ্জগুলো তাই ছিল প্রবল দুর্লঙ্ঘ্য। হাজার হোক পাকিস্তান আদতে ছিল মুসলিম লীগের তরফে ব্রিটিশদের সঙ্গে দরকষাকষির একটি ধারণা মাত্র, একটি রণ কৌশল বিশেষ, যার প্রয়োগ করা হয় "হিন্দু কংগ্রেস"-এর হাতে ছেড়ে না রেখে মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে। তাছাড়া কেউই, এমনকি জিন্নাও পাকিস্তানকে কখনও সংজ্ঞায়িত করেননি, ইসলামের নামেই রব তোলা হয়েছে। তাই পাকিস্তানের স্বপ্ন যখন বাস্তব হয়ে গেল, কেউই তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার কোন আগাম মূল্যায়ন ছিল না। কারণ পাকিস্তানের চূড়ান্ত চেহারা কী হবে সে সম্পর্কেও কারও ধারণা ছিল না।[১৭]

তিনি আরও বলেছেন, জিন্নাহ'র 'মুসলিম জাতীয়তা'র কোন ভৌগলিক গন্তব্য ছিল না, থাকতেও পারে না। তিনি কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য একটা জুতসই সংজ্ঞা খুঁজছিলেন। সেই সংজ্ঞার মধ্যেও গুরুতর গোলমাল ছিল। তাই জিন্নাহ তার "পোকায় কাটা" ভূখন্ড পেলেও তা' থেকে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়তে সমর্থ ছিলেন না। আর স্বতন্ত্র জাতি গড়তে তো তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। তিনি এবং মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু প্রমুখ ভারতের বুকে অস্ত্রোপচার করে তাকে শারীরিকভাবে টুকরো করলেন বটে, কিন্তু ওই অস্ত্রোপচার কোন নতুন জাতি বানাতে পারল না।[১৮]

রোজালিন্ড ওয়্যানলন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ব্রিটিশ রাজ্যের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অসম্পূর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ১৮৬০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাব উপনিবেশের যোদ্ধা সরবরাহকারী প্রদেশ ছিল। তার কৃষক ও জমিদাররা উদার কৃষিনীতির দ্বারা লালিত, পুষ্ট হয়েছে। ভারতের অন্যত্র কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রীদের সংগঠিত যে কৃষি সংস্কার কর্মসূচি ও আন্দোলন জমিদারদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, পাঞ্জাবে তা অনুপস্থিত। স্বাধীনতার পর তাই পাকিস্তানের সবথেকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে তার সেনাবাহিনী এবং ভূস্বামী শ্রেণী। এ যুক্তি কেবল পাক-পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে নয়, গোটা পাকিস্তানের বেলাতেই প্রযোজ্য।[১৯]

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, জিন্নাহ যদিও পাকিস্তান জন্মের মহিমার মধ্যেই মারা যান, তাঁর নবজাতক দেশটি অভিভাবকহীন, অনাথই থেকে যায়। তাঁর অর্জনটিও রয়ে যায় এক রকম বন্ধ্যা। পাকিস্তান প্রমাণ করেছে মুসলিম স্বতন্ত্র জাতীয়তার তত্ত্বটির দেউলিয়াপনা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা সেখানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।[২০] অর্থাৎ মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

উপরোক্ত (এই) দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার মানুষের মনে 'পাকিস্তান' অর্জনের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তার বিচার করলে দেখা যায়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মর্মান্তিক সংঘাতের পরিণতি হিসেবে বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, বাংলার জনগণ তাদের জন্মভূমির এই বিভাজন চায় নি, এ ধরণের বিভাজনের জন্য তারা প্রস্তুতও ছিল না। এই বিভাজনকে তাদের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক কথায় পাকিস্তানকেও জোর করেই তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেননা, বাঙালি মুসলমানরা মূল লাহোর প্রস্তাবের ধারণার ভিত্তিতে পাকিস্তান চেয়েছিল। কিন্তু জিন্নাহর মস্তিষ্কপ্রসূত একক ট্রানকেটেড পাকিস্তান তারা চায় নি যা জিন্নাহ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।[২১]

কাজেই বাঙালির জাতীয় আশা-আকাঙ্খা অপূর্ণ থেকে যায় এবং লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র এক পাকিস্তানে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার ব্যাপারে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যাশিত পাকিস্তান ছিল এমন একটি রাষ্ট্র যার অন্তর্ভুক্ত অংশগুলো থাকবে পরস্পর স্বাধীন এবং তাদের আঞ্চলিক অখন্ডতা থাকবে অটুট। বিভাগপূর্ব বাংলার শিল্পোন্নত এলাকা হাতছাড়া হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণ ও তাদের নেতৃত্বের ব্যাপক হতাশা সত্ত্বেও তাঁরা পাকিস্তানের কল্যাণে আন্তরিকভাবে নিবেদিত হয়েছিল।[২২] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাঙালি সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মতো ব্রিটেন প্রবাসীরাও ছিলেন অতি উৎসাহী।[২৩]

দুস্তর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অভিজ্ঞতা বাংলার মানুষের রয়েছে, ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে ট্রানকেটেড একক পাকিস্তানের প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সেই প্রয়াস পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একই প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। পাকিস্তানের দুই অংশের অংশীদারিত্বের ব্যাপারটি প্রথম থেকেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংগঠন কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণ করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নীতিমালাকে খাটো করা হয় এবং শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন পর্যায়ে পারস্পারিক মতবিনিময় ও আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ না করে সরকারি আদেশ জারি করে দেশ শাসন করতে থাকেন। ফলে তাঁদের নির্দেশাবলীর অধিকাংশেই দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এজন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। পাকিস্তানের সূচনায় সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাষা আন্দোলন ছিল এ ধরণের প্রতিরোধের একটি নজির।[২৪] এ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় একটি ঘটনায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদেরও মোহমুক্তি ঘটে। জাহাজ পরিত্যাগ করে বৃটেনে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালিদের লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশন পাসপোর্ট দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কলমায় শরিক পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের বাঙালি বিদ্বেষী কর্মকান্ডে তারা হতাশ হন। জমতে থাকে ক্ষোভ; অবশেষে পাকিস্তান হাইকমিশনে হাতাহাতির মতো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।[২৫] তবুও তাদের পাসপোর্ট পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় ১৯৫০ সালে গঠিত হয় 'পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন'। এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি যথাক্রমে দেওয়ান মুজাফফর আলী ও আশীদ আলী মাষ্টার। এরপর বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, কভেন্ট্রি, ব্রাডফোর্ড, লীডস, লুটন, শেফিল্ড প্রভৃতি শহরেও পাকিস্তানিদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠে। তিনি আরও বলেছেন, পাকিস্তান শব্দ সংযোজিত থাকলেও এগুলো ছিল বাঙালিদের সংগঠন। আর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন বাঙালিরা।[২৬]

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উত্তর ভারতের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করাটা কি যুক্তিসংগত, সুবিবেচনাপ্রসূত বা বাস্তবসম্মত ছিল? উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী।[২৭] ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষার দবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের সংবাদ বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব লন্ডনের গ্রান্ড প্যালেস হলে শত শত বাঙালি সমবেত হয়ে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানান। একই সাথে তাঁরা বৃটেনের মাটিতে স্বদেশের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করেন। তখন থেকেই বৃটেনের প্রবাসী বাঙালিরা দেশের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অবদান রাখতে থাকেন।[২৮]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়েও তারা (বাঙালিরা) নিজদেশে পরাধীনতা বরণ করতে বাধ্য হয়। মুসলিম লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতাদের মধ্যে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মজিবুর রহমান। উনিশ শ' পঞ্চাশের দশকে তাঁরা যখন লন্ডনে আসেন তখন প্রবাসী বাঙালিরা তাঁদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান (ছনু মিয়া), মিনহাজ উদ্দিন, হরমুজ আলী ও আইয়ুব আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজন মতো তাঁরা বাঙালি নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়েছেন। লন্ডনে সফরকালে মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্য বাঙালি নেতারা আর্লস কোর্ট এলাকায় ২৭৫ নম্বর ব্রমটন রোডে অবস্থিত আব্দুল মান্নানের রেস্তোঁরা 'গ্রিন মাস্ক' এবং সিংটন এলাকায় ২৯ নম্বর সেন্ট মেরী এ্যাবট্স (বর্তমানে অন্য নামে পরিচিত) তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে অভ্যর্থনা লাভ করেন।[২৯]

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত প্রথম সংবিধানের মূলনীতি বিরোধী আন্দোলন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি, পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়,তা' স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হবে বলে অনুমান করা তখন কঠিন ছিল।[৩০]

তথাপি পঞ্চাশের দশকে আন্তঃপ্রদেশ বৈষম্য দুরীকরণের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমর্থন লাভের প্রয়াস বিফলে যাবে বলে নিশ্চিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কনসেপ্ট-এর সামগ্রিক বাস্তবায়নযোগ্যতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। পাকিস্তানের স্বপ্ন যদি আদৌ থেকেও থাকে তা সম্পূর্ণভাবে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ও সামরিক কায়েমি স্বার্থের কুক্ষিগত হয়েছিল। এত দ্রুত ও অযৌক্তিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে যে, এ বিষয়ে লন্ডন টাইমস্ এর ভবিষ্যৎবানী অবশেষ সত্য প্রমাণিত হয়। লন্ডন টাইমস্ ভবিষ্যৎবানী করেছিল, যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হবে তার পরের দিনই তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু দ্রুত পতন না হওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্নায়ু যুদ্ধ, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের এবং আয়ুব খানের সামরিক শাসন।[৩১]

১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের এক দশকের সামরিক শাসনের সূচনা হয়। আয়ুব আমলের অবাস্তব কল্পনাময়, পরিবর্তনশীল ও এক ব্যক্তির আদর্শ নির্ভর একটি দশক পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এ আমল দ্রুত পুঁজি সঞ্চয়, উচ্চ সামাজিক সচলতা ও পার্থক্যরণ, রাজনৈতিক অবদমন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রদেশমুখী মেরুকরণ দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। যে পাকিস্তান মুসলিম লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং যা ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল, তা পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া অন্য যে সব রাজনৈতিক দল তখনও তাদের ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছিল, তারাও অন্য প্রদেশে অর্থবহ কর্মতৎপরতা বন্ধ রেখে অবিমিশ্র প্রাদেশিক প্লাটফর্মে পরিণত হয়। এভাবে নিজ প্রদেশের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দল ছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের স্বার্থে কথা বলার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় নেতাও ছিল না। ষাটের দশকের জন্য শুধু মার্কিন সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রই অবশিষ্ট ছিল।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখের ভাষা-আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে "যুক্তফন্ট" সরকারকে অগণতান্ত্রিকভাবে অপসারণ এবং ১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে সারা দেশে এক উন্মাদজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও শোষিত পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা বুঝতে পারলো, আয়ুবের সামরিক শাসনের অবসান ছাড়া তাদের ন্যায্য দাবী আদায় সম্ভব হবে না। এর ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্ষোভ ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামরিক শাসন-বিরোধী গণআন্দোলনকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের অস্ত্র হিসেবে গণ্য করে।[৩৩]

এমন পরিস্থিতিতে দেশবাসীর মতো যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। তাঁদের পরবর্তী কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির প্রতি আর কোন মোহ তাদের অবশিষ্ট থাকে নি। ১৯৫৯ সালে লন্ডন সফরে যান পাকিস্তানী সামরিক সরকারের স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জেনারেল বার্কি। তাঁর আগমনে আয়োজিত সভায় প্রবাসী বাঙালিরা পকিস্তানে সামরিক শাসনের কারণ জানতে চান। তাঁরা তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলেন। মন্ত্রী কোন সুস্পষ্ট বা গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে না পারায় হট্টগোল শুরু হয়; পন্ড হয়ে যায় জেনারেল মন্ত্রীর সভা। এমনিভাবে ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট এবং লৌহমানব বলে পরিচিত জেনারেল আয়ুবের পশ্চিম লন্ডনের আলবার্ট হলে আয়োজিত জনসভাও তাঁর বক্তৃতা শেষে প্রশ্নকারীদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার প্রতারণামূলক আশ্বাসের প্রেক্ষিতে অল্পের জন্য পন্ড হবার হাত থেকে রক্ষা পায়।[৩৪]

ষাটের দশক পর্যন্ত বিলাতে যে সকল প্রবাসী বাঙালি বসবাস করতেন তাদের মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা যায়। ছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী সম্প্রদায়।[৩৫] পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে লন্ডনে বাঙালি ছাত্রদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। উল্লেখিত দশকের শেষভাগ থেকে ষাটের দশকের প্রথম দিকে বহু বাঙালি ছাত্র লন্ডনে আসতে সমর্থ হয়।[৩৬] ষাটের দশকে বিলাতে বসবাসকারী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ দেশের পড়াশুনা সমাপ্ত করে বিভিন্ন পেশায় যোগদান করে বৃত্তি লাভ করে বিলাতে ছাত্র হিসেবে গিয়েছিলেন অথবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর সরাসরি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে গমন করেছিলেন। বিশেষ করে ষাটের দশকের শেষের দিকে ছাত্রদের মধ্যে যারা বিলাতে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষের রাজনৈতিক ভাবধারার অধিকারী। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত যে সব ছাত্র যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের স্বাধিকার আদায় ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগঠিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিনহাজ উদ্দিন, সুলতান মাহমুদ শরীফ, মওদুদ আহমেদ (ব্যারিস্টার), মাহমুদুর রহমান, আমিরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার), শরফুল ইসলাম খান, সুবিদ আলী টিপু, একরামুল হক, কবির উদ্দিন আহমেদ (ডক্টর), জাকারিয়া খান চৌধুরী, আফতাব উদ্দিন শাহ, আহমেদ হোসেন জোয়ার্দার, আজিজুল হক ভূঁইয়া, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, মোহাম্মদ ইসহাক, শামসুদ্দিন চৌধুরী (ব্যারিস্টার), শফিকুল হক, শেখ আব্দুল মান্নান, আনিস রহমান, শামসুল আবেদীন, আব্দুর রউফ (শিল্পী), সাখাওয়াত হোসেন (ব্যারিস্টার), সালাহ উদ্দিন (ব্যারিস্টার), এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, জিয়া উদ্দিন মাহমুদ (ব্যারিস্টার), সাইদুর রহমান (ব্যারিস্টার), গৌরাঙ্গ সাহা, শ্যামা প্রসাদ ঘোষ, আবুল হাসান চৌধুরী, খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর), এ. কে. নজরুল ইসলাম, আখতার ইমাম (ব্যারিস্টার), এলাহী (ডক্টর), শফিউদ্দিন মাহমুদ বুলবুল, লুৎফর রহমান সাহজাহান (ব্যারিস্টার), কামরুল ইসলাম, আমীর আলী, শফিক রেহমান, মিসেস আলেয়া রহমান, আবেদ হাসান, আবদুর রশীদ (ব্যারিস্টার), আবুল খায়ের (ব্যারিস্টার), আলমগীর কবির, ফজলে লোহানী, আবুল মনসুর, মেসবাহ উদ্দিন, মনোয়ার হোসেন (ডক্টর), বেলায়েত হোসেন (ডক্টর), ফজলে আলী, মনজুর মোর্শেদ, সামসুল আলম চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, আব্দুর রব, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

তৎকালীন বিলাতে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা সর্বাধিক থাকলেও তাদের রাজনীতি চর্চা করার সময় ও সুযোগ ছিল না। তথাপি পূর্ব পকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলা বিলাত প্রবাসী বাঙালি শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং স্বাধিকারের প্রশ্নে দেশের শ্রমিকদের সাথে তারা একাত্ম ছিলেন। শ্রমিকদের সংগঠিত করতে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুল মান্নান।[৩৮]

যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী মহিলাদের বেশিরভাগ গৃহিণী ও স্বল্প সংখ্যক ছাত্রী ও চাকুরিজীবী থাকায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তাদের মধ্যে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যাশা ও স্বাধিকারের চেতনা প্রবল ছিল। প্রবাসী মহিলাদের সংগঠিত করার ব্যাপার যাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে জেবুন্নেছা বখস, আনোয়ারা জাহান, লুলু বিলকিস বানু, মুন্নী সাহজাহান, জেবুন্নেসা খায়ের, ফেরদৌস রহমান, ডাঃ হালিমা আলম, সুরাইয়া বেগম, রাজিয়া চৌধুরী, রাবেয়া ভূঁইয়া, সুফিয়া রহমান, মনোয়ারা বেগম, বদরুন্নেছা পাশা, সাবেকা চৌধুরী, কুলসুম উল্লাহ, তাহেরা কাজী, শেফালী আনোয়ার, জোৎস্না হাসান-এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৯]

ষাটের দশকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বসবাস করতেন। যাঁরা এক সময় চাকুরী বা অন্য পেশায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে পরিশ্রমী, উৎসাহী, কর্মঠ ও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেশিরভাগই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা পরিচালনা করতেন। সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী গ্রোসারী ও ছোটখাট গার্মেন্টসের মালিক ছিলেন। ছাত্রদের পরই ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে বিলাতে প্রবাসী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রদের পরই এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় গ্রুপ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকাল থেকেই বিলাতে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া কিছু কিছু শিক্ষিত চাকুরিজীবী ব্যক্তিত্বও রাজনৈতিক অঙ্গণে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছাত্র জীবনের ইতি টেনে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁদেরকে স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীর আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ষাটের দশকে যে সব প্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবী-পেশাজীবী জাতীয়তাবাদী চেতনাসমৃদ্ধ, স্বাধিকার ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নে সোচ্চার ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'গ্রিন মাস্ক' রেস্তোঁরার মালিক আব্দুল মান্নান, 'তাজমহল' রেস্তোঁরার মালিক শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব আলী, 'এলাহবাদ' রেস্তোঁরার মালিক গাউস খান, 'কোহিণূর' রেস্তোঁরার মালিক আব্দুল হামিদ, 'ফুলবাড়ি' রেস্তোঁরার মালিক বি. এইচ. তালুকদার, 'মহাঋষি' রেঁস্তোরার স্বত্বাধিকারী, হাফিজ মজির উদ্দিন, হরমুজ আলী, নিজাম উদ্দিন ইউসুফ, এম. এ. রকীব, শামসুর রহমান, মতিউর রহমান, মিম্বর আলী, আবদুল মতিন, সোহেল ইবনে আজিজ, আতাউর রহমান খান, খালেক মজুমদার, আবদুল বারেক, আজিজুল হক খান, কনা মিয়া, হাজী নিসার আলী, আবুল বাসার, মোহাম্মদ ইসহাক, মিসেস রোজমেরী আহম্মেদ, ডক্টর প্রেমেন আড্ডি, তৈয়বুর রহমান, শামসুল হুদা হারুন, শামসুল মোর্শেদ, জগলুল পাশা, শওকত আলী, নিখিলেশ চক্রবর্তী, আরব আলী, আবদুল মতিন (ম্যানচেস্টার), সুনীল কুমার লাহিড়ী, জহীরুদ্দিন, রাজিউল হাসান রঞ্জু, রুহুল আমীন (ব্যারিস্টার), কিউ. এম. ই. হক, এ. এ. রশিদ, দেওয়ান মনরফ আলী, তারা মিয়া, আবদুর রহমান ওরফে মনাফ মিয়া, আবদুল মুতালিব চৌধুরী, তাহির আলী, সাইফুল্লাহ, শামসুল হক, শেখ আবদুল মন্নান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৪০]

তৎকালে বিলাতে প্রবাসী বাঙালি চিকিৎসকরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেশ সংগঠিত ছিলেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই বিলাতে বসবাসকারী চিকিৎসকরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবদান রাখার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই লন্ডন ভিত্তিক ও বিভিন্ন শহরে 'বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। চিকিৎসকদের সংগঠিত করার ব্যাপার যারা অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ মোশাররফ হোসেন জোয়ার্দার, ডাঃ আব্দুল হাকিম, ডাঃ সামসুল আলম, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদার, ডাঃ কাজী ও ডাঃ আহম্মেদ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৪১]

উক্ত দশকে সাংস্কৃতিক অঙ্গণেও যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা বজায় ছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ব্রিটেনে দু'টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তার মধ্যে একটি হলো মোহাম্মদ আলীর উদ্যোগে গঠিত 'বাংলাদেশ কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন'। আর 'বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ' নামে পরিচিত অন্য প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এনামুল হক (পরবর্তীকালে ডক্টর এনামূল হক)।[৪২]

ষাটের দশকে যেমনিভাবে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সোচ্চার ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লাভ করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে বিলাতে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন কর্মকান্ডে একই লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে ষাটের দশকে বিলাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ সাংগঠিত হতে দেখা যায়। যে সকল রাজনৈতিক দল সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে আওয়ামীলীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৩]

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকালে গাউস খান (মরহুম), মিনহাজ উদ্দিন, তৈয়াবুর রহমান, বি. এইচ. তালুকদার (মরহুম) সুলতান মাহমুদ শরীফ, হাজী আব্দুল মতিন, শামসুর রহমান, মতিউর রহমান, মিম্বর আলী, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আবুল আহসান, আহম্মেদ হোসেন জোয়ার্দার, মোহাম্মদ ইসহাক প্রমুখ সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী বিলাতে আওয়ামী লীগ গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আওয়ামী লীগ সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে আয়ুব বিরোধী জনমত সৃষ্টি করতে ভূমিকা রেখেছিলেন।[৪৪]

আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিলাত প্রবাসীদের কাছে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নাম সংগ্রামের অগ্নিমশাল হিসেবে চিহ্নিত ছিল। মাওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও সেই কারণে বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের আকৃষ্ট করেছিল এবং বিলাতের বিভিন্ন শহরে বিস্তারলাভ করেছিল। মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ বিলাতে সংগঠিত করার ব্যাপারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন কর্মীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমাজকর্মী শেখ আব্দুল মান্নান, আব্দুস সবুর, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদার, সাইদুর রহমান (ব্যারিস্টার), শ্যামা প্রসাদ ঘোষ (ডাকসুর প্রাক্তন ভি. পি.), নিখিলেশ চক্রবর্তী, এম ইয়াহিয়া (ব্যারিস্টার) প্রমুখ ন্যাপ সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ষাটের দশকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিলাত ভ্রমণে যান এবং বাঙালি অধ্যুষিত শহরগুলোতে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন। মাওলা ভাসানীর বিলাত ভ্রমণের ফলে বিলাতে ন্যাপের সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃতি লাভ করে। অবশ্য পরবর্তীতে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া বিলাতের ন্যাপেও বিস্তারলাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপ বিভক্ত হওয়ার ফলে তার প্রতিক্রিয়ায় বিলাতের ন্যাপেও বিভক্তি আসে। খায়রুল হুদা, মাহমুদ এ. রউফ, ডাঃ নূরুল আলম ও

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মোজাফফর পন্থী ন্যাপ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিলাত আন্দোলনে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখেন।[৪৫]

আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ছাড়াও বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কিছু কর্মী সক্রিয় ছিলেন। এঁদের মধ্যে তাসাদ্দুক আহমদ, ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেন, ব্যারিস্টার জিয়া উদ্দিন মাহামুদ, ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান সাহজাহানের নাম উল্লেখযোগ্য। তাসাদ্দুক আহমদ এককালীন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি লন্ডনের কেন্দ্রে অবস্থিত 'গঙ্গা' রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন; যা বিলাত প্রবাসী প্রগতিশীল কর্মীদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বর্তমানে গঙ্গা রেস্টুরেন্টের অস্তিত্ব আর নেই।[৪৬]

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"বিলাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল লন্ডন। তবে বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, লীডস, ব্রাডফোর্ট, কভেন্ট্রি, পোর্টসমাউথ, টিপটন, ওল্ডহাম, ইয়র্কশায়ার এবং যে সকল অঞ্চলে বাঙালিরা বসবাস করতেন সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক কমিটি সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া পেশাগত কিছু সংগঠন স্বাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন শহরে শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ বা সমিতি নামে অগণিত সংগঠন জন্মলাভ করে ষাটের দশকে। বিভিন্ন শহর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বাঙালি যুব ও ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে কিছু আঞ্চলিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে বার্মিংহামের জগলুল পাশা, আজিজুল হক ভূঁইয়া, তোজাম্মেল হক (টনি হক), আফরোজ মিয়া, ইসমাইল মিয়া, ম্যানচেস্টারের হাজী আবদুল মতিন, ইয়র্কশায়ারের মনোয়ার হোসন ও জহিরুল হক, ব্রাডফোর্ডের আবদুল মুসাব্বির তরফদার ও শরাফত আলী, লুটনের দবির উদ্দিন ও বোরহান উদ্দিন, সেন্টঅলবন্সের আবদুল হাই, গ্লাসগোর ডাঃ মোজাম্মেল হক, ডাঃ রফিউদ্দিন ও কাজী এনামুল হক, লীডসের মিয়া মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, খায়রুল বাশার, নর্থহাম্পটনের এ. এইচ. চৌধুরী, বি. মিয়া ও ইস্রাইল আলী, লেস্টারের নূর মোহাম্মদ খান, ল্যাংকাশায়ারের কবীর চৌধুরী, কভেন্ট্রির শামসুল হুদা চৌধুরী ও মতাছিম আলী, টিপটনের আলতাফুর রহমান ও আসব আলী এবং সাউথলের আবদুস সালাম চৌধুরী ও এম. ইউ. আহসান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে লন্ডন ভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দই ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয়ফ্রন্ট বলে খ্যাত বিলাত আন্দোলনের নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।"[৪৭]

ষাটের দশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে লন্ডন ভিত্তিক ও আঞ্চলিক এসব ছাত্র-ব্যবসায়ী-শ্রমিক-রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গড়ে তোলেন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন।

এ প্রসঙ্গে জাকারিয়া খান চৌধুরী বলেন ঃ

"১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আইনের ছাত্র আবদুর রশিদ (পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার-সংসদ সদস্য) যুক্তরাজ্য প্রবাসী ছাত্রদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্র গঠন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করি আমি, আমিরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার), আবদুর রব, আবদুর রাজ্জাক, নুরুল ইসলাম, কবীর উদ্দিন, ফজলে আলী প্রমুখ। এর সাথে যোগ দেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী । সেই সময় লন্ডন সফরে গিয়ে তিনি প্রগতিবাদী বাঙালি ছাত্রদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে বৈষম্যমূলক পাকিস্তানের ভাঙ্গনের সুর তোলেন। এ বক্তব্যে উৎসাহী হয়ে ছাত্ররা ছয়দিন ধরে বৈঠক করেন আমার বাসায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবির উদ্দিন আহমেদ, মনোয়ার হোসেন, নুরুল ইসলাম, আবদুর রশিদ, আবুল খায়ের খান, ফজলে আলী, সালাহউদ্দিন ও আলমগীর কবির। বাঙালি ছাত্রদের আলোচনার সারবস্তু হিসেবে বেরিয়ে আসে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই ছাত্র গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার লক্ষ্যে উভয় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যসমূহ তুলে ধরে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার উপর গুরুত্বারোপ করেন; যাতে বৃটেন প্রবাসী বাঙালিরা এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন। তাছাড়া বাঙালি প্রবাসীদের জন্য একটি নিজস্ব ভবনের ব্যবস্থা করার উপরও জোর দেয়া হয়। যাতে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সেখান থেকে কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়।"[৪৮]

১৯৬০ সালে লন্ডনে গঠিত হয় 'ক্যারটার্স এ্যাসোসিয়েশন'। ১৯৬৩ সালের ১৩ ও ১৪ এপ্রিল এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তানী এ্যাসোসিয়েশন ইন দি গ্রেট ব্রিটেন'।[৪৯]

১৯৬২ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্বসূরী' নামক এক সংগঠনের। এ প্রসঙ্গে জাকারিয়া খান চৌধুরী বলেন ঃ

"একদল প্রগতিশীল ছাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অব্যাহতভাবে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের জন্য স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় গ্রহণ করেন। 'পূর্বসূরি'র ইংরেজী নামকরণ করা হয় 'ইষ্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট'। এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা পরিচালিত হত অত্যন্ত গোপনে। 'পূর্বসূরি'র এ ধরণের ইংরেজী নামকরণের কিছু কারণও ছিল। ১৯৬৪ সালে আমি লন্ডনস্থ কিউবান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করি। কেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দরকার এবং এই আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কিউবার সহোযোগিতাদান কেন প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক আমি একটি দীর্ঘ দলিল তৈরী করি। এই দলিল আমি কিউবান দূতাবাসে হস্তান্তর করি। 'পূর্বসূরি' নামে বিভ্রান্ত দূতাবাস থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, সংগঠনের নামকরণ এমন হতে হবে যেন তাদের বোধগম্য হয়। আর এই বিদেশীদের বোঝার সুবিধার জন্যই নতুন নামকরণ করা হয়েছিল। আরো বেশ কিছুদিন পরে কিউবান দূতাবাস থেকে জানানো হয় যে, কিউবার

Dhaka University Institutional Repository

পার্টি আমাদের দলিল গ্রহণ করেছে। তাদের দেশ এই সংগঠনের কয়েকজন সদস্যকে কিউবায় প্রশিক্ষণ দিতেও প্রস্তুত আছে। এ সময়েই আবার দূতাবাসের কর্মকর্তা বদলি হয়ে যাওয়ায় আমাদের কর্মসূচির অগ্রগতি স্থিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু 'ইষ্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' গোপনে আমাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকি। কিউবার সাথে ফ্রন্টের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে সমাজতন্ত্রী নেতা তারিক আলীর মাধ্যমে।"[৫০]

পরবর্তী সময়ে লন্ডনে বসবাসকারী বাঙালি প্রবাসী রেস্টুরেন্ট মালিক ও সমাজকর্মীদের যৌথ প্রয়াসে উত্তর লন্ডনের হাইবারী হীলে 'পূর্ব পাস্তান হাউজ' নামে একটি বাড়ী ক্রয় করা হয়।[৫১]

পূর্ব পাকিস্তান হাউজ ঃ

ষাটের দশকে 'পাকিস্তান হাউজ'-এ অবস্থিত ছাত্র ফেডারেশনের বিভেদকে কেন্দ্র করে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ ও নির্যাতনের প্রশ্নে বাঙালি ছাত্রদের সাথে পাকিস্তানী ছাত্রদের বিরোধ তীব্র হয়।[৫২] জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মীদের সহযোগিতায় ১৯৬৪ সালে উত্তর লন্ডনের ৯১ নং হাইবারী হীলে 'পূর্ব পাকিস্তান হাউজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৩] পাকিস্তানী দূতাবাসের নানা হুমকি ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উপেক্ষা করে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ষাটের দশকে 'পূর্ব পাকিস্তান হাউজ' প্রতিষ্ঠা বিলাতের প্রবাসী বাঙালিদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানটি। পূর্ব বঙ্গের জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতার সপক্ষে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে সহয়তা করাই ছিল প্রতিষ্ঠাতাদের মূল উদ্দেশ্য।[৫৪] পাকিস্তানিরাও এই 'হাউজ' প্রতিষ্ঠাকে নিছক একটি বাড়ী ক্রয় হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। তাদের দৃষ্টিতে এই আলাদা 'হাউজ' প্রতিষ্ঠাকে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'পূর্ব পাকিস্তান হাউজ' পশ্চিম লন্ডনে অবস্থিত 'পাকিস্থান হাউজ'-এর বিকল্প এবং বাঙালিদের আলাদা অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালে এই 'হাউজ' ও তার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৫৫]

এ 'হাউজ' প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে জাকারিয়া খান চৌধুরী বলেন ঃ

"বাংলাদেশের স্বাধিকারের সংগ্রামে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে বিলেত প্রবাসীদের কাছে 'পূর্ব পাকিস্তান হাইজ' একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে 'এসিয়ান টাইড' (Asian Tide) শীর্ষক একটি ইংরেজী পত্রিকা এবং 'পূর্ব বাংলা' শীর্ষক একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইংরেজী পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ফজলে আলী ও নিজাম উদ্দিন ইউসুফ। বাংলা পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন আলমগীর কবির ও মেজবাহ উদ্দিন। কয়েক মাস পর আমীর আলী পত্রিকা দু'টির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে 'আনহ্যাপি ইস্ট পাকিস্তান' (Unhappy East Pakistan) শীর্ষক একটি ইংরেজী পুস্তিকা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। কবীর উদ্দিন আহম্মদ (পরবর্তীকালে ডক্টর এবং ক্রনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার) সম্পাদিত পুস্তিকাটি রচনার ব্যাপারে আমি সহয়তা করি। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যে জেনারেল আয়ুব খানের সফরকালে 'আইয়ুব এক্সপোজড' শীর্ষক একটি ইংরেজী পুস্তিকাও প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়।"[৫৬]

এ প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম বলেন ঃ

"তের-চৌদ্দটি কক্ষ বিশিষ্ট এই দোতলা বাড়িটির মূল্য ছিল দশ হাজার পাউন্ড।"[৫৭]

'পূর্ব পাকিস্তান হাউজ' প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছিল; যার সভাপতি ছিলেন, কিউ. এম. ই. হক, সম্পাদক এ. এ. এ. রশিদ এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান ও রিয়াজুল হক। যাদের অর্থ সহায়তায় এই 'হাউজ' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন হরমুজ আলী, নেছার আলী, তারা মিয়া, আব্দুর রহমান ওরফে মনাফ মিয়া, আব্দুল মোত্তালিব চৌধুরী, তাহির আলী, সাইফুল্লাহ, শামসুল হক, গাউস খান, সফি আহম্মদ ও তৈয়বুর রহমান প্রমুখ।[৫৮]

জাকারিয়া খান চৌধুরী আরও বলেন ঃ

"তৎকালে লন্ডনে উচ্চ শিক্ষার জন্য অবস্থানকারী ছাত্রদের মধ্যে আমার সাথে ডাঃ কবির উদ্দিন আহম্মদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মদ, আমীর আলী, শফিক রেহমান, মিসেস আলেয়া রহমান, আবেদ হাসান, ব্যারিস্টার আবদুর রশিদ, ব্যারিস্টার আবুল খায়ের, আলমগীর কবির, ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান সাহজাহান, ফজলে লোহানী, আবুল মনসুর, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ফজলে আলী এবং আবিদ হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।"[৫৯]

এ রকম একটি ভবনের নাম 'পাকিস্তান ভবন' না হয়ে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ' করায় পাকিস্তান হাই কমিশন পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা নিশ্চয়ই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে সমর্থ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, "পাকিস্তান হাই কমিশনের ফাস্ট সেক্রেটারি জুলফিকার আলী লন্ডনে একটি রেস্টুরেন্টে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবাসীর সাথে

Dhaka University Institutional Repository
দেখা করে এ ঘটনায় পাকিস্তান সরকারের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার মনে করে এই 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ' হবে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনের বীজ।"[৬০]

এ প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম বলেন ঃ

"জেনারেল ইউসুফ পরবর্তী হাইকমিশনার আগা হেলালী ছিলেন এক জাঁদরেল আমলা; তিনি 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ' এবং পূর্ব বাংলার প্রতি ছিলেন খড়্গহস্ত। তিনি বৃটেনে অবস্থানরত বাঙালি ছাত্রদের ডেকে এই বলে হুঁশিয়ার করে বলেন, "যারা ইস্ট পাকিস্তান হাউস'-এর সাথে সম্পর্ক রাখবে তাদের পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দেয়া বৃত্তি বন্ধ করে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের নাম ইত্যবসরে হাইকমিশনের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে।" তাই ১৯৬৬ সালে দেশে যাওয়ার পর ফেডারেশনের সম্পাদক হিসেবে আমি এবং আমার সাথে আরো কয়েকজন গ্রেফতার হই। কিন্তু তাতেও আমাদের আন্দোলনকে রুদ্ধ করতে পারে নি পাকিস্তানী জেনারেল বা আমলা, হাইকমিশনার কেউই।"[৬১]

পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ও যুব সমিতি ঃ

১৯৭১ সালে বিলাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারকার্যে প্রবাসী ছাত্ররা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। ষাটের দশকে বাঙালি ছাত্ররা 'পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন' এবং এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন ছাত্র সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হতে থাকেন। লন্ডনের 'পাকিস্তান হাউজ'-এ অবস্থিত ছাত্র ফেডারেশন যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি ছাত্র সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই ছাত্র ফেডারেশনের স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের দাবী জোরদার করার লক্ষ্যে বাঙালি ছাত্ররা বিলাতে ঐক্যবদ্ধ হয়। বাঙালি ছাত্রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনে মাহমুদুর রহমান, আমিরুল ইসলাম, শরফুল ইসলাম খান, সুবিদ আলী টিপু ও একরামুল হক প্রমুখ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬২] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের বৈঠক বাতিল ঘোষণার প্রতিবাদ করার জন্য পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের এক সভায় পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বের সাথে বাঙালি সদস্যদের মতোবিরোধ হয়। পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সংহতির জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে নিন্দার প্রস্তাব নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং অপ্রীতিকর ঘটনায় পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি বাঙালি (একরামুল হক) হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ফেডারেশনের মাধ্যমে উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি। এর ফলশ্রুতিতে বাঙালি ছাত্রদের অনাগ্রহের কারণে পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতোদ্দেশ্যে 'পাকিস্তান যুব সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাতে শুধু বাঙালি ছাত্র ও যুবকদের সদস্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"এই উদ্যোগে আমি সহ অন্য যাঁরা সম্পৃক্ত ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, সুলতান মাহমুদ শরীফ, এ. কে. নজরুল ইসলাম, আহমেদ হোসেন জোয়ার্দার, এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, মঞ্জুর মোর্শেদ, শামসুল আলম চৌধুরী, জিয়া উদ্দিন মাহমুদ, লুৎফর রহমান শাহজাহান, আখতার ইমাম, শফিউদ্দিন মাহমুদ বুলবুল, শামসুল আবেদীন, আনিস আহমেদ, এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত সংগঠনের উদ্যোক্তা সদস্যদের পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্র বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।"[৬৩]

ষাটের দশকের প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে লন্ডনে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। তৎকালীন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে মতামত প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে লন্ডনের বালহাম এলাকার ২নং টেম্পারলি রোড থেকে 'জনমত' (১৯৬৯) নামে একটি পরিপূর্ণ সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। এককালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, ভাসানী পন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং পরবর্তীকালে সংসদ সদস্য এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ পত্রিকাটির প্রকাশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন আনিস আহমেদ। 'জনমত' ছাড়াও ষাটের দশকে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। শেখ আব্দুল মান্নানের সম্পাদনায় বামপন্থী চিন্তাধারার বাহক হিসেবে অর্ধ-সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'মশাল' (১৯৬৯) 'সাপ্তাহিক শিখা' (১৯৬৯) ও মাসিক 'পদ্মা' (১৯৬৮-৭১) নামক পত্রিকা। এ তিনটি পত্রিকার সাথেও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছেলেন এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ। ইতোপূর্বে অবশ্য কিছু অনিয়মিত 'প্রচারপত্র' ও 'বুলেটিন' স্বাধিকারের সপক্ষে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করে।[৬৪]

তৎকালীন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন অর্জন তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। এর প্রধান কারণ, তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ অংশ ব্যয় করেছেন। অভিষ্ট লাভের পর তা' ধ্বংস করা অযৌক্তিক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্রসম্মত আবেদন-নিবেদন এবং প্রয়োজন মতো গণআন্দোলনের মধ্যমে পূর্ব বঙ্গের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীকে রাজী করানো সম্ভব হবে।[৬৫]

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সুদূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, শুধু আবেদন-নিবেদন ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গের দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। সামরিক শাসনের উৎখাত ছাড়া সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বীজ উপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী বলে প্রমাণ করেন।"[৬৬]

তৎকালীন 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের পরিচালক বোর্ডের সদস্য বজলুর রহমান রচিত, 'একটি ঐতিহাসিক বৈঠক' প্রবন্ধের সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন বলেছেন, ১৯৬১ সালের শেষের দিকে 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন মিয়ার বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মনি সিংহ, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য খোকা রায় এবং 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া)-র সাথে আলোচনাকালে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন এবং শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন- এই চারটি জনপ্রিয় দাবির সাথে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার দাবিটি আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখার প্রস্তাব রেখে বলেন, "গরীবের কথা বাসী হলে ফলে।"[৬৭]

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন ঃ

"১৯৬২ সাল থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কথা উকি দিচ্ছিল এবং এ ধারণা তিনি (বঙ্গবন্ধু) পোষণও করতেন।"[৬৮]

১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের প্রায় দু'মাস পর (সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে) শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কার্যকর করার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন। তিনি স্থির করেন, পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের পরিবর্তে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী লন্ডনে পৌঁছানোর পর তিনি বাংলাদেশের জন্য অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার (Revoulutionary Goverment of Bangladesh) গঠন করবেন। এরপর তিনি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানাবেন। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাহয্য সবচেয়ে বেশী জরুরী বলে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া যাবে কি-না তা' জানার জন্য তিনি ঢাকার নিয়োজিত ভারতীয় কনসুলার অফিসার শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জীর সাহয্য গ্রহণ করেন।[৬৯]

১৯৯১ সালের জুন মাসে এবং ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রদত্ত দু'টি সাক্ষাৎকারে শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জী আবদুল মতিনকে বলেন, তৎকালে (১৯৬২ সাল) নিয়োজিত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সৌর্য কুমার চৌধুরী, গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান শৈলেশ চন্দ্র ঘোষ এবং শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জী তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া)-র বসার ঘরে আলোচনাকালে শেখ মুজিব লন্ডনে গিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত পরিকল্পনার কথা বলেন। উল্লেখিত বৈঠকে সৌর্য কুমার চৌধুরী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁকে (শেখ মুজিব) ভারতের মনোভাব জানানো হবে।" তিনি আবদুল মতিনকে আরও জানান, কিছুকাল পর দিল্লীতে গিয়ে সৌর্য কুমার চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন (পন্ডিত নেহেরু একই সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন)। মিঃ চৌধুরী ঢাকায় ফিরে এসে মিঃ ব্যানার্জী ও কর্নেল ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে মানিক মিয়ার বাড়িতে গিয়ে শেখ মুজিবকে ভারতের এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন যে, দিল্লীর উচ্চতম মহলে আলোচনার পর স্থির করা হয়, ভারত-চীন যুদ্ধের অব্যবহিত পর ভারতের সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে এত বড় দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না। ভারতের সমর্থন পেতে হলে গণআন্দোলনের মাধ্যমে শেখ সাহেবকে প্রমাণ করতে হবে দেশের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি চায়, তারা স্বাধীনতা চায় এবং তাঁকে (শেখ সাহেবকে) স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি কাঠামোও তৈরী করতে হবে। এরপর সভা-সমিতিতে বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ উত্থাপনের পাশাপাশি পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথাও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রচার করতে হবে। সরাসরি স্বাধীনতা শব্দটির পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন শব্দ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। গণআন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছানের আগে সমর্থন জানালে ভারত একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমর্থন করছে বলে অভিযোগ করা হবে।[৭০]

স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে অবিলম্বে ভারতের সমর্থন ও সহায়তা না পাওয়ার ফলে শেখ সাহেব অসন্তুষ্ট হন। এই ব্যর্থতার জন্য তিনি ভারতীয় আমলাতন্ত্র বিশেষ করে ডেপুটি হাই কমিশনার ও তাঁর সহকর্মীদের দায়ী বলে মনে করেন। এরপর তিনি (শেখ মুজিব) প্রভাবশালী ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে পন্ডিত নেহেরুর সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে গোপনে আগরতলায় গিয়ে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ভারতের মনোভাব জানতে চান। তিনি ভবিষ্যৎ সংগ্রামে ভারত সরকারের সমর্থন ও সহোযোগিতা পাওয়ার আশা করেন।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে শচীন্দ্র লাল সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে সাহিত্য প্রকাশের কর্ণধার মফিদুল হক ভারত-চীন যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে বঙ্গবন্ধুর আগরতলা সফরের কথা উল্লেখ করেন। মফিদুল হকের অনুরোধে তিনি (শচীন্দ্র লাল সিংহ) তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য লিখে দেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত বক্তব্য উপলক্ষ্যে সচীন বাবু বলেন, "........মুজিব ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করি।............তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া (প্রচার চালানোর অনুমোতি দিতে) সম্মত হন নাই। কারণ, চীনের সাথে লড়াইয়ের পর এতো বড় ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি (শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।"[৭২]

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭১ সালে গঠিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের নেতা ও তৎকালীন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন আতিকুর রহমানকে বলেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন, "বঙ্গবন্ধু আগরতলায় গিয়ে বৈঠক করেছেন, এটা মিথ্যা নয়"। "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলাতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন বাবুর সংগে খেতে বসেছিলাম আমি ও আবদুর রব। শচীন বাবু স্বীকার করেছেন, বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন।"[৭৩]

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে জেনেভার 'লা রিজার্ভ' হোটেলে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু আবদুল মতিনকে বলেন, "তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে, আয়ুব বিরোধী সংগ্রামের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি গোপনে আগরতলা গিয়েছিলেন। এই বিপদসংকুল সময় সম্পর্কে কয়েকটি গোপন তথ্য উল্লেখ করেন তিনি বলেন, সময়-সুযোগ মতো তিনি এসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করবেন।"[৭৪]

১৯৬৪ সালে লন্ডন সফরকালে শেখ মুজিবুর রহমান তাসাদ্দুক আহমদের সাথে পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলাপ করেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন। ওয়েষ্ট এন্ডের গুজ স্ট্রিটের নিকটবর্তী তৎকালীন কেরাটার্স এ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এই আলাপ অনুষ্ঠিত হয়। তাসাদ্দুক আহমদের ভাষায়, "১৯৬০ সালে ঢাকায় তিনি (শেখ মুজিব) আমাকে আগরতলা থেকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দেন, তারই পুনরাবৃত্তি করেন তিনি।" এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার শত্রুপক্ষ টের পেলে তিনি (শেখ মুজিব) বিপদগ্রস্ত হবেন আশঙ্কা করে আবদুল মতিন ও তাসাদ্দুক আহম্মদ এ সম্পর্কে কারোর সঙ্গে আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[৭৫]

পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন সামনে রেখে বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা যখন পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ঘটে আরেকটি বিয়োগান্তক ঘটনা। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে ঢাকায় হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে লন্ডনের 'সেন্ট প্যানক্রাস টাউন হলে' প্রতিবাদ সভার আহবান করা হয়। সেই সভায় দুই হাজার বাঙালির উপস্থিতি ঘটে বলে নুরুল ইসলাম বলেছেন। উদ্যোক্তারা বৃটেনের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত সমস্ত বাঙালিদের একত্রিত করে পাকিস্তান সরকারের এই ফ্যাসিস্ট আচরণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন।[৭৬] ১৯৬৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনেও প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বিরুদ্ধে একটি প্রচারপত্র বিলি করে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা।[৭৭]

এমন অবস্থায় পাকিস্তানের সামরিক চক্র পাকিস্তানী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার আশায় শেষ উপায় হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ যুদ্ধে (১৯৬৫) থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া গেল না বরং এর পরিবর্তে এ ক্ষতিকর যুদ্ধ রাষ্ট্রকে সমস্যার গোলকধাধায় নিমজ্জিত করে, যা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করেন 'শক্ত মানব' আয়ুব খান। এ যুদ্ধে এযাবৎ অজ্ঞাত সেই সত্যটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে যে, পাকিস্তানের তথাকথিত অপরাজেয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত প্রান্তিক ও নাজুক অবস্থানে ছিল। এ সত্য উদঘাটন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পাকিস্তানের জনগণকে বিশেষভাবে মর্মাহত করে, কারণ এদের প্রদত্ত কর থেকেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাবদ খরচের বৃহত্তর অংশ আসত। পূর্ব পাকিস্তান ইতোমধ্যই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অবদমনের কারণে অত্যন্ত অসুখী ছিল এবং এর সাথে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো যুক্ত হয় প্রতিরক্ষাহীনতার বিষয়টি। এর ফলে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং সকল শ্রেণীর জনগণ তথা রাজনীতিক, পেশাজীবী, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকগণ সমভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। উদ্ভূত সংকট উত্তরণের জন্য এবং রাষ্ট্রকে অংশীদারিত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে তথা পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব একটি ফর্মূলা নিয়ে এগিয়ে আসে। এটি ছিল ছয় দফা সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন ফর্মূলা। এ ফর্মূলার স্থাপতি শেখ মুজিবুর রহমান একে যথাযথভাবেই বাঙালিদের মুক্তি সনদ বলে অভিহিত করেছিলেন।[৭৮] যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরাও ছয় দফাকে তাদের মুক্তিসনদ হিসেবে গণ্য করেন। পাকিস্তান যুব ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সুলতান মাহমুদ শরীফ এবং ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা যুক্তভাবে ছয় দফা সম্পর্কিত দলিল ছাপিয়ে সমগ্র যুক্তরাজ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন সভাপতি সুবিদ আলী টিপু ও পাকিস্তান যুব ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আফতাব উদ্দিন শাহ্ সহযোগিতা করেন।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চাভিলাষী সেনাবাহিনী ও আমলতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্ব স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে তথা সুবিচার, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে নবায়িত অংশীদারিত্বের উপর পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত মুজিবের স্বায়ত্তশাসন তত্ত্বকে পূর্ব পাকিস্তানের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার পদক্ষেপ বলে গণ্য করলো। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের দাবি খারিজ করা এবং এ দাবি নিয়ে আন্দোলনকারী নেতাদের কারারুদ্ধ করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হয়রানিমূলক বিচারের ব্যবস্থা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে তারা মনে করলো। সারা বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা সম্ভবত একঘেয়ে শান্তির পরিবেশের চেয়ে দমনমূলক পরিবেশে অধিকতর ভালো কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেন। যুগমানব হিসেবে আভির্ভূত শেখ মুজিবুর রহমানের এমন কিছু গুণ ছিল যা তাকে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী করেছিল। বাংলার জনগণ তাঁকে অত্যন্ত স্বদেশভক্ত ও সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন একজন নেতা বলে গ্রহণ করে। কারণ তাঁর মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছিল এমন একজন বিরল ধরনের নেতাকে, যিনি ছিলেন সাহসী, বিচক্ষণ, আত্মপ্রত্যয়ী, আপোষহীন, অনমনীয়, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী, দরদী ও অবিচল। আয়ুব এবং আয়ুব পরবর্তী দমনমূলক রাজনীতিতে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি আভির্ভূত হন। তাঁর কণ্ঠস্বর তথা আওয়ামী লীগের কণ্ঠস্বর অচিরেই সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি কেবল আওয়ামী লীগ নয়, সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। এক স্বতঃস্ফুর্ত গণঅভিষেক অনুষ্ঠানে মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপধি প্রদান করা হয়। এটি ছিল নেতার প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন।[৮০]

১৯৬৮ সালের তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে আয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। মামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রধানত বাঙালি ছাত্ররা লাউন্ডস স্কোয়ারে আবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশন দখল করেন। বিক্ষোভকারী ছাত্ররা শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ঘোষণা করেন এবং অবিলম্বে তাঁর মুক্তির দাবি জানান। যুক্তরাজ্যে যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত একটি প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে সাত-আট হাজার বাঙালি হাইড পার্ক থেকে পাকিস্তান হাইকমিশনে গিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। এই প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয়া ও হাই কমিশন দখল করার ব্যাপারে অংশগ্রহণের জন্য আনিস আহমদকে জুলাই মাসের প্রথম দিকে (সম্ভবত ৮ জুলাই) পাকিস্তান হাইকমিশনের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তখন পর্যন্ত এটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ মিছিল। এরপর আরো কয়েকটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে ছিলেন এম. এ. রকীব, মিম্বর আলী ও সুলতান মাহমুদ শরীফ। একটি মিছিলের পর সুলতান মাহমুদ শরীফ হাইকমিশন থেকে পাকিস্তানী পতাকা সরিয়ে ফেলে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। এই কালো পতাকার ফটো ও প্রতিবাদ মিছিলের সংবাদ ১৯৬৯ সালের ৩ ফ্রেব্রুয়ারী 'দি টাইম্স' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়।[৮১]

ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতিবাদ মিছেলের পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আলোচনা করে বক্তব্য নির্ধারণ করার জন্য পরপর দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের হাসেল স্ট্রিটে হাফিজ মজির উদ্দিনের দোকানে প্রথম সভা এবং দক্ষিন-পশ্চিম লন্ডনে আবদুল মান্নানের 'গ্রিন মাস্ক' রেস্তোঁরায় দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সর্ব প্রকার সাহায্যদানের জন্য একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করা হয়; যার নামকরণ করা হয় "শেখ মুজিব ডিফেন্স ফান্ড"।[৮২] এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আবদুল মান্নান, মিনহাজ উদ্দিন সম্পাদক এবং হাফিজ মজির উদ্দিন ছিলেন কোষাধ্যক্ষ।[৮৩] ডিফেন্স কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরীফ, ব্যারিস্টার সালাহউদ্দিন, সুবিদ আলী টিপু, ওয়ালী আশরাফ, আনিস আহমেদ, আবদুল বারেক, খালেক মজুমদার, আজিজুল হক খান, মিম্বর আলী, শামসুর রহমান, এম. এ. রকীব, মতিউর রহমান ও কনা মিয়া।[৮৪]

ফান্ডের জন্য সেদিন যে সব প্রবাসী বাঙালি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের একটি তালিকা দিয়েছেন নূরুল ইসলাম। এঁরা হলেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে ইসরাইল মিয়া, সিফাত উল্লাহ, শফিক মিয়া, আহন্দর মিয়া, আবদুল রকীব, মিম্বর আলী, মতিউর রহমান চৌধুরী, সিরাজ খান, আবদুল আহাদ, আবদুল গণি, আবদুল মছব্বির, সাইফুল্লাহ, সৈয়দ আবদুল মতিন, জয়তুন মিয়া, আবদুর রহমান, এ. কে. এস. চৌধুরী, আবদুল বারী, সৈয়দ মাহমুদ আলী, ইসমাইল মিয়া, গোলাম মোস্তফা, এম. এ. চৌধুরী, বশীরউদ্দিন ও নজব মিয়া, জাকারিয়া খান চৌধুরী, সবিদ আলী টিপু, সালাহউদ্দিন, ওয়ালী আশরাফ, আমিন আহম্মেদ, সুলতান মাহমুদ শরীফ, মোহাম্মদ ইসহাক, আবদুল গফুর, কনা মিয়া ও দদরিছ আহমেদ।[৮৫]

শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য কমিটি ব্রিটেন থেকে একজন কৌঁসলি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮৬] জাকারিয়া খান চৌধুরী ও মিনহাজ উদ্দিন বিলাতে বিশিষ্ট আইনজীবীদের সাথে কথা বলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৮৭] 'তাজমহল' রেস্তোরার মালিক আইয়ুব আলীর সৌজন্যে কেনসিংটন হাই স্ট্রিট এলাকার ১ নম্বর এডিংটন রোডে ডিফেন্স কমিটির অফিস স্থাপন করা হয়। অফিস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুলতান মাহমুদ শরীফ।[৮৮]

ডিফেন্স কমিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের সংবাদপত্র এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সাহায্যে এগিয়ে এলো মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ১৯৬৮ সালের ২৬ জুলাই তারিখে বিলাতের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস্ কিউ. সি. এম. পিকে প্রবাসী বাঙালিরা শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে ঢাকায় পাঠান।[৮৯] মিনহাজ উদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে মজনু-নুল হককে বলেছেন বলে আব্দুল মতিন উল্লেখ করেছেন, "অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এর মাধ্যমে আমরা ব্যারিস্টার নিযুক্ত করলাম। (এজন্য) অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমি বারো শ' পাউন্ড যোগাড় করলাম। মিসেস মুজিব জায়গা-জমি বিক্রি করে সেই সময় বিশ হাজার টাকা জোগাড় করলেন এবং সেই টাকা আমার কথামতো চিটাগাং-এর একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা দেয়া হলো। আগরতলা কেসে আমার নিজ পকেট থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড খরচ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকে। ইতোমধ্যে লন্ডনে এক রেস্তোঁরায় ছোট-খাটো একটা প্রেস কনফারেন্স করা হলো। আগারতলা কেস সম্পর্কে এবং আমরা যে শেখ মুজিবকে ডিফেন্ড করার জন্য ব্যারিস্টার পাঠিয়েছি লন্ডন থেকে তাও বলা হলো। পরের দিনই খবরের কাগজে আমাদের ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়।"[৯০]

ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিরা শুধু আইনজীবী পাঠিয়েই বিরত থাকেন নি। তাঁরা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর একের পর এক চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। সথে সাথে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করারও প্রয়াস চালানো হয়। ১৯৬৮ সালের ১৪ জুলাই তারিখে লন্ডনের রাস্তায় নামে কয়েক হাজার বাঙালি। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে লন্ডনের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত শ্লোগান তোলেন তাঁরা। এর আগে তাঁরা জনসভা করেছেন হাইড পার্ক কর্নারে। হাইড পার্ক থেকে প্রবাসী বাঙালিরা শোভাযাত্রাসহ আসেন পাকিস্তকান হাইকমিশনে। সেখানে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। তার পর জ্বলে ওঠে আগুণ। ভস্মীভুত করা হয় আয়ুবের কুশপুত্তলিকা এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'Friends, Not Masters.' এই কর্মসূচিতে বৃটিশ এবং বিশ্ববাসীর কাছে আয়ুবের স্বরূপ উদঘাটিত হতে শুরু করে। এই বিক্ষোভ মিছিল পন্ড করার জন্য পাকিস্তান হাইকমিশন পাঞ্জাবিদের ভাড়াটিয়া হিসেবে হাইকমিশনে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারাও সেদিন বাঙালিদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে নি। পরবর্তীকালে অবশ্য তারা হাইকমিশনের পাশে স্টুডেন্টস হোস্টেলে বাঙালি ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাতে জাকারিয়া খান চৌধুরী আহত হন।[৯১]

১৯৬৮ সালের ২১ জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব আসেন লন্ডনে। তিনি লন্ডনে অবকাশ যাপন করবেন; এ সংবাদটি গোপন রাখার চেষ্টা করে হাইকমিশন। কিন্তু সেই দিনই বাঙালিরা সংবাদ পেয়ে রাজপথে "আয়ুব খান নিপাত যাক", "শেখ মুজিবের মুক্তি চাই" শ্লোগানে মুখরিত করে তোলেন লন্ডন শহর। ক্লারিজেস হোটেলে আয়ুবের অবস্থান জানার পর বাঙালিরা হোটেল ঘেরাও করলে গোপনে পালিয়ে তিনি ক্রয়ডন শহরের সেলসডন হোটেলে আশ্রয় নেন। ২৭ জুলাই বাঙালিরা খবর পেয়ে মশাল মিছিল সহকারে গিয়ে সন্ধ্যা থেকে সারা রাত উক্ত হোটেলে ঘেরাও করে রাখেন আয়ুবকে। মিছিলের নেতৃত্বে জাকারিয়া খান চৌধুরী, মিনহাজ উদ্দিন ও সুবিদ আলী টিপু ছিলেন বলে নুরুল ইসলাম এবং জাকারিয়া খান চৌধুরী সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।[৯২]

এভাবে প্রবাসীরা বাংলা ও বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের অর্থে প্রেরিত ইংরেজ ব্যারিস্টারের ভূমিকা ব্যতীত বঙ্গবন্ধুর যে কি অবস্থা হতো তা ভাবাও দুষ্কর। এক সাক্ষাতকারে নুরুল ইসলামকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "তা না হলে যা হতো, তা একমাত্র আল্লাই জানেন"।[৯৩]

দেশে-বিদেশে প্রচন্ড আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে আয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পর শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হন। শুধু তাই নয় এ আন্দোলনের ফল হিসেবে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন এক দশকের স্বৈরশাসক সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধু লন্ডন প্রবাসীদের এই প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি (বঙ্গবন্ধু) লন্ডন সফরে আসেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা একটি কমিটি গঠন করেন; যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন গাউস খান।[৯৪] হিথ্রো বিমান বন্দরে পাঁচশ' বাঙালি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং ২ নভেম্বর বার্মিংহাম শহরের "ডিগবেথ সিভিক" হলে সহস্রাধিক লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু।[৯৫] লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাসাদ্দুক আহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জেরার্ড স্ট্রিটে তাঁর রেস্তোরা 'দা গ্যাঞ্জেস'-এ যান। বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পর তাসাদ্দুক আহমদ তাঁর সহকর্মী আবদুল মতিনকে বলেন, পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র সংগ্রামের কথা চিন্তা করছেন। তাঁর (বঙ্গবন্ধু) স্পষ্ট অভিমত রক্তাক্ত সংগ্রাম এড়ানো যাবে না। এই সংগ্রামে কার সাহায্য পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (বঙ্গবন্ধু) তাসাদ্দুক আহমেদকে বলেন, "যে কেউ সাহায্য করবে তারই সাহায্য নেব।"[৯৬]

বঙ্গবন্ধু ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের রাজনৈতিক চেতনাবোধ দেখে অভিভূত হয়ে যান। তিনি সেখানে আওয়ামী লীগের শাখা গঠনেরও পরামর্শ দেন। ১৯৬৯ সালের ৬ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু লন্ডন ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর (বঙ্গবন্ধু) নির্দেশ কার্যকর করতে ১৯৭০ সালের এপ্রিলে গঠিত হয় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শাখা। গাউস খান এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনীত হন। দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের 'ফুলাউড়া' রেস্তোঁরার মালিক বি. এইচ. তালুকদার সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়োজিত হন। পরবর্তীকালে লন্ডন অওয়ামী লীগ গঠিত হয়; যার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত হন যথাক্রমে মিনহাজ উদ্দিন ও সুলতান মাহমুদ শরীফ। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পরিচালনা করেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমানের জামাতা এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী)-এঁর সদ্য প্রয়াত স্বামী বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী ড. এম. ওয়াজেদ মিয়া। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও তথায় উপস্থিত ছিলেন।[৯৭]

অবশ্য আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখা গঠিত হওয়ার আগেই সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যয় নির্বাহের উপায় নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য ১৯৭০ সালের ৮ মার্চ এক সভা আহবান করা হয়। 'মোগলশাহী' রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন গাউস খান। সভায় গঠন করা হয় একটি নির্বাচনী তহবিল। তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে যে টীম গঠন করা হয়েছিল তার একটি তালিকা সাপ্তাহিক 'জনমত'- এর সূত্র উল্লেখ করে তাজুল মোহাম্মদ দিয়েছেন। সদস্যবর্গ ছিলেন মিম্বর আলী, সমরু মিয়া, গফুর মিয়া, আবদুর রব চৌধুরী, এম. এ. রকীব, কবির উদ্দিন, হাজী মজির উদ্দিন, তৈয়বুর রহমান, আবুল বশার, সিরাজুল হক, মকবুল আলী, তাহির আলী, মকসন্দর আলী, আবদুল আজিজ চৌধুরী, আবদুর রহিম, আতাউর রহমান (১), আতাউর রহমান (২), আবদুল মান্নান (ছনু মিয়া) (১), শেখ আবদুল মান্নান (২), আবদুল করিম, ইয়াওর মিয়া, গাউস খান, বি. এইচ. তালুকদার, মইনুদ্দিন আহমেদ, আবদুল হামিদ, হাজী ছুরতুর রহমান, রমজান আলী, বশির উদ্দিন, শফিকুর রহমান, ইসমাইল মিয়া ও গোলাম মোস্তফা চৌধুরী।[৯৮] এই তাহবিলে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় এবং তা প্রেরিত হয় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী তহবিলে। এ প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম লিখেছেন, যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুকে একটি ল্যান্ডরোভার গাড়িও কিনে দিয়েছিলেন।[৯৯]

সে সময় বহু লন্ডন প্রবাসী বাঙালি আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করার জন্য দেশে যান। ন্যাপের পক্ষে কাজ করার জন্যও দেশে গিয়েছেন অনেকে। আবার যারা দেশে যান নি তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার পরামর্শ দিয়ে দেশে আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি লিখতে থাকেন। এভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার চিঠি দেশে যেতে থাকে। সে সময় অনেক সাধারণ প্রবাসী বাঙালি চিঠির ঠিকানা লেখার জন্য শিক্ষিত লোকদের কাছে লাইন দিতেন। প্রত্যেক চিঠিরই মূল বক্তব্য, ভোট দেয়া আওয়ামী লীগকে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপকে।[১০০]

১৯৭০ সালে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে যখন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের দূর্গত জনগণের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে বিমাতাসূলভ মনোভাবের পরিচয় দিলেন তখন বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা সাহায্যের হাত পেতে বিশ্ব দরবারে পাকিস্তানী শাসকদের আসল চেহারা উন্মোচন করে দিতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ও দূতাবাসসমূহে বাঙালিরা লবিং করে পাকিস্তান প্রশাসনের অবহেলার কথা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তনী শাসকগোষ্ঠীর এহেন মনোবৃত্তির পরিচয় বৃটিশ সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে বাঙালিদের প্রতি সংবেদনশীল করে গড়ে তুলতে নানা প্রচারপত্রসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই কাজে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বিবিসি বাংলা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে সিরাজুর রহমান, শ্যামল লোধ, কমল বোস, এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফসহ বিলাতে অধ্যয়নরত কিছু ছাত্র বিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের সংবেদনশীল মনোভাবের ফলে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় বিলাতের পত্র-পত্রিকা পাকিস্তান প্রশাসনের সমালোচনামূখর ছিল; যার ফলে বৃটিশ জনমত বাঙালিদের পক্ষে সৃষ্টি হয়েছিল।[১০১]

সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ১৯৭০ সালে নির্বাচনে মেতে ওঠেন। বৃটেন প্রবাসী বাঙালিরাও বাংলার স্বার্থ রক্ষাকারী দল আওয়ামী লীগকে জয়ী করার লক্ষ্যে তাদের প্রয়াস নিয়োজিত করেন এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অগ্রসর করে নিতে থাকেন। কয়েক বছর ধরে ছয় দফা আন্দোলন, ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করার প্রয়াস ইত্যাদি চালিয়ে গেলেও তাঁরা মূল লক্ষ্য স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে যান নি। এসব আন্দোলন সংগ্রামের সাথে তাঁরা ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টকেও অগ্রসর করে নেন এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় একরামুল হকের বক্তব্যে। ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর বৃটেনস্থ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি একরামুল হক পূর্ব লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'জনমত'কে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বলে তাজুল মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেন, "অবিলম্বে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য দূরীকরণ না করা হলে আমাদের জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।"[১০২]

স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিও চলছিল বৃটেনে। প্রায় এক দশক গোপনে কাজ করার পর এই গ্রুপ ১৯৭০ সালের শেষের দিকে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় স্বাধীনতার জন্য। ঐ বছর ২৯ নভেম্বর বার্মিংহাম শহরের ডিগবেথ সিভিক হলে এই গ্রুপ একটি পাবলিক মিটিং আহবান করে। সেই সভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৫ সালের ২৭ জুন লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে ইসমাইল আজাদ (উদ্যোক্তাদের একজন) তাজুল মোহাম্মদকে বলেন, সেই সভায় কয়েক হাজার বাঙালির সমাগম হয়েছিল।[১০৩] তবে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রে সন্নিবেশিত রেজুলেশন কপিতে দুই হাজার লোকের উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে।[১০৪] সভায় বক্তৃতা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক নেতা তারিক আলী। তিনি বলেন, "The step taken by the East Pakistan Libaration Front will be an example to the whole of Asia."

Dhaka University Institutional Repository

"During the British rule in India, it was commonly said that, What Bengla thinks today, the rest of India thinks tommorow." সভায় সভাপতি আজিজুল হক ভূঁইয়া অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আহবান জানান।[১০৫] 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নিউজ' নামে প্রকাশিত দলিলপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তাজুল মোহাম্মদ বলেছেন, এটা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কিছু ছাত্র ও শ্রমিক দ্বারা গঠিত একটি বিপ্লবী সংগঠন। এই সংগঠনের মূলমন্ত্র হলো পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্ত করা ও পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা। উক্ত দলিলপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে সংগঠনের আহবায়ক ছিলেন আজিজুল হক ভূঁইয়া এবং যুগ্ম আহবায়ক এস. আহমেদ। তাদের এই সব দলিলপত্র রিপ্রোগ্রাফিক সেন্টার, ১২৯ সোহোহিল, বার্মিংহাম-১৯ থেকে প্রকাশিত হয় বলে ১৯৯৫ সালের ৬ জুন বার্মিংহামে আলী ইসমাইল এক সাক্ষাৎকারে তাজুল মোহাম্মদকে জানিয়েছেন।[১০৬]

সে সময় ৭১, রাইটস্ট্রিট, বার্মিংহাম-১০ থেকে ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট-এর মুখপত্র হিসেবে 'বিদ্রোহী বাংলা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সম্পাদনা করতেন সেলিম আহমেদ, এ. ইসমাইল এবং টিপু। এই সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার অনুসারে এই তিনটি নামই ছিল ছদ্ম নাম। সেলিম আহমেদ নামের আড়ালে কাজ করতেন সংগঠনের আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়া, এ. ইসমাইল ছিল ইসমাইল আজাদেরই ছদ্ম নাম এবং বামপন্থী রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত মোস্তাফিজুর রহমান টিপু তার পুরো নাম না লিখে শুধু টিপু নামের আড়ালে সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে ১৯৯৫ সালের ৬ জুন বার্মিংহামে সাক্ষাৎকরে আলী ইসমাইল এবং ৭ জুন মোস্তাফিজুর রহমান টিপু জানিয়েছেন বলে তাজুল মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন।[১০৭]

এরপর আসে পাকিস্তানের বহু আকাঙ্খিত সাধারণ নির্বাচন। ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে সুলতান মাহমুদ শরীফ এক সাক্ষাৎকারে আবদুল মতিনকে বলেন, নির্বাচনের পূর্বে ১৯৭০ সালের আগষ্ট (কিংবা সেপ্টেম্বর) মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আমেরিকা যাওয়ার পথে লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলে অবস্থান করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে লন্ডন আওয়ামী লীগ হোটেলের সামনে এক বিক্ষোভের আয়োজন করে। হোটেলের নিকটবর্তী রাস্তার কোণে পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে কালো পতাকাধারী প্রবাসী বাঙালিরা ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের সপক্ষে শ্লোগান দেয়। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে স্বয়ং ইয়াহিয়া খান রাস্তা পার হয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আসেন। তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সময় সুলতান মাহমুদ শরীফ সরাসরি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করেন, "আসন্ন নির্বাচনে (বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান যদি পার্লামেন্টে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করেন তা'হলে তাঁকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হবে কি না?" এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইয়াহিয়া খান কিছুটা অসংলগ্নভাবে বলেন: "আমি যে-কোন মূল্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করবো। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সুযোগ আমি কাউকে দেব না। পাকিস্তানের জন্য আমি প্রাণ দিতে রাজী আছি।"[১০৮]

১৯৮৯ সালে লন্ডনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে আহমদ হোসেন জোয়ার্দার (এ.এইচ. জোয়ার্দার) আবদুল মতিনকে বলেন, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ইয়াহিয়া খান বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। আসন্ন নির্বাচনে (১৯৭০) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা অর্জন করলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া হবে কি না এই প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া খান বলেন, এটা প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে মিঃ জোয়ার্দার বলেন: "তখন আমাদের কাছে পাকিস্তানী শাসকদের চিন্তাধারা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।" তাঁরা ধরে নিয়েছিল, বাঙালিরা তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেই না; আর যদি ঘটনাক্রমে তেমন কিছু ঘটেই যায়, তবুও তাদের ক্ষমতায় যেতে দেয়া হবে না। এটা তারা নির্বাচনের আগেই ধরে রেখেছিল।[১০৯]

এই আশঙ্কার কথা আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে পাঠানো ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর রিপোর্টেও। এতে বলা হয়েছে "............বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে খুব কম সংখ্যক প্রতিশ্রুতিই নতুন সরকার পূরণ করতে পারবে, যে কারণে খুব শিগগিরই রাজনৈতিক নেতাদের উপর থেকে জনগণের আস্থা উঠে যাবে, সেনাবাহিনী পুনর্বার ক্ষমতা নিতে পারবে এবং এর জন্য খুব বাঁধার সম্মুখীনও তাদের হতে হবে না। অনেক উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা মনে করেছেন যে, নতুন নির্বাচিত সরকার ছয় থেকে নয় মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না।"[১১০]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন চাইলেন এবং জনগণ নির্দ্বিধায় এ সমর্থন প্রদান করে। নির্বাচনে মাত্র দু'টি আসন ছাড়া সব ক'টি আসনে তাঁর মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি ছিল।[১১১] কারণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ছয় দফার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল পাকিস্তানের ভাঙ্গনের বীজ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ছয় দফাকে কেউ যদি গবেষণার মনোভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখেন তাহলে তার মধ্যে সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত ছিল, যা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিশেষকরে জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। একথা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ দূতাবাসের রিপোর্টেরও স্বীকার করা হয়েছে। ইসলামাবাদে নিযুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার সিরিল পিকার্ড পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের কাছে ২১ ডিসেম্বরের রিপোর্ট লিখেছেন, "শেখ মুজিব ঘোষিত ছয় দফা বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তাহলো 'ফেডারেটিং ইউনিট'-এর

Dhaka University Institutional Repository

অনেকখানি অটোনমি বা স্বায়ত্তশাসন, তাহলে বাকী রইলো শুধু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা।" সুতরাং নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলী অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ছয় দফার সুপ্ত কথাগুলি অর্থাৎ স্বাধীনতার দিকেই এগিয়ে গেছে।[১১২]

এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে (বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তখন থেকেই যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিভিন্ন পক্ষ নানা রকম সমীকরণ করতে শুরু করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নির্বাচন-পরবর্তী ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার সিরিল পিকার্ডের রিপোর্ট থেকে। তিনি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রত্যেকটি ঘটনার সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন এবং ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী (ফরেন এন্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি) স্যার আলেক ডগলাস হিউমকে তা' জানিয়েছেন। সিরিল পিকার্ডের রিপোর্টে পাকিস্তানের অখন্ডতা যে বিপন্ন এবং তা নিয়ে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে। তবে সবচেয়ে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা'হলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুরাচারি মনোভাব। তারা বাধ্য হয়েই এক হাত দিয়ে নির্বাচিত প্রতিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কথা বলছে সত্য, কিন্তু অন্যহাতে ক্ষমতা কি করে দখল করা সম্ভব তারও একটা পরিকল্পনা আগে-ভাগেই সেরে রাখছে। আরও একটি বিষয় খুবই স্পষ্টভাবে স্যার পিকার্ড উল্লেখ করেছেন, তা'হলো ভূট্টোর দৈত চরিত্রটি তিনি যথাসম্ভব উন্মোচন করেছেন। জানা যায়, ভুট্টো প্রথম থেকেই বিদেশী দূতাবাসগুলো বিশেষ করে পশ্চিমের দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে রাওয়ালপিন্ডির বিদেশী দুতাবাসগুলির কমবেশি সকলেই অবগত ছিল। স্যার সিরিল পিকার্ড পাকিস্তানের অখন্ডতা যে বিপন্ন এবং এই বিপন্নতায় ভূট্টো ও সেনাবাহিনী একপক্ষ, আর (বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা যে অন্য পক্ষ, তাও স্পষ্ট করেই বলেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৃটিশ দূতাবাস ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একটি আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত ১৯৭০ এর ডিসেম্বর বা তারও আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল। ফলতঃ দেখা যায় যে, প্রায় জানুয়ারী মাস থেকেই তারা পাকিস্তান থেকে তাদের স্বার্থ (লোকজন, জরুরী কাগজ-পত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি) সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল।[১১৩]

আন্দোলনের এই পর্যায়ে একটি বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয় ছিল যে, পাকিস্তানের কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ অধিবেশন আহবান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে বিলাতে বাঙালিদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিলাতের বিভিন্ন অরাজনৈতিক মানবতাবাদী সংগঠন পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছিল। কমনওয়েলথ সোসাইটি, বিভিন্ন চার্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সংসদ সমূহ পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার একটি ন্যায়সংগত সমাধান চেয়েছিলেন। এমনি একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল লন্ডনের ইম্পেরিয়েল কলেজ ছাত্র সংসদের ডিবেটিং সোসাইটি। উক্ত সেমিনারে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন ও পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখার জন্যও বক্তা নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে আলোচক হিসেবে এসেছিলেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজী 'দৈনিক গার্ডয়ান'-এ কর্মরত প্রখ্যাত সাংবাদিক কলিম সিদ্দিকী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, "আজ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাশালীদের প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের ভাইদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি করা যাতে তারা পশ্চিম পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে না দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, তিনি (কলিম সিদ্দিকী) ১৯৭০ সালের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর গার্ডিয়ানে স্বনামে যথাক্রমে 'পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার জ্বর' (ফিভার) এবং 'ইয়াহিয়ার চলে যাওয়া উচিৎ' শিরোণামে কলাম লিখেও পাকিস্তানকে রক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছিল বলে তিনি লিখেছেন।[১১৪]

১৯৭০ সালের ১৫ ডিসেম্বর লন্ডনের বাঙালি ছাত্র ও যুবকরা নাইটব্রিজ এলাকার চেশামপ্লেসে অবস্থিত ছাত্রাবাসে মিলিত হন। প্রস্তাবিত গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেবে না বলে সভায় অংশগ্রহণকারীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ পর্যন্ত এ ধরণের আরো কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থকরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একমত না হওয়ায় তখনও পর্যন্ত 'এ্যাকশন কমিটি' গঠন করা সম্ভব হয় নি বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১১৫]

সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর জুলফিকার আলী ভূট্টো নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেন। রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ইয়াহিয়া খান ১৪ জানুয়ারী ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৭ জানুয়ারী তিনি সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় ভূট্টোর বাড়ীতে এক গোপন বৈঠকে সলাপারামর্শ করেন। মিঃ ভূট্টো গণপরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশন 'বয়কট' করবেন বলে ঘোষণা করেন।[১১৬] কারণ, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছয় দফার নিগূঢ় সত্য পাকিস্তানী সামরিক শক্তি ও বেসামরিক নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিল বলেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে গড়িমসি চলছিল, আলোচনার নামে চলছিল সৈন্য সমাবেশ। করাচি থেকে বেসামরিক বিমানে বেসামরিক পোশাকে সৈন্য আনা হচ্ছিল ঢাকায়। ২৫ শে মার্চ কালরাত্রিতে যে নারকীয় গণহত্যা ঘটবে তার নীলনক্সা বহু আগেই তৈরী হয়েছিল। ভূট্টোর লারকানার বাড়িতে বসে পাখি শিকারের নামে সেই নক্সায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো নতুন নতুন ধারা সংযোজন

Dhaka University Institutional Repository

করছিলেন মাত্র। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, বাঙালিকে অস্ত্রের ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া তাদের ছয় দফা সফল হওয়ার নয়। বাঙালি নেতৃত্বকেও বুঝিয়ে দেওয়া যে ছয় দফার মধ্য দিয়ে তাদের আসল লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছাতে পারবে না। সত্তরের ডিসেম্বর থেকে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালরাত্রি পর্যন্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের দায়িত্ব ছাড়তে সামরিক শাসক কিংবা বেসামরিক নেতৃত্ব কেউই রাজী নয়।[১১৭]

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ১৯৭১ সালের জানুয়ারী (৯ জানুয়ারী) মাসে পাকিস্তান সফরে গেলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে দুই নেতার মধ্যে কথোপকথনের একপর্যায়ে নির্বাচিত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি কী হতে পারে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে, "……প্রেসিডেন্ট মনে করেন না যে, মুজিব ভূট্টোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বসাবে; ভূট্টোর হওয়া উচিত উপ-প্রধানমন্ত্রী।" অর্থাৎ ইয়াহিয়া একটি বিশেষ ইঙ্গিত এখানে দিয়ে রাখেন। যদিও তখন পর্যন্ত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসিতে বিরোধী দলীয় নেতাকে মন্ত্রী পদে বসানোর নজির ছিল বিরল ব্যাপার। তারপর গোটা ফেব্রুয়ারী এবং মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ বারকয়েক পরিবর্তন করা হয়েছে। বাঙালিরা কতদূর যেতে পারে তা গোটা ফেব্রুয়ারী মাস ধরে সামরিক কর্তৃপক্ষ লাইট থেকে ঘুড়ির সূতো ছাড়ার মতো করে পর্যবেক্ষণ করেছে। মার্চ মাসের ৭ তারিখে এসে তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, বাঙালিকে আর বাড়তে দেওয়া যাবে না, তাহলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধরে টান দেবে।[১১৮]

১৯৭১ সালর ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে যখন জাতীয় পরিষদ আহবানের প্রশ্নে দেশে চরম উত্তেজনা এবং পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল তখন লন্ডনের বাঙালি ছাত্রদের চাপে পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী আপোসকামী বাঙালি ছাত্রনেতা একরামুল হক। সভা চলাকালে অন্য একজন বাঙালি নেতা এককালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'এন. এস. এফ.' নামক ছাত্র সংগঠনের নেতা এবং ফজলুল হক হলের এককালীন সহ-সভাপতি মনোয়ার আনসারী খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে লেখা একটি মেমোরেন্ডাম পাঠ করে তা' ফেডারেশন থেকে অনুমোদন প্রার্থণা করলেন। এই পর্যায়ে স্বাধিকার আন্দোলনের সপক্ষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপস্থিত প্রায় সকল সদস্য এই মেমোরেন্ডাম প্রেরণকে 'কামার বাড়ীতে কোরআন পাঠের সামিল' হিসেবে মন্তব্য করে সভা ত্যাগ করেন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল লন্ডনের পাকিস্তান হাউজের বেজমেন্ট মিটিং কক্ষে। সভাকক্ষ ত্যাগ করার ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরাই পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে পাকিস্তান হাইজে বসেই বাংলাদেশ ছাত্র সগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিলেন। দেশের ছাত্ররা যখন অস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সুদূর লন্ডনেও বাঙালি ছাত্রদের সাথে পাকিস্তানী ছাত্রদের দ্বন্দ-সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছিল।[১১৯]

১৯৭১ সালের ২১ ফিব্রুয়ারীতে বিলাত প্রবাসীদের মধ্যে শহীদ দিবস পালনের আয়োজন ও আকার ছিল রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোন উৎসাহ স্বাভাবিক ভাবেই থাকার কথা নয়। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনসাধারণ লন্ডনের পাকিস্তান ভবন, পূর্ব পাকিস্তান ভবন ও পূর্ব লন্ডনের কমিউনিটি হল সহ বিলাতের বিভিন্ন শহরে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মহান শহীদ দিবস পালন করেন। এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতির একটি পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বিলাতে অবস্থানরত বাঙালি ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করেন এবং সাধারণ বাঙালি জনসাধারণকে স্বাধীনাতার প্রয়োজনীতার কথা বিশ্লেষণ করেন। বাঙালিদের মধ্যে একটি ছোট অংশ এ সকল বক্তব্য ও প্রচারণাকে পাকিস্তানের মধ্যে সংহতি বিরোধী বলে মনে করতেন এবং জাতীয়তাবাদী গ্রুপ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। পরবর্তীকালে এই গ্রুপ ব্যারিস্টার আব্বাস আলীর নেতৃত্বে বিলাতে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১২০]

১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে লন্ডন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্নারে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করার জন্য এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও উক্ত প্রতিবাদ সভা লন্ডন আওয়ামী লীগ আহবান করেছিল, কিন্তু ইস্যুটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী সভায় যোগদান করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালি ছাত্ররা উক্ত জনসভায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি মিনহাজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সুলতান মাহমুদ শরীফ, ছাত্রনেতা এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।[১২১]

লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে সুলতান মাহামুদ শরীফ আবদুল মতিনকে বলেন, পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত অধিবেশন স্থগিত রাখার সম্ভবনা আঁচ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পার্লামেন্টের অধিবেশন নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠানের দাবিতে লন্ডনে বিক্ষভ প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারী লন্ডন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনের সমানে এক প্রচন্ড বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন হাজার বাঙালি এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন সন্ধ্যায় লন্ডনের 'ইভিনিং

Dhaka University Institutional Repository
স্টান্ডার্ড' পত্রিকা ও রেডিও মারফত গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রবাসী বাঙালিরা অবিলম্বে মশাল মিছিল ও পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে ২৪-ঘন্টা ব্যাপী 'ভিজিল' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই 'ভিজিল' ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১২২]

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে এসে পাকিস্তানের ঐক্যের আকাশে ঘনকালো মেঘের দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান করে; যার আভাস সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন গোপন দলিলপত্র থেকেও পাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী এক স্মারক পত্র বা দাপ্তরিক বিবরণীতে প্রেসিডেন্টকে পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

স্মারকপত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

"পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে অনমনীয় আলাপ-আলোচনা থেকে গোলযোগ সৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা প্রায় শুরু হয়ে গেছে।......... প্রধান ইস্যুটি হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতা মুজিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন সংবিধান প্রশ্নে এখন পর্যন্ত একটি আনুষ্ঠানিক ঐক্যমত্যে পৌছাতে পারেন নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর সামরিক সরকারকে বেসামরিক রাজনীতিকদের কাছে হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তিনি পাকিস্তানের ভাঙ্গনের পৌরহিত্য করতে চান না।"

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"গণপরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩ মার্চ। এর পর ১২০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে গণপরিষদকে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। তবে মুজিবুর রহমান, ভুট্টো ও ইয়াহিয়া এদের প্রত্যেকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান যে প্রণয়ন করা যাবে না এমন সম্ভাবনাই বাড়ছে বলে মনে হয়। মুজিবুর রহমান এখন কার্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর দাবিতে অটল থাকার পরিকল্পনা করেছেন। যদি তাঁর এ দাবি মেনে নেওয়া না হয়- সে সম্ভবনাই সবচেয়ে বেশি- তাহলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।[১২৩]

পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপার যখন চুড়ান্ত তখন তার প্রতিবাদে ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্বদেশের মতো লন্ডনে বসবাসকারী বাঙালিরা ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত একটানা আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর মধ্যে ১ মার্চ থেকে লন্ডনস্থ পাকিস্তান দুতাবাসের সামনে লাগাতার তৎপরতা (Vigilancc), অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যহত রাখা হয়।[১২৪] ২ মার্চ বার্মিংহাম থেকে আজিজুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একদল বাঙালি রাজনৈতিক-কর্মী লন্ডনে এসে 'ভিজিল'- এ অংশ গ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগ দেন। ৩ মার্চ বিক্ষোভকারীরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানী পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন। বাঙালি রেস্তোঁরার মালিকরা বিক্ষোভকারীদের জন্য খাবার সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১২৫] ৩ মার্চ 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, ইসলাম ও ভুগোলের মধ্যে বিরোধের সৃষ্ট বিপরীতমুখি শক্তি পাকিস্তানকে দু'ভাগে ভেঙ্গে ফেলবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই নিবন্ধে পাকিস্তানকে কৃত্রিম উপায় সৃষ্ট মুসলিম রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয় বলে আবদুল মতিন জানিয়েছেন।[১২৬] উল্লেখিত তারিখে (৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পরবর্তী রোববার তিনি ছয় দফার ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তানের সংবিধান ঘোষণা করবেন। পরদিন 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যতঃ স্বায়ত্তশাসন কায়েম হবে বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১২৭] ইসলামাবাদস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে ৪ মার্চ তারিখে পাঠানো রিপোর্টে বলা হয় ঃ "যে কোন পরিস্থিতেই হোক না কেনো পাকিস্তানের কোনও অংশই সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া সরে দাড়াবে বলে মনে হয় না। এরকম ভয়ঙ্কর তিক্ত পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ-বিছিন্ন হওয়ার প্রশ্নটি অবান্তর নয়, দিন দিন তা বরং আরও খোলামেলা হয়ে উঠছে।"[১২৮]

ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে জাতীয় পরিষদ বসার তারিখ স্থগিত করে দেবার খবর লন্ডনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র, যুবক, চাকুরিজীবীসহ রাজনৈতিক কর্মী ৫ মার্চ (১৯৭১) তারিখে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হাইকমিশনের দেয়ালে তাঁরা লিখে দেন 'জয় বাংলা', 'স্বাধীন বাংলা' ইত্যাদি শ্লোগান। এ সময় তাঁরা পথচারীদের কাছে বিতরণ করেন স্মারকলিপির কপি। অবশেষে হাইকমিশনার সালমান আলী বেরিয়ে আসলে 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর চেয়ারম্যান আল মোজাহিদ স্বাধীনতার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁর হাতে। অনেক বিদেশী সাংবাদিক ও বিবিসি টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ও প্রেসিডেন্ট নরপশু ইয়াহিয়ার ছবি পুড়িয়ে দেন বলে তাজুল মোহাম্মদ ২১ মার্চ (১৯৭১) তারিখে প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যা, 'বিদ্রোহী বাংলা'র উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন।[১২৯]

৫ মার্চের পর বিক্ষোভকারীরা পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে থেকে সরে গিয়ে নিকটবর্তী হাইড পার্কে ক্রমাগত বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক বিক্ষোভকারী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহায্যের আবেদন জানান।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত তারিখ অর্থাৎ ৫ মার্চ (১৯৭১) 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ৩০০ জন (বাঙালি) নিহত হয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ করে (বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিব পাকিস্তান সৈন্য বাহিনী দখলদারী শক্তির মতো ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেন। সৈন্য বাহিনী নির্বিচারে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে অসহায় জনসাধারণকে হত্যা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এবং উক্ত তারিখ (৫ মার্চ, ১৯৭১)-এ ঢাকা থেকে প্রেরিত এক সংবাদে পল মার্টিন শেখ মুজিবকে কার্যতঃ "বিদ্রোহী পূর্ব বাংলার" শাসক বলে উল্লেখ করেন। পরদিন 'দি টাইমস'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয় বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৩১] ৬ মার্চ (১৯৭১) 'দি টাইমস'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, প্রতিবাদমুখর পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি ঘন্টায় ঘন্টায় তীব্রতর হচ্ছে।.......শেখ মুজিব নিশ্চয় পাকিস্তানকে দু'ভাগ করতে চান না। কিন্তু ভুট্টো তাকে সেদিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এবং উক্ত তারিখে (৬ মার্চ, ১৯৭১) করাচি থেকে পিটার হ্যাজেলহার্স্ট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে ঃ

তিনি এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন অথবা গণপরিষদের অধিবেশন ডেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন; যা ৭ মার্চ (১৯৭১) 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত হয় বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৩২] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে 'ঘটনার সমস্ত দায়ভার' পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের উপর চাপিয়ে দেন। তিনি তাঁর ভাষণে জোর দিয়ে বলেন ঃ "যতোদিন তাঁর হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে ততোদিন তিনি পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করবেন এবং কতিপয় মানুষের জন্য তিনি পাকিস্তানকে ধ্বংস হতে দেবেন না।"[১৩৩]

ইতোমধ্যে ৭ মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স (পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় ভাষণ দিবেন বলে প্রকাশিত হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৭ মার্চের জনসভার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবাসী বাঙালিরা সমগ্র যুক্তরাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং তিনটি সমাবেশের আয়োজন করে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ৭ মার্চ (১৯৭১) লন্ডনের ঐতিহাসিক হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্নারে এক জনসভার আয়োজন করে। হাজার হাজার প্রবাসী বাঙালি উক্ত জনসভায় যোগদান করেন। বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টারসহ বিভিন্ন শহর থেকেও প্রবাসী বাঙালিরা হাইডপার্ক কর্নারে সমবেত হয়ে বাঙালিদের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খানের সভাপতিত্বে উক্ত জনসভায় বেশির ভাগ বক্তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা ঘটে তা হলো বাংলাদেশের কাল্পনিক পতাকা উত্তোলন। লন্ডনের বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পতাকা কী হতে পারে তার একটা অস্পষ্ট ধারণা বিরাজমান ছিল। সবুজ, লাল ও সোনালী রংয়ের সমন্বয়ে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাবে এমন একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে সেদিনের পতাকাটি ডিজাইন করা হয়েছিল; যার পটভূমিতে ছিল সবুজ রং এবং মাঝে লাল সূর্য ও তার অভ্যন্তরে ছয় পাতা বিশিষ্ট একটি সোনালী পাট গাছ। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা চির সবুজ বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে পতাকার পটভূমিতে সবুজ রং এবং একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে লাল সূর্য লন্ডনে উত্তোলিত বাংলাদেশের পতাকায় স্থান পেয়েছিল। লাল সূর্যের মধ্যভাগে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট এবং ছয় দফা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ছয়টি সোনালী পাতা উক্ত পতাকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।[১৩৪]

উক্ত তারিখে (৭ মার্চ, ১৯৭১) পাকিস্তান স্টুডেন্ট হাউজ-এ অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি' গঠন করা হয় ও তার ১১ সদস্য মনোনয়নদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৩৫] এ্যাকশন কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ঃ মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু (আহবায়ক), সুলতান মাহমুদ শরীফ, আনিস রহমান, শামসুল আবেদীন, এ. এইচ. এম. শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি) খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর), নজরুল ইসলাম, আবদুর রউফ, এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, আক্তার ইমাম ও ডক্টর এলাহী।[১৩৬]

৭ মার্চ (১৯৭১) বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে উত্তেজিত ছাত্র ও যুবকরা চেশামপ্লেসে অবস্থিত পাকিস্তানী ছাত্রাবাসের দেয়াল থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি নামিয়ে পায়ের তলায় ফেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। ছাত্রবাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে অবস্থিত লাউন্ডস্ স্কোয়ারে অবিরাম বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য বহু ছাত্র ও যুবক জমায়েত হন। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের যুক্তরাজ্য শাখার সদস্যরা এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সদস্য ও সমর্থকরা এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। শেখ আবদুল মান্নান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সদস্যদের নেতৃত্বদান করেন।[১৩৭]

উক্ত তারিখে (৭ মার্চ, ১৯৭১) উত্তর লন্ডনের ৯১, হাইবারী হীলে অবস্থিত 'পূর্ব পাকিস্তান হাউজ'-এ এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন 'পূর্ব পাকিস্তান হাউজ'-এর সেক্রেটারি আমীর আলী। এই সমাবেশে ছাত্র, চাকুরিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সমাবেশ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বসম্মতভাবে পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের কিছু অংশ উল্লেখ করা প্রয়োজন যাতে লেখা ছিল ঃ

"............The Panjabi answer to the popular Bengali mandate (given by the electorate in General Election) has been a bloodbath. And so things have come to such a head that nothing short of complete Independence can satisfy the Bengalees. Hence the Revolution.

.... We, the overseas Bengalees, express our fullest solidarity with our fighting and slaying brothers back home. A free Bengal will exact retribution for this blood. And as the same blood floes through our veins, we also raise our voices in unison with them and say "Victory for Bengal. Long live the Revolution."

হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্নারের সভায় স্বাধীনতা ঘোষণা ও বাংলাদেশের পতাকা (কাল্পনিক) উত্তোলন এবং পূর্ব পাকিস্তান হউজ-এ অনুষ্ঠিত সমাবেশের ঘোষণার প্রস্তাব একই চেতনার বহিঃপ্রকাশ।[১৩৮]

যে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ' ছিল পাকিস্তানী শাসকদের গাত্রদাহের কারণ এখন থেকে তা আর 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ' রইলো না, এক ঘোষণায় হয়ে গেল 'বাংলাদেশ ভবন'। তার শীর্ষে উড়লো সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্য খচিত বাংলাদেশের পতাকা। পরদিন থেকে ইংল্যান্ড জুড়ে শুরু হলো আর এক অভিযান; সভা-সমাবেশের সাথে সাথে প্রত্যেক এলাকার পার্লামেন্ট সদস্য, মেয়র, কাউন্টি কাউন্সিল এবং বোরো কাউন্সিল সদস্যদের বাড়ী বাড়ী ধরণা। ২৩ বছর পাকিস্তানী শাসকদের শোষণের নমুনা এবং অন্তিমে সারা বাংলা জুড়ে তাদের নারকীয় কর্মকান্ডের কাহিনী উথাপন করে তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা চলে। এভাবে ২৫ মার্চের আগে থেকেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত সংগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।[১৩৯]

এ রকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে নানা টালবাহানা শুরু করে তখন বাঙালি জাতির কান্ডারী রূপে আবির্ভূত শেখ মুজিবুর রহমান এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কারার জন্য ৭ মার্চ (১৯৭১) রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত জনসভায় জাতির উদ্দেশ্যে বহুল আকাঙ্খিত ভাষণদানের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই ভাষণে সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রের নানা কৌশল ও ছলনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এবং পাকিস্তানে শাসনক্ষমতার অংশীদার হয়ে থাকা আর সম্ভব নয় বলে স্থিরপ্রতীতির কথা জানিয়ে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বজ্রগম্ভীর আহবান জানান প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক গৃহ থেকে পাকিস্তানী শাসক চক্রকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং হাতের কাছে যে অস্ত্র আছে তা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি এই বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেন ঃ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" এতে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে, শেখ মুজিবের ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না? তাঁর ঘোষণার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন অস্পষ্ঠতা নেই। মূলত এই ভাষণে ছিল গুরুতর এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা, যেমনটি ছিল বোস্টন টি পার্টির ভাষণ; যা আমেরিকান বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল; কিংবা টেনিসকোর্ট শপথ অনুষ্ঠানের ভাষণ, যা থেকে ঘোষিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিশপথ।[১৪০]

৭ মার্চের (১৯৭১) ভাষণে[১৪১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইয়াহিয়া সরকারের উদ্দেশ্যে সরাসরি কিছু শর্ত জুড়ে দেন। যে শর্তগুলো পালন করা কোন সামরিক সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়, বিশেষ করে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক শক্তির জন্যই এই শর্তগুলো মেনে নেওয়া হলো মৃত্যু ফাঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে মোট চারটি শর্ত দেন এবং সেই সঙ্গে জুড়ে দেন সামনের সময়ে বাঙালির করণীয় কী হবে তা। শেখ মুজিবের এই ঘোষণার পর কার্যতঃ সবই এই ঘোষণা মত চলছিল। এই ঘোষণার প্রতিটি শর্তই একটি স্বাধীন দেশের অস্তিত্বের কথা বলে। পাকিস্তানী সামরিক শাসকবর্গ ও বেসামরিক শক্তিটি এই শর্তাদি কতোটা পালিত হয় তা দেখার জন্য ২৫ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং এরই মাঝে আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়।[১৪২]

বঙ্গবন্ধু এই ঐতিহাসিক ঘোষণার খবর পরদিন লন্ডনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা তাঁর ভাষণের বিবরণ জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।[১৪৩]

৮ মার্চ ঢাকা থেকে মার্টিন এ্যাডিনি প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, নতুন সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ইয়াকুব খান সম্ভবত পদচ্যুত হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস বি, এ, সিদ্দিকী নতুন গভর্নর হিসেবে জেনারেল টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেছেন। পরদিন 'দি গার্ডিয়ান'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয় বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৪৪]

৯ মার্চ মঙ্গলবার 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রাকাশিত অপর সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিবের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার পরদিন (সোমবার) ঢাকার জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তবে এটা পরিস্কারভাবে বোঝা যায়, তাঁর (শেখ মুজিব) নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন সরকারি কার্য পরিচালিত হবে না। গত রোববার (৭ মার্চ) তাঁর বক্তৃতা ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে সরাসরিভাবে প্রচারিত না হওয়ার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

বেতার কর্মচারীরা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। পরদিন (৮ মার্চ) বক্তৃতাটি প্রচারিত হওয়ার পর রেডিও স্টেশনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৪৫]

উল্লেখিত তারিখে (৯ মার্চ) 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ধর্মঘট পালনের জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ী সব সরকারি ও বেসরকারি অফিস, উচ্চ ও নিম্ন আদালত, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকবে। তাছাড়া ট্যাক্স ও খাজনা দেয়া হবে না, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থিক লেনদেন বন্ধ থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাঙ্কে পশ্চিম পাকিস্তানের একাউন্টগুলো পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ বলে গণ্য করা হবে বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন।[১৪৬]

৯ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে চীনাপন্থী মওলানা ভাসানী বলেন, পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেন। এর ফলে শেখ মুজিবের নীতির প্রতি বামপন্থীদের প্রকাশ্য সমর্থন সূচিত হয় বলে 'দি টাইমস'-এর সংবাদদাতা পল মার্টিন মন্তব্য করেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৪৭]

১০ মার্চ (১৯৭১) 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতার সারমর্ম উল্লেখ করা হয় বলে আবদুল মতিন জানিয়েছেন।[১৪৮]

১২ মার্চ (১৯৭১) 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকর্তা বলে মনে হয়। ইতোমধ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর (বর্তমানে ১০ নম্বর) রাস্তায় অবস্থিত তাঁর বাড়িকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের অনুকরণে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। সরকারি অফিসার, রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিল্পপতি এবং অন্যান্য মহলের লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন। এই পরিস্থিতে শুধু মিলিটারি ব্যারাক ও সৈন্যবেষ্টিত বিমান বন্দরের উপর ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের কর্তৃত্ব রয়েছে বলে এই সংবাদে উল্লেখ করা হয় বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন।[১৪৯]

বিভিন্ন দেশের সরকার কিংবা তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে পূর্ব বঙ্গের আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের অনুরোধ জানানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে) সুলতান মাহমুদ শরীফ, মিনহাজ উদ্দিন ও এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু লন্ডনে নিয়োজিত ভারতীয় হাইকমিশনার আপা বি. পান্থ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, ভারত সরকার এ ব্যাপারে সর্ব প্রকার সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশন প্রবাসী বাঙালিদের সাহায্যদান করবে বলে বিদেশে ভারতের প্রত্যেকটি দূতাবাসকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে আবদুল মতিন লিখেছেন।[১৫০]

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৪ মার্চ (রোববার) লন্ডনে একটি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মফস্বলের বহু শহর থেকে দশ হাজারের বেশি বাঙালি হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে যোগদান করেন। হাইড পার্ক থেকে বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খানের নেতৃত্বে লাউন্ডস স্কোয়ারে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়ে পূর্ব বাংলার দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এর আগে লন্ডনে বাঙালিদের এত বড় সমাবেশ আর দেখা যায় নি বলে আবদুল মতিন ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজলেটার, প্রথম সংখ্যার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।[১৫১] এই সমাবেশের পর ব্রিটেনে বাঙালিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সারা ব্রিটেনের বিভিন্ন নগরে-বন্দরে এ্যাকশন কমিটি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। বার্মিংহামের 'পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর নাম পরিবর্তন করে হয়ে যায় 'বাংলাদেশ এ্যাকশন' কমিটি। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁরা প্রায় ১৫টি শহরে 'এ্যাকশন কমিটি' গঠন করেন। এই শহরগুলোর মধ্যে ছিল লন্ডন, বার্মিংহাম, লিডস্, ব্রাডফোর্ড ও ম্যানচেস্টার প্রমুখ।[১৫২]

এরই মধ্যে চলছে ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের শলাপরামর্শ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার মধ্যস্ততা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, কিন্তু স্যার সিরিল পিকার্ড (তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার) তা প্রত্যাখান করেছেন। কেন করেছেন, তা অবশ্য পরবর্তীকালে স্পষ্ট হয়েছে। যে আলোচনার সফল অথবা ব্যর্থতা উভয়ের পরিণামই সামরিক আক্রমণ তার মধ্যস্ততা করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্থান ব্রিটেন নিতে চায় নি। শেখ মুজিব ঢাকায় গোঁ ধরে বসে আছেন, ইয়াহিয়া খান তাঁর পার্শ্বচর ভুট্টোর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে মোটামুটি শলাপরামর্শ শেষে 'বাজপাখি' থেকে 'ঘুঘুর' ভূমিকায় নেমে আসার অভিনয় চর্চা করছেন। পূর্ব পাকিস্তানে চলছে অসহযোগ আন্দোলন, এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার এই ভূমিকা-ত্যাগ অভিনয় ছাড়া কিছু নয়, যার প্রমাণ ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঢাকা পৌঁছানোর পর থেকে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে মার্চের উত্তাল সময়, বাঙালির আন্দোলন তুঙ্গে, বিচ্ছিন্নভাবে সেনাবাহিনী বাঙালি হত্যা করছে, প্রস্তুত হচ্ছে একটি বিশাল আক্রমণের পরিকল্পনা সামনে নিয়ে। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ-কর্মীদের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েও কিসের আশায় বসে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন গোপন প্রতিবেদন এখনও নিরব থাকলেও বৃটিশ দলিল পত্র বলছে, "যদিও তিনি (বঙ্গবন্ধু) মুখে বলছেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান না, তবে তিনি প্রেসিডেন্টের (ইয়াহিয়া) উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীলও নন এবং তিনি

Dhaka University Institutional Repository
(বঙ্গবন্ধু) এও মনে করেন না যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কোনও অধিবেশন আদৌ বসবে। আমাদের কিছু বিশ্বস্ত সূত্রের মতে, মুজিব হয়তো শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা চাইবেন, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নয়।"[১৫৩]

১৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পৌঁছাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে চার হাজারেরও বেশি ছাত্র তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৬ মার্চ 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে আসন্ন আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কোন কোন মহল আশাবাদী ছিল। কিন্তু ছাত্র ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কথা শুনতে রাজী নয় বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বিদেশী সামরিক ও বেসামরিক বিমান ভারতের উপর দিয়ে সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে উড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।[১৫৪]

একটি শক্তিশালী ও পৃথিবীর অন্যতম সু-প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিপক্ষে প্রশিক্ষণহীন, নিরস্ত্র জনসাধারণকে সশস্ত্র বিপ্লবে ঠেলে দিয়ে স্বাধীনতা কামনা একজন সত্যিকার নেতার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়, শেখ মুজিব তা ভাবছিলেন বলেও মনে হয় না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যে আসবে না এবং বাঙালিকেও অস্ত্র ধরতেই হবে তাও বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা কমিটি গঠন করার; যে কমিটি সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবে। এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে অন্যান্য দিকগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। ১৬ মার্চের বৃটিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "..................পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়সহ বেশ কিছু কর্মকান্ড যা আগে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল সেগুলো মুজিব নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন"। বঙ্গবন্ধু আলোচনার ফাঁকে পূর্ব পাকিস্তানকে একেবারেই নিজের কজায় আনার চেষ্টায় ছিলেন এবং তিনি তাতে সফলও হয়েছিলেন।[১৫৫]

১৭ মার্চ 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিবের নির্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে ডক-শ্রমিকরা জাহাজ থেকে চীনা অস্ত্রশস্ত্র নামাতে অস্বীকার করেছে। এ সংবাদে আরও বলা হয়, গত সপ্তাহের দু'হাজারেরও বেশি পাকিস্তানী সৈন্য গোপনে চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় জাহাজ থেকে নেমেছে বলে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছেন বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন।[১৫৬]

এই ঘটনা থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, পাশব শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে দমনের জন্য সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার তারিখ ৩ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পিছিয়ে দেন বলে 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর স্টাফ রিপোর্টার মন্তব্য করেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ইতোপূর্বে পাকিস্তানের অখন্ডত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করা হবে বলে ইয়াহিয়া খান প্রকাশ্যে হুঙ্কার দেন।[১৫৭]

১৯ মার্চ 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে দু'দিন ব্যাপী আলোচনার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক গুলি চালনার ব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা থেকেই বোঝা যায়; কমিশন গঠনের প্রস্তাব অর্থহীন, জনগণকে প্রতারণা করাই এর উদ্দেশ্য। এই কমিশনের সঙ্গে কেউই সহযোগিতা করবে না বলে তিনি (বঙ্গবন্ধু) ঘোষণা করেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৫৮]

২০ মার্চ ঢাকা থেকে প্রেরিত এক সংবাদে 'দি অবজারভার'-এর সংবাদদাতা বলেন, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনার ফলে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে একটা কনফেডারেশন গঠনের সম্ভবনা রয়েছে। শেখ মুজিব সম্ভবত অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োজিত হবেন বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন।[১৫৯]

দেশের জনগণের জন্য ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ যেমনি বিভীষিকাময় ও দুঃস্বপ্নের ছিল তেমনি বিলাত প্রবাসীদের মধ্যে ছিল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া। দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মধ্যে যে আলোচনা চলছিল তা প্রবাসীরা খুব আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন। প্রতিদিন অফিস বা কারখানার কাজ শেষ করে লন্ডনের বাঙালিরা ছুটে আসতেন পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে। তৎকালে প্রতিদিন বিকেলে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশের আয়োজন করা হতো (তবে ৫ মার্চের পর থেকে হাইড পার্কে)। প্রবাসী বাঙালিরা দু'টো উদ্দেশ্যে প্রতিদিন দূতাবাসের সামনে হাজির হতেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা এবং অপরটি হচ্ছে দেশে আলোচনার অগ্রগতি কতটুকু হচ্ছে তার সর্বশেষ খবর নেয়া। যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অনিবার্য সংঘাতের দিকেই যাচ্ছে। একদিকে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী আর অন্যদিকে নিরস্ত্র বাঙালি। তাই প্রবাসী বাঙালিদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা, অনিবার্য ভবিষ্যৎ ও দেশের আপনজনের নিরাপত্তার চিন্তা সকলকে আপ্লুত করে রেখেছিল।[১৬০] ২০ মার্চ (১৯৭১) সন্ধ্যায় পাকিস্তান ছাত্রাবাসে প্রবাসী বাঙালিদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রথম অংশে সভাপতিত্ব করেন সামসুল আবেদীন এবং দ্বিতীয় অংশে সভপতিত্ব করেন শেখ আবদুল মন্নান। পূর্ববঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি আন্দোলনে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে একটি সর্ব দলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই সভার আহবান করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দই তড়িঘড়ি করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।[১৬১] ২১ মার্চ (১৯৭১) তারিখে বেঙ্গল স্টুডেন্টস্

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাকশন কমিটি এক সভায় মিলিত হয়ে সর্ব দলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্ভব না হলেও নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে ঐক্যমত্য প্রকাশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিলঃ (১) প্রবাসী বাঙালিদের দেশে টাকা প্রেরণ বন্ধ রাখতে হবে। (২) পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। (৩) পাকিস্তানের দূতাবাসের সাথে সকল প্রকার সহযোগিতা এবং তাদের সকল নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। (৪) পাকিস্তান সরকারের স্কলারশীপসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখান করতে হবে। এই সকল নির্দেশ লন্ডনে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনমত'-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন উল্লেখ করেছেন। এই আহবানে সাড়া দিয়ে সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকা পরবর্তী সপ্তাহ থেকে পাকিস্তান সরকারের প্রদত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন (পি. আই. এ.সহ) প্রত্যাখ্যান করে নজির সৃষ্টি করেছিল।[১৬২]

ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণে ২১ মার্চ জুলফিকর আলী ভূট্টোর ঢাকা আগমন রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে আশার সঞ্চার করে। কিন্তু বিদ্রোহী বাঙালিরা অমঙ্গল আশা করে মিঃ ভূট্টোর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৬৩]

২২ মার্চ শেখ মুজিব ও মিঃ ভূট্টো এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক চলাকালে ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে বলাহয়, গণপরিষদের প্রারম্ভিক অধিবেশনের তারিখ ২৫ মার্চ থেকে পিছিয়ে দেয়া হবে।[১৬৪]

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি' ও তাদের সমর্থকরা ২৫ মার্চ (১৯৭১) 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে বাংলার জনগণের সঙ্গে তাদের সংহতি ঘোষণা করেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৬৫]

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালন করে। ঢাকার সরকারী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং শেখ মুজিবের বাড়ীসহ শত শত বাড়ীর উপর সবুজ পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সম্পর্কে ২৪ মার্চ 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মজিব তাঁর বাড়ীর সমনে কয়েকশ' আওয়ামী লীগ কর্মীর এক সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন বলে আবদুল মতিন জানিয়েছেন। তিনি (বঙ্গবন্ধু) বলেন, ২২ দিন আগে তাঁর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তার ফলে পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থের মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। "রক্তপাত ছাড়া যিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন তিনিই সবচেয়ে বড় সেনাপতি" বলে শেখ মুজিব মন্তব্য করেন উল্লেখ করে বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন।[১৬৬] উক্ত তারিখে (২৩মার্চ) 'দি টইমস' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল মতিন আরো উল্লেখ করেন, মওলানা ভাসানী ও তাঁর সহকর্মীরা প্রতিরোধ দিবসের পরিবর্তে ২৩ মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) স্বীকার করেন, তাঁর প্রতিপক্ষ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আস্থা অর্জন করেছে। তিনি আরও বলেনঃ "জনগণ সামরিক বাহিনী ও আওয়ামী লীগের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে এবং তারা সেনাবাহিনীর নির্দেশ উপেক্ষা করেছে।[১৬৭]

একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ্যনীয়, ৭ মার্চের পরে সরকারি অফিস-আদালত খুব কমই চলছে, স্কুল-কলেজও তাই। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোর বেশিরভাগই চলছে আওয়ামী লীগের নির্দেশে। গ্রামের কথা আলাদা, সেখানে জীবনযাত্রা সরকারি নিয়মাধীন নয়। কিন্তু এসব শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে থাকায় ২৫ মার্চের কালরাত্রির নৃশংসতা পরিকল্পনার তুলনায় কম হয়েছে, কারণ বড় শহরগুলোতে মানুষ কিন্তু মোটামুটি প্রস্তুতই ছিল ভয়ঙ্কর কোনও কিছুর জন্য। এটা শেখ মুজিবের দূরদর্শিতায় কারণেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ২৫ মার্চের মধ্যরাত্রির আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের 'ডি-ফ্যাক্টো কন্টোল' রেখেছিলেন। যার প্রমাণ আমরা পাই ২৬ মার্চ ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো ব্রিটিশ রিপোর্টে, "...............যেহেতু কোন ঘোষণা ছাড়াই প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া) ঢাকা ত্যাগ করেছেন, সেহেতু এটা নিশ্চিত যে, কোন প্রকার রাজনৈতিক সমাধানের পথ আর খোলা নেই এবং ধারণা করা যায় যে, প্রেসিডেন্ট মনে করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মুজিব তাঁর আগের অবস্থান ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করা ছাড়া হয়তো আর কোনও উপায় থাকবে না।"[১৬৮]

২৫ মার্চ সন্ধ্যার আগে করাচি থেকে প্রেরিত 'দি টাইমস্' ও 'দি গার্ডিয়ান'-এর সংবাদদাতাদের খবরে বলা হয়, ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। শেখ মুজিব এক ঘোষণা জারি করে বিদেশী কোম্পানীদের মাল রপ্তানি সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন পূর্ব বাংলায় দু'টি ব্যাংকের মারফত করার নির্দেশ দেন। করাচির পরিবর্তে ম্যানিলা ও লন্ডনের মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের টেলিযোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনি বিদেশী ডাক ও টেলিগ্রাফ কোম্পানীদের অনুরোধ জানান বলে আবদুল মতিন উদ্ধৃত করেছেন।[১৬৯]

'প্রেস ট্রাষ্ট অব ইন্ডিয়া'র এক খবরে প্রকাশ, পূর্ব বঙ্গের ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের অসহযোগিতার ফলে পাকিস্তনী সৈন্যরা পুলিশ বাহিনীকে অস্ত্র পরিত্যাগে বাধ্য করতে পারেন নি। তাছাড়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, অস্ত্রধারী রিজার্ভ পুলিশ ও বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা একযোগে শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ২৬ মার্চ লন্ডনের সংবাদপত্রে এসব খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয় বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৭০]

Dhaka University Institutional Repository

২৬ মার্চ সকাল থেকেই বিবিসি (বাংলা বিভাগ) ও অন্যান্য সূত্র থেকে অসমর্থিত খবর আসতে থাকে ২৫ মার্চ গভীর রাত্রে ঢাকাসহ 'পূর্ব বঙ্গে' এক জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়েছে। এই দিনের সকালের পত্রিকা স্পষ্ট কোন তথ্য দিতে না পারলেও বৈকালিক পত্রিকাসমূহ হত্যাযজ্ঞের বিবরণ প্রকাশ করে। এই সামরিক অভিযানে কত লোককে হত্যা করা হয়েছে, নেতারা কে কী অবস্থায় আছেন, প্রবাসীদের আপনজনদের কার কী অবস্থা এই সকল অবস্থা ভেবে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা এক বিরাট উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে দিনটি অতিবাহিত করেন। রাজনৈতিক সচেতন ও স্বাধীনতাকামী প্রবাসীদের সবচাইতে বড় উৎকণ্ঠা ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়।[১৭১]

উক্ত তারিখের (২৬ মার্চ) যুক্তরাজ্যে উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আবির্ভূত হন মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডন কেন্দ্রিক সমগ্র ইউরোপ-আমেরিকা আন্দোলনের পুরোধা, প্রাণ-পুরুষ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম (মুক্তিযুদ্ধকালীন) বিশেষ দূত পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে জেনেভায় ছিলেন। সেদিন সকাল বেলা বিবিসি'র খবর শুনে তিনি অনুমান করেন, বাংলাদেশে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। ঢাকার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বিছিন্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক- শিক্ষিকাদের কথা তাঁর মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। সেদিনের অধিবেশনে গিয়ে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ এগুইলার অনুমোতি নিয়ে বিবিসি'র খবরের কথা উল্লেখ করে সেদিনই লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ইতোপূর্বে জেনেভায় অবস্থানকালেই পত্রিকা মারফত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র নিহত হবার খবর অবগত হয়ে ১৫ মার্চ এক পত্রে তিনি প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবকে জানানঃ "আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর পর আমার ভাইস চ্যান্সেলর থাকার যুক্তিসংগত কারণ নেই। আমি পদত্যাগ করলাম।"[১৭২]

উক্ত তারিখে লন্ডন বিমানবন্দরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বড় ছেলে আবুল হাসান চৌধুরী (কায়সার) ও হাবিবুর রহমান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। আবুল হাসান চৌধুরী তখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য ঘটনা চক্রে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পুরো পরিবারই তখন লন্ডনে ছিলেন এবং হাবিবুর রহমান তখন পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত ছিলেন। বিচারপতি আবু সাইদ চেধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার তিন সপ্তাহ পরে তিনি চাকুরিচ্যুত হন।[১৭৩]

দক্ষিণ লন্ডনের বাসায় পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর সুলতান মাহামুদ শরীফ কয়েকজন বাঙালি কর্মীসহ বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা সবাই ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বিচারপতি চৌধুরীর মতো শঙ্কিত বোধ করেন। তিনি তখনই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং সন্ধ্যার পর যোগাযোগ সম্ভব হয়। পরদিন (শনিবার) ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকাল ১১ঘটিকার সময় বিচারপতি চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ দিতে রাজী হন। তাঁর (বিচারপতি চৌধুরী) অনুরোধক্রমে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব মিঃ ব্যারিংটনও পরদিন পররাষ্ট্র দপ্তরে আসতে রাজি হন।[১৭৪]

২৬ মার্চ সকালবেলা থেকে বাঙালি ছাত্র শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) ও আফরোজ আফগান ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নিকটবর্তী হোয়াইট হলে অনশন ধর্ম ঘট শুরু করেন। লন্ডনে মজনু-নুল হককে এক সাক্ষাৎকারকালে শামসুদ্দিন চৌধুরী বলেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন, "বাংলাদেশে মর্মান্তিক কিছু একটা হতে যাচ্ছে" আশঙ্কা করে ২৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অনশন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে অনশনকারীদের আশে পাশে 'হ্যাঙ্গ ইয়াহিয়া', 'রিকগনাইজ বাংলাদেশ', 'স্টপ জেনোসাইড' ইত্যাদি শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও পোষ্টার রাখা হয়। প্রচন্ড শীতের মধ্যে রাতের বেলাও ৫০ থেকে ১০০ জন বাঙালি পর্যায়ক্রমে অনশনকারীদের সঙ্গে ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। পাকিস্তানীদের সম্ভব্য আক্রমণ থেকে অনশনকারীদের রক্ষা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমান করা হয়। পুলিশের ডাক্তার প্রতিদিন অনশনকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তৃতীয় দিন তারা (পুলিশ) বলেন, অনশনকারীদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে অনশন ত্যাগ না করা হলে তাঁদের জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা অনশন অব্যাহত রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং প্রতিদিনই এম. পি-দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে শ্রমিকদলীয় এম. পি. পিটার শোরের অনুরোধক্রমে ২৮ মার্চ বিকাল ৩/৪ ঘটিকার দিকে তাঁরা অনশন ভঙ্গ কারেন। ব্রিটিশ টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় অনশনকারীদের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হয়।"[১৭৫]

২৬ মার্চ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতা গাউস খানের উদ্যোগে লন্ডনে বেরিক স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর 'এলাহবাদ' রেস্তোঁরার উপরের তলার অফিসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার পর পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে অবিলম্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত করা হয় বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[১৭৬]

সেদিন সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে প্রায় ৩০০ বাঙালি ছাত্র ও জনসাধারণ তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা হাইকমিশন দখলের চেষ্টা করেন। রাত প্রায় ৯ টার দিকে উত্তেজিত ছাত্র ও যুবক এবং পুলিশের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে মোহাম্মদ ইসহাক, শরিফুল হক সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়। মোহাম্মাদ ইসহাক তখন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। পরের দিন তিন জনের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করে। ১ জুন মার্লবারা স্ট্রিট কোর্টে উত্থাপিত মামলায় মোহাম্মদ ইসহাকে ছ'সপ্তাহের কারাদণ্ড দেয়া হয়। গাউস খান এই মামলার ব্যায়ভার বহন করেন।[১৭৭]

লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি মিনহাজ উদ্দিন উল্লেখিত বিক্ষোভে যোগ দেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তান হাইকমিশনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি হাইকমিশনের বাইরে অবস্থান করবেন। ২৭ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবের পার্টি আওয়ামী লীগ এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। প্রায় একশ' জন ছাত্র ও জনসাধারণ সারা রাত হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান ডেমোক্রিটিক ফ্রন্টের নেতা শেখ আবদুল মন্নান এবং ছাত্র নেতা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। পুলিশ কর্তৃপক্ষ হাইকমিশনকে পাহারা দেয়ার জন্য প্রায় ৫০ জন পুলিশ অফিসার নিয়োগ করেন।[১৭৮]

পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের খবর পাওয়ার পর আহম্মদ হোসেন জোয়ার্দার তাঁর সহকর্মীদের সহয়তায় ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তান স্টুডেন্টস্ হোস্টেলে এক জরুরী সভার আয়োজন করেন। এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, ছাত্র ও যুবকরা যোগদান করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, আজ বাংলাদেশের জন্মদিন এবং এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান বলে কিছু নেই। তৎকালীন পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফেডারেশনের বাঙালি সভাপতি একরামুল হক এই প্রস্তাব সম্পর্কে আপত্তি জানান। এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু বলেন, "আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এক সঙ্গে থাকার জন্য, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার-অবিচারের ফলে আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।" ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ হাউসের প্রেসিডেন্ট আনিচ রহমান বলেন, "পাকিস্তন ইজ-ডেট। কাজেই এখন আমাদের সেই ভাবে তৈরী হতে হবে।" উক্ত সভায় লন্ডনের বিভিন্ন এলাকায় এ্যাকশন কমিটি গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং সেই রাতেই মিঃ জোয়ার্দার ও তাঁর ১৫/২০ জন সহকর্মী দক্ষিণ-পশ্চিমের স্ট্রেথাম এলাকায় 'কুলাউড়া' তন্দুরি রেস্তোঁরায় ওপর তলায় সমবেত হয়ে একটি 'এ্যাকশন কমিটি' গঠন করেন।[১৭৯]

২৭ মার্চ ' দি টাইমস্' ও দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ৩ কলাম শিরোণাম দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ এবং এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 'দি টাইমস্'-এর সংবাদে বলা হয় ২৫ মার্চ রাত্রিবেলা পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার পর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে 'বে-আইনি প্রতিষ্ঠান' এবং শেখ মুজিবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে ঘোষণা করে শাস্তিদানের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন বলে আবদুল মতিন লিখেছেন।[১৮০]

'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তান সৈন্য বাহিনী এবং শেখ মুজিবের সমর্থক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।[১৮১]

'পাকিস্তানের আকাশে যুদ্ধের মেঘ' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখ করে 'দি টাইমস্'-এ বলা হয় পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দিয়ে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা করে শেখ মুজিব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি রেজিমেন্টের সেনারা শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে নেবে বলে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে।[১৮২]

ট্রাজেডি ইন ইস্ট পাকিস্তান'- শিরোণাম দিয়ে 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, যে-কোন মূল্যে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের একগুয়ে মনোভাব শেখ মুজিবকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য করে।.......বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অখন্ড পাকিস্তানের চিন্তাধারা অযৌক্তিক বলে আবার প্রমাণিত হয়েছে।[১৮৩]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়ে 'বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি' ২৭ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেয়। বাংলাদেশ আক্রমণকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের অপসারণের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যও এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে আবদন জানানো হয়।[১৮৪]

ব্রিটিশ রিপোর্ট (২৮ মার্চ) থেকে জানা যায়, ২৬ মার্চের রিপোর্টে মুজিবের যে 'উপস্থিনতার কথা' বলা হয়েছিল, শেখ মুজিব তাই-ই করেছেন অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৮ মার্চের রিপোর্টে বলা হয়, "..... ২৬ মার্চ (অর্থাৎ ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে) স্থানীয় সময় ভোররাত ১ টা ৩০ মিনিটে শেখ মুজিবকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন রেডিও স্টেশন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যান্য রিপোর্ট বলেছে যে, গ্রেফতার হওয়ার বেশ আগেই মুজিবের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে"- অর্থাৎ শেখ মুজিবের সমালোচকদের সমালোচনার জবাবটি দিয়েই শেখ মজিব গ্রেফতার বরণ করেছেন, তিনি বাঙালির কানে স্বাধীনতার বীজ মন্ত্রটি ঢেলে দিয়েই গ্রেফতার হন। যেহেতু ২৫ শে মার্চ প্রায় বিকেল অবধি চলেছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা; যাতে ইয়াহিয়া শেখ মজিবকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যদিও তাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহু আগে থেকেই তিনি (শেখ মুজিব) নিশ্চিত ছিলেন। ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাতে শুরু হয়েছে নীরিহ বাঙালির উপর আক্রমণ, এমতাবস্থায় বাঙালিকে মরণযজ্ঞে ফেলে

Dhaka University Institutional Repository

কোন নেতার পক্ষে পলায়ন করাটা কতটা যুক্তিসংগত তা' ভেবে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শেখ মুজিব সেই নেতা যিনি ছয় দফাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে তার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রীতিতে অর্থাৎ নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। যিনি ইয়াহিয়া খানের মনোভাব নিশ্চিত জেনেও আলোচনার টেবিলে বসেছেন, যদিও তিনি বাঙালিকে অরক্ষণীয় রেখে পশ্চিম পাকিস্তানে যান নি। যদি প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হতো তা' হলে তিনি তা অর্জন করতে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন, ইয়াহিয়া যেখানে ডাকতেন সেখানেই তাঁর ছুটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি নিয়মতান্ত্রিক পন্থাকে লোকচক্ষুর সামনে রেখে অসহযোগ আন্দোলন করেছেন, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলতে বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ভাববাচ্যের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।" কিন্তু ২৫ শে মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তনী সেনাবাহিনীর সেই অতর্কিত হামলার পর তিনি আর ভাববাচ্যের আশ্রয় নেন নি বরং সরাসরি বলেছেন, "আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন"।[১৮৫] ২৬ মার্চ দুপুরের পর (বেলা দুইটা ২:৩০ ঘটিকার সময়) চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আবদুল হান্নান কালুরঘাটে অবস্থিত চট্টগ্রাম বেতার ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত ইংরেজী প্রচার পত্র চট্টগ্রামে বিলি করা হয়। পর দিন (২৭ মার্চ) সন্ধ্যাবেলা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তা বেলাল মোহাম্মাদের অনুরোধ অনুযায়ী মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১৮৬]

অতিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন জন জে. প্যাভেলের উদ্ধৃতি দিয়ে 'দি গভর্নমেন্ট অব ইউ. এস. এ. ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, অপরেশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিভিশন' কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত ২৬ মার্চ (১৯৭১, সময় ১৪টা ৩০ ই.এস.টি) হোয়াইট হাউস সিচুয়েশন রুম-এর রিপোর্টে দেখা যায়, "আজ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দু'অঞ্চল বিশিষ্ট দেশের পূর্ব অঞ্চলকে সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণাদান করার পর পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।........"[১৮৭]

হাবিবুর রহমান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়ে যান (২৭ মার্চ ১৯৭১)। তিনি মিঃ সাদারল্যান্ডের রুমে পৌঁছানের পর মিঃ ব্যারিংটন এসে তাদের সংঙ্গে যোগ দেন। তথায় অবস্থানকালে ঢাকা থেকে আগত টেলেক্স থেকে সমস্ত বিষয়ে অবহত হয়ে মিঃ চৌধুরী স্যাদারল্যান্ডকে বলেন, "এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইলো না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাব, আর পাকিস্তানী সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাব। তাঁরা আমার ছেলে-মেয়েদের হত্যা করেছে। এর প্রতিবিধান চাই।[১৮৮] পরবর্তী নয় মাস তিনি তাই-ই করেছিলেন, বরং তার চেয়েও বেশি কিছু।- এভাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দী জুড়ে ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালিদের দেশের রাজনীতি পর্যালোচনা এবং তাতে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার ফলেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর গৃহীত ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত করা এবং সফলতা লাভ করা সম্ভব ও সহজতর হয়েছিল।[১৮৯]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। 'যুক্তরাজ্য' বলতে এ গবেষণায় বর্তমানের United Kingdom –এর রাষ্ট্রীয় সীমানা বুঝানো হয়েছে, তবে আলোচনার সুবিধার্থে 'যুক্তরাজ্য' শব্দের পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে 'বৃটেন', 'বিলাত' বা 'ব্রিটিশ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২। (ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ, ৬১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা- 'প্রকাশকের কথা' অংশের ৩ পৃষ্ঠা।

(খ) তাজুল মোহাম্মদ, 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ', সাহিত্য প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০১- 'পূর্ব কথন' অংশের ২ পৃষ্ঠা ।

৩। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫- পৃষ্ঠা-৭।

৪। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরিচয় সম্পর্কে আলাদা একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সহকর্মীবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে যথাস্থানে টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

৬। শেখ আব্দুল মন্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', জোৎস্না পাবলিশার্স ১৩/২, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- 'লেখকের বক্তব্য' অংশের ৯ - ১০ পৃষ্ঠা।

৭। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- 'ফ্ল্যাপ পেজ'।

৮। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত -পৃষ্ঠা - ৯৭।

৯। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পর ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্সে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁকে গণসংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository
সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" খেতাবে ভূষিত করেন। সমবেত জনসাধারণ বিপুল করতালিসহকারে তোফায়েল আহমদের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১০। (ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত - পৃষ্ঠা- ৯৭।
(খ) মাসুদা ভাট্টি, 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃটিশ দলিলপত্র', জ্যোৎস্না পাবলিসার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩, ভূমিকা অংশে- পৃষ্ঠা- ২৩।

১১। 'যুক্তরাজ্যে বাঙালিদের প্রবাস জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' অধ্যায়ে প্রবাসী বাঙালিদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২। নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', প্রবাসী পাবলিকেশন্স, সুরমা ম্যানশন, সিলেট, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯৩২।

১৩। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৯৩৩।

১৪। সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)', (প্রথম খন্ড), পৃষ্ঠা–২১, সম্পাদিত, এসিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭।

১৫। যশোবন্ত সিংহ, 'জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা', পৃষ্ঠা- ২-৩, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২য় সংস্করণ (বাংলা), ২০০৯।

১৬। (ক) ঐ, পৃষ্ঠা-৪৪৩।
(খ) সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩১, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

১৭। যশোবন্ত সিংহ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৪৩৫।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪৬।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪৮।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫১।

২১। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১–৩২।

২২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২।

২৩। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৩।

২৪। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩২।

২৫। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৩৩।

২৬। নূরুল ইসলাম, ঐ, ৯৩৪-৯৩৫।

২৭। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩২।

২৮। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৪।

২৯। আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১১-১২ এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

৩০। আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, লন্ডন-ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৮৬।

৩১। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা, (তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬।

৩৩। আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, লন্ডন-ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৮৬।

৩৪। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৪৩।

৩৫। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১১।

৩৬। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১১।

৩৭। (ক) তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫-১৬ ।
(খ) আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ২১০।
(গ) ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৩, ১৭।

৩৮। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩।

৩৯। (ক) তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫-১৬।
(খ) আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ২১০ (তিনি সূত্র উল্লেখ করেছেনঃ বাংলাদেশ নিউজ লেটারের বিভিন্ন সংখ্যা এবং মিসেস আনোয়ারা জাহানের "গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতিঃ ইতিহাস ও কার্যক্রম" শীর্ষক নিবন্ধের)।
(গ) ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪০। (ক) তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫-১৮ ।
(খ) আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ২১০।
(গ) ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১১-১৮।
৪১। (ক) তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫-১৮।
(খ) ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৩।
৪২। শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩৫।
৪৩। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৩।
৪৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩।
৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪ এবং সাক্ষাৎকারে প্রফেসর এম. ডঃ মোফাখখারুল ইসলাম।
৪৬। সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম।
৪৭। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
৪৮। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৪৯। সিলেটে সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
৫০। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৫১। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১২।
৫২। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৬।
৫৩। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ১৬।
৫৪। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৬।
৫৫। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৬।
৫৬। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী এবং আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১২।
৫৭। সিলেটে সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
৫৮। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৭।
৫৯। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৬০। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা-৯৪৪।
৬১। সিলেটে সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
৬২। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য' পৃষ্ঠা- ১২।
৬৩। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
৬৪। (ক) ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- ১৭।
(খ) আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ১৭২।
(গ) শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৬৬।
৬৫। আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ', র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, লন্ডন-ঢাকা- ২০০৯), পৃষ্ঠা- ৮৬।
৬৬। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম ।
৬৭। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৮৮, (মূল সূত্রঃ বজলুর রহমান- 'একটি ঐতিহাসিক বৈঠক'- অধ্যায়, ফয়েজ আহমদ, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ', সাহিত্য প্রকাশ- ঢাকা-১৯৯৪, এম. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু স্মারক গ্রন্থ-তৃতীয় খন্ড- পৃষ্ঠা- ১২৭৩-১২৮১)।
৬৮। প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম-এর সাথে বর্তমান গবেষকের সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

১৯৬২ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক (তিন জনের এক জন, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু) প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম-এঁর আপন চাচাতো ভাই এ. কে. রফিকুল হোসেন-এর বাসায় একটি গোপন সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তথায় উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান, ইত্তেফাকের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং দু'জন উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানী (এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে অর্থায়নকারী ঢাকায় বসবাসরত ব্যবসায়ী)। উক্ত বৈঠকের দিন সিরাজুল ইসলাম -এর এম. এ. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ক্লাসমেটদ্বয় শেখ ফজলুল হক মণি ও ব্যারিস্টার মঈনুল ইসলামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিরাজুল ইসলামের দায়িত্ব ছিল (চাচাতো ভাই-এর বাড়ি হিসেবে) খাবার পরিবেশনের।

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আলোচনা চলছিল ঃ

সিরাজুল ইসলামকে তাঁর চাচাতো ভাই এ. কে. রফিকুল হোসেন আলোচনাকারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন এক মুহূর্তে 'Movement' আর 'Modality' নিয়ে আলোচনার এক ফাঁকে শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু) বলে উঠেন ঃ "আমি পাকিস্তানের সাথে নাই। আমি দেশ স্বাধীন করে ফেলবো। আমি দেশ স্বাধীন করার পক্ষে।"

(তখন) আতাউর রহমান বলেন ঃ "তুই দেশ স্বাধীন করবি, কেমনে দেশ স্বাধীন করবি, 'ক' ?"

শেখ মুজিবুর রহমান ঃ "আতা ভাই, আপনি তো শনি-রবিবারের পলিটিক্স করেন, আর বাকি সময় করেন ওকালতি, এ দিয়ে আপনি এগুলো বুঝবেন না, পলিটিক্স অন্য জিনিস। আমি দেশ স্বাধীন করে ফেলবো।"

তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া ঃ "তুই কয় না, কেমন করে দেশ স্বাধীন করবি, কয় না।"

করাচির ভদ্রলোক বলেন ঃ "দেশ স্বাধীন করা কি এতোই সোজা।"

শেখ মুজিব (বঙ্গবন্ধু) ঃ "Yes. Easy. Very Easy."

করাচির ভদ্রলোক ঃ "How? Place it."

শেখ মুজিব (বঙ্গবন্ধু) ঃ "এটি খুবই সোজা, আমার দরকার শুধু এক টিন কেরোশিন আর একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি।"

সবাই বলে উঠলেন ঃ "এটা আবার কী। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি আর এক টিন কেরোশিন দিয়ে দেশ স্বাধীন করবি, কীভাবে?"

শেখ মুজিব (বঙ্গবন্ধু) ঃ "আপনারা শোনেন, আমি যেভাবে বলি শুনবেন এবং এটাই হবে। আমি তেজগাঁও বিমান বন্দরে যাবো, যেয়ে বিমান বন্দরের পিচের মধ্যে দিব আগুন লাগাইয়া। আগুন লাগাইয়া দিলে এ্যারোপ্লেন আর আসতে পারবে না। ওদের এ্যারোপ্লেন এখানে নামতে পারবে না, আমরা স্বাধীন হইয়া গেলাম।" (সিরাজুল ইসলাম- তখন কিন্তু পাকিস্তানের আর্মি ওখানে লিমিটেড ছিল)।

সিরাজুল ইসলাম ঃ "একথা বলার পরে আট-'ন জন যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন হাসি শুরু হয়ে গেলো, হাসি আর থামে না। কিন্তু আমিতো আর হাসতে পারি না, আমিতে টেবল বয়।" হাসি..........

বর্তমান গবেষক ঃ হাসি............

সিরাজুল ইসলাম ঃ বঙ্গবন্ধু আসলেই সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন এবং শেখ ফজলুল হক মণিসহ কয়েকজনের সমন্বয়ে তৎকালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার জন্য'সিক্রেট গ্রুপ' গঠন করিয়েছিলেন।.....................

৬৯। আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসেরপর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ' পৃষ্ঠা-৮৯।

৭০। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৯০।

৭১। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৯১।

৭২। আবদুল মতিন, ঐ,পৃষ্ঠা-৯১, (মূলসূত্রঃ ফয়েজ আহমদ-'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ')।

৭৩। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৯১, (মূলসূত্রঃ আতিকুর রহমানঃ জাতির পিতা ও পতাকা কাহিনী, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮)।

৭৪। আবদুল মতিন, 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু', ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৩।

৭৫। আবদুল মতিন, 'স্মৃতি চারণঃ পাঁচ অধ্যায়', পৃষ্ঠা- ১৯২।

৭৬। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-৯৪৭-৯৪৮।

৭৭। নূরুল ইসলাম, ঐ, পৃষ্ঠা-৯৪৮।

৭৮। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৬।

৭৯। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ১৩।

৮০। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩৪, প্রথম প্রকাশ।

৮১। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১৩।

৮২। ঐ, ১৪।

৮৩। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৯৪৫।

৮৪। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য' পৃষ্ঠা- ১৯৪।

৮৫। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৯৫১।

৮৬। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪।

৮৭। সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী এবং তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৮।

৮৮। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪।

৮৯। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৯০। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪, (মূল সূত্র ঃ মনজু-রুল হক, 'বিলাতে বাংলার যুদ্ধ', পৃষ্ঠা- ৩৫)।
৯১। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৮ এবং সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৯২। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৯৮০ এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম ও জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৯৩। নূরুল ইসলাম, সাক্ষাৎকারে এবং প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৯৮২।
৯৪। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪।
৯৫। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৯ (মূল সূত্র ঃ "সাপ্তাহিক জনমত", ৩১-১০-১৯৬৯ সংখ্যা) এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
৯৬। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫।
৯৭। (ক) তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৯ এবং সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
(খ) আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫।
৯৮। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২০, (মূল সূত্র ঃ "সাপ্তাহিক জনমত"-২০-০৩-১৯৭০ সংখ্যা)।
৯৯। নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৯৮৮।
১০০। ঐ।
১০১। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২০।
১০২। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২০।
১০৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১।
১০৪। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), ঐ, পৃষ্ঠা - ২-৩।
১০৫। আবদুল মতিন, মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ২১।
১০৬। ঐ।
১০৭। ঐ।
১০৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫।
১০৯। ঐ।
১১০। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৯-১০ (১৯৭০ সালের ২১ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডি থেকে স্যার আলেক ডগলাস হিউমের কাছে পাঠানো সিরিল পিকার্ডের রিপোর্ট)।
১১১। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩৪।
১১২। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৮-৯।
১১৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯।
১১৪। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২২।
১১৫। সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু) ও এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি) এবং আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১৬ (ছাত্র ও যুবকদের সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরীফ, শেখ আবদুল মান্নান, জিয়া উদ্দিন মাহমুদ, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, সাইদুর রহমান মিয়া, গৌরাঙ্গ সাহা, এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি), একরামুল হক, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ ও ওয়ালী আশরাফ)।
১১৬। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬।
১১৭। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১১।
১১৮। ঐ।
১১৯। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২২-২৩।
১২০। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম এবং ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩।
১২১। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪
১২২। সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং আবদুল মতিন 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১৬।
১২৩। আসিফ রশীদ, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকার গোপন দলিল', সময় প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, ঢাকা- পৃষ্ঠা- ১৩-১৪।
১২৪। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৪
১২৫। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ১৭।
১২৬। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

১২৭। ঐ।
১২৮। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১২।
১২৯। তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২২।
১৩০। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭।
১৩১। ঐ।
১৩২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮।
১৩৩। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১২।
১৩৪। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৫-২৬।
১৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬।
১৩৬। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও এ. এইচ. এম. শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি) এবং আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ২১০।
১৩৭। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮।
১৩৮। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৭-২৮।
১৩৯। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৫।
১৪০। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৫।
১৪১। "ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম ?

নির্বাচনের পরে (নির্বাচনে), বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দ্যান। আমাদের ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি বসবে, আমারা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তোলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সংগে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস- বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস- মুমূর্ষ নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস- এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমারা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান, মার্শাল-ল জারী করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে, যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন; তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলা নয়; পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন- ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে আমরা এ্যাসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এ্যাসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমন কি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যেয্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও, একজন যদিও সে হয়, তার ন্যেয্য কথা আমরা মেনে নেবো।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন; বলে গেলেন, যে আলোচনার দরোজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের সংগে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে, তাহলে- কসাইখানা হবে এ্যাসেমব্লি। তিনি বললেন যে যাবে, তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এ্যাসেমব্লিতে আসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত, দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এ্যাসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এ্যাসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে, এ্যাসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা, সবকিছু বন্ধ করে দ্যান। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে, আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে - তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা বাংগালিরা যখই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

দেখা হয়; তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, কীভাবে, আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। উনি বললেন, আমি নাকি বলেছি আগামী ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমিতো অনেক আগেই বলেছি, কিসের রাজনীতি, কার সংগে বসবো ? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সংগে বসবো ? হঠাৎ, আমার সংগে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা, গোপনে বৈঠক করে, যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে এ্যাসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আর কিছুতেই মজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এ্যাসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে; প্রথম- সামরিক আইন, মার্শাল-ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর- জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তার পরে বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এ্যাসেমব্লিতে বসতে পারবো কি, পারবো না। এর পূর্বে এ্যাসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই, যে আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেই জন্য; সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সে গুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে, শুধু; সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট, দপ্তরগুলো- ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর (লোকদেরকে) হত্যা করা হয়- তোমাদের উপর, কাছে আমার অনুরোধ রইলো; প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তা-ঘাট, যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। সৈনিক ভাইদের বলি, আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালবার চেষ্টা কোরো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি- তখন কেউ আমাদের দুমাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো; যারা পারেন; আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য, টাকা পয়সা, পৌঁছিয়ে দেবেন। আর, এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়া দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার, এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না।

শোনেন, মনে রাখবেন; শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্ম-কলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাংগালী- নন-বাংগালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই; তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা; যদি রেডিওতে আমদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাংগালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাংগালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠ হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়- বাংগালিরা বুঝে-শুণে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা; রক্ত যখন দিয়েছি,

Dhaka University Institutional Repository

রক্ত আরও দেব; এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাহআলাহ্। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

সূত্রঃ টেপ রেকর্ডার।

১৪২। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১২-১৩।
১৪৩। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ১৮।
১৪৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯।
১৪৫। ঐ।
১৪৬। ঐ।
১৪৭। ঐ।
১৪৮। ঐ।
১৪৯। ঐ।
১৫০। সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২০।
১৫১। ঐ।
১৫২। ঐ।
১৫৩। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৪।
১৫৪। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২০।
১৫৫। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৪-১৫।
১৫৬। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২০।
১৫৭। ঐ।
১৫৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১।
১৫৯। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৯।
১৬০। সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২৯।
১৬১। এ সম্পর্কে আলাদা একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
১৬২। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩০।
১৬৩। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা- ২০।
১৬৪। ঐ।
১৬৫। সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং আবদুল মতিন, এ, পৃষ্ঠা- ২০।
১৬৬। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২০।
১৬৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১।
১৬৮। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫।
১৬৯। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২২।
১৭০। ঐ।
১৭১। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৩০।
১৭২। আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২।
১৭৩। ঐ, পৃষ্ঠা- (১-২)।
১৭৪। ঐ।
১৭৫। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪।
১৭৬। ঐ, (এই সভায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, তাসাদ্দুক আহমদ, একরামুল হক, হাজী নিসার আলী, আবুল বসার ও মোহাম্মদ ইসহাক)।
১৭৭। ঐ।
১৭৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫।
১৭৯। সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪।
১৮০। আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬।
১৮১। ঐ।
১৮২। ঐ।
১৮৩। ঐ।
১৮৪। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫। মাসুদা ভাট্টি, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫-১৬।

১৮৬। (ক) বেলাল মোহাম্মদ, 'স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্র', পৃষ্ঠা- ৪৬-৬৪, দ্বিতীয় প্রকাশ–ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।

(খ) ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিয়োজিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালিক তাঁর 'উইটনেস টু স্যারেন্ডার' (Oxford University Press, Karachi, 1977) গ্রন্থে বেতারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি নিজে তা শোনেন নি। ভারতে নিয়োজিত 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর তৎকালীন বিশেষ সংবাদদাতা ডেভিড লোশাকের বই 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' থেকে তিনি নিম্নবর্ণিত উদ্ধৃতি দেন ঃ যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো ঠিত সেই মুহূর্তে "সরকারী মালিকানাধীন পাকিস্তান রেডিয়োর তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর বাণী নিশ্চই ইতঃপূর্বে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়েছিল।"

[সূত্র ঃ আবদুল মতিন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব- কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়', পৃষ্ঠা-১৯।]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৫দিন পর বঙ্গবন্ধু 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এর বিশেষ প্রতিনিধি সিডনী শোন বার্গের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতা ঘোষণা রেকর্ড করা হয়েছিল বলে প্রকাশ করেন।

[সূত্র ঃ 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' -১৬ই জানুয়ারী -১৯৭২-এর সূত্র উল্লেখ করেছেন আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৫।]

Declacration of Independence:

"This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bengladesh wherever you might be and with wherever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bengladesh and final victory is achieved."

[সূত্র ঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খন্ড', তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১।]

১৮৭। আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-১।

১৮৮। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- (৩-৫)।

১৮৯। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে রাজিউল হাসান (রঞ্জু) এবং তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত- ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন এবং ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গঃ পরিচয় ঃ

২.১ পটভূমি ঃ

সময় এবং আর্থিক সংকটের কারণে লন্ডনে যেতে না পারা এবং যুক্তরাজ্য আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও জ্ঞাত ২২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এবং শিরোণামভুক্ত বিষয়োল্লিখিত বিভিন্ন প্রকাশনা আমার হাতে থাকা সত্ত্বেও এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ সম্পের্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা সত্ত্বেও এ্যাকশন কমিটি ভিত্তিক কে কোন কমিটিতে ছিলেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে সাজানো সম্ভবপর হয়নি। এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে এ্যাকশন কমিটি ওয়ারী এবং আলাদাভাবে যতোটুকু সম্ভব তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

২.২ কেন্দ্রীয় সংগঠন ঃ

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের নবনির্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণা জারি করেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিরা ইয়াহিয়া খানের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৪ মার্চ লন্ডন এক গণসমাবেশের আয়োজন করে। যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের উদ্যোগে হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে ১০ হাজারেরও বেশি বাঙালি যোগদান করে। হাইড পার্ক থেকে বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খানের নেতৃত্বে লাউন্ডস স্কোয়ারে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়ে পূর্ব বাংলার দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

এই সমাবেশের পর প্রবাসী বাঙালিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁরা প্রায় ১৫টি শহরে 'এ্যাকশন কমিটি' গঠন করেন। এই শহরগুলোর মধ্যে ছিল লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার, লিডস ও ব্রাডফোর্ড। ইতোপূর্বে বার্মিংহামে সংগঠিত পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি নাম গ্রহণ করে। এই কমিটি বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের বীভৎস হত্যাকান্ড সম্পর্কে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই কমিটির উদ্যোগে ২১ মার্চ বার্মিংহামে একটি গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে ৭ হাজারেরও বেশি বাঙালী ও তাদের দাবির সমর্থকরা যোগদান করেন।

২৬ মার্চের পর বিভিন্ন পেশাজীবী এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিরাও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটি (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ), বাংলাদেশ উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (মহিলা সমিতি), বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন, এ্যাকশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ এবং ওমেগা। [সূত্র ঃ Bangladesh Newsletter, London, 30 March, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন লিখেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৫৫।] এ ব্যাপারে কিছু বিতর্ক আছে যা বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২.২.১ কাউন্সিল ফর দ্যা পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ. কে. (কভেন্ট্রি সম্মেলনে বিলুপ্ত হয়) ঃ

ঠিকানা ঃ মহাঋষি রেস্তোঁরা, পোভল্যান্ড স্ট্রীট, লন্ডন (প্রতিষ্ঠাকালীন); পরবর্তীকালেঃ 58 BERWICK ST. LONDON, W.1

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

২৬ মার্চ হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে যৌথ নেতৃত্বদানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ২৯ মার্চ (সোমবার) লন্ডনর পোল্যান্ড স্ট্রীটে অবস্থিত 'মহাঋষি' রেস্তোরাঁয় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.' শীর্ষক একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। গাউস খান এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। উইন্ডমিল স্ট্রীটে অবস্থিত 'লাক্ষ্ণৌ' রেস্তোরাঁর মালিক শওকত আলী তাঁর রেস্তোরাঁর দু'টি রুম বিনা ভাড়ায় কমিটির অফিস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দেন। তাছাড়া অফিসের কাজে বিনা খরচে একটি টেলিফোন ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা লন্ডনের বাইরের কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন কভেন্ট্রি ও বার্মিংহামসহ মিডল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে যান। শেখ আবদুল মান্নান ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা এবং লন্ডনের চারপাশের শহরে যেসব কমিটি ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গাউস খান নিজে ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারসহ উত্তরাঞ্চলের কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [সূত্র : শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-১৭-১৮।]

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১
কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ দ্যা ইউ. কে.ঃ
১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তালিকা ঃ

নাম	পদবী
গাউস খান	সভাপতি
শেখ আবদুল মান্নান	সেক্রেটারি
আবদুল হামিদ	কোষাধ্যক্ষ
ব্যারিষ্টার শাখাওয়াত হোসেন	সদস্য
আমীর আলী	সদস্য
শামসুল মোর্শেদ	সদস্য
মোঃ আইয়ুব আলী	সদস্য
ব্রাডফোর্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
শেফিল্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
গ্লাসগোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
বার্মিংহামের একজন প্রতিনিধি	সদস্য

[সূত্র ঃ আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-২৮-৩০; ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-৩৫ ।]

২.২.২ এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.ঃ
ঠিকানাঃ কভেন্ট্রি শহরের স্থানীয় একটি মিলনায়তন (প্রতিষ্ঠাকালীন); পরবর্তীকালেঃ ১১, গোরিং স্ট্রীট, লন্ডন, E.C-3 ।
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২
কভেন্ট্রি সম্মেলনে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিঃ

নাম	পদ
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	উপদেষ্টা
বেগম লুলু বিলকিস বানু	সভাপতি
আজিজুল হক ভূঁইয়া	সদস্য
কবির চৌধুরী	সদস্য
মনোয়ার হোসেন (বিচারপতি)	সদস্য
শেখ আবদুল মান্নান	সদস্য
শামসুর রহমান	সদস্য

[সূত্র ঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড' পৃষ্ঠা-২৮-এ উল্লেখিত কভেন্ট্রিতে বাঙালিদের সভার প্রস্তাবলী এবং শেখ আব্দুল মান্নান, শেখ আব্দুল মন্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-২৭ ।]

২.২.৩ স্টিয়ারিং কমিটি অফ দ্যা এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ. কে.ঃ
ঠিকানাঃ ১১, রোমিলি স্ট্রীট, লন্ডন (প্রতিষ্ঠাকালীন); পরবর্তীকালেঃ ১১, গোরিং স্ট্রীট, লন্ডন, E.C-3 ।
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

২৩ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের আর্টিলারি প্যাসেজে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিভিন্ন অ্যাকশন কমিটি প্রতিনিধিরা একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে পরদিন (২৪ এপ্রিল) কভেন্ট্রি শহরে একটি প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে গঠিত 'এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক ইন দি ইউ. কে.' নামের প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা জন্য ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে আজিজুল হক ভুঁইয়া কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন। তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সময় দেয়া সম্ভব না হওয়ায় কিছুকাল পর শেখ আবদুল মান্নান কমিটির আহবায়ক এবং অফিস পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্টিয়ারিং কমিটির প্রধান দুটি দায়িত্ব ছিল: ক. প্রবাসে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং খ. বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটিকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা। স্টিয়ারিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শেখ আবদুল মান্নান বলেনঃ

"আমাদের প্রথম দায়িত্ব সাফল্যজনকভাবে আমরা পালন করেছি। কিন্তু দ্বিতীয় দায়িত্ব পালনে আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছি। এজন্য বিচারপতি চৌধুরী বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন। তিনি ছিলেন আমাদের উপদেষ্টা। স্টিয়ারিং

Dhaka University Institutional Repository
কমিটির আহ্বায়ক এর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমিও ব্যক্তিগতভাবে সমালোচিত হয়েছি। কেউ কেউ এজন্য আমাকে দায়ীও করেছেন কেন আমরা ব্যর্থ হয়েছি, সে সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দল ও মতের সমর্থকরা বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে বার বার দেখা করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার জন্য জানাচ্ছিলেন। তাদের চিন্তাধারা এবং উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা সম্মিলিত আন্দোলনের পরিপন্থি হবে বলে বিচারপতি চৌধুরী আসঙ্কা করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে অবশ্যম্ভাবী আত্মকলহের ফলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখেন, বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন হলে আমরা যে এক জাতি, আমাদের এটাই দাবী -স্বাধীনতা, তা থাকবে না।'

শেখ আবদুল মান্নান প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, স্টিয়ারিং কমিটি পাঁচজন সদস্য কাজের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। এই অঞ্চলগুলো ছিল ঃ ক. ইয়র্কশায়ার ও ব্রিটেনের উত্তরাঞ্চল, খ. ল্যাঙ্কশায়ার, গ. মিডল্যান্ডস এবং ঘ. ও দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ড। এই চারজন নেতা এবং তাঁদের প্রত্যেকের একজন সহকর্মী স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে অনুষ্ঠিত একাধিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। আঞ্চলিক নেতাদের মধ্যে এ. এম. দফাদার, হাজী আবদুল মতিন, জগলুল পাশা ও গাউস খান। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারেননি। লন্ডন এলাকার নেতৃবৃন্দ আরও ছ'জন আঞ্চলিক প্রতিনিধি নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি পুনর্গঠনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করে নতুন কমিটি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিচারপতি চৌধুরী শেখ মান্নানের কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন :

"আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখছি, আপনি যাদের নামের তালিকা দিয়েছেন, তাদের 'কোঅপ্ট' করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং কিছুতেই আপনাদের একতা আর থাকবে না। আর আমি কোনো কাজেই লাগবো না।...'প্যান্ডোরা'র বাক্স একবার খুলে দেয়া হলে আর বন্ধ করা যাবে না । আপনারা 'প্যান্ডোরা'র বাক্স খুলে দেবেন, এটা হবে না।"

বিচারপতি চৌধুরী আরও বলেন, ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব দেশে তিনি গিয়েছেন, সেখানে দেখেছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের সঙ্গে দেখা করেছেন। আন্দোলনের একটা 'ইমেজ'(ভাবমূর্তি) তিনি গড়ে তুলেছেন এবং এই আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

[সূত্র : শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৪২-৪৪ ।]

সারণি-৩

স্টিয়ারিং কমিটি অব দি একশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে. ঃ

৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঃ

নাম	পদ
আজিজুল হক ভূঁইয়া	আহবায়ক
কবির চৌধুরী	সদস্য
মনোয়ার হোসেন (বিচারপতি)	সদস্য
শেখ আব্দুল মান্নান	সদস্য আজিজুল হক ভূঁইয়ার অনুপস্থিতি কালে আহবায়ক
শামসুর রহমান	সদস্য

[সূত্র ঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড' পৃষ্ঠা-২৮-এ উল্লেখিত কভেন্ট্রিতে বাঙালিদের সভার প্রস্তাবলী এবং শেখ আব্দুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-২৭ ।]

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ পেশাজীবী সংগঠনসমূহ ঃ

২.৩.১ বাংলাদেশ ষ্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি ইন দি ইউ. কে. (কেন্দ্রীয়) ঃ

ঠিকানাঃ পাকিস্তান স্টুডেন্ট্স হোস্টেল (প্রতিষ্ঠাকালীন); পরবর্তীকালেঃ ৩৫, গমেজ বিল্ডিং, ১২০, হবর্ন, লন্ডন EC1.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সারণি-৪

১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঃ

নাম	পদ
এ. জেড মোহাম্মাদ হোসেন (মঞ্জু)	আহবায়ক (১)
খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর)	আহবায়ক (২)
নজরুল ইসলাম	আহবায়ক (৩)
সুলতান মাহমুদ শরীফ (বর্তমানে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি)	সদস্য
আনিস আহম্মেদ	সদস্য
শামসুল আবেদীন	সদস্য
এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বর্তমানে বিচারপতি)	সদস্য
আব্দুর রউফ	সদস্য
এ.টি.এম. ওয়ালী আশরাফ	সদস্য
আখতার ইমাম	সদস্য
ডক্টর এলাহী	সদস্য

[টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেনের দেয়া তালিকায় ৭ ই মার্চ (১৯৭১) তারিখে গঠিত কমিটিতে ১১ সদস্যের মধ্যে শফিউদ্দিন মাহমুদ বুলবুল, জিয়া উদ্দিন মাহমুদ, লুতফর রহমান, সাহজাহান ও কামরুল ইসলামের নাম আছে। পরবর্তীতে এর সদস্য সংখ্যা ২১ এ বৃদ্ধি করা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, পৃষ্ঠা নং- ১৬৫। অন্যদিকে আব্দুল মতিনের দেয়া তালিকায় উপরোক্ত নাম গুলোর উল্লেখ নেই। তবে এদের নামের স্থানে আনিস আহম্মদ, শামসুল আবেদীন, আব্দুর রউফ ও ডক্টর এলাহীর নাম সহ উল্লেখিত ১১ জনের নামের তালিকা পাওয়া যায়। আব্দুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-২১০।]

২.৩.২ বাংলাদেশ উইমেন্স এ্যাসোসিয়েশন ইন ইউ. কে. (কেন্দ্রীয়) ঃ

ঠিকানা ঃ 103, LEADBURY DOAD, LONDON, W. 11. TELt 01-727-6578.

[সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (চতুর্থ খন্ড), পৃষ্ঠা-৬৫৮।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সারণি-৫

বাংলাদেশ উইমেন্স এ্যাসোসিয়েশন ইন ইউ. কে. (কেন্দ্রীয়) ঃ

নাম	পদ
জেবুন্নেছা বখ্‌শ	সভাপতি
আনোয়ারা জাহান	জেনারেল সভাপতি
খালেদা উদ্দিন	ট্রেজারার
মিসেস ফেরদৌস রহমান	সদস্য, প্রতিষ্ঠাকালীন সজসংযোগের দয়িত্বে ছিলেন।
মিসেস সুফিয়া রহমান	সদস্য, প্রতিষ্ঠাকালীন জেনারেল সেক্রেটারি
বেগম লুলু বিলকিস বানু	সদস্য
জেবুন্নেসা খায়ের	সদস্য
ডাঃ হালিমা আলম	সদস্য
সুর‍্যাইয়া বেগম	সদস্য
রাবেয়া ভূইয়া	সদস্য
মনোয়ারা বেগম	সদস্য
বদরুন্ন নেছা পাশা	সদস্য
সাবেকা চৌধুরী	সদস্য
তাহেরা কাজী	সদস্য
শেফালী আনোয়ার	সদস্য
জোৎস্না হাসান	সদস্য
রাপিয়া চৌধুরী	সদস্য

[সূত্র ঃ আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা -১৬৫; ডঃ খন্দকার মোশররফ হোসেন, পৃষ্ঠা-১৩,২১৩।]

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৩ বাংলাদেশ পিপিলস্ কালচারাল সোসাইটি (কেন্দ্রীয়) ঃ

ঠিকানাঃ 59, SEYMOUR HOUSE, TAVISTOCK PLACE, LONDON-W. C. 1.

[সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (চতুর্থ খন্ড), পৃষ্ঠা-৬৬৮ ।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৬

বাংলাদেশ পিপিলস্ কালচারাল সোসাইটি (কেন্দ্রীয়) ঃ

নাম	পদ
ডক্টর এনামুল হক	সভাপতি
মিসেস মুন্নী রহমান (শাহজাহান)	সেক্রেটারি
মিসেস ফাহমিদা হাফিজ (মঞ্জু)	সদস্য
এম,এ, রউফ	সদস্য
মিসেস রুনী চৌধুরী	সদস্য
জেবুন্নেছা খায়ের	ট্রেজারার

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৩, আবদুল মতিন, মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা - ১৬১ ।]

২.৩.৪ বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন ইন দি ইউ. কে. (কেন্দ্রীয়) ঃ

ঠিকানাঃ LONDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৭

বাংলাদেশ মেডিফেল এ্যাসোসিয়েশন ইন দি ইউ. কে. (কেন্দ্রীয়) ঃ

নাম	পদ
ডাঃ আবদুল হাকিম	সভাপতি
ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী	সদস্য
ডাঃ মোশাররফ হোসেন জোয়ার্দার	সদস্য
ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদার	সদস্য
ডাঃ আহমদ	সদস্য
ডাঃ সাইদুর রহমান	সদস্য
ডাঃ সামসুল আলম	সদস্য

[সূত্র ঃ আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৬০; ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৪ ।]

২.৩.৫ বাংলাদেশ কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন (মোহাম্মদ আলী) ঃ

ঠিকানাঃ TOTTENHAM ST. LONDON, W.1.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৮

বাংলাদেশ কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন (মোহাম্মদ আলী) ঃ

নাম	পদ
মোহম্মদ আলী	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৪ ।]

২.৩.৬ বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশন (কেন্দ্রীয়) ঃ

ঠিকানাঃ 11, GLADSTONE AVE. LONDON, E.12.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৯

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশন (কেন্দ্রীয়) ঃ

নাম	পদ
এম. এন. জামান	সভাপতি
মোসাব্বির আলী	সেক্রেটারি
চেরাগ আলী	জয়েন্ট সেক্রেটারি
তাইফুর হোসাইন	সদস্য

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা -২১৭ ।]

২.৩.৭ বার্মিংহাম বাংলাদেশ ইওথ সোসাইটি (কেন্দ্রীয়) ঃ

ঠিকানাঃ বার্মিংহাম ।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১০

বার্মিংহাম বাংলাদেশ ইওথ সোসাইটি (কেন্দ্রীয়) ঃ

নাম	পদ
দেওয়ান আল মনসুর (রাজা)	সভাপতি
নবির আহম্মেদ	সেক্রেটারি
জমশেদ আলী	সদস্য
মোঃ ইউসুফ মিয়া	সদস্য
নজরুল ইসলাম	সদস্য
জব্বার খান	সদস্য

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা -১২৮ ।]

২.৩.৮ ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ ম্যানচেস্টার ।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১১

ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
মাসুদ হোসাইন	সভাপতি
জাফিউদ্দিন আহমেদ	সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২.৩.৯ এ্যাকশন বাংলাদেশ ক্লিয়ারিং হাউজ ঃ

ঠিকানাঃ LONDON. ঃ ক্যামডেন এলাকায় মারিয়েটার বাড়িতে ।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১২

এ্যাকশন বাংলাদেশ ক্লিয়ারিং হাউজ ঃ

নাম	পদ
পল কনেট	
মারিয়েটা প্রকোপে	

[সূত্রঃ আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য',পৃষ্ঠা-১৬২ ।]

২.৪ বিভিন্ন শহর কেন্দ্রিক এ্যাকশন কমিটিসমূহ ঃ

২.৪.১ লন্ডন কেন্দ্রিক এ্যাকশন কমিটি ঃ

২.৪.১.১ এ্যাকশন কমিটি (লন্ডন) ফর দ্যা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে. ঃ

ঠিকানাঃ 58, BERWICK ST. LONDON, W.1.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

Dhaka University Institutional Repository

কভেন্ট্রি সম্মেলন থেকে কোচযোগে লন্ডন ফিরে আসার পথে শেখ আবদুল মান্নান 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.' ভেঙ্গে দিয়ে বৃহত্তর লন্ডন এলাকার জন্য কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির একটি শাখা গঠন প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের হ্যাসেল স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' গঠন হয়। গাউস খান ও ব্যারিস্টার সাখাওয়াতে হোসেন যথাক্রমে এই কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। কিছুকাল পর লন্ডন এ্যাকশন কমিটি একটি সংবিধান প্রনয়ণ করে গ্রেটার লন্ডন নাম গ্রহণ করে। সংবিধান প্রনয়ণ করার পর বিভিন্ন কারণে কমিটির সদস্যদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা দেয়। সাখাওয়াত হোসেন সেক্রেটারী পদ থেকে ইস্তেফা দেন। আমির আলীও কমিটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। [সূত্র : শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-২৭-২৮।]

সারণি-১৩

এ্যাকশন কমিটি (লন্ডন) ফর দ্যা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন দি ইউ.কে (বারউইক স্ট্রিট, লন্ডন)ঃ

নাম	পদ
গাউস খান	সভাপতি
শাখাওয়াত হোসেন	সেক্রেটারি
তৈয়াবুর রহমান	সদস্য
আতাউর রহমান	সদস্য
মোহাম্মাদ ইসহাক	সদস্য
আমীর আলী	সদস্য

[সূত্রঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৪]

২.৪.১.২ এ্যাকশন কমিটি ফর বাংলাদেশ ইন নর্থ এন্ড নর্থ-ওয়েস্ট লন্ডন ঃ

ঠিকানাঃ 33, DGMAR RD. LONDON, N.22.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১৪

এ্যাকশন কমিটি ফর বাংলাদেশ ইন নর্থ এন্ড নর্থ-ওয়েস্ট লন্ডন ঃ

নাম	পদ
এস. এম. আইয়ুব আলী	সভাপতি

[সূত্রঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৪।]

২.৪.১.৩ বাংলাদেশ এ্যকশন কমিটি ইন গ্রেট ব্রিটেন, স্ট্রেথাম রোড (লন্ডন) ঃ

ঠিকানাঃ 68, STREATHAM HIGH RD, LONDON, S.W.16.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

২৬ মার্চ সন্ধ্যার পর পাকিস্তান স্টুডেন্টস হোস্টেলে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভার পর আহমদ হোসেন জোয়ারদার (এ. এইচ. জোয়ারদার) কয়েকজন সঙ্গীসহ দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের ২৪ নম্বর স্ট্রেথাম হাই স্ট্রীটে বি. এইচ তালুকদারের 'কুলাউড়া' তন্দুরি রেস্তোরাঁর উপরতলায় অনুষ্ঠিত এক সভায় যোগ দেন। পূর্ব বঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার পর মি. তালুকদারের নেতৃত্বে স্ট্রেথাম এ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির উৎসাহী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নুরুল হক চৌধুরী, এ. এইচ. জোয়ারদার, সোহেল ইবনে আজিজ, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, মোহাম্মদ রফিক এবং এ. ইসলাম। মি.তালুকদার রেস্তোরাঁর ওপরতালা বিনা ভাড়ায় এ্যাকশন কমিটির অফিস হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

[সূত্র : 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ' মজাদ্-দুল হক, পৃষ্ঠা-৪৩-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন লিখেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৫৬।]

সারণি-১৫

বাংলাদেশ এ্যকশন কমিটি ইন গ্রেট ব্রিটেন, স্ট্রেথাম রোড (লন্ডন) ঃ

নাম	পদ
বি.এইচ. তালুকদার	সভাপতি
আহমদ হোসেন জোয়ারদার	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৪।]

২.৪.১.৪ ওয়েস্টমিনিস্টার, লন্ডন বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 23, MIDFORD GARDENS, WESTMINISTER LONDON, W.1.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৬

ওয়েস্টমিনিস্টার, লন্ডন বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
আবদুল রহিম চৌধুরী	কনভেনর
শরীফুল ইসলাম	জয়েন্ট কনভেনর

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২.৪.১.৫ ক্যালেন্ডানিয়ান রোড ইজলিংটন লন্ডন কমিটি ফর বাংলাদেশ ঃ

ঠিকানাঃ 189, CALEDONIAN ROAD, ISLINGTON, LONDON, N.1.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১৭

ক্যালেন্ডানিয়ান রোড ইজলিংটন লন্ডন কমিটি ফর বাংলাদেশ ঃ

নাম	পদ
ই. রহমান	জেনারেল সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২.৪.১.৬ কমার্শিয়াল রোড, লন্ডন ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ ঃ

ঠিকানাঃ 91, COMMERCIAL ROAD, LONDON, E.1.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১৮

কমার্শিয়াল রোড, লন্ডন ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ ঃ

নাম	পদ
এম. এ. সামাদ খান	
আর. ইউ. আহমেদ	
এ. এইচ. জোয়ারদার	
এ. মোতালিব	
মোঃ আবদুল রব	

[সূত্র ঃ সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২.৪.১.৭ বেজওয়াটার ব্রাঞ্চ, লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপলস্ রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ঃ

ঠিকানাঃ BAYSWATER, LONDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-১৯

বেজওয়াটার ব্রাঞ্চ, লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপলস্ রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ঃ

নাম	পদ
মনজুর মোর্শেদ তালুকদার	সভাপতি
কাজী মজিবুর রহমান	সেক্রেটারি
আবদুল রাজ্জাক	
সাখাওয়াৎ হোসেন	

[সূত্র ঃ সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২.৪.১.৮ জেরার্ড স্ট্রিট, লন্ডন বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসিস ঃ

ঠিকানাঃ JERARLD STREET, LONDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২০

জেরার্ড স্ট্রিট, লন্ডন বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসিস ঃ

নাম	পদ
নাবির উদ্দিন	সভাপতি
মোঃ বুরহান উদ্দিন	সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.১.৯ ইস্ট লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ EAST LONDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২১

ইস্ট লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
তৈয়াবুর রহমান	
শামসুর রহমান	
মতিউর রহমান চৌধুরী	
হাজী নেসার আহমেদ	
আমীর আলী	
জিল্লুর রহমান	
সিরাজুল হক	
আতাউর রহমান খান	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৬ ।]

২.৪.১.১০ সাউথ লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ SOUTH LONDON.

466276

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২২

সাউথ লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
বি.এইচ তালুকদার	সভাপতি
নূরুল হক চৌধুরী	
নৃপেন্দনাথ ঘোষ	
মোহাম্মদ রফিক	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান',পৃষ্ঠা-২১৬ ।]

২.৪.১.১১ সাউথ-ওয়েস্ট লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ SOUTHWEST LONDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সারণি-২৩

সাউথ-ওয়েস্ট লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
সৈয়দ আবুল আহসান	
ফায়সারুল ইসলাম	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

২.৪.১.১২ কভেন্ট্রি এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ CVENTRY, LONDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২৪

কভেন্ট্রি এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
শামসুল হুদা চৌধুরী	
মতছিম আলী	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.১.১৩ রিলিফ কমিটি লন্ডন/ ফরদহাম স্ট্রিট লন্ডন রিলিফ কমিটি
ঠিকানাঃ 5, FORDHAM ST. LONDON, E.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.১৪ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (মতিউর রহমান) ঃ
ঠিকানাঃ 24, WIDEGATE ST. LONDON, E.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২৫
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (মতিউর রহমান) ঃ

নাম	পদ
মতিউর রহমান	

২.৪.১.১৫ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 103, LEDBURY ROAD, LONDON, W.11.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.১৬ বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ HESSEL ST. LONDON, E.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.১৭ বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি
ঠিকানাঃ 67, BRICK LANE, LONDON, E.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.১৮ বাংলাদেশ যুব সংঘ ঃ
ঠিকানাঃ 85, YORK ST. LONDON, W.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.১৯ ডারলেশটন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 76, STOKE NEWINGTON RD. LONDON N.16.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.২০ ব্রিকলেন লন্ডন বাংলা ফ্যাশন এন্ড বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 169, BRICK LANE, LONDON, E.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২.৪.১.২১ মৌলভী বাজার জনসেবা সমিতি ঃ
ঠিকানাঃ 172, WARDOUR ST. LONDON, W.1.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।
[সূত্র ঃ ২.৪.১.১৩, ২.৪.১.১৫-২.৪.১.২১- এ উল্লেখিত কমিটি গুলোর নাম নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা' পৃষ্ঠা-৯৩১-১০৩৬ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।]

২.৪.১.২২ এ্যাকশন কমিটি ফর বাংলাদেশ ইন নর্থ লন্ডন ঃ
ঠিকানাঃ NORTH LONDON,
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সারণি-২৬
এ্যাকশন কমিটি ফর বাংলাদেশ ইন নর্থ লন্ডন ঃ

নাম	পদ
সিরাজুল ইসলাম (প্রফেসর ডঃ)	সহ-সভাপতি

[সূত্রঃ সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.২ অন্যান্য শহর কেন্দ্রিক এ্যাকশন কমিটি ঃ

২.৪.২.১ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (স্মলহীথ, বার্মিংহাম) ঃ
ঠিকানাঃ 52, WORDSWORTH ROAD, SMALLHEATH, BIRMINGHAM-10.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২৭
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (স্মলহীথ, বার্মিংহাম) ঃ

নাম	পদ
জগলুল পাশা	সভাপতি
এম. আজিজুল হক ভূঁইয়া	সেক্রেটারি
আফরোজ মিয়া	সদস্য
ইসরাইল মিয়া	
এম. ইউ. আহমেদ	
হাবিবুর রহমান	
আবুল হাসান	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৪]

২. ৪.২.২ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (পোর্টসমাউথ) ঃ
ঠিকানাঃ 6, BRITAIN ROAD, PORTSMOUTH.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২৮
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (পোর্টসমাউথ) ঃ

নাম	পদ
এম. এ. রাজ্জাক খান	সভাপতি
গিয়াসউদ্দিন	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
সাজেদুর রহমান চৌধুরী	সেক্রেটারি
টি, এ, তালুকদার	সদস্য
নিজার আহমেদ	সদস্য

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৪]

২. ৪.২.৩ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ইন স্কটল্যান্ড (এলডনস্ট্রিট, গ্লাসগো) ঃ
ঠিকানাঃ 5, ELDON STREET,GLASGOW.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-২৯
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ইন স্কটল্যান্ড (এলডনস্ট্রিট, গ্লাসগো) ঃ

নাম	পদ
ডঃ মোজাম্মেল হক	সহ-সভাপতি
ডঃ রফিকউদ্দিন আহমেদ	
কাজী এনামূল হক	

সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৪

২. ৪.২.৪ বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট, লীডস (লিস্টারগ্রোভ) ঃ
ঠিকানাঃ 10, LIESTER GROVE, LEEDS.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩০

বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট, লীডস (লিস্টারগ্রোভ) ঃ

নাম	পদ
মিয়া মোস্তাফিজুর রহমান	সভাপতি
খায়রুল বাশার	
মোঃ নূরুদ্দিন	
ডঃ ফজলুল ফরিদ	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৪ ।]

২. ৪.২.৫ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি এসেক্স (ক্যামব্রিজ, এসেক্স, সাফোক এন্ড নরউইচ) ঃ

ঠিকানাঃ 70/A, HIGH STREET, COLCHESTER, ESSEX.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩১

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি এসেক্স (ক্যামব্রিজ, এসেক্স, সাফোক এন্ড নরউইচ) ঃ

নাম	পদ
এম. লোকমান	সহ-সভাপতি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২. ৪.২.৬ সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ ঃ

ঠিকানাঃ SOUTHALL.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩২

সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ ঃ

নাম	পদ
আবদুস সালাম চৌধুরী	সভাপতি
এম. ইউ আহসান	জেনারেল সেক্রেটারি
আকবর আলী	সহ-সভাপতি
সাদিক আলী	সহ-সভাপতি
সাজ্জাদুর রহমান	ট্রেজারার
নূর হোসাইন	সাংগঠনিক

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৫]

২. ৪.২.৭ বাংলাদেশ রিলিফ এ্যাণ্ড এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 19, MOSLEY ROAD, BIRMINGHAM.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩৩

বাংলাদেশ রিলিফ এ্যাণ্ড এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
আবদুস সালাম খান	জেনারেল সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২. ৪.২.৮ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, ল্যাংকাশায়ার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা (ম্যাঞ্চেস্টার) ঃ

ঠিকানাঃ 336, STOCKPORT ROAD, MANCHESTER-13.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩৪

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, ল্যাংকাশায়ার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা (ম্যাঞ্চেস্টার) ঃ

নাম	পদ
এম. এ. মতিন	সভাপতি
এম. লতিফ আহমেদ	সেক্রেটারি
এম. জহিরুল হক চৌধুরী	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

Dhaka University Institutional Repository

২. ৪.২.৯ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি, কিদারমিনিস্টার (Kidderminster, অরকেস্টার/Worcester) ঃ

ঠিকানা ঃ 72, COVENTRY STREET, KIDDERMINISTER, WORCESTER.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩৫

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি, কিদারমিনিস্টার (Kidderminster, অরকেস্টার/Worcester) ঃ

নাম	পদ
সৈয়দ মুজতবা হোসাইন	সভাপতি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৫ ।]

২. ৪.২.১০ এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপিলস বিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, লুটন ঃ

ঠিকানাঃ 5, KENILWORTH ROAD, LUTON BEDS.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩৬

এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপিলস বিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, লুটন ঃ

নাম	পদ
নাঁবর উদ্দিন	সভাপতি
মোঃ বোরহানউদ্দিন	সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৬ ।]

২. ৪.২.১১ বাংলদেশ এ্যাকশন কমিটি, নর্দাম্পটন ঃ

ঠিকানাঃ 21, CASTILTON STREET, NORTHAMPTON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩৭

বাংলদেশ এ্যাকশন কমিটি, নর্দাম্পটন ঃ

নাম	পদ
এ. এইচ. চৌধুরী	সভাপতি
বী. মিয়া	সেক্রেটারি
ইসরাইল আলী	
ইয়শাদ হোসাইন	
আবদুল আহাদ	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৬ ।]

২. ৪.২.১২ হেনডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ HENDON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৩৮

হেনডন এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
আবদুল মান্নান	সভাপতি
হারুন-অর-রশীদ	সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

২. ৪.২.১৩ বাংলাদেশ ওয়ারক্রস সোসাইটি ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সারণি-৩৯

বাংলাদেশ ওয়ারক্রস সোসাইটি ঃ

নাম	পদ
আবদুল মান্নান	সভাপতি
হারুন-অর-রশীদ	সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

Dhaka University Institutional Repository

২. ৪.২.১৪ এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপল্‌স রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন ইয়ার্কশয়ার, ব্রাডফোর্ড ঃ

ঠিকানাঃ 10, CORNWALL ROAD, BRADFORD.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪০

এ্যাকশন কমিটি ফর দ্যা পিপল্‌স রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন ইয়ার্কশয়ার, ব্রাডফোর্ড ঃ

নাম	পদ
আবদুল মোসাব্বির তরফদার	
সয়াফত আলী	
এ. কে. এম এনায়েতউল্লাহ	
আবদুল সোবহান	
আবদুল কাদের	
মাহমুদুল হক	
মির্জা লুৎফর রহমান	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

২. ৪.২.১৫ ওল্ডহাম বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ঃ

ঠিকানাঃ OLDHAM.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪১

ওল্ডহাম বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ঃ

নাম	পদ
মাকসুদ আলী	সভাপতি
নূরুল হুদা	সহ-সভাপতি
মফিজুল হাসান (মাফজুল)	সেক্রেটারি
সুফিত আলী	
গোলাম মোস্তফা	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

২. ৪.২.১৬ টিপটন বাংলাদেশ এ্যাকশন এ্যান্ড রিলিফ কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 94, PARD LANE, TIPTON.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪২

টিপটন বাংলাদেশ এ্যাকশন এ্যান্ড রিলিফ কমিটি ঃ

নাম	পদ
আলতাফুর রহমান চৌধুরী	সভাপতি
আসব আলী	সেক্রেটারি
চমক আলী	
সোনা মিয়া	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৭ ।]

২. ৪.২.১৭ এনফিল্ড এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 370, LINCOLN ROAD, ENFIELD.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.১৮ অক্সব্রিজ এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 10, MILLAVE, UXBRIDGE.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

২. ৪.২.১৯ চ্যাথামহিল ক্যান্ট এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 26, CHATHAM HILL, KENT.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২০ স্টকসক্রাফট ব্রিস্টল এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 58, STOKES CROFT, BRISTOL.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২১ রোভ লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ রোভ লন্ডন।
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২২ কুইন্স রোড ব্রাইটন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 15, QUEENS ROAD, BRIGHTON.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৩ পিটার স্ট্রীট ক্রয়ডন পিপল্স সোসাইটি ঃ
ঠিকানাঃ 45, ST.PETER STREET, CROYDON.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৪ ভিক্টোরিয়া রোড সুইনটন এ্যাকশন কমিটি
ঠিকানাঃ 5, VICTORYA ROAD, SWINDON.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৫ কুইন্স রোড ব্রাইটন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ কুইন্স রোড ব্রাইটন।
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৬ সাউথসি বাংলাদেশ সমিতি ঃ
ঠিকানাঃ 27, FAWCETT ROAD, SOUTH SEA.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৭ ইপসুইচ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 125, HELEN STREET, IPSWICH.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৮ উইলিং ক্যান্ট এ্যাকশন কমিটি
ঠিকানাঃ উইলিং ক্যান্ট
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.২৯ সেন্ট আলবান্স এইড কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 56, STANHOPE ROAD, ALBANS.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৩০ সাউথ হ্যাটন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ সাউথ হ্যাটন
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।
[সূত্র ঃ ২. ৪.২.১৭-২. ৪.২.৩০- এ উল্লেখিত কমিটি গুলোর নাম নূরুলইসলাম, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-৯৩১-১০৩৬ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।]

২. ৪.২.৩১ সাউথহল বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ সাউথহল
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪৩

সাউথহল বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
আবদুস সালাম চৌধুরী	সভাপতি
এম. ইউ. আহম্মেদ	সেক্রেটারি

২. ৪.২.৩২ ম্যাঞ্চেস্টার বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ ম্যাঞ্চেস্টার

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪৪

ম্যাঞ্চেস্টার বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি ঃ

নাম	পদ
মাসুদ হোসাইন	সভাপতি
জাকিউদ্দিন আহমেদ	সেক্রেটারি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২. ৪.২.৩৩ লুটন উইমেনস এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ LUTON

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৩৪ বেঙ্গলি এসোসিয়েশন নরউইচ ঃ

ঠিকানাঃ 74, PRINCE OF WALES ROAD, NORWICH.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৩৫ মিডলসেক্স এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 60, OUTERFIELD ROAD, MIDDLESEX.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৩৬ বাংলাদেশ মিশন (এটি বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাসের তৎকালীন নাম যে সম্পর্কে ৩.৭ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

২. ৪.২.৩৭ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ব্লেসলি ঃ

ঠিকানাঃ BLETCHLEY.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৩৮ বেডফোর্ড কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 98, FOSTER HILL ROAD, BEDFORD.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৩৯ মৌলভীবাজার জন সেবা সমিতি (লন্ডন শহর কেন্দ্রিক কমিটির মধ্যে আলোচিত হয়েছে) ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

২. ৪.২.৪০ সাউথওয়েলস এ্যাকশন কমিটি ঃ

ঠিকানাঃ 98, FOSTER HILL ROAD, BEDFORD.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪১ বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি ব্রিকলেন ঃ

ঠিকানাঃ ব্রিকলেন

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

২. ৪.২.৪২ ক্রয়ডন বাংলাদেশ সারভাইভেল কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 5, DERBY ROAD, WEST CROYDON.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৩ এক্সরটার এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ EDETER.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৪ বার্নমাউথ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ BOURNEMOUTH.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৫ নিউপোর্ট এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ NEW PORT.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৬ ম্যানসফিল্ড এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 21, BRADDER STREET, MANSFIELD.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৭ হ্যালেসোয়েন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 53, CHURCH STTEET, HALESOWEN.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৮ ওয়েডন্সেবারি বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ঃ
ঠিকানাঃ 14, PARR STTEET, WEDNEBURY.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৪৯ ওয়েডন্সেবারি এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ WEDNESBURY.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫০ লাখবরো বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 1, MORLEY STRET, LOUGHBOROUGH.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫১ নটিংহাম এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ NOTTINGHAM.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫২ ক্লাকহিটন সংগ্রাম পরিষদ ঃ
ঠিকানাঃ CLACKHEATON.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫৩ হাডারসফিল্ড মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ
ঠিকানাঃ হাডারসফিল্ড
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫৪ মিডলসবোরো এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 42, VICTORIA STREET, MIDDLESBOROUGH.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫৫ সাউথবোরো সংগ্রাম পরিষদ ঃ
ঠিকানাঃ 3, SCARBOROUGH STREET, SOUTHBOROUGH.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

২. ৪.২.৫৬ হ্যালিফ্যাক্স বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 27, LISTER LANE, HALIFAX.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

২. ৪.২.৫৭ বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট, কেইলি ঃ
ঠিকানাঃ 25, HOLKER STREET, KEIGHLEY.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫৮ বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম কমিটি, টিসাইড ঃ
ঠিকানাঃ 42, VICTORIA STREET, TEESIDE.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৫৯ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি শেফিল্ড ঃ
ঠিকানাঃ 6, THOMPSON ROAD, SHEFFIELD.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬০ স্কানথ্রোপ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 10, CLERK STREET, SCUNTHORPE.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬১ ব্রাডফোর্ড পপুলার ফ্রন্ট ঃ
ঠিকানাঃ 86, UNDERCLIF STEET, BRADFORD.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬২ নিউক্যাসল-আপঅন-টাইন ইস্ট বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন ঃ
ঠিকানাঃ 45, CAVENDESHPLACE NEWCASTLE-UPON-TYNE.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৩ লিভারপুল বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ লিভারপুল
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৪ ওল্ডহ্যামল্যাক্স এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ ওল্ডহ্যামল্যাক্স
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৫ রচডেল কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ রচডেল
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৬ কার্ডিফ কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ কার্ডিফ
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৭ ডরসেট কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ ডরসেট
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৮ ক্লাকহিটন এ্যাকশন কমিটি ঃ
ঠিকানাঃ 33, PEGLANE STREET, CLACKHEATON.
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

২. ৪.২.৬৯ বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ ওয়েলস ঃ
ঠিকানাঃ ওয়েলস
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

[সূত্র ঃ ২. ৪.২.৩৩-২. ৪.২.৬৯- এ উল্লেখিত কমিটি গুলোর নাম নূরুলইসলাম, 'প্রবাসীর কথা' পৃষ্ঠা-৯৩১-১০৩৬ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।]

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ যুক্তরাজ্যস্থ প্রবাসী বাঙালি রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিটিসমূহ ঃ

২.৫.১ গ্রেট ব্রিটেন আওয়ামী লীগ (এ সম্পর্কে ৩.১৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪৫

গ্রেট ব্রিটেন আওয়ামী লীগ ঃ

নাম	পদ
গাউস খান	সভাপতি
তৈয়াবুর রহমান	সেক্রেটারি
আলহাজ্ব আবদুল মতিন	
আতাউর রহমান খান	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮।]

২.৫.২ লন্ডন আওয়ামী লীগ ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা, ভ্রাম্যমান দূত, ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ ১০ অক্টোবর লন্ডনের রাসেল স্কোয়ারের নিকটস্থ সেন্টার হোটেলে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করে বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে যে ঐতিহাসিক অবদান রাখছেন তার জন্য প্রবাসী বাঙালিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নেতা আব্দুল মন্নান ওরফে ছানু মিয়া। আবদুস সামাদ আজাদ এই সফরকালে বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রাডফোর্ড প্রবাসী বাঙালিদের জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং লুটন, সেন্ট আলবান্স, হ্যালিফ্যাক্স, কিথলী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট শহরেও প্রবাসী বাঙালিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। প্রায় এক হাজার মাইলের এই ঝটিকা সফরে সহযাত্রী ছিলেন গাউস খান, মোশাহিদ আলী চৌধুরী এবং নূরুল ইসলাম । লন্ডনে স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরোও জোরদার করার উদ্দেশ্যে ১৩ অক্টোবর তিনি লন্ডন আওয়ামী লীগ শাখার এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এই সম্মেলনে লন্ডন আওয়ামী লীগ শাখাকে নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্য সহকারে পুণর্গঠিত করা হয়।

সারণি-৪৬

লন্ডন আওয়ামী লীগ ঃ

নাম	পদ
আবদুল মান্নান (ছানু মিয়া)	সভাপতি
মিনহাজ উদ্দিন আহমদ	১ম সহ- সভাপতি
ইসমাইল মিয়া	২য় সহ- সভাপতি
মোহাম্মদ ইছহাক	৩য় সহ- সভাপতি
মোহাম্মদ আবদুল বশর	সাধারণ সম্পাদক
সুলতান মাহমুদ শরীফ	সাংগঠনিক সম্পাদক
জিল্লুল হক	জনসংযোগ সম্পাদক
নিম্বর আলী	সামাজিক সম্পাদক
শাহ সিরাজুল হক	শ্রম সম্পাদক
আবদুর রকিব	বহিরাগত সম্পাদক
মিসেস হেলেন তালুকদার	মহিলা সম্পাদিকা
এম, এ, হাকিম	দফতর সম্পাদক
হাফিজ মজির উদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ

সদস্যবৃন্দঃ গউস খান (সভাপতি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ), তৈয়বুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ), রমজান আলী, শফিকুর রহমান, আবদুল হামিদ, শফিক মিয়া, কলমদর আলী, শরিয়ত উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ একরাম হোসেন, নুরুল হক, তোয়াহিদ আলী, শামসুর রহমান, মশরফ আলী, মোহাম্মদ ওমর, রেজওয়ান মিয়া, এ. কে. এস. ইসলাম, বি. এইচ. তালুকদার, মইন উদ্দিন, শায়েস্তামিয়া, আবদুল আজিজ, রহিম উদ্দিন, এন. ইউ. আহমদ ও নূরুল ইসলাম। (মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নূরুল ইসলাম রণাঙ্গনের ৪ নম্বর সেক্টরে ছিলেন। প্রবাসী নেতা আব্দুল মান্নান ওরফে ছানু

Dhaka University Institutional Repository
মিয়াও সেখানে ছিলেন। আগস্ট মাসে তাঁরা জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করার জন্য বিলাত চলে যান।

[সূত্রঃ নুরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-১০৩৪ ।]

২.৫.৩ ওভারসিস আওয়ামী লীগ ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪৭

ওভারসিস আওয়ামী লীগ ঃ

নাম	পদ
বি. এইচ.তালুকদার	সভাপতি

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২.৫.৪ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, মোজাফফর) ঃ

ঠিকানা ঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪৮

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, মোজাফফর) ঃ

নাম	পদ
খাইরুল হুদা	সভাপতি
ডঃ নূরুল আলম	সহ-সভাপতি
মাহমুদ এ. রউফ	সেক্রেটারি
ডঃ মনজুর আহমেদ	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২.৫.৫ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, ভাসানী) ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৪৯

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, ভাসানী) ঃ

নাম	পদ
সাইদুর রহমান	
শ্যামা প্রসাদ ঘোষ	
নিখিলেশ চক্রবর্তী	
হাবিবুর রহমান	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮]

২.৫.৬ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, মতিয়া) ঃ (এ সম্পর্কে ৩.১৬ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৬ বৃটিশ নাগরিক প্রতিষ্ঠিত কমিটিসমূহ ঃ

২.৬.১ এ্যাকশন বাংলাদেশ ঃ

ঠিকানাঃ মিস মারিয়েটা প্রকোপে- এর বাড়িতে লন্ডনের ক্যামডন এলাকা।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে তরুণ শিক্ষক পল কনেট, তাঁর স্ত্রী এলেন কনেট এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. কোর্সের ছাত্রী মারিয়েটা প্রকোপে বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' নামের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

সারণি-৫০

এ্যাকশন বাংলাদেশ ঃ

নাম	পদ
পল কনেট	
মিস মারিয়েটা প্রকোপে	
মিস লিন বিকলে	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

Dhaka University Institutional Repository

২.৬.২ জাস্টিস ফর ইস্ট পাকিস্তান ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি-৫১

জাস্টিস ফর ইস্ট পাকিস্তান ঃ

নাম	পদ
ব্রুস ডগলাস ম্যান এম.পি	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২.৬.৩ এইড টু বাংলাদেশ ঃ

ঠিকানাঃ কার্ডিফ ওয়েলস

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি- ৫২

এইড টু বাংলাদেশ ঃ

নাম	পদ
আলফ্রেড এভান্স এম. পি.	
মাইকেল রবার্ট	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২.৬.৪ কমিটি ফর দ্যা ক্রিশ্চিয়ান এ্যাকশন ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি- ৫৩

কমিটি ফর দ্যা ক্রিশ্চিয়ান এ্যাকশন ঃ

নাম	পদ
ক্যানন কলিন্স	
জন গ্রিগ	

[সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৮ ।]

২.৬.৫ অপরেশন ওমেগা ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৬.৬ ইন্টারন্যাশনাল পিস টিম ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৬.৭ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্টস অফ বাংলাদেশ ঃ

ঠিকানাঃ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

সারণি- ৫৪

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্টস অফ বাংলাদেশ ঃ

নাম	পদ
লেডী গিফোর্ড	
জন পাথস্ মিলস কিউ. সি	

সূত্র ঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২১৬

২.৭ যুক্তরাজ্যস্থ পাকিস্থানী বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দ ঃ (এ সম্পর্কে ৩.১৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮ যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ঃ

২.৮.১ অক্সফাম ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.২ ওয়ার এন্ড ওয়ান্ট ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.৩ থার্ড ওয়ার্ড ফাস্ট ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.৪ সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.৫ এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.৬ দ্যা সোসালিস্ট লীগ ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.৭ আন্তর্জাতিক রেডক্রস ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.১০ সেভ দ্যা চিলড্রেন ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৮.১১ মুভমেন্ট ফর কলোনিয়াল ফ্রিডম ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৫ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৯ যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন গণমাধ্যম ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৯.১ প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা পুস্তিকা ঃ (এ সম্পর্কে ৩.১৮ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৯.২ বৃটিশ গণমাধ্যম ঃ

২.৯.২.১ বৃটিশ ব্রডকাস্টিং সোসাইটি (বিবিসি) ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৯.২.২ বৃটিশ পত্র-পত্রিকা ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.৯.২.৩ অন্যান্য ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.১০ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন ঃ (এ সম্পর্কে ৩.১৭ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.১১ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন ঃ (এ সম্পর্কে ৩.১৯ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.১১.১ পশ্চিম পাকিস্তানী

২.১১.২ প্রবাসী বাঙালি

২.১১.৩ বৃটিশ নাগরিক

২.১২ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় নাগরিক ও সংগঠন ঃ (এ সম্পর্কে ৪.৬ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ঃ

২.১৩ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি যাঁদের সম্বৃদ্ধ স্মৃতিচারণ পাওয়া গেছে ঃ

সারণি- ৫৫

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি যাঁদের সম্বৃদ্ধ স্মৃতিচারণ পাওয়া গেছে ঃ

মতিউর রহমান চৌধুরী	আবদুর রউফ চৌধুরী	এন,জে কহিনূর
হাজী মোঃ নিছার আলী	এ,এম, সিরাজ খান	ডাক্তার ফাইজুল ইসলাম
আলহাজ্জ্ব জিল্লুল হক	শফিকুর রহমান চৌধুরী	শাহাবুদ্দিন চঞ্চল
আলহাজ্জ্ব হাফিজ মজির উদ্দিন	নুরুল হক লালা মিয়া	মোঃ নূরুল আমীন
আতাউর রহমান খান	নুরুল ইসলাম	আলহাজ্জ্ব মোঃ আব্দুল মতলিব
আলহাজ্জ্ব খন্দকার মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মোঃ লালা মিয়া	আনোয়ারা জাহান
মোঃ কবির উদ্দিন	আলহাজ্জ্ব মোঃ তারা মিয়া খান।	মাহামুদ এ রউফ
শরিয়ত উদ্দিন আহমদ	আলহাজ্জ্ব উস্তার আলী	মুহিবুর রহমান
আব্দুল ওহাব	গিয়াস মিয়া	শামসুদ্দিন খান
মোঃ লুৎফর রহমান (আছির মিয়া)	শাহ ফারুক আহমেদ	মোঃ আব্দুল গফুর খালিশদার
আব্দুল মোহাব্বির খান		

[সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৬১-৯১।]

২.১৪ ঐতিহাসিক দলিল ঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব জনমত গঠনে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা যেগুলো অধিকহারে ব্যবহার করতেন ঃ

সারণি- ৫৬

ঐতিহাসিক দলিল ঃ

ক	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক ট্রাইবুনালে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য
খ	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
গ	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ঐতিহাসিক ভাষণ
ঘ	প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ঐতিহাসিক ভাষণ
ঙ	সাইমন ড্রিং-এর রিপোর্ট

[সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-১১৩-১৪৬।]

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি ঃ দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গ সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে ভূমিকা পালনকারী যাঁদের পরিচয় (সংক্ষিপ্ত জবিনী গুরুত্বানুসারে প্রাসঙ্গিকভাবে) ও সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অত্র গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে (নামের অদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে) ঃ

সারণি- ৫৭

অরুণা আসফ আলী	আবদুল মান্নান (শ্রমিক নেতা)	কর্নেলিয়াস, বিচারপতি	ডোবী জ্যাসেল
অশোক সেন	আবদুল হাকিম, ডাক্তার	কবীর চৌধুরী	ডানকান স্যান্ডস্
আইয়ুব আলী	আবদুর মোত্তালিব মালিক	গাউস খান	ডেনিস হীলি
আইয়ুব খান, জে.	আবদুল মালেক	গুনার মীয়ারডাল, অধ্যাপক	ডেভিড স্টীল (লর্ড স্টীল)
আখতার সোলায়মান	ইউজিন ম্যাককার্থী	গোলাম আজম	ডোনাল্ড চেস্ওয়ার্থ
আজিজুর রহমান	ইন্দিরা গান্ধী, মিসেস	চৌ এন-লাই	ড্রেপার, অধ্যাপক
আজিজুল হক ভূঁইয়া	ইকরামুল হক	জগজিৎ সিং চৌহান	তরফদার, এ. এম.
আতাউর রহমান খান	ইনগ্রিড গার্ডেওয়াইডেমার	জগজীবন রাম	তাজউদ্দিন আহমদ
আঁদ্রে সেনারগার	ইসহাক, মোহাম্মদ	জগলুল পাশা	তারাপদ বসু, ড.
আবদুস শহীদ	ইয়ান মিকার্ডো	জগলুল হোসেন	তারিক আলী
আঁদ্রে মালরো	ইয়ান সাদারল্যান্ড	জর্জ হ্যারিসন	তালুকদার, বি. এইচ.
আনিস আহমদ	ইয়াকুব খান, জে.	জন এ্যানালস	তাসাদ্দুক আহমদ
আনিস রহমান	ইয়াহিয়া খান	জন ক্ল্যাপহাম, রেভারেন্ড	তোফায়েল আহমদ
আনোয়ারা জাহান	ইসলাম, অধ্যাপক, এম.	জন হ্যাস্টিংস	তেরেসা, মাদার
আপা পন্থ, বি.	উ থান্ট	জন বিগস্-ডেভিডসন	তৈয়েবুর রহমান
আফতাব উদ্দিন শাহ	উইলি ব্রান্ড	জন পিলজার	তোজাম্মেল হক (টনি)
আফরোজ আফগান	উর্মি রহমান	জন স্টোনহাউস	নবীর উদ্দিন
আফরোজ চৌধুরী	উইলিয়াম হ্যামিলটন	জন পার্ডো	দীন মোহাম্মদ, কাজী
আবদুর রউফ, শিল্পী	উইলিয়াম হোয়াইটল	জহিরুদ্দিন	নজরুল ইসলাম, সৈয়দ,
আবদুর রাজ্জাক, স্যার	এডওয়ার্ড কেনেডী	জহুরুল ইসলাম	নাইজেল ফিশার
আবদুর রাজ্জাক	এডওয়ার্ড দু'ক্যান	জয়প্রকাশ নারায়ণ	নাসিম বাজওয়া
আবদুল গাফফার খান	এডওয়ার্ড হীথ	জাকারিয়া খান চৌধুরী	নাসিম আহমদ
আবদুল মতিন	এনামুল হক, ড.	জাহানারা রহমান	নিজামউদ্দিন ইউসুফ
আবদুল মতিন, হাজী	এনায়েত উল্লাহ্, এ. কে. এম.	জাঁ জিগলার	নিয়াল ম্যাকডারমেট
আবদুল মান্নান, শেখ	এনামুল হক চৌধুরী	জাফরুল্লা চৌধুরী, ডা.	নিয়াজি, জে. এ. এ. কে.
আবদুল মান্নান (ছানু মিয়া)	এনায়েত হোসেন, কর্নেল	জানজুয়া, এম. কে.	নীরদ চন্দ্র চৌধুরী
আবদুল হামিদ	এ্যানমেরী ওয়ালীউল্লাহ	জিনকিন, অধ্যাপক	নূরুল আমিন
আবদুল হান্নান	এম. জেড. ডময়া	জিয়াউদ্দিন মাহমুদ	নূরুল আলম, ড.
আবদুল হালিম	এরিক হেফার	জিল নাইট (ডেইম নাইট)	নূরুল হোসেন, ড.
আবদুল হামিদ খান ভাসানী	এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস	জিল্লুর রহমান	নূরুল হুদা, এ. কে. এম.
আবদুল হাই খান	এ্যালেন বুলক	জুডিথ হার্ট	নেভিল ম্যাক্সওয়েল
আবদুল কাইউম	এ্যালফ্রেড এভান্স	জুলিয়াস সিলভারম্যান	পল্ কনেট
আবদুল মোমিন	এলেন কনেট	জেমস্, লর্ড	পুলিন বিহারী শীল
আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি	এসেলেইন এল-আমীর	জেমস র‍্যামসেসডেন	পিটার শোর (লর্ড শোর)
আবু মুসা	ওয়ালিউর রহমান	জেঙ্কিন্স, লর্ড ও লেডী	পিয়ের অস্ত
আবুল ফতেহ্	ওয়ালী খান	জেবুন্নেসা বখ্স্	প্রীতিশ মজুমদার
আবুল হায়াত	ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ	জেবুন্নেসা খায়ের	ফজলে আলী
আবুল হাসান চৌধুরী	কৃষ্ণমেনন	জেরার্ড নেবারো, স্যার	ফজলে রাব্বী মাহমুদ হাসান
আমীরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার	কাইয়ুম খান	জেরেমী থর্প	ফজলুল হক চৌধুরী
আমীর আলী	ক্যাথলিনলা প্যাঁ	জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা	ফজলুল হক, কাদের চৌধুরী
আর্নল্ড স্মীথ	ক্যালবার্গ	জোসেফ গভয়ার	ফরমান আলী, রাও
আর্থার বটমলী	কিয়েল আলসেন	টমাস উইলিয়ামস্, স্যার	ফরিদ আহমদ, মৌলবী
আল-হোসেইনী	কির্স্টেন ওয়েস্টগার্ড	টমাস হ্যামেবার্গ	ফরিদ এস্. জাফরী
আলমগীর কবীর	কলিন্স, ক্যানন	টিক্কা খান, জে.	ফেরদৌস রহমান
আলেক ডগলাস-হিউম	কবীরউদ্দিন আহমদ, ড.	ট্রেভর হাডলস্টোন	ফ্রেডারিক বেনেট, স্যার

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রেডারিকসেন
ফ্র্যাংক গার্লিং
ফ্র্যাংক জাড্
ফ্র্যাংক সার্জেন্ট
ফ্রান্সিস্ পিম্
বখতিয়ার আলী
বব্ মেলিস্
বিমান মল্লিক
ব্রকওয়ে, লর্ড
ব্রুনো ক্রাইস্কি
ব্রোহী, এ. কে.
ব্যারিংটন
ব্রুস ডগলাসম্যান
ভূট্টো, জুলফিকার আলী
ভ্যাটিওসারিও, বিচারপতি
ভিক্টর কিয়েরনান
মওদুদী, মওলানা
মজির উদ্দিন, হাফেজ
মজাম্মেল-নুল হক
মতিউর রহমান
মতিউর রহমান চৌধুরী
মনির হোসেন, হাফেজ
মনোয়ার হোসেন
মসিউর রহমান
মহিউদ্দিন আহমদ
মহীউদ্দিন আহমদ চৌধুরী
মাহমুদুর রহমান
মাও সে-তুং
মাহমুদ হোসেন
মাইকেল বার্নস্
মার্টিন এ্যানালস্
মাহমুদ আলী
মিনহাজ উদ্দিন
মিম্বর আলী
মুজাফফর আহমদ
মুসাব্বির তরফদার
মুন্নী রহমান
মুস্তাফিজুর রহমান, ড.
মেজবাহউদ্দিন
মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার
মোশাররক হোসেন, খন্দকার ড.
মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, এ. ভোভ
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্
মোহাম্মদ আইয়ুব
মোহাম্মদ ফিরোজ
মোহাম্মদ তোয়াহ
ম্যারিয়েটা প্রকোপে
মোহাম্মদ শাহজাহান
মোজাম্মেল হক, মির্জা
মোহর আলী, ড.

রকীব আলী
রকীব উদ্দিন
রমেশ চন্দ্র
রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড.
রাজিয়া চৌধুরী
রবার্ট ম্যাকনামারা
রিচার্ড উড
রিচার্ড নিক্সন, সাবেক প্রেসিডেন্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
রাভিউল হাসান রঞ্জু
রেজ্ প্রেন্টিস্
রুহুল আমিন, ব্যারিস্টার
রেজাউল করিম
লরেন্স ড্যালি
লুলু বিলকিস বানু
লুৎফুল মতিন
লুৎফুর রহমান, ব্যারিস্টার
ল্যাঙ্গলি, পুলিশ অফিসার
শফিক রেহমান
শফিকুল হক
শামসুর রহমান
শরফুল ইসলাম
শরণ সিং
শামসুল আবেদীন
শামসুল আলম চৌধুরী
শ্যামল লোধ
শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী
শাহ্ আজিজুর রহমান
শেখ জামাল
শেখ মুজিবুর রহমান
সদরউদ্দিন, প্রিন্স
সন্ ম্যাকব্রাইড
সমাদ্দার, এস.আর.
সাখাওয়াত হোসনে
সাইমন ড্রিংগ
সাজ্জাদ হুসাইন, সৈয়দ,
সারাভাই
সালমান আলী
সিড্ ফ্রেঞ্চ
সিউসাগর রামগোলাম
সিরাজুর রহমান
সুফিয়া রহমান
সুবিদ আলী
সুবিদ আলী টিপু
সুনীল কুমার লাহিড়ী
সুরাইয়া খানম
সুলতান মাহমুদ শরীফ
সেন, এস. এন.
সেলকার্ক, লর্ড
স্টেন এ্যান্ডারসন
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ

[illegible]
হামজা আলাভী
হরমুজ আলী
হাবিবুর রহমান
হামিদুল হক চৌধুরী
হারুন-অর-রশীদ
হ্যারল্ড উইলসন
হিউ স্প্রিঙ্গার

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক গৃহীত বিবিধ উদ্যোগ ঃ

৩.১ প্রতিরোধের সূচনা ঃ

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে জেনেভায় ছিলেন।[১] সেদিন সকালবেলা বি বি সি'র খবর শুনে তিনি অনুমান করলেন, বাংলাদেশে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। ঢাকার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন। সেদিনের অধিবেশনে গিয়ে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান মি. এণ্ডইলার অনুমতি নিয়ে বি বি সি'র খবরের কথা উল্লেখ করে সেদিনই লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

লন্ডন বিমানবন্দরে বিচারপতি চৌধুরীর বড় ছেলে আবুল হাসান চৌধুরী (কায়সার) ও হাবিবুর রহমান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হাবিবুর রহমান তখন পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার তিন সপ্তাহ পরে তিনি চাকরিচ্যুত হন।

দক্ষিণ লন্ডনের বাসায় পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পর সুলতান মাহমুদ শরীফ কয়েকজন বাঙালি সহকর্মীসহ বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা সবাই ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বিচারপতি চৌধুরীর মতো শঙ্কিত বোধ করেন। তিনি তখনই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ-এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। পরদিন (শনিবার) ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকাল ১১ টার সময় বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হন। তাঁর (বিচারপতি চৌধুরী) অনুরোধক্রমে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব মি. ব্যারিংটনও পরদিন পররাষ্ট্র দপ্তরে আসতে রাজি হন।[২]

২৬ মার্চ সকালবেলা থেকে বাঙালি ছাত্র এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক, বিচারপতি) ও আফরোজ আফগান ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নিকটবর্তী হোয়াইটহলে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী বলেন ঃ

"বাংলাদেশে 'মর্মান্তিক কিছু একটা হতে যাচ্ছে' আশঙ্কা করে ২৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে আমি ও আফরোজ আফগান চৌধুরী প্রথমে অনশন শুরু করি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের আশপাশে 'হ্যাঙ্গ ইংহিয়া', 'রেকগনাইজ বাংলাদেশ', 'স্টপ জেনোসাইড' ইত্যাদি শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার রাখি। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রাতের বেলাও ৫০ থেকে ১০০ জন বাঙালি পর্যায়ক্রমে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। পাকিস্তানীদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমান করা হয়। পুলিশের ডাক্তার প্রতিদিন আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তৃতীয় দিন তাঁরা বলেন, আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে অনশন ত্যাগ না করা হলে আমাদের জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন অব্যাহত রাখবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং প্রতিদিনই এম. পি-দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে শ্রমিকদলীয় এম. পি. পিটার শোরের অনুরোধক্রমে ২৮ মার্চ বিকেল ৩/৪ টার দিকে আমরা অনশন ভঙ্গ করি। ব্রিটিশ টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় আমাদের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হয়।"[৩]

২৬ মার্চ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতা গাউস খানের উদ্যোগে লন্ডনের বেরিক স্ট্রীটে অবস্থিত তাঁর 'এলাহাবাদ' রেস্তোরাঁর উপরের তলার অফিসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার পর পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে অবিলম্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সভায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, তাসাদ্দুক আহমদ, একরামুল হক (ছাত্রনেতা), হাজী নিসার আলী, আবুল বাসার ও মোহাম্মদ ইসহাক।[৪]

সেদিন সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে প্রায় ৩০০ বাঙালি ছাত্র ও জনসাধারণ তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা হাই কমিশন দখলের চেষ্টা করেন। রাত প্রায় নয়টার দিকে উত্তেজিত ছাত্র ও যুবক এবং পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে মোহাম্মদ ইসহাক, শফিকুল হকসহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়। মোহাম্মদ ইসহাক তখন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। পরদিন তিনজনের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করে। ১ জুন মার্লবারা স্ট্রীট কোর্টে উত্থাপিত মামলায় মোহাম্মদ ইসহাককে ছ'সপ্তাহের কারাদণ্ড দেয়া হয়। গাউস খান এই মামলার ব্যয়ভার বহন করেন।

লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি মিনহাজউদ্দিনও উল্লিখিত বিক্ষোভে যোগ দেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তান হাই কমিশনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে না নেয়া পর্যন্ত তিনি হাই কমিশনের বাইরে অবস্থান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৭ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবের পার্টি আওয়ামী লীগ এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। প্রায় একশ'জন ছাত্র ও জনসাধারণ সারা রাত হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা শেখ আবদুল মান্নান এবং ছাত্রনেতা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। পুলিশ কর্তৃপক্ষ হাই কমিশনকে পাহারা দেয়ার জন্য প্রায় ৫০ জন পুলিশ অফিসার নিয়োগ করেন।[৫]

পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের খবর পাওয়ার পর আহমদ হোসেন জোয়ারদার তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তান স্টুডেন্টস্ হোস্টেলে এক জরুরী সভার আয়োজন করেন। এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, ছাত্র ও যুবকরা যোগদান করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, আজ বাংলাদেশের জন্মদিন এবং এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান বলে কিছু নেই। তৎকালীন পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফেডারেশনের বাঙালি সভাপতি ইকরামুল হক এই প্রস্তাব সম্পর্কে আপত্তি জানান। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউসের প্রেসিডেন্ট আনিস রহমান এবং আরো কয়েকজন বাঙালি ছাত্র পাকিস্তান স্টুডেন্টস হোস্টেলের সভায় যোগ দেন। শামসুল আবেদীন, আনিস রহমান, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং আরো কয়েকজন সভায় বক্তৃতা করেন। শামসুল আবেদীন পাকিস্তানীদের বিভিন্ন অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। এ. জে. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু বলেনঃ

"আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এক সঙ্গে থাকার জন্য, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার-অবিচারের ফলে আর এক সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।"

আনিস রহমান বলেনঃ 'পাকিস্তান ইজ্ ডেড। কাজেই এখন আমাদের সেইভাবে তৈরি হতে হবে।'

লন্ডনে বিভিন্ন এলাকায় এক্যাশন কমিটি গঠনের একটি প্রস্তাবও উল্লিখিত সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী মি. জোয়ারদার ও তাঁর ১৫/২০ জন সহকর্মী সেই রাতেই দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের স্ট্রেথাম এলাকায় 'কুলাউড়া' তন্দুরি রেস্তোঁরাঁর উপরতলায় সমবেত হয়ে একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন বি. এইচ. তালুকদার (সভাপতি), আহমদ হোসেন জোয়ারদার (সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট) এবং সোহেল ইবনে আজিজ (জেনারেল সেক্রেটারী)। মি. জোয়ারদার সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে এই কমিটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৬]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়ে বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি ২৭ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ একটি বিজ্ঞাপন দেয়। বাংলাদেশ আক্রমণকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের অপসারণের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যও এরই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়।[৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ২৭ মার্চ হাবিবুর রহমান বিচারপতি চৌধুরীকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়ে যান। তিনি মি. সাদারল্যান্ডের রুমে পৌঁছানোর পর মি. ব্যারিংটন এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কিছুক্ষণ পর মি. সাদারল্যান্ডের সেক্রেটারি ঢাকা থেকে টেলেক্সযোগে সংবাদ আসছে বলে খবর দিলেন। টেলেক্সের লম্বা সংবাদ পড়ার মাঝখানেই বেদনা ও সহানুভূতিভরা মুখ তুলে মি. সাদারল্যান্ড বিচারপতি চৌধুরীর দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে তিনি বললেনঃ 'খবর খুব খারাপ। বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। অপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী হতাতহ হয়েছে।' এই কথা বলে তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ হলে তিনি বললেন ঃ 'পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত্রে ঢাকায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার একটি ভয়াবহ রাত যাপন করেন। পরের দিনই তিনি গুলশান থেকে শহরের দিকে আসার চেষ্টা করে রাস্তায় অনেক মৃতদেহ দেখে ফিরে যান। সন্ধ্যা-আইন শিথিল করার পর জনৈক ফার্স্ট সেক্রেটারি অল্পক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেন, ইকবাল হল-এর (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তিনি জানতে পারেন, জগন্নাথ হলের সামনে গণকবর খুঁড়ে সেখানে নিহত ছাত্র ও শিক্ষকদের মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হয়। আর যেসব ছাত্রকে গুলির ভয় দেখিয়ে মৃতদেহগুলো গণকবরের সামনে আনতে বাধ্য করা হয়, তাদের ওপরে গুলি করে সেই কবরেই ফেলা হয়। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ফ্রাঙ্ক সার্জেন্ট আরো লিখেছেন, পাকিস্তান রেডিও শেখ মুজিবকে বন্দি করা হয়েছে বলে দাবি করেছে। এ দাবির সত্যতা সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।'

মি. সাদারল্যান্ড আরও বলেন, পাকিস্তান সরকার বিদেশি দূতাবাসের টেলেক্স ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে ঢাকা থেকে আর সংবাদ পাঠানো যাবে না বলে তাঁকে জানানো হয়েছে।

বিদায় নেয়ার আগে বিচারপতি চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগ্লাস হিউমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য মি. সাদারল্যান্ডকে অনুরোধ করেন। স্যার আলেক (পরবর্তীকালে লর্ড হিউম) তখন স্কটল্যান্ডে ছিলেন। লন্ডনে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে তিনি কথা দেন। তা' ছাড়া বৈদেশিক সাহায্য দপ্তরের মন্ত্রী রিচার্ড উডের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সংবাদপত্রে কোনো বিবৃতি না দেয়ার জন্য তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে অনুরোধ করেন। কারণ, সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়ার পর তাঁকে বিদ্রোহী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। এর ফলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষতের ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে 'প্রটোকল' ভঙ্গের অভিযোগ উঠতে পারে।[৮]

বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের কয়েকজন উৎসাহী সমর্থক নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর ২৭ মার্চ (শনিবার) একটি ইংরেজী 'নিউজলেটার' (এ সম্পর্কে আলাদা একটি

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ মার্চ (মঙ্গলবার) 'নিউজলেটার'-এর প্রথম ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি 'খোলা চিঠি' এবং মার্চ মাসে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বাঙালিদের উদ্যোগে গঠিত এ্যাকশন কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'খোলা চিঠি'-তে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে অবিলম্বে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তিদান, আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার দাবি এবং হত্যা ও অমানুষিক নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের দাবি সমর্থন করার জন্য আকুল আবেদন জানানো হয়। উল্লেখ্য প্রখ্যাত পাকিস্তানী সাংবাদিক ও প্রাক্তন কূটনৈতিক ফরিদ এস. ফাজরী 'নিউজলেটার' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সামরিক হস্তক্ষেপের পর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বিনা দ্বিধায় তিনি 'নিউজলেটার'-এর ঠিকানা হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করার অনুমতি দেন। এম. কে. জানজুয়া, তাসাদ্দুক আহমদ, মিসেস রোজমেরী আহমদ, ড. প্রেমেন আড্ডি ও আবদুল মতিন সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার কমোডোর এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী মি. জানজুয়া 'কমিটি ফর জয়েন্ট এ্যাকশন এগেনস্ট মিলিটারি ডিক্টেটরশীপ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে প্রচারকার্য চালান।[৯]

২৭ মার্চ বিকেলবেলা শিল্পী আবদুর রউফ ও মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুসহ কয়েকজন ছাত্র ও যুবনেতা বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তাছাড়া ব্রিটেনস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ড. জাফরউল্লাহ চৌধুরী, ড. মোসাররফ হোসেন জোয়ারদার এবং আবদুল হাকিমও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সবাইকে তিনি সংঘবদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে যাবেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, শিক্ষাবিদ ও পার্লামেন্ট সদস্যের সঙ্গে দেখা করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করবেন।

উত্তর লন্ডনে পূর্ব পাকিস্তান ভবনে সেদিন (২৭ মার্চ) বিকেলবেলা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে ২৯ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, প্রায় আটশ' লোক এই সভায় যোগদান করেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, লন্ডন আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মস্কো ও চীনপন্থী গ্রুপসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা সভায় হাজির ছিলেন। ছাত্রদের প্রস্তাবিত কর্মপন্থার প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। পূর্ব লন্ডনের আর্টিলারি প্যাসেজে একটি ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যরা তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পৃথক সভার আয়োজন করেন। এই সভায় পূর্ব পাকিস্তান ভবনের বক্তব্য পেশ করার জন্য পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। শেখ আবদুল মান্নান এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান ভবনে অনুষ্ঠিত সভার শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পূর্ব লন্ডনের সভায় যোগদানের জন্য ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। পূর্ব পাকিস্তান ভবন থেকে সরাসরি পূর্ব লন্ডনে গিয়ে শেখ আবদুল মান্নান, আমীর আলী, মোহাম্মদ আইয়ুব, সাখাওয়াত এবং আরো কয়েকজন এই সভায় যোগদান করেন। গাউস খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী সভায় গ্রহণের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৯ মার্চ (সোমবার) পর্যন্ত সভায় কাজ স্থগিত রাখা হয়।

শনিবার (২৭ মার্চ) বিকেলবেলা পূর্ব লন্ডনের ফুরনিয়ার স্ট্রীটে অবস্থিত পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের অফিসে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় কয়েকশ' বাঙালি যোগদান করেন। এদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে নিজেদের নাম-ঠিকানা তালিকাভুক্ত করান।

পরবর্তীকালে মিনহাজউদ্দিন এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষ্যে মজনু-নুল হককে বলেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকদের ৩/৪ শ' পাসপোর্ট তাঁর কাছে জমা দেয়া হয়েছিল।[১০]

২৯ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ২৮ মার্চ (রোববার) প্রায় সাত হাজার পতাকা ও প্ল্যাকার্ডধারী বাঙালি বার্মিংহামের স্মল হিথ্ পার্কে সমবেত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানায়। তাদের ব্যানারে 'পিপ্‌লস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' শব্দগুলো বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল।

২৮ মার্চ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারেও একটি বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকরাও এই সভায় যোগদান করেন। বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার, কভেন্ট্রি, লুটন ও অন্যান্য শহর থেকে কোচ্ ও ট্রেনযোগে কয়েক হাজার বাঙালি এই সভায় যোগদানের জন্য আসেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেন এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক দেশ গুলোর প্রতি আহবান জানান। গাউস খান ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে আনুষ্ঠানিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

উল্লিখিত তারিখে (২৯ মার্চ) 'দি অবজারভার' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় না থাকলে এশিয়ার এই অশান্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হবে। কিন্তু সামরিক-বল প্রয়োগ করে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা যাবে না। এই পন্থা অবলম্বন করলে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা করে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন।

উক্ত তারিখে (২৮ মার্চ) কার্ডিফ থেকে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ফর ওয়েলস্-এর নেতৃস্থানীয় সদস্যরা লন্ডনে এসে বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ এ্যাকশান কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলঙ্কা ও সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আবেদন জানান। ২৭ মার্চ তারিখে গঠিত ওয়েলস্ কমিটির সদস্যরা কার্ডিফের এ্যাঞ্জেল হোটেলের সামনে জমায়েত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচারপত্র বিলি করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ তখন এ্যাঞ্জেল হোটেলে অবস্থান করছিলেন।

২৯ মার্চ প্রকাশিত এক সংবাদে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সংবাদদাতা সাইমন ড্রিংগ বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ১২ টার পর (অর্থাৎ ২৬ মার্চ শুক্রবার) পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী বিনা প্ররোচনায় ঢাকার তিন ঘন্টা যাবৎ অবিরাম গোলাগুলি চালায়। ২৮ মার্চ (রোববার) তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

উক্ত তারিখে 'দি টাইমস'-এর সংবাদদাতা কলকাতা থেকে পিটার হ্যাজেলহার্স্ট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো পূর্ব পাকিস্তানে বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে।'

২৯ মার্চ 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা চলে না। উল্লেখিত সংবাদ প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে।[১১]

২৯ মার্চ (সোমবার) লন্ডনের পোল্যান্ড স্ট্রীটে অবস্থিত 'মহাঋষি' রেস্তোরাঁয় গাউস খানের সভাপতিত্বে পূর্ব লন্ডনের অসমাপ্ত কাজ শুরু হয়। সভায় বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.' নামের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে সংগঠিত এ্যাকশন কমিটিগুলোকে অনুমোদন-দানের দায়িত্ব কাউন্সিলকে দেয়া হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদ হিসেবে ১১ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ব্রাডফোর্ড, শেফিল্ড, গ্লাসগো, বার্মিংহাম প্রভৃতি শহরে সংগঠিত এ্যাকশন কমিটির ১০ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। গাউস খান, শেখ আবদুল মান্নান, আতাউর রহমান ও 'কোহিনুর' রেস্তোরাঁর মালিক আবদুল হামিদ যথাক্রমে কমিটির প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। উক্ত সভায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন শেখ আবদুল মান্নান, আতাউর রহমান খান, হাজী নিসার আলী, মোহাম্মদ ইসহাক, আমীর আলী, তৈয়েবুর রহমান, শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব, শামসুল হুদা হারুন, শামসুল মোর্শেদ, সাখাওয়াত হোসেন, জগলুল পাশা, শওকত আলী, আবদুল হামিদ, একরামুল হক, নিখিলেশ চক্রবর্তী, ড. কবীর উদ্দিন আহমদ, আরব আলী ও আবদুল মতিন (ম্যাঞ্চেস্টার)।

উল্লিখিত তারিখে 'দি টাইমস্'-এর সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গাউস খান বলেন, নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে চার-দফা পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে ব্রিটেনের স্বীকৃতিদান, অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘকে ব্রিটেনের অনুরোধ জ্ঞাপন, ব্রিটেনে তৈরি অস্ত্রসস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে চালান নিষিদ্ধকরণ এবং অসহায় ও নিরস্ত্র জনসাধারণকে নির্বাচারে হত্যার নীতি পরিহার করার জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁদের পরিকল্পনা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেয় বলে মি. খান প্রকাশ করেন।

মি. খান আরও বলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ, খাদ্য-সামগ্রী এবং প্রয়োজনমতো অস্ত্র সরবরাহের পন্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক-বাঙালি দেশে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার ব্যাপারে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে টেলিফোন করেছে। ৩০ মার্চ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।[১২]

৩০ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ২৯ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে ভারতীয় পার্লামেন্টের সংহতি ঘোষণার জন্য বিরোধী দলগুলোর দাবি মেনে নেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও বাংলাদেশের কথা উত্থাপন করা হয়। শ্রমিকদলীয় সদস্য পিটার শোর (পরবর্তীকালে লর্ড শোর) বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণের তীব্র ঘৃণার কথা পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেয়ার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস্-হিউমকে অনুরোধ করেন। স্যার আলেক

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাণহানির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না।

৩০ মার্চ 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর 'লিড স্টোরি'তে ঢাকায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের প্রথম বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সংবাদদাতা সাইমন ড্রিংগ প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, ২৫ মার্চ রাত্রে তিনি অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (পরবর্তীকালে শেরাটন হোটেল) ছিলেন। বিদেশী সাংবাদিকদের যখন বহিষ্কার করা হয় তখন তিনি হোটেলের ছাদে লুকিয়ে ছিলেন। পরে সুযোগমতো হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সারা শহর ঘুরে তিনি পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর হত্যা ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। ২৭ মার্চ তাঁকে করাচি পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখান তাকে ২৯ মার্চ ব্যাঙ্কক পৌঁছেই তিনি উক্ত তারবার্তা পাঠান। দু'বার মালপত্র ও দেহ তল্লাশি সত্ত্বেও তিনি তাঁর নোটগুলো বাঁচাতে সক্ষম হন।

'দি ডেইল টেলিগ্রাফ'-এর তিন কলামব্যাপী সংবাদে বলা হয়, আল্লাহ ও অখন্ড পাকিস্তানের নামে ঢাকাকে একটি বিধ্বস্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত নগরীতে পরিণত করা হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর চব্বিশ-ঘন্টাব্যাপী নিষ্ঠুর ও নির্মম গোলাগুলি বর্ষণের ফলে অন্তত সাত হাজার লোক নিহত এবং বিস্তীর্ণ এলাকা ধূলিসাৎ হয়েছে। 'দেশের অবস্থা শান্ত' বলে ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের দাবি সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুরনো শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং নারায়ণগঞ্জে গণহত্যার বিস্তারিত ও হৃদয়বিদারক বিবরণ দেয়া হয়।

সাইমন ড্রিংগ আরও বলেন, শেখ মুজিবকে টেলিফোনে সতর্ক করে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি তাঁর বাড়ি ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। জনৈক আস্থাভাজন ব্যক্তিকে তিনি বলেন ঃ

"আমি যদি পালিয়ে থাকি, তা হলে তারা (পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী) আমাকে খুঁজে বের করার জন্য সমগ্র ঢাকা শহরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।"[১৩]

জনৈক পাঞ্জাবি অফিসার সাইমন ড্রিংগকে বলেন ঃ

"আমরা আল্লাহ্ ও অখন্ড পাকিস্তানের নামে যুদ্ধ করছি।"

সাইমন ড্রিংগ-এর এই রিপোর্ট প্রবাসী বাঙালিদের সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা এই রিপোর্টটি অমূল্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করেন। বিচারপতি চৌধুরী এই রিপোর্টের 'ক্লিপিং' তাঁর ব্রিফকেসে রাখেন এবং যখনই কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন তাঁকে একটি ফটোকপি দিয়ে এসেছেন।

'ইনার টেম্পল'-এ অধ্যয়নরত আইনের ছাত্র শামসুল আলম চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ৩০ মার্চ লন্ডনে পৌঁছান। তিনি পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর হত্যাকান্ডকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে কয়েকটি হত্যাকান্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন। ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে তিনি লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' ও 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩০ মার্চ বিচারপতি চৌধুরী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং সেন্ট ক্যাথরিন কলেজের অধ্যক্ষ লর্ড এ্যালেন বুলকের সঙ্গে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের হতাহত শিক্ষক ও ছাত্রদের কথা জানান। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী বিচারপতি চৌধুরী কমনওয়েলথ ইউনিভারসিটিজ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করেন। স্যার হিউ ইতোমধ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হত্যাকান্ডের খবর পেয়েছিলেন। বিচারপতি চৌধুরীর অনুরোধ অনুযায়ী তিনি হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে এক তারবার্তা পাঠান। অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি স্থাপন করার জন্য তিনি ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান।[১৪]

৩১ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক পত্রে তারিক আলী, হমজা আলাভী, মোহম্মদ আখতার ও নাসিম বাজওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সোশ্যালিস্টদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে অভিনন্দন জানান। সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিদের শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগকে বেআইন ঘোষণা করে পূর্ব বাংলার ৭ কোটি অধিবাসীকে দেশদ্রোহিতার অপবাদ দেয়ার জন্য তাঁরা ইয়াহিয়া খানকে নিন্দা করেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু করা ছাড়া বাঙালি জনসাধারণের আর কোনো উপায় ছিল না বলে পত্রলেখকরা মনে করেন। তাঁরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য মি. ভূট্টোকে দায়ী করেন।

উল্লিখিত তারিখে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত আরও একটি পত্রে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর মোহাম্মদ খান জানজুয়া (এম. কে. জানজুয়া), কর্নেল ইনায়েত হোসেন ও ফরিদ এস্ জাফরী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার মেনে নেয়ার দাবি জানান। শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত পার্টি ও তার নেতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ চূড়ান্ত অবমাননাকর বলে তাঁরা মনে করেন।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১ এপ্রিল 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা প্রদত্ত এক সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে বিমানযোগে করাচিতে নিয়ে আসা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। তিনি কোথায় ও কিভাবে রয়েছেন সে সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার নীরব থাকার নীতি গ্রহণ করেছে।

একই তারিখে 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহীত এক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সফল হবে বলে আশা করা হয়। মিসেস গান্ধী নিজে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেনঃ

"পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি ভারতীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং তারা সর্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত।"

১৯৮৯ সালে লন্ডনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে 'বাংলাদেশ উইমেনস্ এ্যাসোসিয়েশন ইন্ গ্রেট ব্রিটেন'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিসেস জেবুন্নেসা বখ্স্ বলেনঃ

"পঁচিশ মার্চ আর্মি ক্র্যাকডাউনের আগে থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম, দেশে ভয়ঙ্কর একটা কিছু হতে যাচ্ছে। এ দেশের খবরের কাগজে কিছু কিছু সংবাদ আসছে। আমরা তাই মহিলাদের পক্ষ থেকে কিছু করার কথা ভাবছিলাম। এরপর এলো পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাত। আমরা বুঝলাম, আর নয়, অপেক্ষা করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এবার রাস্তায় নামতে হবে। এর জন্য চাই একটা সংগঠন। আমরা কয়েকজন আলাপ-আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে ২ এপ্রিল লেভ্ষারি রোডে আমার বাড়িতে মিসেস ফেরদৌস রহমান, ঊর্মি রহমান, লুলু বিলকিস বানু এবং আরো দু'একজন একত্র হলাম এবং সেদিনই আমাকে কনভেনার করে 'বাংলাদেশ উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন ইন্ গ্রেট ব্রিটেন' (বাংলাদেশ মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১৬]

৩ এপ্রিল (শনিবার) বাংলাদেশ মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে মিসেস আনোয়ারা জাহান বলেন, সকালবেলা প্রায় তিনশ' শাড়ি-পরিহিত বাঙালি মহিলা টেমস্ নদীর উত্তর তীরবর্তী ভিক্টোরিয়া এ্যামব্যাঙ্কমেন্ট এলাকায় সারিবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ মিছিলের জন্য তৈরি হন। অনেকের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। তার একদিকে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ছিল 'স্টপ জেনোসাইড', 'রেকগনাইজ বাংলাদেশ, 'ইয়াহিয়া'স আর্মি-আউট' এবং অন্যদিকে বাংলায় লেখা ছিল 'গণহত্যা বন্ধ কর',-'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও,' 'আমার নেতা তোমার নেতা- শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'ইয়াহিয়ার আর্মি- ভাগো ভাগো।' কেউ কেউ শিশুদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা শ্লোগানগুলোর সঙ্গে 'তোমার দেশ আমার দেশ- বাংলাদেশ বাংলাদেশ ' শ্লোগান দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মহিলারা সুশৃঙ্খলভাবে হোয়াইটহল্ হয়ে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করে মিছিল বাকিংহাম প্রাসাদে গিয়ে হাজির হয়। প্রসাদে কর্মরত অফিসারদের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে মিছিল হাইড পার্কের দিকে এগিয়ে যায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের চোখেমুখে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। তাঁরা শপথ নিয়েছিল- দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত সুখ ও আরাম বিসর্জন দিতে হবে। হাইড পার্কে স্পিকার্স কর্নারের কাছে সমবেত হওয়ার পর নেতৃস্থানীয় মহিলারা দেশের দুর্দিনে বাঙালি মহিলাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। মহিলাদের এই মিছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর লন্ডনে এটাই ছিল বাঙালি মহিলাদের প্রথম মিছিল। উক্ত মিছিলে যোগদানকারী মহিলা সমিতির অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাবেকা চৌধুরী, কুলসুম উল্লাহ, তাহেরা কাজী, শেফালি আনোয়ার, আনোয়ার কবীর, পুষ্পিতা চৌধুরী, জেবুন্নেসা খায়ের, উমা রকীব, সুরাইয়া খালেক, রাবেয়া ভুঁইয়া ও জ্যোৎস্না হাসান।[১৭]

উল্লেখিত তারিখে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে 'দি টাইমস্' ও 'দি গার্ডিয়ান' নিরাপরাধ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যার জন্য দায়ী পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। 'দি গার্ডিয়ান'-এ পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়, পাকিস্তানের তথাকথিত জাতীয় সংহতির মৃত্যু হয়েছে; নির্বিচারে হত্যার মাধ্যমে দুই অংশকে এক করা সম্ভব নয়।

৪ এপ্রিল লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি অবজারভার'-এর মস্কো সংবাদদাতা দেব মুরারকা প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগরনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহার ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ৩ এপ্রিল প্রেরিত এক কূটনৈতিক বার্তায় তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন লাভের পর বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে উদ্বেগজনক। শক্তি প্রয়োগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা জটিলতর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করর জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের আবেদন সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিচারপতি চৌধুরী এনামুল হকসহ (পরবর্তীকালে ডক্টর) লন্ডনস্থ সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়ে জনৈক উর্ধ্বতন কূটনীতিবিদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

৪ এপ্রিল (রোববার) দুপুরবেলা বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে হাইড পার্কে বাংলাদেশের সমর্থনে একটি জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান এই জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন।

হাইড পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ-মিছিল ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে গিয়ে কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ এবং স্ট্রেথাম এলাকার এ্যাকশন কমিটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত একটি বিরাট জনসভায় যোগ দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গাউস খান। সভার কার্য পরিচালনা করেন বি. এইচ. তালুকদার। কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে শেখ আবদুল মান্নান এবং স্ট্রেথাম এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে আহমদ হোসেন জোয়ারদার সভায় বক্তৃতা করেন। অপর বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরীফ, হাজী আবদুল মতিন (ম্যাঞ্চেস্টার) ও সাখাওয়াত হোসেন। সভার পর একটি বিক্ষোভ মিছিল ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করে।[১৯]

উল্লেখিত তারিখে সন্ধ্যায় লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড টাউন হলে শ্রমিক দলের প্রভাবশালী সদস্য জন এ্যানালসের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য অহূত এই সভায় বক্তৃতাদানকারীদের মধ্যে ছিলেন লর্ড (ফেনার) ব্রকওয়ে, শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর, পাকিস্তানী ছাত্রনেতা তারিক আলী, শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মাইকেল বার্নস্, শেখ আবদুল মান্নান, লুলু বিলকিস বানু, লন্ডন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি সুলতান মাহমুদ শরীফ ও 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর সম্পাদক ফরিদ এস. জাফরী।

লর্ড ব্রকওয়ে পূর্ব বঙ্গের ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করেন এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে কোনো প্রকার সাহায্য না দেয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার প্রতি আবেদন জানান। পিটার শোর পূর্ব বঙ্গের হত্যাকান্ডকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং বিধ্বস্ত এলাকায় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল পাঠাবার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানান।

মাইকেল বার্নস শরণার্থীদের সাহায্যদানের ব্যাপারে আলোচনা উপলক্ষ্যে সময় অপচয় না করে পূর্ব বঙ্গ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা বাঞ্চনীয় বলে মন্তব্য করেন।

সুলতান শরীফ স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলেন, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বাঙালিরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

'বাংলাদেশ নিউজলেটার' সম্পাদক ফরিদ এস. জাফরী এবং পাকিস্তানী ছাত্রনেতা তারিক আলী পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেন।[২০]

এই সভায় কোনো কোনো বক্তা বাংলাদেশ সংগ্রামকে ভিয়েতনামের সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁদের বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের জীবনমরণ সংগ্রামে প্রতিবেশী ভারত ও অন্যান্য বন্ধু দেশের সাহায্য তাঁরা প্রত্যাশা করেন। অধিকাংশ শ্রোতা তাঁদের সঙ্গে একমত হন।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বিচারপতি চৌধুরী ব্রিটিশ মিনিস্টার ফর ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট রিচার্ড উডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইয়ান সাদারল্যান্ড এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তিনিও এই সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী মি. উড্‌কে পূর্ব বঙ্গে রক্তক্ষয় বন্ধ এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করার অনুরোধ জানান। মি. উড বলেন, ব্রিটিশ সরকার ইতোমধ্যে পাকিস্তানে নিয়োজিত ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করেছেন এবং একটি বন্ধু রাষ্ট্রের ওপর যতটা চাপ দেয়া সম্ভব তা তারা নিশ্চয় দেবেন।

৬ এপ্রিল স্যার আলেক পকিস্তান হাই কামিশনার সালমান আলীর সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী আলোচনাকালে পূর্ব বাংলা সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাব জ্ঞাপন করেন। শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য ফ্রাঙ্ক জাডের এক চিঠির উত্তরে পাকিস্তান হাই কমিশনার জানান ঃ

"পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে কয়েক দিন আগে গ্রেফতার করেছেন এবং বর্তমানে তিনি আটক রয়েছেন।" ৬ এপ্রিল 'দি গার্ডিয়ান' ও 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৬ এপ্রিল (সোবরার) সকালবেলা জানা যায়, পূর্বদিন রাতে বেশ কিছুসংখ্যক পার্লামেন্ট সদস্য পূর্ব বঙ্গে 'গৃহযুদ্ধ' বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। এঁদের মধ্যে ব্রুস ডগলাসম্যান, ফ্রাঙ্ক জাড্, নাইজেল ফিসার, এরিক হেকার এবং জন্দ পার্ডোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেদিন বিকেলবেলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক ডগলাস-হিউম পার্লামেন্টে পূর্ব বঙ্গ সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। ৬ এপ্রিলের মধ্যে ১৬০ জনেরও বেশি পার্লামেন্ট সদস্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

স্যার আলেকের বক্তব্য বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনকারীদের কিছুটা নিরাশ করে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতবিরোধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূর করা বাঞ্চনীয় বলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইতঃপূর্বে ইয়াহিয়া খানকে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর সামরিক বল প্রয়োগ করার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সংঘাত বন্ধ করে পুনরায় আলোচনা শুরু করার জন্য পাকিস্তানের কাছে আবেদন জানান।

পার্লামেন্টে স্যার আলেক প্রদত্ত বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে ৬ এপ্রিল 'দি গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, গতকাল স্যার আলেক ডগলাস-হিউম পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সমর্থন ঘোষণার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি সে সুযোগের অপচয় করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন দলীয় সদস্যরা যে প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্পর্কে অবাক হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। পূর্ব পকিস্তানের জনগণ ভোটের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে ক্ষমতা গ্রহণের অধিকার দিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক নির্যাতন অসঙ্গত- একথা খোলাখুলিভাবে বলতে না পারলে স্যার আলেকের পক্ষে বিবৃতিদান স্থগিত রাখা উচিত ছিল।[২১]

ইতোপূর্বে টেলিফোন করে বিচারপতি চৌধুরী ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও সম্মানিত শিক্ষাবিদ লর্ড জেমসের সঙ্গে ৬ এপ্রিল সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে মধ্যাহ্নভোজ আমন্ত্রণ জানান। অতিথি হিসেবে প্রায় পনেরোজন অধ্যাপক তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। লর্ড জেমস্ ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনাকোলে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেন। তিনি বলেনঃ

"আমাদের সম-অধিকারের দাবি আজ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। জীবনে কখনো রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বাঙালি হিসেবে আমিও সেই সংগ্রামে যোগদান করেছি।" লর্ড জেমস্ বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা শিগগিরই বুঝতে পারবে তারা কি ভুল করেছে। ছ' মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।[২২]

আওয়ামী লীগ পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সংযোগ স্থাপন এবং তার ব্যাপকতা সম্পর্কে তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ৭ এপ্রিল সুলতান মাহমুদ শরীফ, এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু) ও মাহমুদ হোসেন লন্ডন থেকে কলকাতা রওনা হন। ব্রিটেনে দূতাবাস স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য তাঁরা প্রায় তিন মাস পর লন্ডনে ফিরে আসেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানী নির্যাতন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস সম্পর্কে তিনটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এই চলচ্চিত্রগুলো যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে স্থানীয় অ্যাকশন কমিটিগুলোর উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়।

১০ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি এবং পূর্ব বাংলায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার যতদূর সম্ভব কূটনৈতিক চাপ দেবেন বলে স্যার আলেক আশ্বাস দেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় দেড় ঘন্টাকাল আলাপের সময় মি. সান্দারল্যান্ড ও মি. ব্যারিংটন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাকালে স্যার আলেক জানতে চান, বিচারপতি চৌধুরী কোথায় থাকবেন বলে স্থির করেছেন। উত্তরে তিনি বলেনঃ

"আমি ঠিক করেছি আমার দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটেনে অবস্থান করবো, আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।"

এর উত্তরে স্যার আলেক অনেক কিছু না বলে একটি প্রীতিপূর্ণ হাসি উপহার দিলেন বলে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন। এই সাক্ষাৎকালে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, স্যার আলেক বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল।[২৩]

হোয়াইটহলে অবস্থিত পররাষ্ট্র দফতর থেকে বেরিয়ে এসে বিচারপতি চৌধুরী একটি ট্যাক্সি নিয়ে অল্ডউইচ এলাকায় অবস্থিত বুশ হাউসে বি বি সি'র ওভারসিজ সার্ভিসের বাংলা বিভাগে যান। সিরাজুল রহমান ও শ্যামল লোধ তৈরি হয়েই ছিলেন। তাঁরা বিচারপতি চৌধুরী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী হত্যার কাহিনী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বর্ণনা করে বলেন, বিশ্ববাসীকে এই নৃশংস হত্যার কথা তিনি জানাবেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরবেন না। বি বি সি সেদিনই এই সাক্ষাৎকার প্রচার করে। কলকাতার সংবাদপত্রে এই সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

বি বি সির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর পক্ষ থেকে পিটার গিল্ বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের পর বুশ হাউস ত্যাগ করার সময় স্থানীয় পাকিস্তান দূতাবাসে নিয়োজিত সেকেন্ড সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদকে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। মহিউদ্দিন আহমদ বলেনঃ

"স্যার, আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি। আপনি ডাকলেই আমাকে পাবেন।" তখনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দেয়ার কথা বলেন নি।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সভায় বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটি বাংলাদেশ আন্দোলনে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দলের সঙ্গে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটির সদস্য-সংখ্যা ৩১-এ দাঁড়ায়। কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ দেয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে আবেদন জানানো হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নিয়ে ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি চীনের সমর্থন প্রত্যাহার করার জন্য চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর কাছে একটি তারবার্তা পাঠানো হয়।

১২ এপ্রিল এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে বহুসংখ্যক বাঙালি ছাত্র নিজেদের পতাকা ও স্বাধীনতার দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে কমিটি ফর নিউক্লিয়ার ডিস্আরমামেন্ট আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসমাবেশে যোগ দেয়।[২৫]

উল্লেখিত তারিখে লন্ডনের জেরার্ড স্ট্রীটে 'দি গ্যাঞ্জেস' রেস্তোরাঁর মালিক তাসাদ্দুক আহমদ বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে 'মুজিবনগর'-এ অবস্থান গ্রহণকারী ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনযোগে আলাপ করেন। আলাপকালে আমীরুল ইসলাম বলেন, ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিচারপতি চৌধুরীর বেতার সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে তাজউদ্দিন আহমদ ও তাঁর সহকর্মীরা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁরা শিগগির প্রবাসী সরকার গঠন করবেন এবং তাজউদ্দিন আহমদ হবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে বিদেশে প্রবাসী সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চান। তাঁর সম্মতি নেয়ার জন্য আমীরুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার জন্য আমীরুল ইসলাম তাসাদ্দুক আহমদকে অনুরোধ করেন।[২৬]

১২ এপ্রিল আমীরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় বিচারপতি চৌধুরী বলেনঃ

"আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না হলেও আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কাজ করার সম্মতি জানাচ্ছি। আপনি নেতৃবৃন্দকে আমার সালাম জানাবেন এবং বলবেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সাধ্যমতো সাহায্য করবো।" আমীরুল ইসলাম বললেনঃ 'শিগগিরই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং তার পরেই আপনার নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেয়া হবে।'[২৭]

আমিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার পর বিচারপতি চৌধুরী ব্যালহাম এলাকার বাড়ি থেকে উত্তর লন্ডনের ফিঞ্চলি এলাকার একটি বাড়িতে উঠে যান। পাকিস্তান হাই কমিশনার সালমান আলী ব্যালহামের বাড়ির টেলিফোন নম্বর যোগাড় করে বিচারপতি চৌধুরীকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বরাবর তাঁকে টেলিফোন করা হয়। নিরাপত্তার খাতিরে তিনি বাড়ি বদলাতে বাধ্য হন। ফিঞ্চলির ফ্ল্যাটে এক সপ্তাহ থাকার পর তিনি পশ্চিম লন্ডনের এ্যাকটিন এলাকায় একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যান।

ফিঞ্চলির ফ্ল্যাটে থাকার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নামে পরিচিত লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স থেকে পুলিশ অফিসার মি. ল্যাঙ্গলি ও তাঁর সহকর্মী মি. ওয়াকার বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের এক গোপন পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে বলেন, সুযোগ পেলেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাদা পোশাকধারী গুপ্তচররা তাঁকে অপহরণ করে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। কাজেই তিনি যেন সাবধানে চলাফেরা করেন। অফিসাররা তাঁকে ভরসা দিয়ে বলেন, যুক্তরাজ্য সরকার তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধ্যানুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা বিচারপতি চৌধুরীর ওপর নজর রাখবেন। তাঁর টেলিফোন নম্বরের গোপনীয়তা রক্ষা, অপরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বেসরকারি যানবাহনযোগে চলাফেরা সম্পর্কে নানা ধরণের সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে বিদায় নেয়ার আগে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার জন্য একটি টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলে যান, এই টেলিফোন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবেন।[২৮]

১৩ এপ্রিল লন্ডনের 'দি ওয়ার্কার্স প্রেস'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, গাউস খানের নেতৃত্বে কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশের কয়েকশ' বাঙালি সমর্থক ১২ এপ্রিল লন্ডনস্থ চীনা দূতাবাসে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের প্রতি চীনের সমর্থন প্রত্যাহার করার আবেদন জানায়। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে দূতাবাসের কর্মচারীদের হাতে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বলা হয়, বাঙালিরা অতীতে তাদের সংগ্রামে চীনকে সমর্থক বলে বিবেচনা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি তাদের বর্তমান নীতির ফলে বাঙালি জনসাধারণ চীনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে শুরু করেছে।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিচারপতি চৌধুরী কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ এবং অধ্যাপক জিনকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর মি. স্মিথ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও পূর্ব বঙ্গে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাবেন বলে কথা দেন।

অধ্যাপক জিন্‌কিন্ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি রক্ষণশীল দলের কমনওয়েলথ গ্রুপের সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণক্রমে বিচারপতি চৌধুরী রক্ষণশীল দলভুক্ত পার্লামেন্ট সদস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

এক সভায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। লর্ড সেলকার্ক এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। মূল বক্তৃতার পর লর্ড সেলকার্ক একটি সহানুভূতিমূলক বক্তৃতা দেন। পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রশ্নের ধারা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁরা বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

১৩ এপ্রিল 'দি টাইমস্' পত্রিকায় যুক্তরাজ্য-প্রবাসী ভারতীয় লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শুরুতে তিনি বলেন, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং বেতার ও টিভিকে পূর্ব বঙ্গের ঘটনাবলিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বাঙালি হিসেবে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডর্ড' পত্রিকায় (বর্তমানে অবলুপ্ত) প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধের উল্লেখ করে মি. চৌধুরী বলেন, তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তা ঘটেছে। সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের অচিন্তনীয় শ্রেষ্ঠতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে এই শক্তি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হবে। তিনি পূর্ব বাংলা মুসলমানদের এ ব্যাপারে সংযত হওয়ার পরামর্শ দেন। পাকিস্তানের সামরিক আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে ঢাকায় সমবেত ব্রিটিশ সাংবাদিকরা যে ধরণের সংবাদ পাঠিয়েছেন, তার ফলে বাঙালি মুসলমানরা চরম পন্থা গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

মি. চৌধুরী মনে করেন, পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা ফিরিওয়ে আনা পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা দূর করে তারা পূর্ব বাংলায় শত্রু-দেশ দখলকারী সৈন্যবাহিনী হিসেবে থাকার চেষ্টা করছে। তাদের এই চেষ্টা সফল হবে এবং অনির্দিষ্টকাল তারা পূর্ব বাংলা দখলে রাখতে সক্ষম হবে। 'দি টাইমস্'কে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, আপনাদের উদ্দেশ্য সৎ বলে স্বীকার করে বলতে হচ্ছে, উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা যে পরামর্শ দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন অসম্ভব। উপসংহারে তিনি বলেন, বাঙালিদের প্রতিরোধ বৃদ্ধির সহায়ক কোনো কিছু না করাই হবে দয়ালু মনোভাবের পরিচায়ক।[২৯]

উল্লেখিত তারিখে 'দি টাইমস্'-এর প্রকাশিত অপর এক চিঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যারয়ের উপাচার্য এস. এন. সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১৪ এপ্রিল 'দি ওয়ার্কার্স প্রেস'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, পাকিস্তানের সংহিত বজায় রাখার জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে চৌ এন-লাই বাণী পাঠিয়েছেন। বানীতে বলা হয়, পাকিস্তানে এখন যা ঘটছে তা মূলত তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চীন সরকার মনে করে। ভারতের সম্প্রসারণবাদীরা যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে তাহলে চীনের জনসাধারণ ও সরকার পাকিস্তান সরকারের পক্ষ সমর্থন করবে।

ইতোমধ্যে পাকিস্তান থেকে লন্ডনে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও মওলানা মওদুদী বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থনদানের জন্য অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর এম. কে. জানজুয়া, তারিক আলী, ফরিদ জাফরী, হামজা আলভী ও অন্য পাকিস্তানীদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। উগ্রপন্থী পাকিস্তানী মোল্লারা তারিক আলী ও ফরিদ জাফরীকে কাফের বলে বর্ণনা করে।

এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে পৃথকভাবে দেখা করে তাদের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি বলেন, ব্যরিস্টার আমীরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন, তাঁর কোনো দল বা সমিতির কর্মকান্ডে যোগ দেয়া উচিত হবে না। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিভিন্ন দলের সংগ্রামী স্পৃহা ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অতএব, তিনি নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতার জন্য কাজ করবেন।[৩০]

গাউস খানের অনুরোধক্রমে শেখ আবদুল মান্নান বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলের সাফল্য কামনা করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, তিনি কোনো বিশেষ দল বা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবেন না। নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতার জন্য তিনি কাজ করবেন বলে স্থির করেছেন।

স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ হাউসের প্রেসিডেন্ট আনিস রহমান বলেন ঃ

'এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকের এক সন্ধ্যায় তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ফজলে রাব্বি মাহমুদ হাসানের আর্লস্ কোর্টের বাড়িতে বসে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁরা বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দলীয় কোনো ব্যক্তিত্বের শরণাপন্ন হওয়ার কথা ভাবছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা বিচারপতি চৌধুরীর কথা চিন্তা করেন। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নির্বিচারে হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য হিসেবে বিচারপতি চৌধুরীকে তাঁরা উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আনিস রহমান তখনই তাঁকে টেলিফোনে করে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য অনুরোধ জানান।" বিচারপতি চৌধুরী একটু ইতস্ত ত করে বললেনঃ "আমার কি কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়া উচিত হবে?" আনিস রহমান বললেন ঃ 'স্যার, এটা এখন আর রাজনীতি পর্যায়ে নেই; এটা বাংলাদেশের জনগণের অস্তিত্বের প্রশ্ন।' বিচারপতি চৌধুরী কথাটা মেনে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আধঘন্টার মধ্যেই আর্লস্ কোর্টে এসে হাজির হন। সেদিন যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, তার ভিত্তিতে কিছুকাল পর এ্যাকশন কমিটিগুলোকে নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।[৩১]

১৬ এপ্রিল লন্ডনের হলওয়ে এলাকায় ব্যারিস্টার রুহুল আমিনের বাড়িতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন অ্যাকশন কমিটি ও রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে তাঁদের কার্যকলাপের বিবরণ দেন। বৈঠকে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও কাউন্সিল ফর দি পিপল'স রিপাবলিক অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট গাউস খান, শেখ আবদুল মান্নান, শামসুল হুদা হারুন, আমীর আলী, শামসুল মোর্শেদ, আবদুল হামিদ ও ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন।[৩২]

এই বৈঠকে কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট গাউস খান বলেন, আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। বিচারপতি চৌধুরী প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করতে রাজি হলে তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন। বিচারপতি চৌধুরীর পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা কেন সম্ভব নয় তা তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের আবেদন জানান। রাত দুটো পর্যন্ত আলোচনায় পরও কমিটির কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয় নি। পরদিন আবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে একমত না হলে তিনি আর ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করবেন না। তা সত্ত্বেও সেদিন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

১৬ এপ্রিল (শুক্রবার) ব্রিটেনের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ স্টেটসম্যান'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'দি ব্লাড অব বাংলাদেশ' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, রক্তের বিনিময়ে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, তা হলে বাংলাদেশ অত্যধিক রক্ত দিয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সরকারের পতন এবং দেশের সীমান্ত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যেসব সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে, তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী ও স্বল্পকাল স্থায়ী বলে প্রমাণিত হতে পারে। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম সাময়িকভাবে পরাজিত হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকৃতি পাবে।

উল্লেখিত তারিখে ব্রিটেনের বামপন্থী রাজনৈতিক দল 'দি সোস্যালিস্ট লেবার লীগ'-এর উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের টয়েনবি হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আশাতীত জনসমাগমের ফলে বহু বাঙালি শ্রোতা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে গণহত্যা সংগঠনের জন্য রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া চক্র ও তার সমর্থক চীনের তীব্র নিন্দা করা হয়।

১৮ এপ্রিল 'দি অবজারভার' পত্রিকায় 'মুজিবনগর' সরকার গঠনের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদ শপথ গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ হাজার বাঙালি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সমবেত হন। মুক্তিবাহিনীর রাইফেলধারী তরুণরা বাংলাদেশ সরকারের সদস্য, বিদেশী সাংবাদিক ও অতিথিদের নিরাপত্তা দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৮ এপ্রিল 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 'ম্যানড্রেক' গৃহীত এক সাক্ষাৎকারকালে বিচারপতি চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের হৃদয়বিদারক বিবরণ দিয়ে বলেন, এরপর অখন্ড পাকিস্তানের আদর্শ মরিচিকা মাত্র। তিনি আরও বলেন, দু'সপ্তাহ যাবৎ ক্রমাগত বোমা ও গোলাগুলির সাহায্যে জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যার পর পূর্ব বাংলার ভয়াবহ পরিস্থিতিকে পাকিস্তানের 'ঘরোয়া ব্যাপার' বলে গণ্য করা চলবে না।

উল্লিখিত তারিখে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলনের (মুভমেন্ট ফর কলোনিয়াল ফ্রিডম) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান লর্ড ব্রকওয়ে বলেন, পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ হিটলার আমলের পর দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে অনুভূতিহীন ও বর্বরতম আক্রমণ বলে পরিগণিত হবে। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি জানানো হয়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে 'লিবারেশন' নামে পরিচিত হয়।

১৮ এপ্রিল (রোববার) পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচশ বাঙালি শ্রমিক এই সভায় যোগদান করেন। সেদিন বিকেলবেলা লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশেও প্রায় পাঁচ হাজার লোক যোগদান করেন। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তোজাম্মেল হক (টনি) তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত তারিখে শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যানের নেতৃত্বে 'জাস্টিস ফর ইস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ হতে আগত শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য কলকাতা রওনা হন।

ইতোমধ্যে বিচারপতি চৌধুরী কয়েকজন সমমনা বাঙালিসহ পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পিটার শোর, ব্রুস ডগলাসম্যান, মাইকেল বার্নস্ ও জন স্টোনহাউস। তাঁরা প্রবাসী বাঙালিদের সম্মিলিতভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মাইকেল বার্নস্ পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের যুক্তরাজ্য সফর বাতিল করার দাবি জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর গণহত্যামূলক অভিযানের পর পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের সফর 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'র সঙ্গে তুলনীয়। ১৯ এপ্রিলের মধ্যে বিভিন্ন দলভুক্ত ত্রিশজন পার্লামেন্ট সদস্য এই প্রস্তাবের পক্ষে স্বাক্ষরদান করেন।

২০ এপ্রিল ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের বিরোধীদলের নেতা হ্যারল্ড উইলসনের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বলেন, যথাসময়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিবৃতি পার্লামেন্টে পেশ করবেন। মি. উইলসন পূর্ব বাংলায় গণহত্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পরিদর্শক টিম পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। উদারনৈতিক দলের সদস্য ডেভিড স্টিলের এক প্রশ্নের উত্তরে মি. হীথ বলেন, ব্রিটিশ সরকার সংঘর্ষের অবসান এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অনুসন্ধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকদলীয় সদস্য উইলিয়াম হ্যামিলটন বলেন, পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের তীব্র নিন্দা নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত। শ্রমিকদলের নেতৃস্থানীয় সদস্য পিটার শোর পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী অনুসৃত নিষ্ঠুর দমননীতি পরিহারের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নীতি-নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে জরুরি আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবি জানান।[৩৩]

২০ এপ্রিল 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, 'বিচ্ছেদপন্থী নেতা' শেখ মুজিব ও 'পাকিস্তান-বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত তাঁর সহকর্মীদের' বিচারের জন্য ইসলামাবাদে একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। করাচি থেকে প্রেরিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ নামের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতাদের ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার 'নিশ্চিত প্রমাণ' পাকিস্তান সরকারের হাতে রয়েছে বলে একটি আধাসরকারি সূত্র দাবি করে।

১৯৬০-এর দশকে ব্রিটেনের বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী পাকিস্তানী ছাত্রনেতা তারিক আলী বামপন্থী পাক্ষিক 'দি রেড মৌল'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের সামরিক চক্র ও জুলফিকার আলী ভূট্টোকে দায়ী বলে ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানকে সমর্থনদানের জন্য তিনি মাওপন্থী চীনের কঠোর সমালোচনা করেন।

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের কর্মসূচী তৈরি করার উদ্দেশ্যে পাক্ষিক 'পিস নিউজ' পত্রিকার অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পল কনেট, মিস মারিয়েটা প্রকোপে ও পত্রিকাটির সম্পাদক। যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি) ও খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর) এই বৈঠকে যোগ দেন। কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর 'এ্যাকশন বাংলাদেশ ক্লিয়ারিং হাউস' শীর্ষক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০ এপ্রিল আটটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে 'এ্যাকশন বাংলাদেশ ক্লিয়ারিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪] পূর্ব বাংলা থেকে অবিলম্বে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের দাবির ভিত্তিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বাস্তুহারা বাঙালিদের সাহায্যদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়। পল কনেটের নেতৃত্বে তরুণ শিক্ষার্থী মিস মারিয়েটা প্রকোপে ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লন্ডনের ক্যামডেন এলাকায় তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠানটির অফিস স্থাপন করা হয়। শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মাইকেল বার্নস এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২৩ এপ্রিল কলকাতায় এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যান বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে সংঘটিত মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের মতো বহু ঘটনা পূর্ব বাংলায় প্রতিনিয়ত ঘটছে। কয়েক দিন আগে মি. ডগলাসম্যান তাঁর পার্লামেন্টারি সহকর্মী মি. স্টোনহাউসসহ পূর্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য কলকাতায় পৌছান।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের এ্যাকশন কমিটিগুলোর কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব লন্ডনের আর্টিলারি প্যাসেজে নেতৃস্থানীয় বাঙালিদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা মতিউর রহমান চৌধুরী ('দিলশাদ' রেস্তোরাঁর মালিক) হলের ব্যয়ভার বহন করেন। বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেন। পরপর তিন রাত আলোচনার পর ২৩ এপ্রিলের বৈঠকে কভেন্ট্রি শহরে পরদিন (২৪ এপ্রিল) এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে এ্যাকশন কমিটিগুলোকে নেতৃত্বদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

উল্লিখিত বৈঠকে 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.'র সভাপতি গাউস খানসহ কেন্দ্রীয় কমিটির ১১ জন সদস্য পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা করেন। যুক্তরাজ্যের প্রত্যেকটি এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের কভেন্ট্রি সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সভার উদ্যোক্তারা বিচারপতি চৌধুরীকে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

কভেন্ট্রি সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাজী আবদুল মতিন (ম্যাঞ্চেস্টার), নবীরউদ্দিন (লুটন), শামসুর রহমান (পূর্ব লন্ডন), আজিজুল হক ভূঁইয়া (বার্মিংহাম), মনোয়ার হোসেন (ইয়র্কশায়ার), এ. এম. তরফদার (ব্রাডফোর্ড) এবং শেখ আবদুল মান্নান (লন্ডন)।[৩৫]

২৪ এপ্রিল 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, পশ্চিম বঙ্গের 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, পশ্চিম বঙ্গের নকশালপন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নকশালপন্থীদের দেয়ালপত্রে দাবি করা হয়, পূর্ব বাংলায় 'তথাকথিত বিপ্লব চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র' ছাড়া আর কিছুই নয়। উক্ত সংবাদে আরও বলা হয়, উগ্র মাওপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

২১ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রে বিচারপতি চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২৩ এপ্রিল লন্ডনে বসবাসরত বাঙালি ব্যবসায়ী রফিক উদ্দিন তাঁকে টেলিফোনে জানান, কলকাতা থেকে তাঁর নিয়োগপত্র তিনি সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছেন। সেদিন দুপুরবেলা বিচারপতি চৌধুরী এনামুল (ভন্টর) হকসহ রফিকউদ্দিনের রেস্তোরাঁয় যান। মধ্যাহ্নভোজনের সময় নিয়োগপত্রখানি তাঁর হাতে দেয়া হয়। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে নিয়োগপত্রখানি কভেন্ট্রি সম্মেলনে পড়ে শোনানোর জন্য অনুরোধ করেন। কারণ, এই নিয়োগপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পক্ষে কোনো বিশেষ দল বা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার প্রশ্ন অবান্তর।[৩৬]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-২।
২. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী।
৩. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক)।
৪. আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-২৪, ১৯৫।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪-২৫।
৬. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু) এবং 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল-হক, পৃষ্ঠা-৪৯-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-২৫।
৭. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-২৬।
৮. 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩-৫।
৯. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮, ১৯৬।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-২৮-২৯।
১১. 'Thanks to Allah, Pakistan is at last saved,' he (Mr. Bhutto) said, as the tanks and guns rolled into Bengal. But the dream of Mr. Jinnah, the first Governor-General of Pakistan, of a country united by the bond of Islam has vanished into the thin air. Mr.Bhutto's new Pakistan will be kept together with rifle and bayonets.
[সূত্রঃ Peter Hazelhurst, 'The Times', 29 March, 1971. -এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-২৯-৩০, ১৯৬।]
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-৩০, ১৯৬।
১৩. Sheikh Mujib was telephoned and warned that something was happening, but he refused to leave his house. 'If I go into hiding, they will burn the whole of Dhaka to find me,' he told an aide who escaped arrest.

Dhaka University Institutional Repository

[সূত্রঃ Simon Dring, 'The Telegraph', 30 March, 1971. -এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৩১, ১৯৬।]

১৪. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৭।

১৫. ঐ।

১৬. 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃষ্ঠা-৪৯-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে আবদুল মতিন উল্লেখিত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন, ঐ, পৃষ্ঠা-৩২-এ।

১৭. সূত্রঃ আনোয়ারা জাহান রচিত নিবন্ধ 'গ্রেট ব্রিটেনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ঃ ইতিহাস ও কার্যক্রম', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ৮৩ ; আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৩২-এ 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃষ্ঠা-৪৯-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

১৮. On 3 April, 1971 the TASS news agency of the Soviet Union made public a message sent by N. Podgrony, President of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR to President Yahiya Khan of Pakistan. The following are excerpts from the message:

'The report that talks in Dhaka had been broken off and the military administration had found it possible to resort to extreme measures and used armed force against the population of East Pakistan was met with great alarm in the Soviet Union.

'The Soviet people cannot but be concerned by the numerous casualties, by the sufferings and privations that such a development of events bring to the people of Pakistan. Concern is also caused in the Soviet Union by the arrest and the persecution of M. (Sheikh Mujibur) Rahman and other politicians who had received such convincing support by the overwhelming majority of the population of East Pakistan at the recent General Election....'

[সূত্রঃ 'The Observer', London, 4 April, 1971. -এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৩১, ১৯৬ এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-১৫০।]

১৯. শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৫৭।

২০. 'Bangladesh Newsletter, London, 14 April, 1971-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬, ১৯৬।

২১. 'Sir Alec Douglas-Home had the opportunity yesterday (5 April) to declare Britain's support for democracy in East Pakistan. He wasted it. Instead his statement reflected in every line the immemorial caution of is department (of Foreign Affairs) ... The President (Yahiya Khan) did not want Sheikh Mujib to assume the power that his people had voted him. So the President reached for his gun.'

[সূত্রঃ Editorial comment, 'The Guardian', London, 6 April, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬, ১৯৭]

২২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ঐ, পৃষ্ঠা-৮-৯।

২৩. সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু) এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ঐ, পৃষ্ঠা-১৫-১৭।

২৪. ঢাকায় এক সাক্ষাৎকারে মহিউদ্দিন আহমদ এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭।

২৫. ঢাকায় এক সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

২৬. বিচারপতি চৌধুরীর ঠিকানা তাসাদ্দুক আহমদের জানা ছিল না। তিনি আমীরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ বিচারপতি চৌধুরীকে জানাবার জন্য আবদুল মতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আবদুল মতিন তাঁর সহকর্মী আমীর আলী মারফত উল্লিখিত সংবাদ বিচারপতি চৌধুরীকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আমীর আলীর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর যোগাযোগের কথা তাঁর জানা ছিল। তাঁকে বলা হলো, তিনি যদি আমীরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন, তাহলে তাসাদ্দুক আহমদের রেস্তোরাঁ থেকে পরদিন (১২ এপ্রিল) একটি নির্দিষ্ট সময়ের 'কল বুক' করা হবে। যথাসময়ে কলকাতার এক 'কল' পাওয়া গেলে তা দক্ষিণ লন্ডনের ব্যালহামে অবস্থিত বিচারপতি চৌধুরীর বাসস্থানের টেলিফোনে দেয়ার জন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে নির্দেশ দেয়া হবে। ১১ এপ্রিল বিকেলবেলা বিচারপতি চৌধুরীর সম্মতি পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

[সূত্রঃ 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য'র লেখক আবদুল মতিনের স্মৃতিচারণ, পৃষ্ঠা-১৯৭ এবং সাক্ষাৎকারে ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম।

২৭. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮-১৯।

২৮. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ঐ, পৃষ্ঠা-২০।

২৯. Excerpts from the letter of Nirad C. Chaudhury, author of `Autobiography of an Unknown Indian':

'The British correspondents in Dhaka before the military action began were extremely unrealistic in playing up the possibility and even inevitability of the secession, and in overrating the strength of the Awami League. It was reckoning without the host. I do think that this attitude of the foreign correspondents encouraged the extremism of the Muslim Bengaless.

'Secondly, it is wholly unrealistic to speak of a civil war which however regrettable is after all an honourable phenomenon. The Pakistan Army has ruthlessly slaughtered the Bengali secessionists and the Bengalees have reacted in a manner in which Indian masses react whenever their fears, passions and anger are aroused. They break out in an unreasoining frenzy of violence, which does more harm to themselves than to the enemy...

'Thirdly, the military appraisements of what might happen during the monsoons are equally unreal. No terrain or weather condition can obstruct a determined Army; that is a military axiom forgotten only by anameture strategist. But in this case these are not even relevant. It is not the object of the Pakistan Army to restore normal civil administration and life in East Bengal. All that it is attempting to do is to prevent secession and remain in East Bengal as an Army of occupation in an enemy country. This it can do indefinitely. So, the onus of restoring government to Eat Bengal has been passed on to the Bengalees, who alone will suffer if the disorders continue. The worst is yet to come, for famine and disease will follow...

'Lastly, I must denounce as strongly as I can the mood that I detect in this country of getting vicatious enjoyment from the idea of successful resistance by East Bengal Muslims and of gloating over small and local success of Bengalsee resistance. I think the BBC acted very irresponsibly by showing a film of Jessore with scenes of the killing of non-Bengalee Muslims and of gloating over small and local success of Bengalee resistance and even of the surrender of the Pakistan troops in Jessore Cantonment with a confidence which shocked me...

'The only human attitude to adopt now would be to refrain from saying or doing things which would encourage Bengalee resistance or give provocation to the Pakistan Army. The outside cannot do anything more for the Bengalee Muslims, but it can at least avoid worsening the situation.'

[সূত্রঃ 'The Times, London, 13 April, 1971. -এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০-৪১, ১৯৮-১৯৯]

৩০. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৩১. 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজমু-নুল হক, পৃষ্ঠা-৭৮-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে আবদুল মতিন উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২-এ।

৩২. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩, ১৯৯।

৩৩. 'Bangladesh Newsletter, London, 4th issue 16 April, 1971-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

৩৪. Bangladesh Students Action Committee, International Conscience for Action, Peace Pledge Union, Friends Peace Council. Third World Review, Young Liberals, Peace News and Campaign for Self-Rule in Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

[সূত্রঃ 'Bangladesh Newsletter', London, 26 April, 1971. -এর সূত্র উল্লেখ করে [সূত্রঃ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬, ১৯৯ এবং ঢাকায় সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) এবং ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেন।]

৩৫. শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬।

৩৬. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩-২৪।

৩.২ কভেন্ট্রি সম্মেলন, সংগঠনসমূহের একতাবদ্ধতা এবং স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ঃ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বিলাতে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও কর্মসূচী প্রণয়নের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া প্রবাসী বাঙালিদের এক গৌরবের ইতিহাস। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

কভেন্ট্রি সম্মেলন প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"প্রতি শহরে ও এলাকায় স্ব-স্ব উদ্যোগে সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিরা তাঁদের দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও পাকিস্তানীদের জঘন্য গণহত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রত্যেক বাঙালি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই কোন পরিকল্পনা ও বৃহত্তম যোগাযোগের তোয়াক্কা না করে প্রায় প্রত্যেক শহরেই একাধিক সংগ্রাম কমিটি গড়ে উঠেছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একস্থানে একাধিক সংগঠন কোন প্রতিযোগিতা বা বিরোধের ফলে আত্মপ্রকাশ করেনি বরং দেশের দুর্দিনে সামান্য হলেও অবদান রাখার মহৎ উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল। তবে প্রতিযোগিতা বা বিরোধের কারণে লন্ডনসহ কয়েকটি বড় শহরে বহু সংগ্রাম পরিষদ আত্মপ্রকাশ করে। যার ফলে পরবর্তীতে সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণে অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। লন্ডন ছিল বিলাতে বাংলাদেশ সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। লন্ডন শহরে বেশ কয়েকটি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে ওঠে রাজনৈতিক ও ব্যক্তির প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে। গাউস খানের নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তরাজ্যস্থ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লন্ডনে 'কাউন্সিল ফর লিবারেশন অব বাংলাদেশ' নামে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। মিনহাজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন লন্ডন আওয়ামী লীগ এবং বি. এইচ তালুকদারের নেতৃত্বে পরিচালিত ওভারসীজ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আরো দু'টি সংগ্রাম পরিষদ অত্মপ্রকাশ করে। এমনিভাবে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পন্থী ন্যাপ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ পন্থী ন্যাপ ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করে। পেশাভিত্তিক সংগঠন- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ডাক্তার সমিতি ও মহিলা সমিতি ইতোমধ্যে বহু কর্মসূচী এককভাবে বা যৌথভাবে যোগাযোগের মাধ্যেমে গ্রহণ করেছিল। রাজনীতির সাথে জড়িত নানা বহু সমাজসেবী ব্যক্তিও এলাকা ভিত্তিক বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সমিতি, বাংলাদেশ যুব সংঘ, বাংলাদেশ সারভাইভাল কমিটি, বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি, বাংলাদেশ গণ সংহতি, (মৌলভী-বাজার) জনসেবা সমিতি ইত্যাদি নামে বহু কমিটি গঠন করে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন। এমনও দেখা গেছে যে, একই ঠিকানায় দুই কমিটি কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ ৫৮ নং বারউইক স্ট্রীট, লন্ডন ডবিউ-১ এর ঠিকানায় 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' ও 'লন্ডন এ্যাকশন কমিটি' নামে দুইটি সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছে। লন্ডন ছাড়াও বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রাডফোর্ডে বহু স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম কমিটি আত্মপ্রকাশ করে।"[১]

স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতো কমিটি আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম ও প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও বিলাতের সংগ্রামকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বেশ বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রাটের ফলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েও কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছিলেন না। তাই মধ্য এপ্রিলেই সংগ্রাম পরিষদের নেতা ও কর্মীরা উপলব্ধি করলেন যে, সকল সংগ্রাম কমিটিকে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাথে পরামর্শক্রমে কভেন্ট্রি নামক একটি ছোট শহরে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা সকল সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সম্মেলন আহবানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২]

২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত কভেন্ট্রি সম্মেলন বিলাতের বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের এক মাইল ফলক। এত দ্রুত গড়ে ওঠা সংগ্রাম পরিষদগুলোকে সমন্বয় করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠন কঠিন বিষয় হলেও কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছিল। বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা কোন একক রাজনৈতিক সংগঠনকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই উক্ত সম্মেলনটিকে অরাজনৈতিক ও সার্বজনীন চরিত্র দেয়ার উদ্দেশ্যে বিলাতে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে বিশিষ্ট মহিলা মিসেস লুলু বিলকিস বানুকে সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি কোন রাজনৈতিক দল বা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন না। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি ইতোমধ্যে মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন। নিয়োগপত্রটি মুজিবনগর সরকার সিলেটবাসী লন্ডনে বসবাসকারী সমাজকর্মী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রকিবের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। সম্মেলনে তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিয়োগপত্রটি পাঠ করে শোনান। কভেন্ট্রি সম্মেলনে বিলাতের প্রায় সকল শহরের সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, গাউস খান, মিনহাজ উদ্দিন, আজিজুল হক ভূঁইয়া, শেখ আবদুল মান্নান, মহিলা সমিতির পক্ষে মিসেস জেবুন্নেসা বখশ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আহবায়ক-দ্বিতীয় খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।[৩] কভেন্ট্রির প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের একটি তালিকা দিয়েছেন নূরুল ইসলাম; যা নিম্নরূপ ঃ

সারণি-৫৮

কভেন্ট্রির প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের তালিকা ঃ

এ্যাকশন কমিটির নাম	অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ
লন্ডনঃ	গাউস খান, নেছার আলী, জুরতুর রহমান, তৈয়বুর রহমান, শামসুর রহমান, তাসাদ্দুক আহমদ তাহির আলী, মিনহাজ উদ্দিন, নজিরউদ্দীন, নিম্বর আলী, আব্দুল হামিদ, আব্দুর রকিব, ছমরু মিয়া, মতিউর রহমান চৌধুরী, বদরুল হক তালুকদার, আতাউর রহমান খান, মোহাম্মদ ইসাক, জিল্লুল হক, গোলাম মোস্তফা, আছান আলী, রমজান আলী, শাহ সিরাজুল হক, শওকত আলী, আবুল বশর ও একরামুল হক।
বার্মিংহাম ঃ	আফরুজ মিয়া, জমশেদ মিয়া, এম. জে. পাশা, সবুর চৌধুরী, এ. কে. এম. এ. হক ও আজিজুল হক ভূঁইয়া।
কভেন্ট্রি ঃ	সিতু মিয়া, আব্দুল বারী, শামসুল হুদা চৌধুরী।
ম্যাঞ্চেস্টার ঃ	আব্দুল মতিন, মকদ্দছ বখত, কবীর চৌধুরী, লাল মিয়া ও মাহবুবুর রহমান।
ওল্ডহাম ঃ	আব্বাছ আলী, মকছুদ আলী ও আব্দুর রহমান।
ব্রাডফোর্ড ঃ	মনোয়ার হোসেন, সি. এম. খান, এ. বি. তরফদার ও লুৎফুর রহমান।
শেফিল্ড ঃ	আব্দুল গফুর ও খলিলুর রহমান।
লুটন ঃ	মুহিবুর রহমান, হবিবুর রহমান ও বুরহানউদ্দীন।
সেন্ট আলবান্স ঃ	নবীরউদ্দীন চৌধুরী ও ফিরোজ মিয়া।
বেডফোর্ড ঃ	আব্দুছ ছুবহান মাষ্টার ও ফজলুর রহমান।
অক্সফোর্ড ঃ	এখলাছুর রহমান, ফজলুল হক ও ময়না মিয়া।
হেসলিংডেন ঃ	তবারক আলী, তমিজউদ্দীন ও মোঃ ফজলু।
রচ্‌ডেল ঃ	আব্দুল মছব্বির, আনোয়ার আলী ও রহমত আলী।
হাইড (চেশায়ার) ঃ	গাউস আলী খান, আব্দুল আজিজ ও মোজাম্মিল আলী।
ব্রায়টন ঃ	আফজল হোসেন মাষ্টার, সিফৎ উল্লাহ ও হাজী আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী।
কার্ডিফ ঃ	আব্দুল হান্নান, মোঃ ফিরোজ মিয়া ও আব্দুস শহীদ।

[৪]

কভেন্ট্রির এই প্রতিনিধি সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয় ঃ

(ক) গ্রেট বৃটেনে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং এই প্রস্তাবাবলি গ্রহীত হয় 'Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in the U.K.'

(খ) অদ্যকার সভায় পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হল এবং উক্ত কমিটির নাম হবে 'Steering Committee of the Action Committee'. উক্ত কমিটিকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সর্বক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকার দেয়া হল।

(গ) এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত হলো যে, 'Steering Committee'কে প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য বাড়াবার ক্ষমতা দেয়া হলো।

(ঘ) এই কমিটির যে পাঁচজন সদস্য মনোনয়ন দান করা হলো তাঁরা হলেন ঃ

(১) আজিজুল হক ভূঁইয়া, (২) কবীর চৌধুরী, (৩) মনোয়ার হোসেন, (৪) শেখ আবদুল মান্নান ও (৫) শামসুর রহমান।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) এই পাঁচজনের প্রথম সভার অধিবেশন অদ্যকার সভার সভানেত্রী লুলু বিলকিস বানুর আহবানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ সভায় একজন আহবায়ক নিযুক্ত করা হবে।

(চ) বর্তমানে গ্রেট বৃটেনে যত কমিটি আছে সে সকল কমিটি এই কমিটির শাখা রূপে কাজ করবে।[৫]

উক্ত সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ও বাংলাদেশ মেডিকেল সমিতি স্টিয়ারিং কমিটির সকল কর্মকান্ডে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। কভেন্ট্রি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় আজিজুল হক ভূঁইয়াকে স্টিয়ারিং আহবায়ক মনোনয়ন করা হয় এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে কভেন্ট্রি সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা' অক্ষুন্ন রাখা হয়।[৬]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. সিলেটে সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
৩. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং নূরুল ইসলাম।
৪. নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-১০০৫-১০০৬।
৫. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড', পৃষ্ঠা-২৮।
৬. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

৩.৩ স্টিয়ারিং কমিটির অফিস স্থাপন ঃ

বৃটেনের বাঙালিদের সকল সংগ্রাম কমিটির কর্মকান্ডের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য পূর্ব লন্ডনের ১১নং গোরিং স্ট্রীটে 'স্টিয়ারিং কমিটি অব দি এ্যাকশন কমিটি ফর দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.'-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অফিস স্থাপন করা হয়। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

লন্ডন প্রবাসীদের বিশেষ করে পূর্ব লন্ডনের বাঙালিদের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত অফিসটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি প্রবাসীদের সকল কর্মকান্ডের একটি কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"কেন্দ্রীয় কমিটির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ শুরু করে ঃ

(ক) বিলাতে গড়ে ওঠা সংগ্রাম কমিটিসমূহের সমন্বয় সাধন করা।

(খ) দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক শক্তি ও অন্যান্য সামগ্রী যোগদান এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণকে সাহায্য প্রেরণ।

(গ) দখলদার পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিদেশে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য বিদেশে সভা ও সমাবেশ আয়োজন করা।

(ঙ) বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বক্তব্য পেশ ও প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

(চ) বিভিন্ন সংগ্রাম কমিটির সংগৃহীত অর্থের সমন্বয় সাধন ও হিসাব সংরক্ষণ করা।[১]

উক্ত কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়া কমিটির কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বার্মিংহাম থেকে লন্ডনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। স্টিয়ারিং কমিটির অপর সক্রিয় সদস্য শেখ আবদুল মান্নান বৃটিশ সিভিল সার্ভিসে চাকরিরত ছিলেন। চাকুরীরত থাকা সত্ত্বেও শেখ আবদুল মান্নান সংগ্রামের সকল কর্মকান্ডের প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেছেন। শামসুর রহমান পূর্ব লন্ডনের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি কমিটির কার্যক্রমে উলেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কবির চৌধুরী এবং মনোয়ার হোসেন লন্ডনের বাইরে বসবাস করার ফলে আন্দোলনের সকল কর্মসূচীতে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। পরবর্তীকালে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যপদ থেকে মনোয়ার হোসেনের নাম বাদ পড়ে যায়। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে উলেখ করা হয়েছে।[২]

স্টিয়ারিং কমিটির অফিস স্থাপনের পর সংগ্রামের কর্মসূচী এবং বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে স্টিয়ারিং কমিটিতে কয়েকজন সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োজিত হন। তাঁদের মধ্যে শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং শামসুল আলম চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পী আবদুর রউফ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। তিনি তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও চলচ্চিত্র বিভাগের উপ-পরিচালক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডি এফ পি) ও আর্কাইভের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শিল্পী হিসেবে আবদুর রউফের উপর দায়িত্ব ছিল স্টিয়ারিং কমিটির প্রচার, আঁকা-জোঁখা, লিফলেট লেখা ও প্রকাশ করা। জনাব রউফ স্টিয়ারিং কমিটি ছাড়াও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, গণসংস্কৃতি সংসদ ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতির বিভিন্ন প্রচারপত্র ও পোস্টার তৈরি ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন। মহিউদ্দিন চৌধুরী পি. আই. এ.-এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পি. আই. এ পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের আন্দোলনে যোগদান করেন এবং স্টিয়ারিং কমিটিতে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হন। শামসুল আলম চৌধুরী 'বার-এট-ল' পড়ার জন্য লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। তিনি স্টিয়ারিং কমিটি এবং বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরীকে সাহায্য করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধির অফিস হিসেবে ১১নং গোরিং স্ট্রীটস্থ অফিসটিকেই ব্যবহার করতেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি ও স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে যুগপৎভাবে এই অফিসে বসে কাজ করতেন।[৩]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতির বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য বিলাতে অন্যান্য সংগ্রাম কমিটির পাশাপাশি স্টিয়ারিং কমিটিও সমাবেশ, শোভাযাত্রা এবং লবিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়া স্টিয়ারিং কমিটি মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং বিলাতের আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন, নির্দেশ জারি এবং পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। মুজিবনগর থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ এবং যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যাপারেও স্টিয়ারিং কমিটি দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে বিলাতের বাঙালিদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত রাখার উদ্দেশ্যে স্টিয়ারিং কমিটি ইংরেজী ভাষায় 'বাংলাদেশ টু-ডে' এবং বাংলা ভাষায় 'সংবাদ পরিক্রমা' নামে দু'টি সংবাদ সাময়িকী প্রকাশ করে। উক্ত পত্রিকাসমূহ বাংলাদেশ সরকারের এবং স্টিয়ারিং কমিটির মুখপত্র হিসেবে বিলাতের বাঙালিদের কাছে খবরাখবর পরিবেশন করে।[৪]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. সাক্ষাৎকারে ঐ এবং শহীদুল হক ভূঁইয়া।
৩. সাক্ষাৎকারে ঐ এবং আবুল হাসান চৌধুরী।
৪. সাক্ষাৎকারে ঐ এবং এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু)।

৩.৪ বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা ঃ

১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত 'এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.' এবং উক্ত এ্যাকশন কমিটির (উল্লেখ্য, বিদেশী নাগরিক প্রতিষ্ঠিত কমিটিসহ শতাধিক এ্যাকশন কমিটি উক্ত কমিটির আওতাভূক্ত হয়ে যায়) সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত করার লক্ষ্যে গঠিত 'স্টিয়ারিং কমিটি অব দি এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.' গঠিত হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্যস্থ প্রবাসী বাঙালিদের কর্মকান্ডের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হয়। এরপর থেকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ভাবে চলতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক কর্মকান্ড। আর এসব কর্মকান্ডের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) বলেন ঃ

"পঁচিশে মার্চের গণহত্যার খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের প্রধানতম কাজ হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র বিশ্বের বাংলাদেশের প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করা। অর্থাৎ বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সারা বিশ্বের সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বজনমত গঠন করা।"[১]

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকালবেলা থেকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি ছাত্র (বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) এ. এইচ. এম শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) ও আফরোজ আফগান চৌধুরীর ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের নিকটবর্তী হোয়াইট হলে অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে এই জনমত গঠনের কাজ শুরু হয় এবং এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারী লন্ডনের হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সর্বশেষ জনসভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সর্বশেষ বক্তব্যের মাধ্যমে।[২]

বিশ্ব জনমত গঠনে প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম ছিল ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা। জনসংযোগ, লবিং, ধর্ণা ইত্যাদির মাধ্যমে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা বৃটিশ সরকার, পার্লামেন্ট, সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধানদের নিকট পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো 'তীব্র গণহত্যা বন্ধ', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি' এবং 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়'-এর যৌক্তিক দাবীগুলো সফল ভাবে তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরতে সক্ষম হন। অন্যদিকে কখনো কখনো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বহির্বিশ্বে প্রচার-প্রচারণা চলানোর লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যকে ব্যবহার করেছেন ঘাঁটি হিসাবে; তাঁদেরকেও আশ্রয় ও সার্বিক সহায়তা যেমন দিয়েছেন, তেমনি পাক সরকারের পাঠানো এবং যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদেরও যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা মোকাবেলা করেছে সমান তালে।[৩]

সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল ছিল বিশ্ব দরবারে বাঙালি ও বাংলাদেশের দাবীগুলো তুলে ধরার আর এক শক্তিশালী মাধ্যম।[৪]

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্ব জনমত গঠনের আর এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ফ্যাক্টশীট, বুলেটিন, চিঠি, স্মারকলিপি, বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকার, পার্লামেন্ট, সরকার ও বিরোধী দলসমূহ, ব্রিটিশ মন্ত্রী, এম. পি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, ব্রিটিশ আপামর জনসাধারণ, মার্কিন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য, বিভিন্ন সংগঠন ও জনসাধারণ, অন্যান্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, ব্যক্তি ও সংগঠন এবং জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর এগুলো প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'সুদীর্ঘ তেইশ বছরের পাকিস্তানী শাসন-শোষণ, বৈষম্য, অপমান, লাঞ্ছনা-গাঞ্জনা,' এবং এর ফলে সৃষ্ট অচলঅবস্থা, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের টাল-বাহানার প্রতিবাদ এবং অবশেষে নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিত গণহত্যা শুরু করার কারণে বাঙালি কর্তৃক 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' রাষ্ট্র ঘোষণা করার যৌক্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা। এই ঘোষণাকে সফল ও সার্থক করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও ব্যাপক গণধর্ষণ লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ বন্ধ করা', 'ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থীর করুণ অবস্থার স্থায়ী সমাধান,' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির' দাবীর প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ঘোরানো এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে সাহায্য, সমর্থন আদায় করার জন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ফ্যাক্টশীট, বুলেটিন, চিঠি, স্মারকলিপি, বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। তাঁরা 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ'-এর স্বীকৃতি লাভ করার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী তাঁদের এ কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[৫]

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্লাকার্ড, পোস্টার, ব্যানার ও পতাকা প্রদর্শন, র‍্যালী, শোভাযাত্রা, চ্যারিটি শো, বিচিত্রানুষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্যক্রম এক দিকে যেমন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত লক্ষাধিক প্রবাসী বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে, অন্যদিকে একইভাবে বাংলাদেশের প্রতি বহির্বিশ্বের মানুষের মানবতাবাদী হৃদয় কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হয়।[৬]

বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আন্তর্জাতিক সর্থমন আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্বজনমত গঠনের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ব্যক্তি পর্যায়ে ও ছোট ছোট দল গঠন করে চষে বেড়িয়েছেন সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকাসহ তৎকালীন অধিকাংশ স্বাধীন ও সার্বভোম রাষ্ট্রসমূহ। প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এক হিসেবে প্রায় সমগ্র বিশ্ব দরবারে। এ লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ছুটে গেছেন মার্কিন মুলুক, নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, মুজিবনগরসহ জাতিসংঘে এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবী ও বিচার প্রহসনের মোকাবেলায় কৌশলী পাঠিয়েছেন খোদ পাকিস্তানেও।[৭] এছাড়া আন্তর্জাতিক নেতা-নেত্রীবৃন্দ যাঁরাই যুক্তরাজ্যে এসেছেন তাঁদের কাছেই ছুটে গেছেন প্রবাসী বাঙালিরা (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। নিম্নে বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটিসহ যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন সংস্থার সার্বিক কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

কভেন্ট্রি সম্মেলন (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) উপলক্ষ্যে বৃহত্তর লন্ডনের ১৪টি কমিটি ১৪ জন প্রতিনিধি এবং নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে গাউস খান, মিনহাজউদ্দিন, তৈয়েবুর রহমান, আজিজুর রহমান, ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, জাকারিয়া খান চৌধুরী, মতিউর রহমান চৌধুরী এবং শেখ আবদুল মান্নান একটি কোচযোগে ২৪ এপ্রিল (শনিবার) কভেন্ট্রি শহরে পৌছান। স্থানীয় একটি মিলনায়তনে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে ১২৫ জন প্রতিনিধি ও ২৫ জন পর্যবেক্ষক যোগদান করেন। সকল দলের পক্ষ থেকে বিচারপতি চৌধুরীকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি তাতে রাজি না হয়ে সভানেত্রী হিসেবে লুলু বিলকিস বানুর নাম প্রস্তাব করেন। মিসেস বানু বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বিচারপতি চৌধুরী বলেনঃ 'সভার শুরুতেই সকল দলের পক্ষ থেকে আমাকে সভাপতিত্ব করতে বলা হয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম, যদি এই সভা কোনো কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ব্যর্থ হয়, অথবা গঠিত হলেও যদি ভেঙে যায় তবে ইউরোপীয় বা অন্যদের কাছে বাঙালিদের হয়ে কথা বলার অধিকার কিছুটা বাঁধা পাবে। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করে বেগম লুলু বিলকিস বানুর নাম সভানেত্রী হিসেবে উল্লেখ করি। .... আমার কথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন।'[৮]

সভার কাজ শুরু হওয়ার পর বিচারপতি চৌধুরীর জন্য 'মুজিবনগর' সরকার প্রদত্ত নিয়োগপত্র পড়ে শোনানো হয়। 'মুবিজনগর' সরকারে পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিলেটের অধিবাসী আওয়ামী লীগ নেতা রকিব উদ্দিন পত্রখানি

Dhaka University Institutional Repository

আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে তুলে দেন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় সকল দলের সমর্থনপুষ্ট ও সকলের বিশ্বাসভাজন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য আবেদন জানান।

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা তৈরি করার ব্যাপারে অচলাবস্থা দেখা দেয়। বহু আলাপ-আলোচনা পর 'এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ দি ইন ইউ. কে.' নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের কার্য পরিচালনায় জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে ১. আজিজুল হক ভুঁইয়া, ২. কবীর চৌধুরী, ৩. মনোয়ার হোসেন, ৪. শেখ আবদুল মান্নান, ৫. শামসুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়। এই পাঁচজনের ওপর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং বৃহত্তর কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম বৈঠকে একজন আহবায়ক নিয়োগ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত এ্যাকশন কমিটিগুলোকে কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির শাখার মর্যাদা দেয়া হয়।

কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে অনুরোধ জানানো হয়। 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালে অন্য কোনো পদ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অনুচিত হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তার ফলে সম্মেলনে স্থির করা হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে।

কভেন্ট্রি সম্মেলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুধু আওয়ামী লীগ ও ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা ও কর্মীরা যোগ দিয়েছিলেন তা নয়। সাধারণত বামপন্থী হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক কর্মীরাও সম্মেলনে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, জগলুল হোসেন, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান শাজাহান, আবু মুসা, মেসবাহউদ্দিন ও ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন। বামপন্থীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মাওপন্থী। এঁদের মধ্যে জিয়াউদ্দিন মাহমুদ ছিলেন স্পষ্টভাষী।[৯]

কভেন্ট্রি সম্মেলন থেকে কোচযোগে লন্ডনে ফিরে আসার পথে শেখ আবদুল মান্নান 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ দি ইন ইউ. কে.' ভেঙে দিয়ে লন্ডন এলাকার জন্য কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির একটি শাখা গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের হ্যাসেল স্ট্রীটে হাফেজ মনির হোসেনের দোকানে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শামসুর রহমান (সভাপতি), জিল্লুর রহমান, আমীর আলী, ড. নুরুল হোসেন, মিনহাজউদ্দিন এবং আরো অনেকে। নেতৃস্থানীয় একজন প্রস্তাবিত লন্ডন কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিনহাজউদ্দিনকে নির্বাচনের অনুরোধ জানান। শেখ মান্নান প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী হিসেবে যথাক্রমে গাউস খান ও ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেনের নাম প্রস্তাব করেন। তাঁরা দু'জনেই অনুপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার পরও শেখ মান্নানের প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তখন মিনহাজউদ্দিন আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়ে গাউস খান সম্পর্কিত প্রস্তাব মেনে নেন। সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কিত প্রস্তাব সবাই মেনে নেন। গাউস খান খুশি হন নি। তিনি আশা করেছিলেন কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটিতে তাঁর স্থান হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি লন্ডন কমিটির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করতে রাজি হন। কমিটির অফিস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তিনি ৫৮ নম্বর বেরিক স্ট্রীটে তাঁর রেস্তোরাঁর উপরতলায় একটি রুমও দিয়েছিলেন।

এই শাখা কমিটি 'লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' নাম গ্রহণ করে। আমীর আলীর সম্পাদনায় কমিটির মুখপত্র হিসেবে 'জয় বাংলা' শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পর লন্ডন কমিটি একটি সংবিধান প্রণয়ন করে 'গ্রেটার লন্ডন কমিটি' নাম গ্রহণ করে। সংবিধান প্রণয়নের পর বিভিন্ন কারণে কমিটির সদস্যদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা দেয়। সাখাওয়াত হোসেন সেক্রেটারি পদ থেকে ইস্তফা দেন। আমীর আলীও কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[১০]

অনতিবিলম্বে স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা ২১ নম্বর রোমিলি স্ট্রীটে অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁর বেসমেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। লুলু বিলকিস বানু সভাপতিত্ব করেন। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে কবীর চৌধুরী (পরবর্তীকালে ড. কবীর চৌধুরী), ব্রাডফোর্ড থেকে মনোয়ার হোসেন, বার্মিংহোম থেকে আজিজুল হক ভুঁইয়া এবং লন্ডন থেকে শামসুর রহমান ও শেখ আবদুল মান্নান সভায় যোগদান করেন। বিচারপতি চৌধুরীর উপস্থিতিতে সভার কাজ শুরু হয়। আলাপ-আলোচনায় বিষয়বস্তু ও সিদ্ধান্ত গোপন রাখা সম্ভব হবে না আশঙ্কা করে বিচারপতি চৌধুরী অবিলম্বে একটি অফিস (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

ইতোমধ্যে (২৭ এপ্রিল) স্থানীয় পাকিস্তান হাই কমিশনে নিয়োজিত প্রবীণ অফিসার হাবিবুর রহমানকে বিনা নোটিশে পদচ্যুত করা হয়। তিনি সাত বছর যাবৎ উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন।

২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় এক হাজারেরও বেশি প্রবাসী বাঙালি লন্ডনের মে ফেয়ারে অবস্থিত ইংলিশ স্পিকিং ইউনিয়নের হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত এক সংবর্ধনায় যুক্তরাজ্য সফররত পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের সদস্যদের যোগদানে বাধা সৃষ্টি করেন। স্টিয়ারিং কমিটি এবং কয়েকটি স্থানীয় এ্যাকশন কমিটি এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। প্রায় ৫০ জন পুলিশের সহায়তায় ক্রিকেটারদের হলের ভেতরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। চব্বিশজন বাঙালি বিক্ষোভকারীকে এই উপলক্ষ্যে গ্রেফতার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩০ এপ্রিল শেখ আবদুল মান্নানের বাড়িতে স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি চৌধুরীর উপস্থিতিতে কমিটির কর্তব্য, কর্মপদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কবীর চৌধুরী কমিটির আহবায়ক হিসেবে শেখ মান্নানের নাম প্রস্তাব করেন। বাকি সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করেন। শেখ মান্নান পরবর্তীকালে বলেন, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে তিনি তাঁর চেয়ে কম বয়স্ক কাউকে আহবায়ক নিয়োগ করার অনুরোধ জানান। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে বলেন: 'আপনি অভিজ্ঞ, আপনি রাজনীতি করেছেন, বাকি চারজন রাজনীতি করেন নি। অতএব, আপনার এই দায়িত্ব নেয়া উচিত।' শেখ মান্নান তাঁকে বুঝিয়ে বলেন: 'কাজটা যদি আমি করি, নামটা আমি নিতে চাই না। আমি অঙ্গীকার করছি, কাজ আমি করবো।' তখন আজিজুল হক ভুঁইয়াকে আহবায়ক নিয়োগ করা হয়।[১১]

তিন সপ্তাহের মধ্যে আজিজুল হক ভুঁইয়া 'মুজিবনগর' সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনার জন্য কলকাতা চলে যান। তিন মাস পর তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে শেখ মান্নান কমিটির আহবায়ক ও অফিস পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

কিছুকাল পর ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ব্র্যাডফোর্ডের মনোয়ার হোসেন সম্পর্কে জটিলতা দেখা দেয়। শেফিল্ড, ব্র্যাডফোর্ড ও লিডস থেকে দলে দলে লোকজন এসে বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, মনোয়ার হোসেন নাকি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে এক তারবার্তায় পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁকে অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে। বিচারপতি চৌধুরী প্রথমে এই দাবি উপেক্ষা করেন। পরপর বিভিন্ন প্রতিনিধিদল লন্ডনে এসে একই দাবি পেশ করার ফলে বিচারপতি চৌধুরী বিভ্রান্ত হন। মনোয়ার হোসেন ছিলেন ইয়র্কশায়ারের প্রথম নির্বাচিত কাউন্টি কাউন্সিলর। পাকিস্তানীদের ভোট নিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বলেই তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তারবার্তা পাঠান নি বলে শেখ মান্নান মনে করেন। তাঁর (শেখ মান্নান) আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিচারপতি চৌধুরী সঙ্কট এড়ানোর জন্য স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দেন : ক) এরপর থেকে মনোয়ার হোসেন কমিটির বৈঠকে যোগদান করবে না, শুধু টেলিফোনে শেখ মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন; খ) লন্ডনে এসে কমিটির কাগজপত্র নিয়ে যাবেন এবং কোচভর্তি লোকজন নিয়ে এসে বিক্ষোভ-মিছিল ও জনসভায় যোগ দেবেন; গ) যেভাবে তিনি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হয়েছেন সেভাবেই থাকবেন। মনোয়ার হোসেন ১৬ ডিসেম্বর স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।[১২]

ব্রিটেন সফরকারী পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের বিক্ষোভের ফলে ক্রীড়ামোদীরা বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি হারাতে পারে বলে ১ মে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পদদলিত করার বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সমর্থকরা প্রতিবাদ করবে বলে আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য করেনি। কাজেই বাঙালিদের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই বলে উক্ত নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়।

১ মে উরস্টার শহরে পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের প্রথম ব্যাচের বিরুদ্ধে প্রায় ছ'শ বাঙালি পুরুষ ও মহিলা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির বার্মিংহাম শাখার প্রেসিডেন্ট জগলুল পাশার নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন থেকে কোচযোগে আগত প্রায় একশ' বাঙালি ছাত্র ও যুবক এই বিক্ষোভে যোগদান করে।

উক্ত তারিখ (১ মে) ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের কাছে লিখিত এক পত্রে বিরোধীদলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসনের অন্যতম পার্লামেন্টারি প্রাইভেট সেক্রেটারি ফ্র্যাঙ্ক জাড পাকিস্তানকে সাহায্যদান অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান।

পশ্চিম বঙ্গ সফর শেষে লন্ডনে ফিরে এসে ব্রুস ডগলাসম্যান ১ মে 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতাকে বলেন, শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার পর মুক্তাঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি মি. রয়ালের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। লন্ডনের কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, যশোর জেলায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। পূর্ব বঙ্গের সঙ্কট পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয় বলে তিনি স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। মি. রয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে জন স্টোনহাউসও উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপদ পরিবেশে স্টিয়ারিং কমিটির অফিস স্থাপনের জন্য শেখ আবদুল মান্নান ও তাঁর সহকর্মীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মে মাসের গোড়ার দিকে ড. মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার ও হারুন-অর-রশীদ শেখ মান্নানের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ড. জোয়ারদার বলেন, বহির্বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের রফতানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে হেন্ডন এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট হারুন-অর-রশীদের পাট-রফতানি ব্যবসাও বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্ব লন্ডনের ১১ নম্বর গোরিং স্ট্রীটে অবস্থিত দোতলা দালানে তাঁর অফিস তিনি আর চালাতে পারছেন না। তাঁর অফিসে তিনটি টেলিফোন, টেবিল,

Dhaka University Institutional Repository

টাইপ-রাইটার এবং অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র রয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির জন্য নেয়া হলে তিনি অফিসটির জন্য যে ভাড়া দিচ্ছেন, তাই দিতে হবে। ভাড়া নেয়া সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরীর সম্মতি পাওয়ার পর ৩ মে গোরিং স্ট্রীটে স্টিয়ারিং কমিটির অফিস খোলা হয়।[১৩] নতুন অফিসে বিচারপতি চৌধুরীর উপস্থিতিতে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শামসুল আলম চৌধুরী অফিস সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নতুন অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সমবেত বাঙালিদের উদ্দেশে বিচারপতি চৌধুরী বলেনঃ 'মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র পাকিস্তান মৃত্যুবরণ করেছে। বাংলাদেশ আজ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগ্রাম করছে। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীকে খতম না করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।' পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পূর্ব বাংলায় সংঘটিত গণহত্যা কিছুতেই পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হতে পারে না। জাতিসংঘ ও ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস এই গণহত্যা সম্পর্কে তদন্ত করে অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থাকরবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।[১৪]

স্টিয়ারিং কমিটির অফিস ভাড়া নেয়ার কিছুকাল পর হারুন-অর-রশীদ একখানি চিঠি নিয়ে দেখা করতে আসেন। চিঠিখানি খুলনা থেকে তাঁর স্ত্রীর নামে লেখা হয়েছে। শেখ মান্নান ও তাঁর সহকর্মীদের সামনে এসে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। চিঠিতে বলা হয়েছে, তাঁর ১৪ বছর বয়সী ভাইকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে নির্মমভাবে মারধর করেছে, তারপর কান দুটো কেটে ফেলেছে এবং সব শেষে গাছে ঝুলিয়ে তার চোখ দুটো উপড়ে ফেলেছে। অবিলম্বে এই চিঠির ইংরেজি অনুবাদ করে শেখ মান্নান জাকারিয়া খান চৌধুরীসহ কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে যান। শ্রমিকদলীয় সদস্য জন স্টোনহাউসের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা চিঠিখানি অবিলম্বে স্পিকারের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশের নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করার এই জঘন্য চিত্র পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ফলে প্রবাসী বাঙালিরা তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছিলেন।[১৫]

'দি মর্নিং স্টার'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বার্মিংহামের নিকটবর্তী এজবাস্টন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের বাইরে প্রায় দু'হাজার বাঙালি পুরুষ ও মহিলা যুক্তরাজ্য সফররত পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জগলুল পাশা বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দেন।[১৬]

'দি ইভিনিং স্টার'- এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, ১৯৪৭ সালে জোড়াতালি দিয়ে যে দুটি দেশকে এক দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ বলা চলে না। এই দুটি দেশের মধ্যে একটি যে অপরটির সম্পূরক নয়, তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।[১৭]

ইতোমধ্যে 'মুজিবনগর' সরকার বিচারপতি চৌধুরীকে আমেরিকায় গিয়ে জাতিসংঘে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল ও মার্কিন জনসাধারণকে বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অবিলম্বে মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে তিন মাসের ভিসার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু কন্সাল-জেনারেল তাঁকে ১৯৭১ সালের ৬ মে থেকে ১৯৭৫ সালের ৬ মে পর্যন্ত চার বছরের ভিসা মঞ্জুর করেন। চার বছরের মধ্যে যতবার খুশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি ভুলক্রমে দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে কন্সাল-জেনারেল বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন ঃ 'না, ভুল নয়, ইচ্ছা করেই দিয়েছি। একবার গেলেই আপনার দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে সেটা ভাবি নি। ... দেখুন, মি. জাস্টিস চৌধুরী ব্যাপারটা হচ্ছে এই-আপনি আমাদের দেশে যাচ্ছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে। পাকিস্তান আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। তাদের আমরা অসন্তুষ্ট করতে পারি না। সে রকম চিঠি পেলে আমরা পাকিস্তানীদের জানিয়ে দেব যে আর আপনাকে ভিসা দেয়া হবে না। অল্প দিনের ভিসা দিলে আপনি ভিসার জন্য আবার আসতেন; তাই আমরা ঠিক করলাম যে আপনাকে আমরা চার বছরের ভিসা দেব। তা হলে পাকিস্তান ও আপনারা -দু'পক্ষই আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবেন।'[১৮]

৮ মে গোরিং স্ট্রীটের অফিসে সমগ্র যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির প্রায় একশ'জন প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর এই সভা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাহায্যার্থে 'বাংলাদেশ ফান্ড' (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) নামের একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তহবিল পরিচালনার জন্য 'বোর্ড অব ট্রাস্টি'র বাঙালি সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দেয়। বিচারপতি চৌধুরী প্রথমে 'বোর্ড অব ট্রাস্টি'-র সদস্য হতে রাজি হন নি। বহু আলাপ-আলোচনার পর বিচারপতি চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ ও শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য জন স্টোনহাউসকে সদস্য মনোনীত করে 'বোর্ড অব ট্রাস্টি' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ তখনো পর্যন্ত স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে কোনো ব্যাঙ্কই 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একাউন্ট খুলতে রাজি হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টার পর হ্যামব্রোজ ব্যাঙ্ক নামের একটি মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে রাজি হয়। কিছুকাল পর হ্যামব্রোজ ব্যাঙ্ক হঠাৎ একাউন্টটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বহু চেষ্টার পর 'বোর্ড অব ট্রাস্টি'-র সদস্যগণ ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনস্টার ব্যাঙ্কে নতুন একাউন্ট খুলতে সক্ষম হন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিবাদের ফলেই হ্যামব্রোজ ব্যাঙ্ক উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বলে তিনি পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশ ফান্ড' থেকে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও ট্রাস্টিবৃন্দ এবং বিচারপতি চৌধুরী নিজে কোনো অর্থ গ্রহণ করেন নি।[১৯]

৮ মে লন্ডনের উত্তরে অবস্থিত নর্থহ্যাম্পটন শহরের ক্রিকেট গ্রাউন্ডের বাইরে প্রায় দু'শ বাঙালি পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমকে দেশে ফিরে যাওয়ার দাবি সংবলিত 'স্লোগান' দেয়।[২০]

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে জনসভায় বক্তৃতাদানের জন্য যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিচারপতি চৌধুরীকে অনুরোধ জানানো হয়। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ মে সকাল বেলা ব্র্যাডফোর্ড এবং বিকেলবেলা বার্মিংহামে জনসভার আয়োজন করা হয়। ব্র্যাডফোর্ডে অনুষ্ঠিত জনসভা স্টিয়ারিং কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী জনসংযোগের প্রথম প্রচেষ্টা। একটি আহবায়ক কমিটি এই জনসভার আয়োজনকরে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে মুসাব্বির তরফদার এবং এ. কে. এম এনায়েতউল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মি. খান এই কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ব্র্যাডফোর্ডে একটি জনাকীর্ণ হলে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন ঃ 'বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বাংলার নেতা (শেখ মুজিবুর রহমান) স্বাধীনতা ঘোষণা করে সমগ্র বাঙালি জাতির আশা ও আকাঙ্খারই প্রতিধ্বনি করেছেন।' শেখ মুজিবকে বন্দি করে পাকিস্তান বাঙালি জাতির অনুভূতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে বলে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন। দীর্ঘ বক্তৃতায় 'মুজিবনগর' সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। সমবেত জনসাধারণ 'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করে।

ব্র্যাডফোর্ড থেকে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ড. মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার ও স্টিয়ারিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শেখ আবদুল মান্নানসহ বার্মিংহাম যান। বার্মিংহাম এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে জগলুল পাশা এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ মান্নানের বক্তৃতার পর বিচারপতি চৌধুরী প্রধান বক্তা হিসেবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন ঃ 'পঁচিশে মার্চের স্তব্ধ অন্ধকারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এক নবজাগ্রত জাতির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই ন্যায়যুদ্ধে আপনারা সকলেই যোগদান করেছেন। আপনাদের সঙ্গে একজন নগণ্য বাঙালি হিসেবে আমিও এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম সমান অধিকার, এগিয়ে চলেছিলাম নিয়মতান্ত্রিক পথে। সেই সময় প্রতারণার দ্বারা সময় হরণ করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য এনে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে শ্যামল বাংলার বুকে মা-বোনের ইজ্জত হরণ, লুণ্ঠন আর গণহত্যার জন্য। এই সভার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, 'বাঙালির সংগ্রাম ছিল আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সে আদর্শ এমন এক অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল, যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।'[২১]

১২ মে ল্যাঙ্কাশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ৬৩০-সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যের হাতে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ৬৩০ খানি চিঠি নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে এসে হাজির হন। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম. রহমান, জাহির চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, এ. কে. কামালউদ্দিন এবং লতিফ আহমদ। প্রতিনিধিদলের ছবি পরদিন 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২২]

'দি টাইমস্'-এর প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সৈন্যবাহিনী অপসারণ না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনো প্রকার সাহায্যদানে বিরত থাকার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। ব্রিটেনের ২০৬ জন বুদ্ধিজীবী, পার্লামেন্ট সদস্য ও প্রখ্যাত নাগরিকদের দস্তখত সংবলিত বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তি-হত্যার ঘটনাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে উল্লেখ করার জন্য বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করা হয়। ২৫ মার্চ রাত্রিবেলা ঢাকায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের আভাস দেয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধ-করা দোকানপাটের সামনে পড়ে থাকা একটি বিকৃত মৃতদেহের ভীতিপ্রদ ছবি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞাপনটির শিরোণাম ছিল 'এই মুহূর্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষ অভ্যন্তরীণ সমস্যার চেয়ে অনেক বড়।' অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস গৃহীত এই ছবিতে পাকিস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যায়।

বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' বিজ্ঞাপনের ব্যয়ভার বহন করে। বিজ্ঞাপনটি কেটে নিজের নাম ও ঠিকানা যোগ করে নিজ নিজ এলাকার পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে ডাকযোগে পাঠাবার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ জানানো হয়।[২৩]

কার্ডিফে সংগঠিত দক্ষিণ ওয়েলসের বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির পাঁচজন সদস্য বাংলাদেশ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে ১৩ মে দুপুরবেলা থেকে পরদিন বিকেলবেলা পর্যন্ত মোট ২৬ ঘণ্টা অনশন পালন করেন। অনশনকারীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল হান্নান, এম. জেড. মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ, আবদুল হালিম ও আবদুস

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ। এ্যাকশন কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, দক্ষিণ ওয়েলস্ থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যরা বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবির সমর্থক।[২৪]

মে মাসের প্রথম দিকে শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যান বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে হাউস অব কমন্সে যে ব্যক্তিগত প্রস্তাব পেশ করেন, সে সম্পর্কে ১৪ মে সরকার ও বিরোধীদলের সম্মতিক্রমে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেই বিচারপতি চৌধুরী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে স্যার আলেক বলেন, শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ নেই বলে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের এই উক্তি বিশ্বাস না করে ইসলামাবাদে অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনের মাধ্যমে প্রকৃত খবর সংগ্রহ করার জন্য বিচারপতি চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। স্যার আলেক বলেন, শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারকে রাজি করানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

প্রায় তিনশ' পার্লামেন্ট সদস্য মি. ডগলাসম্যানের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সমর্থনকারীদের মধ্যে পিটার শোর, মাইকেল বার্নস, ফ্র্যাঙ্ক এলান, হিউ ফ্রেজার ফ্রেড এভান্স, এন্ড্রু ফাউল্ড, রেজ ফ্রিসন, হিউ জেনকিন্স, জন সিলকিন, রবার্ট প্যারি, জন স্টোনহাউস, ইয়ান মিকার্ডো,স্যার জেরাল্ড নেবারো প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রস্তাবের স্বপক্ষেক্ষে বক্তৃতাদানকালে মি. ডগলাসম্যান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে তার ফলে পাকিস্তান আজ এক রাষ্ট্র হিসেবে মৃত। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে বলে বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে বলা হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে পাকিস্তানকে কোনো প্রকার সাহায্য না দেয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীকে বের করে না দেয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ ও আওয়ামীলীগের পক্ষে ক্রমাগত গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। অবিলম্বে শান্তি স্থাপন করার ব্যবস্থা না করা হলে বর্তমান পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পর্যবসিত হবে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে, মহামারী ও বুলেটের আঘাতে মৃত্যুবরণ করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে প্রভাব রয়েছে তা প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য।

তিনি আশা করেন, পাকিস্তানকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে সাহায্যদান বন্ধ রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ বাবদ পাকিস্তানকে দৈনিক দশ লক্ষ পাউন্ড খরচ করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অবসান ঘোষণা না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনো প্রকার সাহায্য না দেয়ার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানান।

বৈদেশিক উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী রিচার্ড উড্ বলেন, পূর্ব বঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যদান বন্ধ রেখে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, আওয়ামীলী নেতা শেখ মুজিবকে পূর্ব বঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা যাচাই করা সম্ভব হয় নি। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং সম্ভবত তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এডওয়ার্ড হিথ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে গোপন আলোচনা করেছেন বলে মি. উড্ প্রকাশ করেন। আলোচনাকালে মি.হিথ্ পূর্ববাংলা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরামর্শ দেন।

শ্রমিক দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য ডেনিস হিলি বলেন, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিচারের ব্যবস্থা করবে না বলে তিনি আশা করেন। যদি তা করা হয় তা হলে বর্তমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী শিগগিরই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ যদি গ্রহণ না করা হয়, তা হলে ভারত ও পাকিস্তান প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যে রাশিয়া ও চীন যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ব্যাহত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।

উদারনৈতিক দলের সদস্য জন পার্ডো বলেন, বাংলাদেশ সমস্যার ব্যাপারে ব্রিটেন, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ নিজেদের হীনবল বলে প্রমাণ করেছে। মনোবলের অভাবে তারা নৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদলীয় সদস্য জন স্টোনহাউস বলেন, পূর্ববঙ্গের জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা চায় কিনা তা যাচাই করার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি গণভোট গ্রহণ করা উচিত। এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব বঙ্গে তাদের শাসন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আলোচনার উপসংহারে মি. উড্ বলেন, পূর্ব বঙ্গে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করবে। কিন্তু উন্নয়ন বন্ধ করে পূর্ব বঙ্গ সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার রাজি নয়। তা সত্ত্বেও তিনি মি. ডগলাসম্যানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন না। কারণ, তা অন্যায় হবে বলে তিনি মনে করেন। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিতর্কের রিপোর্ট পরদিন ফলাও করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর ফলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।[২৫]

২২ মে বিচারপতি চৌধুরী ব্রেচলি ও অক্সফোর্ড শহরে বাঙালিদের দুটি পৃথক সভায় বক্তৃতা করেন। অক্সফোর্ডের বক্তৃতায় তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস করে ফেলতে পারে বলে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নানও উভয় সভায় বক্তৃতা করেন।[২৬]

স্কটল্যান্ডে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

২৩ মে বিচারপতি চৌধুরী ও শেখ মান্নান স্কটল্যান্ডে যান। গ্লাসগো বিমানবন্দরের স্থানীয় এ্যাকশন কমিটির সদস্যরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁরা দু'জন বক্তৃতা করেন। বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন কি করে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়, তা ব্যাখা করেন। সন্ধ্যায় বিমানযোগে তাঁরা লন্ডনে ফিরে আসেন।[২৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতি চৌধুরী (প্রথম বার) ঃ

২৪ মে বিচারপতি চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে রওনা হন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন এনামুল হক (ডক্টর)। তিনি তখন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন।[২৮]

২৭ মে 'দি গার্ডিয়ান' বাংলাদেশে পাকিস্তানী নৃশংসতা সম্পর্কে দু'জন খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা রেভারেন্ড জন হ্যাস্টিংস ও রেভারেন্ড জন ক্ল্যাপহাম প্রদত্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশ করে। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর এই নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রণ করে। পুস্তিকার শেষে বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য এ্যাকশন বাংলাদেশ বিশ্বসমাজকে আহবান জানায়।[২৯]

২৯ মে বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনে ফিরে আসেন। পরদিন তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। ম্যাঞ্চেস্টার রওনা হওয়ার আগে তিনি গোরিং স্ট্রীটের অফিসে গিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কাছে বিদেশ থেকে অস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখে স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়ার মারফত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। মি. ভূঁইয়া তিন মাস পর লন্ডনে ফিরে আসেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে শেখ আবদুল মান্নান স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক ও অফিস পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।[৩০]

ম্যাঞ্চেস্টারের অধিবাসী প্রবীণ বাঙালি হাজী আবদুল মতিন উল্লিখিত সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কবির চৌধুরী এবং স্থানীয় বাঙালি ছাত্রদের নেতা মহিউদ্দিন আহমদ তাঁকে সাহায্য করেন। বিরাট হলটিতে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ তারিখের বক্তৃতার ক্যাসেট বাজিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় ২৫ মার্চের রাত থেকে শুরু করে ৩০ মে পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলির বিবরণ দেন। তিনি আমেরিকায় বাঙালিদের সংগঠন এবং কর্মতৎপরতার কথাও উল্লেখ করেন। শ্রোতারা 'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। হাজী আবদুল মতিন, শেখ আবদুল মান্নান, এনামুল হক এবং আরো কয়েকজন এই সভায় বক্তৃতা করেন।[৩১]

৪ জুন (শুক্রবার) বাংলাদেশ মহিলা সমিতি (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে একটি মিছিলের আয়োজন করে। সমিতির সভানেত্রী মিসেস জেবুন্নেসা বখ্সের নেতৃত্বে প্রায় দু'শ মহিলা ও শিশু সেন্ট জেমস্ পার্ক থেকে মিছিল করে ডাউনিং স্ট্রীটে যান। অবিলম্বে গণহত্যার অবসান ও স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি সংবলিত পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড-ধারিণী শাড়ি পরিহিতা মহিলারা সহজেই পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আপন দু'বোন সমিতির ব্যানার বহন করেন। এঁদের মধ্যে একজন তাঁর স্বামী ও তিন

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান নিয়ে দু'সপ্তাহ আগে লন্ডনে পৌঁছাতে সক্ষম হন। মিসেস জাহানারা রহমান ও মিসেস আনোয়ার জাহান মিছিল পরিচালনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদলের নেত্রী হিসেবে মিসেস বখস্ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে ইয়াহিয়া সরকারকে সাহায্যদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারকে সাহায্যদান অব্যাহত রাখা হলে বাংলাদেশে বহু পরিবারের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাবে এবং বহু লোকের মৃত্যু ঘটবে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।[৩২]

৫ জুন 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে 'সেইভ দি চিলড্রেন ফান্ড', 'দি ব্রিটিশ রেডক্রস সোসাইটি' এবং 'ক্রিস্টিয়ান এইড' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে অবিলম্বে ত্রাণকার্য শুরু করার জন্য একটি আবেদন পেশ করা হয়।[৩৩]

৫ জুন শেফিল্ড এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে টাউন হলে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রীতিশ মজুমদার এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাঙালি, ভারতীয় ও ইংরেজ শ্রোতারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। শেখ আবদুল মান্নান, ড. জোয়ারদার এবং অপর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে বিচারপতি চৌধুরী এই সভায় যোগদানের জন্য লন্ডন থেকে শেফিল্ডে যান।

হলে ঢোকার আগে প্রীতিশ মজুমদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, 'স্যার, আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে। আমরা তো সভা করতে পারছি না। পাকিস্তানীরা হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হলঘরটিও তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।' বিচারপতি চৌধুরীর সহকর্মীরা বলেন, 'হলে আমরা ঢুকবো এবং সভা হবেই। যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমরা তৈরি রয়েছি।' হলে ঢোকার সময় বিরোধী পক্ষ গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা দু'তিন টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারে এবং 'ব্যারিকেড' তৈরি করে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে। বিচারপতি চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীরা 'ব্যারিকেড' ভেঙে হলে ঢুকে পড়েন। পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী বলেন ঃ 'আমরা একটি পবিত্র সাধনায় লিপ্ত। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপনে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প । ব্রিটেনের মতো নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন। মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে; সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ স্থায়ী করতে হবে। সেই মহৎ জীবনের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দৃপ্ত পদক্ষেপে।'[৩৪]

সভায় বক্তৃতাদানকারীদের মধ্যে ছিলেন শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক গার্লিং, আফরোজ চৌধুরী, কবীর চৌধুরী ও শেখ আবদুল মান্নান। হলের বাইরে একদল পাকিস্তানী জমায়েত হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় দু'শ ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ তাদের প্রতি নজর রাখে।[৩৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রিডার ও শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান মে মাসে কলকাতা থেকে লন্ডন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে তিনি 'এইড কন্সর্শিয়াম'-এর সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যদান বন্ধ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনে ফিরে এসে অধ্যাপক সোবহান কয়েকটি প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর ফলে ৪ ও ৫ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তাঁর দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম নিবন্ধে তিনি পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যদান বন্ধ রাখার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনি মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ বলেন, পূর্ব বঙ্গে গণহত্যা সংঘটনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্ভবত ১ ও ৬ মার্চের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৪ জুন সাপ্তাহিক 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছিল মূলত তাঁরই বক্তব্য। নিবন্ধের উপসংহারে বলা হয়, অতঃপর ইয়াহিয়া ও তাঁর অনুচরদের বৈদেশিক সাহায্যদানকারী দেশগুলো পূর্ব বঙ্গে গণহত্যার দায় এড়াতে পারবে না। 'দি করপ্সেজ ইন দি সান' (সূর্যালোক মৃতদেহ) শীর্ষক এই নিবন্ধ পাঠকদের অভিভূত করে।

৫ জুন মি. সোবহান স্থানীয় 'দি গ্যাঞ্জেস' রেস্তোরাঁয় 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' ও 'বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসিজ'-এর কর্মী ও সমর্থকদের এক ঘরোয়া সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।[৩৬]

৬ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের সাহায্যার্থে দশ লক্ষ পাউন্ড মঞ্জুর করে। বিবিসি প্রচারিত 'দি ওয়ার্ল্ড দিস উইকয়েন্ড' এই সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বলে উল্লেখ করে। এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রিচার্ড উড্ কিছুটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলেন, অযথা বিলম্ব না করে তাঁরা এই মঞ্জুরির কথা ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের সিদ্ধান্তও তাঁরা নিয়েছেন। এই উভয় প্রকার সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২০ লক্ষ পাউন্ড। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মি. উড্ বলেন, ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন।

উক্ত দিনে (৬ জুন) লন্ডন এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পূর্ব লন্ডনে বসবাসকারী বাঙালিরা এবং বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজ যোগদান করেন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে একতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী অপপ্রচারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেনঃ 'জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'[৩৭]

এসময়ে পাকিস্তানের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট কয়েকজন বাঙালি 'মুক্তি' (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) নামের একটি বাংলা সাপ্তাহিকের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে হীন প্রচারণা চালায়। এদের মধ্যে 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক আবুল হায়াতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি ভারতীয় হিন্দুদের মুসলমান-বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন। বিচারপতি চৌধুরীর বিরুদ্ধে তিনি মিথ্যা ও মানহানিকর প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। উক্ত পত্রিকাটির কয়েকটি কপি সংগ্রহ করে দেশ প্রেমিক বাঙালিরা সভামঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্নিসংযোগ করেন।[৩৮]

৭ জুন 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্টারি মুখপাত্র জুডিথ হার্ট ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত সাহায্যের পরিমাণ 'হাস্যকর' বলে উল্লেখ করেন। পূর্ববঙ্গে সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনো প্রকার সাহায্যদান অনুচিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৮ জুন 'দি রয়াল কমনওয়েলথ সোসাইটি'র হলরুমে অনুষ্ঠিত বক্তৃতায় বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের জন্য পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বিচারে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক হত্যা সম্পর্কে হৃদয়বিদারক বর্ণনা দেন, তখন শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই শোকে অভিভূত হন। সভার কাজ শেষ হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. ডবলিউ এ জেঙ্কিন্সের স্ত্রী লেডি জেঙ্কিন্স সভামঞ্চে গিয়ে বিচারপতি চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ সংগ্রামের প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করেন।'[৩৯]

বিচারপতি চৌধুরী প্রত্যেকবার পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে স্যার আলেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর পাকিস্তান হাই কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানায়। এর ফলে স্যার আলেক বিচারপতি চৌধুরীকে তাঁর সরকারি বাসভবনে গিয়ে দেখা করার পরামর্শ দেন। বাসভবনে সামাজিক সাক্ষাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কূটনৈতিক রীতি-বিরুদ্ধ বলে তিনি উক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সামাজিক সাক্ষাতের সময় রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ নয়।[৪০]

অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী থেকে লন্ডনে ফিরে এসে শফিক রেহমান (চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট) 'দি গার্ডিয়ান' ও 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতাদের সাথে ৯ জুন এক সাক্ষাৎকারকালে বলেন, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। তারা মাইনের সাহায্যে রাস্তাঘাট ও রেলওয়ে লাইনের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে এবং খুলনাগামী স্টিমার সার্ভিস বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ওঁৎ পেতে থেকে সামরিক যানবাহনের ক্ষতিসাধন এবং পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাকারী দেশদ্রোহীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছে।

মি. রেহমান আরও বলেন, ঢাকায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম উল্লেখ করেন। এঁদের জেরা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা ফিরে আসেননি। যাঁরা দেশ ত্যাগ করতে পারবেন না বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাঁদের নাম ৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি নিজে সৌভাগ্যবান বলেই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ 'আমরা যুদ্ধ করার মতো মনোবলের অধিকারী কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর; প্রাণের দায়ে এখন আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।'

মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতিসাধনের ফলে ঢাকার বাইরে যাওয়া এক রকম অসম্ভব বলে তিনি প্রকাশ করেন। টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটেছে। কেবল বিমানযোগে চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভব। টিকেট কেনার জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার নামের একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত প্রোগ্রাম প্রচার করা হচ্ছে। ১৭ মে ঢাকায় স্টেট ব্যাঙ্ক, দুটি সিনেমা হল এবং একটি আধুনিক 'শপিং' এলাকায় একযোগে ৮টি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। মে মাসে মুক্তিবাহিনীর একটি দল সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে নরসিংদী এলাকার একটি তথাকথিত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মিয়া আবদুল হামিদ ও তার দু'জন সহযোগীকে হত্যার কাহিনীও তিনি সবিস্তার বর্ণনা করেন।[৪১]

৯ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে মিসেস জুডিথ্ হার্ট বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ২০ লক্ষ পাউন্ড অপ্রতুল বলে মন্তব্য করেন। শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে তিনি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য দাবি জানান। বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন বাংলাদেশ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে অবিলম্বে উপযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তিনি বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে গত মহাযুদ্ধের পর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন।

বিরোধীদলের দাবি মেনে নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম ১০ জুন পার্লামেন্টে পাকিস্তান সম্পর্কে বিশেষ বিতর্ক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। চার ঘণ্টাব্যাপী বিতর্ককালে স্যার আলেক বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শরণার্থীদের সাহায্য বাবদ ব্রিটিশ সরকারের দান সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে আশ্বাস দেন।

১১ জুন লন্ডনের 'উইকয়েন্ড টেলিভিশন' বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে। এই অনুষ্ঠান বিচারপতি চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে তাঁকে সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিরোধী মত প্রকাশ করার জন্য অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ টোরি দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য জন বিগ্‌স্-ডেভিডসনকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি পাকিস্তানের গোঁড়া সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মি. বিগ্‌স্-ডেভিডসন এবং আরো কয়েকজন বিচারপতি চৌধুরীকে বহু প্রশ্ন করেন। তিনি দৃঢ় তার সঙ্গে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেন।[৪২]

উল্লিখিত তারিখে (১২ জুন) লন্ডনের উত্তরে অবস্থিত সেন্ট আলবান্স শহরে বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী এই সভায় বক্তৃতা করেন।[৪৩]

পরদিন (১৩ জুন) বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে লিড্‌সে পৌঁছান। স্থানীয় একটি বিরাট হলে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশকে শত্রুমুক্ত করে এবং স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরে বাংলাদেশের বীর শহীদদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। সভায় শেখ মান্নান, অধ্যাপক কবীরউদ্দিন আহমদ এবং আরো কয়েকজন বক্তৃতা করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে লিড্‌সের বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ও লিড্‌স্ লিবারেশন ফ্রন্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মিয়া মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (পরবর্তীকালে ড. রহমান) ও মির্জা মোজাম্মেল হক যথাক্রমে প্রতিষ্ঠান দুটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। লিড্‌সের বাঙালি কর্মীরা 'জয় বাংলা' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মোহাম্মদ নুরুল মোহা এই পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লিড্‌সের মহিলারাও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৪৪]

১৩ জুন বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্য একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি লন্ডনের হাইড পার্ক থেকে পার্ক লেন, পিকাডিলি ও ডার্টনিং স্ট্রিট হয়ে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে পৌঁছায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ব্রিটিশ ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট দপ্তর, কানাডার হাই কমিশন এবং ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হল্যান্ড ও ইতালির দূতাবাসগুলোর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১৩ জুন সন্ধ্যায় আই টি. ভি. 'র 'ম্যান ইন দি নিউজ' প্রোগ্রামে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রচারিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের খবর চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন ঃ 'সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানকে খতম করেছে। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া হলেই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে।' বাংলাদেশের বড় বড় শহর ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তান সরকারের অস্তিত্ব নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। ১৪ জুন 'দি টেলিগ্রাফ'-এ উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়।[৪৫]

বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ জুন একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।[৪৬]

'ডেইলি মিরর' পত্রিকায় খ্যাতনামা সাংবাদিক জন পিলজার প্রদত্ত রিপোর্টে পূর্ব বঙ্গে নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা ও নির্যাতনের ভীতিজনক এক বিবরণ দেয়া হয়। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে মি. পিল্‌জার বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা সফর করেন। 'একটি জাতির মৃত্যু' শীর্ষক রিপোর্টে জনৈক বৃদ্ধের পেটে বেয়নেট দিয়ে এলোপাতাড়ি কাটার চিহ্ন, সরাসরি গুলির আঘাতে একটি শিশুর ক্ষতবিক্ষত কানে জমাট রক্ত এবং জীবন্ত কবর দেয়া স্বামীর কবরের পাশে জনৈক মহিলার শোক প্রকাশের করুণ কাহিনী দিয়ে তিনি তাঁর রিপোর্ট শুরু করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক অভিযান পরিচালনা করছে। গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করে শেখ মুজিবের সমর্থক এবং আওয়ামীলীগের সদস্যদের হত্যা করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। হাজার হাজার, সম্ভবত লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে পাঞ্জাবি ও পাঠান সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিচারপতি চৌধুরী জন পিল্‌জারকে টেলিফোন করে ধন্যবাদ জানান। এর দু'একদিন পর মি. পিল্‌জার বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে মৌখিক বিবরণ দেন। মি. পিল্‌জার বলেন, বাংলাদেশ নিজস্ব শক্তিতে জয়ী হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, এ্যাকশন বাংলাদেশ এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধের দাবি জানিয়ে সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে ১৬ জুন পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন উপলক্ষে মহিলা সমিতির কর্মীরা অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লন্ডনস্থ মার্কিন দূতাবাসের সামনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটির কর্মী আবদুল হাই খান ও মিসেস রাজিয়া চৌধুরী দূতাবাসের সামনে অনশন পালন করেন।

বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, এ দু'জনের অনশন শুরু হওয়ার পর তিনি প্রতিদিনই তাদের দেখতে যান। কয়েকদিন পর তাদের অবস্থা দেখে তিনি তাঁর অফিসে বসে ভাবছিলেন, এ ব্যাপারে কী করা যায়। এমন সময় মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক সচিব মি. কিং তাঁকে টেলিফোন করেন। তিনিই বিচারপতি চৌধুরীর জন্য মার্কিন ভিসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মি. কিং বলেন, রাষ্ট্রদূত থেকে সবাই অনশনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিচারপতি চৌধুরী ও অনশনকারীদের মনোভাব রাষ্ট্রদূত ও মার্কিন সরকারকে যথাযথভাবে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মি. কিং অনশন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। মি. কিং-এর অনুরোধ সম্পর্কে স্টিয়ারিং কমিটি এবং স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে বিচারপতি চৌধুরী মার্কিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে ছাত্রদের অনশন ভাঙার অনুরোধ জানান। অনশনকারীরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন।[৪৮]

১৭ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিচারপতি চৌধুরীর কূটনৈতিক পরিচয়পত্র স্বাক্ষর করেন। এই পরিচয়পত্রে বিচারপতি চৌধুরীকে যুক্তরাজ্যে হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এই পরিচয়পত্র রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সরকারি বাসভবন বাকিংহাম প্যালেসে পেশ করা হয়। যথাসময়ে পরিচয়পত্র প্রাপ্তি-স্বীকার করে বাকিংহাম প্যালেস থেকে বিচারপতি চৌধুরীর কাছে একটি পত্র পাঠানো হয়। এই পত্রের মাধ্যমে প্রকারান্তরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয় বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন।[৪৯]

১৯ জুন হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের অগ্রণী হওয়া উচিত। বেসামরিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া হবে না বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়ার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সাহায্যদানকারী সংস্থার প্রতি আবেদন জানান।[৫০]

জুন মাসের মাঝামাঝি জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাজাহান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান লন্ডন সফরে আসেন। স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বক্তৃতা করেন। মার্চ মাসের গৌরবজনক সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁরা আবেগপূর্ণ ভাষায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থন লাভের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতৃদ্বয় ব্রিটেন আসেন। মি. মান্নান ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের নেতা হিউ স্ক্যানলন, রাসায়নিক শ্রমিকদের নেতা বব্ এড্ওয়ার্ডস্, সিনেমা শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের নেতা এ্যালান স্যাপার, খনি শ্রমিকদের নেতা লরেন্স্ ড্যালি এবং ছাপাখানার শ্রমিকদের নেতা রিচার্ড ব্রিগিনশ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের আবেদন জানান। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'দি মর্নিং স্টার'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা ক্রিস্ মায়ান্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মি. মান্নান বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়-দফা দাবির মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ফলে তাঁর নেতৃত্বে গণসংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করার পর নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণী সর্বাগ্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগদান করে। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ২৮ জুলাই 'দি মর্নিং স্টার'- পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৫১]

২০ জুন এক জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য বিচারপতি চৌধুরী ওয়েলসের প্রধান শহর কার্ডিফে যান। মি. মান্নানও তাঁর সঙ্গে যান। সভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বাঙালি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের ভয়াবহতা বর্ণনা করে।

কার্ডিফের জনসভায় বিচারপতি চৌধুরী আরও বলেন, এবারের স্বাধীনতা হবে গণমানুষের স্বাধীনতা এবং তাদের প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের আপোসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে যে গুজব ছড়ানো হয়েছে, তা ভিত্তিহীন বলে তিনি ঘোষণা করেন। অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শেখ আবদুল মান্নান ও সুলতান মাহমুদ শরীফ।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

হল্যান্ডে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

২১ জুন বিচারপতি চৌধুরী শ্রমিক নেতা মি. মান্নানসহ হল্যান্ড সফরে যান। সফরে যাওয়ার দু'দিন আগে হল্যান্ড থেকে একটি টেলিভিশন টিম লন্ডনে এসে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। ২০ জুন সন্ধ্যায় এই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। পরদিন বিকেলবেলা বিমানযোগে তিনি আমস্টারডামে পৌঁছান। বিমানবন্দরের ভি. আই. পি রুমে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের সাংবাদিকরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছানোর পর দু'জন পার্লামেন্ট সদস্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরদিন (২২ জুন) বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে যান। কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্যের সহায়তায় তিনি স্পিকারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। বিকেলবেলা পার্লামেন্টের একটি কমিটি রুমে তিনি বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কিত সাব-কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিচারপতি চৌধুরীকে নানা প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তরের পর সাব-কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে পারে না। তাঁরা আরও বলেন, বাংলাদেশের সংগ্রামকে তাঁরা আদর্শগতভাবে সমর্থন জানাবেন। সাব-কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাকালে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন সুনীল কুমার লাহিড়ী, জহিরুদ্দিন এবং রাজিউল হাসান (রঞ্জু)।

পরদিন লন্ডনে ফিরে আসার আগে বিচারপতি চৌধুরী একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনের রিপোর্ট এবং অন্যান্য কার্যকলাপের সংবাদ হল্যান্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দু'তিন কলামব্যাপী শিরোণাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। স্বল্পসংখ্যক প্রবাসী বাঙালির সাহায্য ও সহায়তা এবং আদর্শের প্রতি বিচারপতি চৌধুরীর দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে ডাচ সরকারি ও বেসরকারি মহল তাঁকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সর্বজন স্বীকৃত রাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধির মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।'[৫৩]

পারী থেকে ২১ জুন প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (এইড্ পাকিস্তান কন্সরসিয়াম) পূর্ব বাংলা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নতুন সাহায্যদানের প্রস্তাব সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সাহায্যদানকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সভায় 'লবি' করার জন্য লন্ডন থেকে এ্যাকশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা পারী সফর করেন।[৫৪]

২৪ জুন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম পার্লামেন্টে বলেন, পূর্ব বাংলা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানকে নতুন কোনো বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুর করবে না। এই ঘোষণার মাধ্যমে কয়েকদিন আগে পারীতে অনুষ্ঠিত 'এইড্ পাকিস্তান কন্সরসিয়াম'-এর সিদ্ধান্তের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন সূচিত হয়।[৫৫]

২৬ জুন লন্ডনের বেজ্ওয়াটার এলাকায় সংগঠিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে একটি প্রকাণ্ড হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ইংরেজ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। শেখ মান্নান স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। বিচারপতি চৌধুরী বলেন ঃ 'বাঙালির জয়যাত্রা সফল হবেই। এই তিন মাসে যে একতা গড়ে উঠেছে তা সকল বাধা অতিক্রম করে সাফল্য বয়ে আনবে।'[৫৬]

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর ২৭ জুন বার্মিংহোমে দ্বিতীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিগবেথ হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতাদান উপলক্ষ্যে বিচারপতি চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌক্তিকতা এবং ২৫ মার্চের পর সংঘটিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ সংগ্রামের ঐতিহাসিক ও আদর্শগত দিক সম্পর্কেও তিনি বিশদ ব্যাখ্যা দেন। শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য জুলিয়াস সিল্ভারম্যান এবং ব্রুস ডগলাসম্যানও সভায় বক্তৃতা করেন।

বিরাট জনসমাবেশের সুযোগ নিয়ে চীনপন্থী বাঙালি মেসবাহউদ্দিন হলের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর দলের মুখপত্র 'গণযুদ্ধ' বিক্রির চেষ্টা করেন। এই খবর পাওয়ার পর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য আজিজুল হক ভূঁইয়া মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'ভাই সব, এই হলের বাইরে চীনের এক চর আমাদের সভা 'স্যাবোটাজ' করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে পত্রিকা বিক্রি করছে।' তাঁর ঘোষণা শোনার পর জনতা মেসবাহউদ্দিনকে ঘিরে ফেলে উত্তম-মধ্যম দেয়ার উপক্রম করে। শেখ মান্নান ছুটে গিয়ে তাঁকে জনতার হাত থেকে মুক্ত করে হলের মধ্যে নিয়ে এসে বিচারপতি চৌধুরীর পাশে চুপচাপ বসে থাকার জন্য বলেন। সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।'[৫৭]

ডিগবেথ হলের একদিকে স্থানীয় এ্যাকশন কমিটি কয়েকটি ছোট ছোট দোকান খোলে। এই দোকানগুলোতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের 'মনোগ্রাম' সংবলিত নেক-টাই, কাফ্-লিঙ্ক ইত্যাদি (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) বিক্রি করা হয়। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জগলুল পাশা, মোহাম্মদ আবদুল গনি ও তোজাম্মেল হক (টনি)।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

২৮ জুন লন্ডনের রেড্ লায়ন স্কোয়ারে অবস্থিত কনওয়ে হলে গ্রেটার লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার এ্যাকশন কমিটিগুলোর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী 'কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটি (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) 'র নির্বাচন স্থগিত রাখার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং একতা বজায় রাখার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির কাজ স্টিয়ারিং কমিটি চালিয়ে যাচ্ছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে সবার দৃষ্টি যদি নির্বাচনের দিকে চলে যায়, তা হলে সাংগঠনিক কাজ পিছিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। জাতীয় স্বার্থে আরও কিছুদিন নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। প্রতিনিধিরা তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়ার ফলে দলাদলির বিপদ থেকে আন্দোলন রক্ষা পায় বলে তিনি পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন।'[৫৯]

২৯ জুন পনের জন বাঙালি খালাসি ও অফিসার ওয়েলসের কার্ডিফ বন্দরে নোঙর করা পাকিস্তানী জাহাজ 'এম. ভি. কর্ণফুলি' থেকে পালিয়ে ট্রেনযোগে লন্ডনে এসে স্বরাষ্ট্র দফতরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাঁরা বলেন, করাচি থেকে রওয়ানা হওয়ার পর নানাভাবে তাঁদের হয়রানি, অপমান, এমনকি শারীরিক নির্যাতন করা হয়। অফিসারদের মুখপাত্র এ. কে. এম. নুরুল হুদা (ইঞ্জিনিয়ার) বলেন, পাকিস্তানে ফিরে গেলে তাঁদের শারীরিক নির্যাতন কিংবা হত্যা করা হবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রবাহী জাহাজ থেকে ডক শ্রমিকরা মাল খালাস করতে অস্বীকার করার পর পাকিস্তানী সৈন্যরা জাহাজে উঠে বাঙালি খালাসিদের প্রত্যেককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়।

কার্ডিফ থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য এ্যালফ্রেড এভান্সের সহায়তায় বিচারপতি চৌধুরী বাঙালি খালাসি ও অফিসারদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে সক্ষম হন। এ. কে. এম. নুরুল হুদাকে স্টিয়ারিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়।'[৬০]

৩০ জুন (বুধবার) 'দি টাইমস্'- এ প্রকাশিত এক পূর্ণ-পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানানো হয়। ১৫ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সমর্থক সদস্যরা যে প্রস্তাব পেশ করেন, তা বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে তার নিচে দু'শজনেরও বেশি পার্লামেন্ট সদস্যের নাম প্রকাশ করাহয়। এঁদের মধ্যে ১১ জন প্রিভি কাউন্সিলর এবং ৩০ জনেরও বেশি প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম রয়েছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।[৬১]

জুন মাসে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রায় ছ'শ পত্রের মাধ্যমে ব্রিটেনের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কাছে পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্যদানের জন্য অনুরোধ জানান।[৬২]

শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য আর্থার বটমলীর নেতৃত্বে প্রেরিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের সদস্য টোবি জ্যাসেল কলকাতায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী পূর্ব বঙ্গে হিন্দু-অধ্যুষিত বহু গ্রাম নির্বিচারে ধ্বংস করেছে। 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ১ জুলাই প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়, গত দশ দিন যাবৎ মি. জ্যাসেল ও তাঁর সঙ্গীরা পূর্ব বঙ্গের বহু এলাকা এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখেছেন। উল্লিখিত তারিখে 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্তী সিন্দুরী নামের একটি গ্রামের বাড়িঘর লুটপাট করার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। গত পাঁচ দিনে এই এলাকায় আরও ৭টি গ্রাম ধ্বংস করা হয়। অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু বলেই গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সৈন্যবাহিনী সিন্দুরী গ্রামের স্বর্ণকার রাধাবিনোদ কর্মকার এবং সাতজন পুরুষ ও এজন বৃদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। চারজন মহিলাকেও তারা ধর্ষণ করে।

মি. বটমলীর নেতৃত্বে প্রেরিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের সদস্য রেজ প্রেন্টিস দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন, কেবল রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। ২ জুলাই 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এই রিপোর্টে আরও বলা হয়, পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

মি. বটমলি ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্য ও সাংবাদিকদের এক সভায় বক্তৃতাদানকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, পূর্ব বঙ্গে 'আরো একটি ভিয়েতনাম' সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। পূর্ব বঙ্গ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য উদ্যোগী না হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবেন বলে তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩ জুলাই লন্ডনের কনওয়ে হলে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনের শাখা কমিটিগুলোর (এ্যাকশন কমিটি) প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী প্রতিনিধিবৃন্দকে একতা বজায় রাখার জন্য আবেদন জানান এবং কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটির নির্বাচন স্থগিত রাখার যুক্তি বিশ্লেষণ করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ তার যুক্তি মেনে নিয়ে নির্বাচন স্থগিত রাখার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন।

উল্লিখিত সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে মোহাম্মদ শাজাহান ও আবদুল মান্নান 'মুজিবনগর' সরকারের পক্ষ থেকে প্রবাসী বাঙালিদের দেশপ্রেম ও কর্মতৎপরতার জন্য ধন্যবাদ জানান।[৬৩]

৩ জুলাই পাকিস্তান সরকার লন্ডনস্থ হাই কমিশনার সালমান আলীকে 'দি রয়াল কমনওয়েলথ সোসাইটি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার নির্দেশ দেয়। পাকিস্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিচারপতি চৌধুরীকে বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার জন্য সোসাইটির আমন্ত্রণ প্রত্যাহার না করার ফলে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬৪]

পূর্ব বাংলা ও ভারত সফরের পর লন্ডনে ফিরে এসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদের সদস্যরা বলেন, পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর হত্যা ও নির্যাতন অভিযান অব্যাহত রয়েছে। শিশুরাও তা থেকে রেহাই পায় নি। পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের বক্তব্য রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর মিসেস জিল নাইট ৫ জুলাই ইয়াহিয়া খানের কাছে লিখিত এক পত্রে তার উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি হত্যা ও নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে অপরাধী সৈন্যদের শাস্তিদানের পরামর্শ দেন। ৬ জুলাই 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

স্কটল্যান্ডের এবারডিনে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ খনি শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে ইউনিয়নের কার্যকর কমিটি পূর্ব বঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবে রাজনৈতিক বন্দিদের, বিশেষ করে শেখ মুজিবের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রস্তাবটি সমর্থন করে ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি লরেন্স ড্যালি বলেন, পূর্ব বঙ্গের শতকরা ৯৯ জনের সমর্থনপুষ্ট আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যই পাকিস্তান সরকার সামরিক অভিযান শুরু করে। ৫ জুলাই তারিখের অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

১০ জুলাই বাঙালিদের উদ্যোগে বেডফোর্ড শহরের একটি পাবলিক হলে বিচারপতি চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পাকিস্তানীরা হলটি চারদিক থেকে ঘিরে রেখে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। প্রত্যেকটি গেটের সামনে তাদের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পাকিস্তানীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বিচারপতি চৌধুরী দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সভার কাজ চালিয়ে যান।

তিনি কঠোর ভাষায় পাকিস্তানীদের হীন মনোভাবের নিন্দা করেন। পাকিস্তানীদের এই হঠকারিতায় বাংলাদেশ আন্দোলন লাভবান হয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন। অধ্যাপক কবীরউদ্দিন আহমদ ও শেখ আবদুল মান্নান এই সভায় বক্তৃতা করেন।[৬৫]

১৮ জুলাই (রোববার) স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে লন্ডনস্থ চীনা দূতাবাসের সামনে একটি বিক্ষোভ এবং দূতাবাস থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ ও মিছিলে যোগদান করার জন্য ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি কোচযোগে লন্ডনে আসেন। জগলুল পাশার নেতৃত্বে বিরাট একটি দল বার্মিংহাম থেকে এসে বিক্ষোভ ও মিছিলে যোগ দেয়। তোজাম্মেল (টনি) হকও কয়েকটি কোচ-ভর্তি বাঙালিদের নিয়ে এদের সঙ্গে যোগ দেন। বিক্ষোভ শেষে দূতাবাসে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, চীনের মহান নেতা মাও সে-তুং এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের প্রতি বাঙালিদের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। পাকিস্তান তাঁদের বন্ধু-রাষ্ট্র-এই অজুহাতে তাঁরা যদি পাকিস্তানকে সমর্থন করেন, তা হলে ইতিহাসের চোখে তাঁরা দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন।[৬৬]

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট লন্ডনে আসেন। তাঁদের সম্মানার্থে কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ শিপ্রঙ্গার একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। ব্রিটেনের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরও এই ভোজ সভায় যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ নেয়ার উদ্দেশ্যে স্যার হিউ বিচারপতি চৌধুরীকে ভোজসভায় যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। বলা বাহুল্য, বিচারপতি চৌধুরী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটি ইন গ্রেট ব্রিটেন একটি 'খোলা চিঠি' ২০ জুলাই 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় অর্ধ-পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এই 'খোলা চিঠি'-তে বার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের লক্ষ করে বলা হয়, আইনজীবী হিসেবে আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া আমেরিকান নাগরিক হিসেবে তাঁরা বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা ও নির্যাতনের খবর সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে অবহিত করে এই অমানিশার অবসান ঘটাতে পারেন।

পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, বহির্বিশ্ব গণহত্যা শব্দটির কথা ভুলে গিয়েছে বলে মনে হয়। আইনজীবী হিসেবে বার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, পাকিস্তান জাতিসংঘের 'জেনোসাইড কনভেনশন'-এর দ্বিতীয় ধারার ক, খ এবং গ উপধারা ভঙ্গ করেছে।

উপসংহারে বলা হয়, বার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা নিম্নে বর্ণিত দাবিগুলোর প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে বাঙালি ছাত্র ছাত্রী ও তাদের সমর্থকরা আশা করেন ঃ ক) পাকিস্তানকে আমেরিকার সামরিক সাহায্যদান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; খ) বাংলাদেশ থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান বন্ধ রাখতে হবে; গ) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে; ঘ) জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে; ঙ) পাকিস্তান 'জেনোসাইড কনভেনশন' ভঙ্গ করে বিশ্ব শান্তি বিপন্ন করার জন্য সমগ্র ব্যাপারটি সিকিউরিটি কাউন্সিলে আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে হবে।

বিজ্ঞাপনটির অর্ধেক জায়গা জুড়ে জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের একটি হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাপানো হয়।[৬৭]

২৬ জুলাই হাউস অব কমন্সের হারকোর্ট রুমে স্বাধীন বাংলাদেশের ৮টি ডাকটিকেট (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) সংবলিত একটি 'সেট' এবং 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সকল দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং দেশ-বিদেশের প্রায় চল্লিশজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডাকটিকেটগুলো ও 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান (ছানু মিয়া) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালি নেতৃবৃন্দও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ডাকটিকেটগুলোতে বাংলাদেশের মানচিত্র, পতাকা, শিকল ভাঙার ছবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তপাত ইত্যাদি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফটো সংবলিত পাঁচ টাকা মূল্যের টিকেটে সোনালি-সদৃশ, কমলা, গাঢ় বাদামি ও হাফ-টোন কালো রঙ ব্যবহার করা হয়। প্রতি 'সেট' ডাকটিকেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২১ টাকা ৮০ পয়সা (তৎকালীন পাউন্ডের মূল ২০ টাকা হিসেবে ব্রিটিশ মুদ্রায় ডাকটিকেটগুলোর মূল্য ছিল ১ পাউন্ড ৯ পেনি)। 'মুজিবনগর' সরকারের সম্মতিক্রমে শ্রমিকদলীয় প্রাক্তন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জন স্টোনহাউসের উদ্যোগে ডাকটিকেট ও 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশিত হয়। লন্ডন প্রবাসী বাঙালি গ্রাফিক শিল্পী বিমান মল্লিক ডাকটিকেটগুলোর নকশা তৈরি করেন। তিনি বলেন, ডাকটিকেটগুলোতে ব্যবহৃত প্রতিকৃতিগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ এবং প্রগতিশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশে চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য ভারত সরকার ডাকটিকেটগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলে উদ্যোক্তরা প্রকাশ করেন। পরদিন (২৭ জুলাই) লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় ডাকটিকেটগুলোর 'ফ্যাক্সিমিলি'সহ সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৬৮]

২৯ জুলাই (১৯৭১) বাংলাদেশ ডাকটিকেট ও 'ফাস্ট ডে কভার' বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল, ভারত, যুক্তরাজ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইজরায়েল, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। 'মুজিবনগর' সরকারও কলকাতায় ডাকটিকেট ও 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ডাকটিকেট প্রদর্শন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, আগস্ট মাস শেষ হওয়ার আগেই ব্রিটেনে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়াই বর্তমানে বাঙালিদের একমাত্র কর্তব্য।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক ঘোষণার উল্লেখ করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, এই ঘোষণা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাঙালি জাতি স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হবে। এই হীন উদ্যোগের বিরোধিতা করার জন্য তিনি বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ ও বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানান।

পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করতে পারে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ করে বিচাপতি চৌধুরী বলেন, কমনওয়েলথের বাকি দেশগুলো সানন্দে তা মেনে নিয়ে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে পারে।

উল্লিখিত সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণ ২৭ জুলাই 'দি মর্নিং স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আগস্ট মাসের প্রথমদিকে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হবে বলে খবর পাওয়ার পর বিচারপতি চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী সন্ ম্যাকব্রাইডকে ইসলামাবাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। লন্ডনের বার্নার্ড শেরিডান সলিসিটার্স-এর পক্ষ থেকে একজন অভিজ্ঞ সলিসিটার ও তাঁর সঙ্গে যান।[৬৯]

২৪ জুলাই (শনিবার) মি. ম্যাকব্রাইড ইসলামাবাদে পৌঁছানোর পর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন। ইয়াহিয়া খান নিজে দেখা করতে অস্বীকার করেন। কাজেই বাধ্য হয়ে তিনি ইয়াহিয়ার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি (কর্নেলিয়াস) বলেন, কোনো বিদেশী আইনজীবীকে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে দেয়া হবে না। ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুদ্ধদ্বার কক্ষে শেখ মুজিবের বিচার অনুষ্ঠিত হবে এবং তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্য একজন পাকিস্তানী আইনজীবী নিয়োগ করা হবে।

২৬ জুলাই পাকিস্তান হাই কমিশনার সালমান আলী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য 'এইড পাকিস্তান কনসরসিয়াম'কে রাজি করানোর ব্যাপারে ব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ২৭ জুলাই রাত্রিবেলা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে স্যার আলেকের সঙ্গে সালমান আলীর সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, আরও বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুর করার আগে পূর্ব বাংলায় একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যন্ত স্পষ্ট।

২৭ জুলাই 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিবের সঙ্গে এই প্রথমবার 'মুজিবনগর' সরকারের পক্ষ থেকে দেখা করার চেষ্টা করা হয়। গ্রেফতারের পর থেকে তাঁকে নির্জন কারাকক্ষে বন্দি করে রাখা হয়।

কয়েক দিন পর লন্ডনে ফিরে এসে মি. ম্যাকব্রাইড বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না পাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এক বিবৃতি দেন।[৭০]

পরবর্তী রোববার (১ আগস্ট) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে যে গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় ২৯ জুলাই অগ্রিম সংবাদ প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত সংবাদে বলা হয়, 'বিটলস্' গ্রুপের অন্যতম সদস্য জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ' নামের যে নতুন রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে তা বেলা দুইটার সময় ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের গণসমাবেশে বাজিয়ে শোনানো হবে। ঠিক তখন নিউইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে রেকর্ডটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রেকর্ড বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থ শরণার্থী সাহায্য তহবিলে দান করা হবে। এই সংবাদে আরও বলা হয়, আগামী রোববার (১ আগস্ট) ব্রিটেনের সর্বত্র বাঙালি রেস্তোরাঁগুলো বন্ধ রেখে মালিক ও কর্মচারীরা দলে দলে ট্রেন ও কোচযোগে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে এসে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানাবেন।

গণসমাবেশের আয়োজনকারী এ্যাকশন বাংলাদেশের জনৈক মুখপাত্র 'দি মর্নিং স্টার' পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন, বার্মিংহাম থেকে ৭০ টি কোচভর্তি বাঙালি গণসমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য লন্ডনে আসবেন।

'পূর্ববঙ্গে গণহত্যা' শীর্ষক অর্ধ-পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন ৩০ জুলাই 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঢাকা শহরের রাস্তায় পরিত্যক্ত তিন জন তরুণের মৃতদেহের একটি ছবির নিচে লেখা রয়েছে: 'এই ছবিটি আপনার ছেলে-মেয়েদের দেখান এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে জনসমাবেশে যোগ দিন।' এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ আগস্ট (রোববার) ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে এ্যাকশন বাংলাদেশ আহূত এক সমাবেশে যোগদানের জন্য জনসাধারণকে আহবান জানানো হয়। পাকিস্তানের অত্যাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্ব-জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে এই গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন বিচারপতি চৌধুরীসহ বিভিন্ন বক্তার নাম এবং বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড, ক্যামব্রিজ, কার্ডিফ, কভেন্ট্রি, গ্লাসগো, লিড্স, লিভারপুল, লুটন, ম্যাঞ্চেস্টার, পোর্টসমাথ ও শেফিল্ড থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্য বিভিন্ন টেলিফোন নাম্বার উল্লেখ করা হয়। যারা গণসমাবেশে যোগ দিতে অক্ষম, তাদের কাছে বাংলাদেশ আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানানো হয়।[৭১]

৩০ জুলাই 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সিনেটর ইউজিন ম্যাককার্থি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে সমর্থন করেন। ৩০ জুলাই এ্যাকশন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি উল্লিখিত মন্তব্য করেন।

৩১ জুলাই এ্যাকশান বাংলাদেশের উদ্যোগে লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. ম্যাককার্থি বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীন বায়াফ্রার দাবি সমর্থন করেন। ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে তিনি মনে করেন।[৭২]

জুলাই মাসের শেষ দিকে ব্রিটেন পূর্ববঙ্গে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি মোটরবোট সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র বিচারপতি চৌধুরী পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করেন। মি. সাদারল্যান্ড সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মোটরবোটগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার না করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, মোটরবোটগুলো পাওয়ার পর পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলার নদীপথ দিয়ে অভ্যন্তরের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে হত্যা ও লুণ্ঠনের জন্য নিশ্চয় ব্যবহার করবে। এই আশঙ্কার প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি স্যার আলেকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।

ইতোমধ্যে জন স্টোনহাউস, পিটার শোর ও আরো কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য ব্রিটিশ সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গেও এ ব্যাপারে তাঁরা একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গেও এ ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করেন।

স্যার আলেকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিচারপতি চৌধুরীকে তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মোটরবোট পাকিস্তানকে সরবরাহ করা হবে না।[৭৩]

পাকিস্তানের অত্যাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্ব-জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ১ আগষ্ট (রোববার) লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পল কনেটের নেতৃত্বে গঠিত এ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ হাজারেরও বেশি বাঙালি যোগ দেন। শতাধিক বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সদস্যদের লন্ডনে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন কমিটি বহু কোচ ভাড়া করে। একমাত্র বার্মিংহাম থেকে ৭০ টি কোচ বাঙালিদের নিয়ে লন্ডনে আসে।

সভায় বক্তৃতাদানকারীদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি চৌধুরী, লর্ড ব্রকওয়ে, লর্ড গিফোর্ড, অশোক সেন (পরবর্তীকালে ভারতের আইন দপ্তরের মন্ত্রী), পিটার শোর, রেজ্ প্রেন্টিস, ব্রুস ডগলাসম্যান, জন স্টোনহাউস, পল কনেট, বেগম লুলু বিলকিস বানু ও গাউস খান।

বক্তৃতাদানকালে বিচারপতি চৌধুরী ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ কখনও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। 'বাংলাদেশের পূত-পবিত্র ভূমি থেকে হানাদার বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত আমাদের আপসহীন, বিরামহীন সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সংগ্রাম।'

হাজার হাজার কণ্ঠে 'জয় বাংলা' স্লোগানের মাধ্যমে বিচারপতি চৌধুরীর উদ্দীপনাময় ঘোষণাকে সমর্থন জানানো হয়। বাঙালিদের আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ পেয়ে তিনি অভিভূত হন বলে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

বিচারপতি চৌধুরী আরও বলেন, 'মুজিবনগর' সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আপোসরফা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য শত্রুপক্ষ এই গুজব ছড়াচ্ছে। তিনি এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। উপরোক্ত গুজব ভিত্তিহীন বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন।'[৭৪] শত্রুপক্ষের মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য বিচারপতি চৌধুরী আহবান জানান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী সন্ ম্যাকব্রাইড বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পাকিস্তান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন বলে বিচারপতি চৌধুরী প্রকাশ করেন। সমবেত জনতা 'শেম' 'শেম' বলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে।

বিচারপতি চৌধুরী অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করেন এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতি আহবান জানান। তাছাড়া পূর্ব বঙ্গে নির্বিচারে ব্যাপক হত্যার মাধ্যমে গণহত্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক 'কনভেনশন' ভঙ্গের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতিসংঘের অধীনস্থ সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্তব্য বলে তিনি দাবি করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী 'মুজিবনগর' সরকারের তিনটি নির্দেশের কথা উল্লেখ করেন। প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী শিগগিরই লন্ডনে একটি দূতাবাস স্থাপন করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বিমানযোগে ভ্রমণ না করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি তিনি আহবান জানান। তৃতীয় নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তানী সরকারি কর্মচারী হিসেবে পাকিস্তান ও বিদেশে নিয়োজিত বাঙালিদের অবিলম্বে পদত্যাগ করে 'মুজিবনগর' সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানান।

বিচারপতি চৌধুরীর বক্তৃতার পর অপ্রত্যাশিতভাবে লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে নিয়োজিত দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মি. আহমদ ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তিনি বেঁচে থাকতে চান। তাঁর বক্তৃতা সমবেত জনতার মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

ইউরোপে কর্মরত পাকিস্তানি কূটনীতিবিদদের মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ১০ এপ্রিল বি বি সি'র বুশ হাউসে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা প্রকাশ করেন। ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভায় যোগদানের জন্য রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মি. আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

টেলিফোনযোগে বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে সপরিবারে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য বলেন। সেখান থেকে তাঁরা দু'জন সরাসরি ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে যান।

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জন স্টোনহাউস এম. পি. বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তান সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও অরাজকতা হিটলারের আমলে সংঘটিত ঘটনাবলির মতোই ভয়াবহ। কিছুদিন আগে তিনি কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে দুর্গতদের অবস্থা নিজ চোখে দেখে এসেছেন।

মি. স্টোনহাউস আরও বলেন, সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করার জন্য পাকিস্তান সরকার বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার জন্য তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। পাকিস্তানে তাঁর শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

পঞ্চাশ বছর যাবৎ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী লর্ড ব্রকওয়ে বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরি সভা অনুষ্ঠানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের আহবান জানানো উচিত। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা করে তিনি বলেন, অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তিনি বৃহৎ শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তার রেজ্ প্রেন্টিস এম. পি. বলেন, বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। ...... নির্বিশেষে সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। অপর বক্তাদের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের নেতা শেখ মুজিবকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবি জানান।

পল কনেট তাঁর বক্তৃতায় বলেন: 'বাংলাদেশের আওয়ামী সংগ্রামী মানুষের পাশে রয়েছে বিশ্বের সকল দেশের, সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মুক্তিকামী মানুষ। এই যুদ্ধ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালির যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধ স্বাধীনতা হরণকারীদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের যুদ্ধ। আপনাদের এই আদর্শবাদী সংগ্রামের সঙ্গে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করছি।'

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অশোক সেন (পরবর্তীকালে ভারতের আইন দপ্তরের মন্ত্রী) বাঙালির সংগ্রাম ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

প্রবাসী বাঙালি মহিলাদের পক্ষ থেকে বক্তৃতাদানকালে বেগম লুলু বিলকিস বানু মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে লন্ডনস্থ বাঙালি মহিলা সমিতির কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন।

সভার শেষে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একটি শোভাযাত্রা সহকারে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই লিপিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানে অস্ত্র চালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানের সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিচারপতি চৌধুরী ব্রিটিশ জনগণ, রাজনীতিবিদ ও সংবাদপত্রগুলোকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

হাইড পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত স্পিকার্স কর্নারের কাছে গিয়ে শোভাযাত্রার অবসান হয়।'[৭৫]

ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'অপারেশন ওমেগা'র উদ্যোগে গঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল পিস্ টিম' ও তার কর্মসূচির বাস্তবায়ন। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ফলে আহত ও ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ওষুধপত্র ও অন্যান্য সাহায্যসামগ্রী নিয়ে পল কনেটের স্ত্রী এলেন কনেট এবং আরও একজন মহিলা একটি মোটরযানযোগে ট্র্যাফালগার স্কোয়ার থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন। উপস্থিত বাঙালিরা তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশে প্রবেশের পর পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের বন্দি করে যশোর কারাগারে আটক রাখে।'[৭৬]

৫ আগস্ট লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে ডাইরেক্টর অব অডিট এ্যান্ড একাউন্টস পদে নিয়োজিত লুৎফুল মতিন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিচারপতি চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। মি. মতিনের পদত্যাগকালে চারজন বাঙালি কূটনৈতিক অফিসার লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত ছিলেন।[৭৭]

জুলাই মাসের শেষদিকে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী কারাগারে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে খবর পাওয়ার পর বিচারপতি চৌধুরী এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি-জেনারেল মার্টিন এ্যানালসের সঙ্গে দেখা করে এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। মি. এ্যানালসের সঙ্গে আলোচনার পর বিচারপতি চৌধুরী এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির (আই সি আর সি) কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মি.এ্যানালসের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান ও 'ডিন' এবং রেডক্রস সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন ও আনুষঙ্গিক আইন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড্রেপারকে 'মুজিবনগর' সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে দরখাস্ত পেশকরার জন্য ব্যারিস্টার হিসেবে নিয়োগ করেন।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

সুইজারল্যান্ডে বিচারপতি চৌধুরী (প্রথম বার)ঃ

৫ আগস্ট বিচারপতি চৌধুরী অধ্যাপক ড্রেপারসহ জেনেভায় পৌঁছান। অধ্যাপক ড্রেপার আনুষ্ঠানিভাবে রেডক্রসের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর শারীরিক নিরাপত্তার ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং তাঁর সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের অনুরোধ জানান। রেডক্রসের কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন এবং ফলাফল যথাসময়ে তাঁকে (অধ্যাপক ড্রেপার) জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

অধ্যাপক ড্রেপারকে বিমানবন্দরে বিদায় দিয়ে বিচারপতি চৌধূরী জেনেভায় ফিরে এসে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস-এর অফিসে গিয়ে সেক্রেটারি জেনারেল নিয়াল ম্যাকডারমেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মি. ম্যাকডারমেট অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরীর বক্তব্য শোনেন। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন। বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

মি. ম্যাকডারমেটের অফিস থেকে বিচারপতি চৌধুরী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেস-এর অফিসে গিয়ে সেক্রেটারি জেনারেল চিদামবরা নাথানের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৬ আগস্ট লন্ডনে ফিরে আসার আগে বিচারপতি চৌধুরী সুইস পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য জাঁ জিগলার এবং কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া ১৭ আগস্ট তিনি জেনেভায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তৃতাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জাঁ জিগলার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'[৭৯]

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পারীতে বসবাসকারী খ্যাতনামা লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে লন্ডনভিত্তিক 'বাংলাদেশ নিউজ গ্রুপ'-এর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট তিনি 'ইউনেস্কো'র সাংস্কৃতিক দপ্তরে প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে উন্নীত হন।

'বাংলাদেশ নিউজলেটার' (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)-এর প্রতিটি সংখ্যা এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্রের বহু ক্লিপিং ডাকযোগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে পাঠানো হয়েছিল। আগস্ট মাসে পারী সফরকালে আবদুল মতিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হওয়ার পর তিনি জানান, বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ফরাসি সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত খবর সরবরাহ করার ব্যাপারে ইতোপূর্বে লন্ডন থেকে পাঠানো বুলেটিন ও ক্লিপিংগুলো তাঁর খুব কাজে লেগেছে। তখন থেকে তাঁর স্ত্রী এ্যানমেরী ওয়ালীউল্লাহ্‌ ফরাসি সংবাদপত্রসমূহে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ-বিশ্লেষণ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এ প্রকাশের জন্য নিয়মিতভাবে পাঠান।

সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৭১) শেষের দিকে তিনি লন্ডনে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করা তাঁর সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিচারপতি চৌধুরী তখন লন্ডনের বাইরে ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় নি।

বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব-জনমত গড়ে তোলার জন্য সর্বোদয় আন্দোলনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে যোগ দেয়ার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে তিনি এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। ১০ অক্টোবর (১৯৭১) তিনি পারীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৮০]

১০ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' ও 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, পরদিন (বুধবার) একটি সামরিক আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও অন্যান্য গুরুতর অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সামরিক-শাসন দপ্তর থেকে ৯ আগস্ট প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য কৌসুলি নিয়োগের সুযোগ দেয়া হবে। তবে পাকিস্তানের নাগরিক ছাড়া অন্য কাউকে কৌসুলি নিয়োগ করা যাবে না। সামরিক আদালতের সদস্যদের নাম এবং কোথায় এই গোপন-বিচার প্রহসন অনুষ্ঠিত হবে তা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ হয়নি।

সামরিক আদালতে বিচারের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি ও ব্যক্তিগত পত্র লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে পাঠানো হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে শেখ মুজিবের বিচার অপরিণামদর্শীর সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করে তা পরিহার করার পরামর্শ দেয়া হয়।

১০ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, শেখ মুজিবের গোপন-বিচার সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত ভারত উপমহাদেশের জন্য অধিকতর তিক্ততা, যুদ্ধ ও ধ্বংস ডেকে আনবে। ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে প্রকাশ্য সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না।'[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

১০ আগস্ট জেনেভা থেকে 'দি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস' শেখ মুজিবের গোপন বিচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে এক জরুরি তারবার্তা প্রেরণ করে। কমিশনের ব্রিটিশ সেক্রেটারি-জেনারেল নিয়াল ম্যাকডারমেটের উদ্যোগে এই তারবার্তা প্রেরণ করা হয়।[৮২]

সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন-বিচার সম্পর্কে ১০ আগস্ট 'দি মর্নিং স্টার'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনাকালে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, এর ফলে বাংলাদেশের জনগণ অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হবে। শেখ মুজিব বাঙালিদের হৃদয়ে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। কোনো নেতাই তাঁর মতো নির্ভীক নন। ২৫ মার্চ ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁকে অনুরোধ করেন। তাঁকে খুঁজে বের করার অজুহাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সমগ্র শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে আশঙ্কা করে তিনি ঢাকা থেকে চলে যেতে অস্বীকার করেন। তিনি অবশ্য জানতেন না, সৈন্যবাহিনী ইতোমধ্যে গণহত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জনগণকে বাঁচাবার জন্য তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিচারপতি চৌধুরী আরও বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসী স্বাধীনতা অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি একটি বাস্তব সত্য। এ সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য পার্লামেন্ট সদস্যরা ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সম্প্রতি উত্থাপিত প্রস্তাবটি ইতোমধ্যে দু'শজনেরও বেশি পার্লামেন্ট সদস্য সমর্থন করেছেন জেনে বিচারপতি চৌধুরী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার ও জনগণের কাছে শেখ মুজিবের মুক্তি অর্জনের ব্যাপারে কার্যকর সমর্থনদানের জন্য আবেদন জানান।

উপসংহারে তিনি বলেন ঃ 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই। আমরা বিজয় অর্জন করবো, এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।'

সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বাংলাদেশ মিশন লন্ডনের বিখ্যাত সলিসিটারদের প্রতিষ্ঠান বার্নার্ড শেরিডান এ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়োগ করে। ১১ আগস্ট 'দি টাইমস'-প্রকাশিত এক পত্রে তারা বলেন, শেখ মুজিবকে আইনগত পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের সরকারি মহলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁরা পাকিস্তান হাই কমিশনার মারফত যে পত্র প্রেরণ করেন, তার কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী সন্ ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে বার্নার্ড শেরিডান এ্যান্ড কোম্পানির জনৈতিক সলিসিটার রাওয়ালপিন্ডি যান। শেখ মুজিবকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগদান, বেসামরিক আদালতে তাঁর প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠান এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো অবিলম্বে তাঁকে অবহিত করার দাবি সরাসরি পাকিস্তান সরকারের কাছে পেশ করার জন্য তাঁরা পাকিস্তান সফর করেন। এই সফর ফলপ্রসূ হয় নি।

পাকিস্তানের বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ২৬ জুলাই মি. ম্যাকব্রাইডকে বলেন, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয় নি এবং দেশি কিংবা বিদেশি আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ তাঁকে দেয়া হয় নি। এমনকি তাঁকে কোন জেলে বন্দি রাখা হয়েছে তাও তিনি জানতে পারেন নি।

পত্রের উপসংহারে বলা হয়, স্বাভাবিক ন্যায়নীতির সর্বনিম্ন মান অনুযায়ী শেখ মুজিবের ন্যায্য বিচার লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।

ইয়াহিয়া খান সন ম্যাকব্রাইড ও বার্নার্ড শেরিডান এ্যান্ড কোম্পানির সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা অগত্যা ইয়াহিয়া খানের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, কোনো বিদেশী আইনজীবীকে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ অথবা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে দেয়া হবে না।[৮৩]

বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রতিবাদে ১১ আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে কোচযোগে বাঙালিরা দলে দলে হাইড পার্কে এসে জমায়েত হন।

সভায় বক্তৃতাদানকালে বিচারপতি চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করে ঘোষণা করেন: 'বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তাহানি কিংবা কোনো প্রকার ক্ষতি হলে বাঙালি জাতি কোনো দিন পাকিস্তানকে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা শব্দটি বাঙালি চিরদিনের মতো ভুলে যাবে।'

আঞ্চলিক কমিটিগুলোর কয়েকজন নেতা এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নানও বক্তৃতা করেন। তাঁরা পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কোনো ক্ষতি হলে সমগ্র বাঙালি জাতি অপরাধীর সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এই সভায় পাকিস্তান হাই কমিশনে ডাইরেক্টর অব অডিট এ্যান্ড একাউন্টস পদে নিয়োজিত লুৎফুল মতিন, ফজলুল হক চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সভার শেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা পিকাডিলি সার্কাসসহ বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণের পর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছায়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'বিচার প্রহসন বন্ধ কর', 'গণহত্যা বন্ধ কর' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়। 'দি মর্নিং স্টার'-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। পিটার শোর, মাইকেল বার্নর্স, ব্রুস ডগলাসম্যান, জন স্টোনহাউস এবং আরো কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সরকারি দপ্তরে নিয়োজিত জনৈক অফিসারের হাতে একটি স্মারকলিপি দিয়ে বিচারপতি চৌধুরী বলেন ঃ 'শেখ মুজিব একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বিচার করার অধিকার কারো নেই। গোপন-বিচার একেবারেই সভ্যতা-বহির্ভূত। এই প্রহসনের অবসান এবং শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এটাই আমাদের আশা।'[৮৪]

১২ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এর প্রধান সম্পাদকীয় নিবন্ধে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন-বিচারের তীব্র নিন্দা করা হয়। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে শোকাবহ বলে উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের যুদ্ধ ঘোষণা করার অভিযোগ উদ্ভট বলে বর্ণনা করা হয়। তাছাড়া গোপন-বিচারকে লজ্জাকর বলে অভিহিত করে বলা হয়, এর ফলাফল অন্যায্য হওয়ার গুরুতর আশঙ্কা থাকে। উপসংহারে বলা হয়, শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য সবাইকে জোরালো আবেদন জানাতে হবে।

সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন-বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দু'জন শ্রমিক দলীয় সদস্যের পৃথক চিঠি ১৩ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থনকারী কৌঁসুলি টমাস উইলিয়ামস্ তাঁর পত্রে বলেন, সামরিক আদালতে গোপন-বিচারের ভয়াবহ ফলাফল এড়ানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার ও জাতিসংঘ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা করেন। অপর পত্রে পিটার শোর বলেন, গোপনে শেখ মুজিবের বিচার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয়, পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট পূর্ববঙ্গ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের আশঙ্কা সম্পর্কে নিরুদ্বেগ। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। নিজেদের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে পাকিস্তানের শাসকচক্র এই পরিস্থিতিতে তাদের মত পরিবর্তন করবে বলে তিনি কি আশা করতে পারেন?

১৬ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত অর্ধ-পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করার জন্য বিশ্ব জনমতের প্রতি আহবান জানানো হয়। তাঁর একটি প্রতিকৃতির নিচে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ ও গণহত্যা এবং সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর গোপন-বিচার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয়া হয়। এই বিজ্ঞাপনের উদ্যোক্তাদের তালিকায় ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৮৫]

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি লন্ডনের ওয়াল্ডর্ফ হোটেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রীতি-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ এ্যাসোসিয়েশন' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুলিন বিহারী শীল ও ড. গিয়াসউদ্দিন বিচারপতি চৌধুরীকে প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা উভয়েই বাঙালি। মি. শীল ত্রিশের দশকে চট্টগ্রাম থেকে লেখাপড়ার জন্য ব্রিটেনে আসেন এবং তখন থেকেই এ দেশে বসবাস করছেন। ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য মি. শীল ও ড. গিয়াসউদ্দিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

এই প্রীতি-অনুষ্ঠানে মুসলিম দেশগুলো ছাড়া অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতগণ যোগদান করেন। পূর্ব ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশ এবং সাইপ্রাস, কিউবা, মরিশাস প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূত, ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনেক সদস্য এবং বহু সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনদানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তৃতা দেন।

এই অনুষ্ঠানে মি. শীল 'গভর্নমেন্ট বাই মার্ডার' (হত্যার মাধ্যমে শাসন) শীর্ষক একটি প্রচারপত্র বিলি করেন।[৮৬]

সুইজারল্যান্ডে বিচারপতি চৌধুরী (দ্বিতীয় বার)

বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বিচারপতি চৌধুরী ১৭ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ৫ আগস্ট জেনেভায় অবস্থানকালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তিনি লন্ডনে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে। সুইজারল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য জাঁ জিগলার এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ফেডারেল পার্লামেন্টের স্থানীয় সদস্যদের ব্যবহারের জন্য জেনেভা শহরে একটি ভবন রয়েছে। এই ভবনের প্রেস রুমে মি. জিগলার সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন।

১৭ আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় বিচারপতি চৌধুরী জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান। সুইজারল্যান্ডের বিশিষ্ট নাগরিক মাদাম ক্যাথলিন লা প্যঁ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, তাঁকে ভিসা মঞ্জুর করা হয়নি বিধায় তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে বলে পাকিস্তানী দূতাবাসের উদ্যোগে জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘের প্রেস রুমে একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। এই খবর পেয়ে মাদাম লা প্যঁ ও তাঁর সহকর্মীরা পাল্টা বিজ্ঞাপনের ঘোষণা করেন, পাকিস্তানী দূতাবাসের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞপ্তি উপেক্ষা করে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্য তাঁরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সম্মেলন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রবেশ-ভিসা থাকা সত্ত্বেও বিমানবন্দরে বিচারপতি চৌধুরীর পাসপোর্টে 'এন্ট্রি সিল' সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয় নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের হাত রয়েছে বলে মাদাম লা প্যঁ মনে করেন।

বিকেলবেলা সাংবাদিক সম্মেলনের আগে দু'জন সুইস ফেডারেল পুলিশ অফিসার বিচারপতি চৌধুরীর হোটেলে গিয়ে তাঁকে বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য রাজধানী বার্ন থেকে তাঁরা এসেছেন। পাকিস্তানীদের দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে তাঁরা খবর পেয়েছেন।

ফেডারেল পার্লামেন্টের জেনেভা অফিসে পৌঁছে বিচারপতি চৌধুরী মি. জিগলারের রুমে যান। মাদাম লা প্যঁ প্রেস রুম থেকে ঘুরে এসে বললেন, পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞপ্তির ফলে সাংবাদিকদের আগ্রহ বেড়ে গেছে। তার ফলে বহু সাংবাদিক প্রেস রুমে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

সাংবাদিকদের ভিড়ের মধ্যে পাকিস্তানী দূতাবাসের একজন সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিলেন। বিচারপতি প্রেস রুম থেকে মি. জিগলারের রুমে ফিরে এসে মাদাম লা প্যঁ, সম্মেলনের কয়েকজন আয়োজনকারী এবং বার্ন থেকে আগত পুলিশ অফিসারদের বলেন: 'এই সম্মেলন সাংবাদিকদের জন্য, পাকিস্তানী কূটনৈতিকবিদ এখানে আসতে পারেন না।'

তাঁরা বলেন, এ প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছেন, দূতাবাসের জনসংযোগ অফিসার পদে তিনি নিয়োজিত। অতএব, তাঁকেও সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন: 'তিনি দূতাবাসের অফিসার, কিন্তু পেশাগতভাবে সাংবাদিক নন অথবা কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি নন। অতএব, তাঁর প্রবেশাধিকার নেই, একথা তাঁকে বুঝিয়ে বলুন।'

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী দূতাবাসের অফিসার প্রেস রুম থেকে চলে যান।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন সম্পর্কেও সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরদিন 'লা সুইস', 'ট্রিবিউন দ্য জেনিভ'সহ সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী সম্মেলনের খবর ও বাংলাদেশ আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলো বড় বড় হরফে। পাকিস্তানীদের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করে। কয়েকটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির ছবিও প্রকাশিত হয়।'[৮৭]

১৭ আগস্ট আন্তর্জাতিক 'ওমেগা পিস টিম'-এর আটজন ব্রিটিশ ও তিনজন আমেরিকান কর্মী পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে পেত্রাপোল পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ইয়াহিয়ার সৈন্যরা তাঁদের গ্রেফতার করে জেলখানায় আটক রাখে।

১৮ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত উক্ত সংবাদে বলা হয়, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন ওমেগার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার স্ত্রী এলেন কনেট এবং আরো কয়েকজন মহিলা। তাঁরা পিস টিমের অগ্রগামী দল হিসেবে একটি ভ্যানযোগে ১ আগস্ট লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ার থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওমেগার কর্মীরা যশোর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।[৮৮]

১৮ আগস্ট বিচারপতি চৌধুরী জেনেভায় লীগ অব রেডক্রস এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। সেদিন বিকেলবেলা তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন।[৮৯]

২১ আগস্ট লন্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানী আইনজীবী এ. কে. ব্রোহি সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করবেন। সামরিক শাসনকর্তার প্রধান কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে এই সংবাদ প্রকাশ করা হয়। 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, মি. ব্রোহি এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আইন দপ্তরের অনুরোধে তিনি রাজি হন।[৯০]

২১ আগস্ট (রোববার) সকালবেলা ইরাকে নিয়োজিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ্ টেলিফোনযোগে বিচারপতি চৌধুরীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে জানান।

সেদিন বিকেলবেলা গোরিং স্ট্রীটের অফিসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. ফতেহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা বিচারপতি চৌধুরী তারবার্তা পাঠিয়ে 'মুজিবনগর' সরকারকে জানিয়ে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক সম্মেলনে মি. ফতেহ্ বলেন, সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ত্যাগ করার দিন তিনি দূতাবাস থেকে বেরিয়ে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে দূতাবাসের একাউন্ট থেকে ২৫ হাজার পাউন্ড তুলে নেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় উক্ত অর্থ 'মুজিবনগর' সরকারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তিনি সপরিবারে ইরাক থেকে ট্যাক্সিযোগে ছ'শ মাইল পার হয়ে কুয়েত বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের পথে রওনা হন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় বিশজন বাঙালি কূটনৈতিক অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে মি. ফতেহ্ ছিলেন সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর লন্ডনে আগমন সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

কিছুকাল পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিচারপতি চৌধুরীকে বলা হয়, আবুল ফতেহর বিরুদ্ধে পাকিস্তান হাই কমিশনার এক অভিযোগ পেশ করেছে। ইরাকের ব্যাংক থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্থ তুলে নিয়ে আসার অভিযোগে মি. ফতেহ্কে পাকিস্তান সরকারের হস্তে অর্পণ করার সরাসরি অনুরোধ আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়। মি. ফতেহ্ বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য 'মুজিবনগর'-এ যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। পাকিস্তান সরকারের মতলব টের পাওয়ার পর অবিলম্বে তাঁর 'মুজিবনগর'-এ চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয়। যাওয়ার আগে তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।"[১১]

২৩ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বার্মিংহামের বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট জগলুল পাশা ছ'হাজার পাঁচশ' পাউন্ডের একখানি চেক পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়গ্রহণকারী দুস্থ বাঙালিদের সাহায্যার্থে লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার আপা বি. পন্থ-এর হস্তে অর্পণ করেন।[১২]

২৪ আগস্ট 'দি মর্নিং স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের মানবিক অধিকার কমিশনের সদস্য বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশে ইয়াহিয়া সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে কমিশনের জরুরি সভা আহবান করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ-থান্টকে অনুরোধ জানিয়ে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। এই তারবার্তায় তিনি আরও বলেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নেতা শেখ মুজিবকে বিচার করার আইনগত অধিকার পাকিস্তানের নেই।[১৩]

২৭ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনের বেজওয়াটার এলাকার নটিংহিল গেইট টিউব স্টেশনের কাছে ২৪ নম্বর পমব্রিজ গার্ডেন্সে প্রায় ৩শ' বাঙালি, কয়েকজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এবং বহু বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে 'বাংলাদেশ মিশন' (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)-এর দ্বারোদঘাটন করেন। ভারতের বাইরে লন্ডনেই বাংলাদেশের প্রথম কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠি হয়।

দূতাবাসের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার পর বিচারপতি চৌধুরী বলেন, লন্ডন থেকেই বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হবে এবং লন্ডনই হবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র।

পরবর্তীকালে লন্ডনে এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত কনভেনার শেখ আবদুল মান্নান বলেন, জাকারিয়া খান চৌধুরী খবর নিয়ে এলেন, বেজওয়াটার এলাকায় ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেন্সের বাড়িটি কূটনৈতিক মিশনের জন্য পাওয়া যেতে পারে। এই বাড়িতে তখন টক্-এইচ নামের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক হোস্টেল ছিল। 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেস্ওয়ার্থ এই হোস্টেলের ওয়ার্ডেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মি. চেসওয়ার্থ প্রথম থেকেই বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর পক্ষ থেকে তিনি ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য কয়েকবার কলকাতা যান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়। মে মাসে মি. চেস্ওয়ার্থ বাংলাদেশ ফান্ডের অন্যতম ট্রাস্টি পদে নিয়োজিত হন।

বিচারপতি চৌধুরী, শেখ আবদুল মান্নান ও জাকারিয়া খান চৌধুরী ডোনাল্ড চেস্ওয়ার্থের সঙ্গে দেখা করেন। মি. চেস্ওয়ার্থ হোস্টেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুমগুলো নামমাত্র ভাড়ায় বাংলাদেশ মিশনকে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিচারপতি চৌধুরী বলেন, ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী পূর্ব বঙ্গে গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৭ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। উপরোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেন-প্রবাসী বাঙালিরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। এই স্বাধীন দেশের সরকারি প্রতীক হিসেবে একটি মিশন স্থাপনের জন্য তাদের আগ্রহ বাসনা বিচার করে গত ১ আগস্ট বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১১ নম্বর গোরিং স্ট্রীটে মিশনের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হয়। এখন থেকে ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেন্সে মিশনের কাজ যথারীতি পরিচালিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গত ২৩ বছর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বঙ্গকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের শিকার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আইনসঙ্গতভাবে আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা বিসর্জন দিয়ে ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী ধ্বংসযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছে। তারা এখনও গণহত্যায় নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে তারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, যে জাতি মৃত্যুকে জয় করেছে তাকে সামরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পরাজিত করা সম্ভব নয়।

আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নির্ভীক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে বেআইনিভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁর বিচার-অনুষ্ঠান বর্বরোচিত কাজ। তাঁর যদি কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি কখনও তা ক্ষমা করবে না। শেখ মুজিব একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। তাঁর বিচার করার অধিকার অন্য কোন দেশের নেই। আমরা অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবি করি।

সবচেয়ে জরুরি যে-কথাটি মনে রাখা দরকার তা হলো-পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে দুটি নতুন দেশের জন্ম হয়েছে। ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটি এখন স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তী অবস্থায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়- একথা কখনও ভুলে যাওয়া চলবে না।

ইয়াহিয়া খানের হানাদার সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলবো। এ দেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে সমান মানবাধিকার ভোগ করবে।

উপসংহারে বিচারপতি চৌধুরী শেখ মুজিবের মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন জানান।'[১৪]

দূতাবাস উদ্বোধনের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধনের দিন দূতাবাসের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আবুল ফতেহ, মহিউদ্দিন আহমদ, লুৎফুল মতিন, শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আবদুস সালাম, এ. কে. এম নুরুল হুদা ও ফজলুল হক চৌধুরী।

'মুজিবনগর' সরকার ইতোপূর্বে বিচাপতি চৌধুরীকে হাই কমিশনার পদে নিয়োগ করে 'লেটার অব ক্রিডেন্স' (কূটনৈতিক পরিচয়পত্র) প্রেরণ করে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের দস্তখত সংবলিত এই পরিচয়পত্র আবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর বিচারপতি চৌধুরী হল-ঘরে উদ্বোধনী ভাষণ দেয়ার সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হয়। বিনা আমন্ত্রণে কয়েকটি কোচ বোঝাই পুলিশ অফিসার মিশনের সামনে এসে পাহারার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শেষে তাদের সবাইকে প্রতি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

দূতাবাস স্থাপিত হওয়ার পর সরকারি অফিসারগণ ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেন্সে এবং বেসরকারি কর্মকর্তারা ১১ নম্বর গোরিং স্ট্রীটে অফিসের কাজ করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গোরিং স্ট্রীটের কর্মকর্তারা সাংগঠনিক ও প্রচারকার্য এবং পেমব্রিজ গার্ডেন্সের অফিসাররা কূটনৈতিক কার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি চৌধুরী সকালবেলা গোরিং স্ট্রীটে এবং বিকেল বেলা পেমব্রিজ গার্ডেন্সে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর বিশিষ্ট বাঙালি শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম তাঁর এক পাঞ্জাবি বন্ধুর সহায়তার চিকিৎসার অজুহাতে লন্ডনে আসার অনুমতি নিয়ে দেশত্যাগ করেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ মেডিক্যেল এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ড. মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, মি. ইসলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। চিকিৎসার অজুহাতে তিনি লন্ডনের লুইসাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ড. জোয়ারদারের গাড়িতে হাসপাতালে গিয়ে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মি. ইসলাম বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অর্থ সাহায্য করার অনুরোধ তিনি তাজউদ্দিন্ আহমদের কাছ থেকে পেয়েছেন। তিনি নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলন সাহায্য করতে চান। বিচারপতি চৌধুরী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র ক্রয় এবং স্টিয়ারিং কমিটির ব্যয়ভার বহনের জন্য 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি তহবিল খোলা হয়েছে। চাঁদাদানকারীরা এই তহবিলের অর্থ অন্য কোনো খাতে খরচ করার পক্ষপাতী নন। প্রস্তাবিত দূতাবাসের জন্য প্রতি মাসে দু' থেকে আড়াই হাজার পাউন্ড প্রয়োজন হবে। মি. ইসলাম যদি দূতাবাসের খরচ চালিয়ে দেন, তাহলে বিচারপতি চৌধুরী নিশ্চিন্ত মনে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। মি. ইসলাম এক কথায় রাজি হয়ে বললেন, প্রতি মাসে তিনি ড. জোয়ারদারের মারফত দু'হাজার পাউন্ড পাঠাবেন। ঢাকায় অবস্থানরত মি. ইসলামের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার খাতিরে উল্লিখিত অর্থ অন্য কারো নামে জমা করে নিতে হবে। তাঁরা তিনজনে মিলে ঠিক করলেন, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ড. জোয়ারদার উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ মি. ইসলামের কাছ থেকে নিয়ে আসবেন। অর্থ প্রদানকারীর নিরাপত্তার খাতিরে জনৈক সুবিদ আলীর নামে তা জমা দেয়া হবে। দূতাবাসের ফিনান্স ডাইরেক্টর লুৎফুল মতিন এই অর্থ গ্রহণ করে প্রতি মাসে সুবিদ আলীর নামে যথারীতি রসিদ প্রদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত মি. ইসলাম বাংলাদেশ মিশনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালন করেন।'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট মাসের শেষ দিকে রুমানিয়ায় 'বিজ্ঞান ও বিশ্ব-শান্তি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী ছাত্রনেতা এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুকে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে রুমানিয়ায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রচার-পুস্তিকা নিয়ে তিনি ৩০ আগস্ট রুমানিয়ায় পৌঁছান।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা সারাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারতীয় দলে অন্য দু'জন সদস্য শিশির গুপ্ত ও হোসেন জাহির তাঁকে অন্যান্য দেশের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদলের সদস্য জেরি স্মিথের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তান সমরাস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। এরপর তিনি সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।'[৯৬]

নরওয়েতে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী লন্ডন থেকে নরওয়ের রাজধানী অসলো পৌঁছান। তাঁর সফর-সঙ্গী ছিলেন রাজিউল হাসান রঞ্জু। বিমানবন্দরে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হামিদুল ইসলাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুজ্জামানসহ ছয়-সাতজন জন বাঙালি তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।

মাত্র ছয়-সাতজন জন অসলোবাসী বাঙালির কর্মতৎপরতার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নরওয়ের বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের প্রচেষ্টায় ফলে স্থানীয় টিভি বিচারপতি চৌধুরীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি নরওয়ের অধিবাসীদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করার সুযোগ লাভ করেন। সেদিন বিকেলবেলা এই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

পরদিন (২ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি চৌধুরী বেলা ১১ টার সময় নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ের অস্তের সঙ্গে কফি পানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের সব বিচারপতিকে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কক্ষে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, বাংলাদেশ কেন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। বিচারপতি চৌধুরী সংক্ষেপে বাঙালির স্বাধীনতা কামনার মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন।

সেদিন দুপুরবেলা বিচারপতি চৌধুরী অসলো রোটারি ক্লাবের সভায় অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। সভা শুরু হওয়ার আগে তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'সংগ্রামী বাংলার দৃঢ় প্রত্যয়ের বাণী' সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেন।

রোটারি ক্লাবের সভার পর বিচারপতি চৌধুরী নরওয়ের পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনাকালে বাঙালিদের দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন।

এরপর বিচারপতি চৌধুরী অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের 'ডিন'-এর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক।

কিছুকাল আগে 'মুজিবনগর' সরকার বাংলাদেশে গণহত্যা সংঘটনের অপরাধে পাকিস্তানের বিচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে অনুরোধ জানায়। এই ট্রাইবুনালের প্রধান কাজ হবে গণহত্যা সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য রিপোর্ট প্রণয়ন করা। এ সম্পর্কে আলোচনার পর আইন বিভাগের 'ডিন' প্রস্তাবিত ট্রাইবুনালের সদস্যপদ গ্রহণ করতে রাজি হন। (এই ট্রাইবুনাল গঠিত হওয়ার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।)

৩ সেপ্টেম্বর সকাল বেলা বিচারপতি চৌধুরী অসলোর মেয়রের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানান। বিচারপতি চৌধুরীকে তিনি অসলো শহরের বিভিন্ন আলোকচিত্র সংবলিত একটি বই উপহার দেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন। নরওয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগেই অসলোর মেয়র বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

সেদিন বিকেলবেলা নরওয়ের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী স্টলটেনবার্গ বিচারপতি চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ আলোচনার পর মি. স্টলটেনবার্গ বলেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আসন্ন সম্মেলনে নরওয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি পেশ করবে। সম্মেলনের সরকারি বিবরণীতে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থনের কথা প্রকাশ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

৬ সেপ্টেম্বর (সোমবার) সকালবেলা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ সংগ্রামের উদ্দেশ্য, বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং সংগ্রামের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেন। পরদিন নরওয়ের সবগুলো সংবাদপত্রে তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত তারিখে সন্ধ্যা সাতটার সময় অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মি. বুল বাংলাদেশ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক। তাঁর উদ্যোগে ছাত্র-সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগে হামিদুল ইসলাম, আলী ইউসুফ, রফিকুজ্জামান এবং আরো কয়েকজন বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী মিলনায়তনে উপস্থিত হয়ে নরওয়ের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন।

নরওয়ের একজন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাত্র ইউনিয়ন পোস্টার হিসেবে ব্যবহার করে। এই ব্যঙ্গচিত্রে ইয়াহিয়া খানকে নরহত্যাকারী দৈত্যরূপে দেখানো হয়। পোস্টারের পাশে ছিল সভার বিজ্ঞপ্তি। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তারা বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, কয়েকজন পাকিস্তানী ছাত্র মিলনায়তনের প্রবেশদ্বারের কাছে কয়েকটি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। এর ফলে উত্তেজিত ছাত্ররা দলে দলে মিলনায়তনে এসে সমাবেশে যোগ দেন। বিচারপতি চৌধুরীর বক্তৃতার আগেই দু'তিনজন ছাত্রনেতা বাংলাদেশে ছাত্র নিপীড়ণের জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন, নরওয়ে বাক্-স্বাধীনতার দেশ। এ দেশে এসে পাকিস্তানী ছাত্ররা যদি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে সাহস করে তা হলে নিজেদের দেশে তাদের এবং তাদের সরকারের ব্যবহার সহজেই অনুমেয়।

পাকিস্তানী ছাত্রদের অগণতান্ত্রিক ও উস্কানিমূলক কাজের ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে বিচারপতি চৌধুরী রাজনৈতিক বক্তৃতার ধরণ ত্যাগ করে মর্যাদাব্যঞ্জক ভাষায় নিপীড়িত জনগণের মুক্তির কামনা ব্যক্ত করেন। সমবেত ছাত্ররা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।"[১৭]

৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী অসলো থেকে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম রওনা হন।

'অপারেশন ওমেগা' প্রেরিত পিস টিমের চারজন সদস্য দুর্গতদের জন্য সাহায্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর পায়ে হেঁটে পেত্রাপোল পার হয়ে দ্বিতীয়বার পূর্ব বঙ্গে প্রবেশ করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা অবিলম্বে তাঁদের গ্রেফতার করে। আরও তিনজন সদস্য অন্য পথ দিয়ে পূর্ব বঙ্গে প্রবেশ করেন। তাঁরাও গ্রেফতার হন বলে অনুমান করা হয়।

পিস টিমের সদস্যরা ১৭ আগস্ট প্রথমবার সাহায্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে পূর্ব বঙ্গে প্রবেশ করেন। ২৬ ঘণ্টা আটক রাখার পর পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁদের পশ্চিম বঙ্গে ফেরত পাঠায়।

১০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বঙ্গে প্রবেশকারী পিস টিমের প্রথম দলের চারজন সদস্যকে কারাদন্ড দিয়ে যশোর জেলে পাঠানো হয়েছে। ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস থেকে এই সংবাদ পাঠানো হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ১৭ সেপ্টেম্বর পিস টিমের সাজাপ্রাপ্ত সদস্যদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। শিগগিরই তাঁরা লন্ডনে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।[১৮]

সুইডেনে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী নরওয়ে থেকে সুইডেনে পৌঁছান। সুইডেনে নিয়োজিত পাকিস্তানের প্রাক্তন কূটনৈতিক অফিসার আবদুর রাজ্জাক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

স্টকহোমে পৌঁছার দু'ঘণ্টা পর বিচারপতি চৌধুরী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুনার মীয়ারডালের সঙ্গে দেখা করেন। আবদুর রাজ্জাক এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পর বিচারপতি চৌধুরী অধ্যাপক মীয়ারডালকে স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সানন্দে রাজি হন।

সেদিন বিকেলবেলা আবদুর রাজ্জাক ও রাজিউল হাসান রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বিচারপতি চৌধুরী সুইডিস সোস্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেল স্টেন এ্যান্ডারসনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর পার্টি তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর মি. এ্যান্ডারসন বলেন, তাঁর পার্টির সমর্থন জানিয়ে শুধু একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বাংলাদেশকে সত্যিকারের সাহায্য করতে হলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের পার্টির মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করার চেষ্টা করবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এরপর বিচারপতি চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্যালযার্গ এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পিয়ের শোরির সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী তখন সুইডেনে ছিলেন না।

৮ সেপ্টেম্বর সকালবেলা বিচারপতি চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মিসেস ইনগ্রিড গার্ডেওয়াইডেমারের সঙ্গে দেখা করেন। বিকেলবেলা তিনি সুইডিস পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে লিবারেল পার্টির চিফ হুইপ ইয়ান স্টিফেনসনের সঙ্গে বাংলাদেশ সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর পার্টি বাংলাদেশকে সমর্থন করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। এরপর বিচারপতি চৌধুরী সুইডেনের খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং 'এক্সপ্রেসেন ইভনিং ডেইলি' পত্রিকার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক টমাস হ্যামেনবার্গের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ আন্দোলন সমর্থন করবেন বলে আশ্বাস দেন।

৯ সেপ্টেম্বর সকাল বেলা 'সাভেনস্কা ডাগ ব্লাডেট' পত্রিকার পক্ষ থেকে সাংবাদিক বো কার্লসন বিচারপতি চৌধুরীর একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। বিকেলবেলা একটি জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। সুইডেনের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নের ধারা বোঝা যায়, সাংবাদিকরা বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল।

১০ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী 'এ্যাফটেন ব্লাডেট' পত্রিকার খ্যাতনামা সাংবাদিক ফ্রেডারিকসেনের সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

১৩ সেপ্টেম্বর বিমানযোগে সুইডেন ত্যাগ করার আগে বিচারপতি চৌধুরী আবদুর রাজ্জাককে সুইডেনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পণের জন্য 'মুজিবনগর' সরকারকে পত্রযোগে অনুরোধ জানান।'[৯৯]

বিচারপতি চৌধুরীর স্ক্যান্ডিনেভিয়া সফরকালে বাংলাদেশ আন্দোলনের শত্রুরা গভীর রাতে লন্ডনের গোরিং স্ট্রীটে অবস্থিত স্টিয়ারিং কমিটির অফিসের নিচের তলার প্রবেশদ্বারে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে দরজা-জানালার ক্ষতি হয়, কিন্তু কেউ আহত হননি। পাকিস্তানপন্থীরাই এর জন্য দায়ী বলে সবাই মনে করেন। ১০ সেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের (মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) অফিসার টিটার ল্যাঙ্গলি অফিসে এসে স্টিয়ারিং কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাছাড়া তিনি অফিসের সামনে পুলিশের ঘন ঘন টহলের ব্যবস্থা করেন।

১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারীতে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৭শ' প্রতিনিধি যোগদান করেন। সংশ্লিষ্ট দেশের স্পিকার তাঁর প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। সম্মেলনে যোগদানকারী পার্লামেন্ট সদস্যদের বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তানী বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।

১ সেপ্টেম্বর প্যারী পৌঁছে ছাত্র-প্রতিনিধিরা সম্মেলনের সভাপতি আঁদ্রে সেনারনাগারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেন। পরদিন অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারকালে ছাত্র-প্রতিনিধিরা বিচারপতি চৌধুরীর চিঠি তাঁর হাতে দেন। এই চিঠিতে তিনি 'মুজিবনগর' সরকারের পার্লামেন্টকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানান।

ছাত্র-প্রতিনিধিরা সুযোগমতো প্রত্যেক প্রতিনিধিদলের নেতার কাছে বিচারপতি চৌধুরীর চিঠি পৌঁছে দেন। এই চিঠির সঙ্গে ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের লেখা একটি নিবন্ধ, বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্ট, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এবং বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত সংবাদ।

নরওয়ে, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। লাইবেরিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা বাংলাদেশ সরকারকে আফ্রিকায় একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল পাঠাবার পরামর্শ দেন। প্রতিনিধিদল পাঠানো হলে তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্যদানের আশ্বাসও তিনি দেন। জর্ডানের প্রতিনিধিদলের নেতা আল হোসেইনি পাকিস্তানী অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনী শুনে অভিভূত হন এবং দেশে ফিরে গিয়ে জর্ডানের বাদশাকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন বলে আশ্বাস দেন। মার্কিন প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্য পাক হানাদার বাহিনী সংঘটিত অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ শুনে বলেন, দেশে ফিরে গিয়ে এসব কথা তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানাবেন। মিশরীয় প্রতিনিধিদলের নেতা প্রথমে ছাত্র প্রতিনিধিদের বলেন, মিশর থেকে রওনা হওয়ার আগে তিনি পাকিস্তানী দূতাবাস থেকে জানতে পেরেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত করার অপচেষ্টা মাত্র। কিন্তু প্যারীতে আলোচনার পর তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই বলে মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সম্মেলনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ছাত্র-প্রতিনিধিগণ ফ্রান্সের জাতীয় ছাত্র সমিতির সঙ্গেও বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের নির্যাতিত ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য তাঁরা একটি বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। ছাত্র-প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নজরুল ইসলাম, এইচ. প্রামাণিক, ওয়ালী আশরাফ, খোন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর) এবং এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু।'[১০০]

'কমিটি ফর ক্রিশ্চিয়ান এ্যাকশন'-এর চেয়ারম্যান ক্যানন কলিন্সের উদ্যোগে লন্ডনে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী এবং চারটি আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে সেন্ট মার্টিন'স-ইন-দি-ফিল্ড নামের বিখ্যাত গির্জার বেসমেন্টে ১৩ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী স্থায়ী হয়। আলোচনা-সভার মূল বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ক্যানন কলিন্স (১০ সেপ্টেম্বর), জন গ্রিগ্ (১৪ সেপ্টেম্বর), মার্টিন এ্যাডেনি (১৫ সেপ্টেম্বর) এবং ফরিদ জাফরী (১৬ সেপ্টেম্বর)।'[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

ফিনল্যান্ডে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

১৩ সেপ্টেম্বর (সোমবার) সকালে বিমানযোগে বিচারপতি চৌধুরী সুইডেন থেকে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজিউল হাসান রঞ্জু। হেলসিংকিতে নিয়োজিত ব্রিটিশ কন্সাল-জেনারেল রয় ফস্ত্র বিমানবন্দরের বিচারপতি চৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানান। ঢাকায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার পদে নিয়োজিত থাকাকালে তাঁর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মি. ফস্ত্র তাঁদের দু'জনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান।

বিকেলবেলা মি. ফস্ত্র বিচারপতি চৌধুরীকে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দেন। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে তিনি সরাসরি বিশ্ব শান্তি পরিষদের সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রমেশচন্দ্র বলেন, হেলসিংকিতে অবস্থানকালে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর অফিস এবং টেলিফোন ও টেলেক্স ব্যবহার করলে তিনি খুশি হবেন। বিচারপতি চৌধুরী সানন্দে এই উদার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর সেখানে বসেই তাঁর হেলসিংকির কর্মসূচি তৈরি করেন।

পরদিন বিচারপতি চৌধুরী অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকেন। সকালবেলা হোটেলে এসে ফিনিশ টেলিভিশন তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানকালে তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও বিদ্যমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। বিকেলবেলা ছাত্রদের এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তারপর পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে একজন কয়েক দিনের মধ্যে ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন। তিনি ফিনিশ সরকারকে বাংলাদেশ সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করা এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সমর্থন করার আশ্বাস দেন।

এরপর পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বিচারপতি চৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, বাংলাদেশ আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ফিনিশ সরকার সজাগ রয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে ফিনল্যান্ডের সহায়তা আশা করতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা হেলসিংকি ত্যাগ করার আগে বিচারপতি চৌধুরী ফিনল্যান্ডের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সুয়োম্যান সোসিয়লি ডেমোক্রাত'-এর সম্পাদক এবং সুপ্রিম কোর্টের জজ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ভ্যাটিওসারিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বাংলাদেশ আন্দোলনকে যথাসম্ভব সাহায্যদানের আশ্বাস দেন।

ডেনমার্কে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা বিচারপতি চৌধুরী ডেনমার্কের কোপেনহেগেন পৌঁছান। বিমানবন্দরে মতিউর রহমান এবং লিয়াকত হুসেনসহ কয়েকজন বাঙালি কর্মী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বাংলাদেশ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক মিমি ক্রিশ্চিয়ানসেন নামের একজন বয়োবৃদ্ধা ডেনিশ মহিলার বাড়িতে বিচারপতি চৌধুরী ও রাজিউল হাসান রঞ্জুর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পরদিন সকালবেলা বিচারপতি চৌধুরী ডেনমার্কের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'ইনফরমেশন' অফিসে গিয়ে সম্পাদক নিয়েলসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছেন। বিচারপতি চৌধুরীকে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে-একথা ডেনমার্ক উপলব্ধি করে। মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা দখল না করা পর্যন্ত কোনো বিদেশী সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান সহজ হবে না বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারপতি চৌধুরী বলেন, ঢাকার বুকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত না হওয়া পর্যন্ত বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের জয়যাত্রা থামবে না।

এরপর বিচারপতি চৌধুরী পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং সম্ভবমত সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দেন।

পার্লামেন্ট ভবন থেকে বিচারপতি চৌধুরী টি.ভি. স্টেশনে যান। সাক্ষাৎকার যিনি পরিচালনা করছিলেন তিনি রেকর্ডিং শুরু হওয়ার আগে বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, পাকিস্তান সরকার ডেনমার্কের একজন অস্ত্র-ব্যবসায়ীকে অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ডেনিশ সরকারের কাছে আবেদন জানাবার জন্য তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে পরামর্শ দেন।

সাক্ষাৎকারকালে অস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্রে অটল বিশ্বাসী ডেনমার্ক কখনও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর স্বৈরশাসন চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সরবরাহ করবে না বলে তিনি আশা করেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করা হলে নারী-নির্যাতন, শিশু-হত্যা এবং যেসব নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি হবে, তার জন্য দায়ী থাকবে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ।

স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি টিভি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কমিটির আহবায়িকা কিস্টেন ওয়েস্টগার্ড একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তিনি ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তার কয়েক দিন আগে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনার যোগদান করেন। সেদিনের হত্যাকাণ্ড তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন বলে দেশে ফিরে এসেও তা ভুলতে পারেন নি। কোপেনহেগেনে তাঁর অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি ঝোলানো রয়েছে। গণ্যমান্য লোকজনের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য তিনি সেদিন রাতে তাঁর বাড়িতে একটি সান্ধ্য-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

টি.ভি. স্টেশন থেকে বিচারপতি চৌধুরী পুনরায় পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশ সংগ্রামের সাফল্য কামনা করেন। এরপর বিচারপতি চৌধুরী পার্লামেন্টে বৈদেশিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদে সমবেত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর বৈদেশিক কমিটির সদস্যরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন। কমিটির সভাপতি কিয়েল অলসেন বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের আশ্বাস দেন। বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের প্রায় দু'মাস পর তিনি ডেনমার্কের দেশরক্ষা মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হন। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য যে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তারা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

১৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনে যোগদানের জন্য মনোনীত ডেনিশ প্রতিনিধিদলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি জাতিসংঘে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে আশ্বাস দেন।

বেলা প্রায় ১১ টার সময় ডেনমার্কের প্রভাবশালী 'পলিটিকেন'-এর খ্যাতনামা সম্পাদক জন ডানস্ট্র্যাপ বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক।

সেদিন বিকেলবেলা স্থানীয় এ্যাকশন কমিটি ও কয়েকজন উৎসাহী বাঙালির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। কোপেনহেগেনের প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং সংবাদ-সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রারম্ভিক ভাষণে বাংলাদেশ সংগ্রামের পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, আদর্শগতভাবে এই সংগ্রাম ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে সকল দেশের ও সকল মানুষের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রামে ডেনিশ জনগণ সক্রিয় সাহায্যদান করবে বলে তিনি আশা করেন।

প্রশ্নোত্তরকালে জনৈক সাংবাদিক বলেন, বাংলাদেশ সরকার ইসরাইলের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি বিচারপতি চৌধুরীর অভিমত জানতে চান। তিনি বলেন, এই মিথ্যা প্রচারণার জন্য পাকিস্তান দায়ী। বাংলাদেশ সরকারকে মুসলিম দেশগুলোর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন কারসাজি ব্যর্থ হবে। সত্য চিরকালই জয়লাভ করে।

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে ডেনিশ ভাষায় একটি সংবাদ বুলেটিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কিস্টেন ওয়েস্টগার্ড ও তাঁর সহযোগীরা এই বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এঁদের কর্মচাঞ্চল্য ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে বিচারপতি চৌধুরী বিস্মিত হন বলে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা বিচারপতি চৌধুরী কোপেনহেগেন থেকে বিমানযোগে লন্ডনের পথে রওনা হন।[১০২]

একই তারিখে ইংল্যান্ডের স্কারবারা শহরে অনুষ্ঠিত উদারনৈতিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে পার্লামেন্ট সদস্য জন পার্ডো উত্থাপিত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে শেখ মুজিবের মুক্তিদান এবং পূর্ববঙ্গ থেকে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়। ১৭ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, আগামী ৬০ দিনের মধ্যে এই দাবি পূরণ না করা হলে একটি কমনওয়েলথ সম্মেলন আহবান করে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব পেশ করা ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

উল্লিখিত তারিখে (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের লিঙ্কস প্রাইমারি স্কুলে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বাংলাদেশের সমর্থনে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ আবদুল মান্নান বলেন, ভারত বিভাগের পর থেকে পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তানী নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম এবং মুক্তিবাহিনীর বর্তমান সংগ্রাম একই সংগ্রামের অংশ বলে তিনি মনে করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় শাখার সভাপতি সিড ফেঞ্চ বলেন, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনসমাবেশের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে তিনি আশা করেন।[১০৩]

১৭ সেপ্টেম্বর ফরাসি সাহিত্যিক, মুক্তিযোদ্ধা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কূটনীতিবিদ আঁদ্রে মালরো প্যারীতে প্রকাশিত এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব বঙ্গে গিয়ে তিনি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, তাঁর রওনা হওয়ার তারিখ শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। এই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিবৃতি বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি গণতান্ত্রিক বিশ্বের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

মসিয়ে মালরোর বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১০৪]

১৮ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওভাল এলাকায় ক্রিকেট খেলার ময়দানে বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের সাহায্যার্থে একটি বিরাট 'পপ' সঙ্গীতের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩৩ হাজার তরুণ-তরুণী এই উৎসবে যোগদান করে। এ সম্পর্কে ২০ সেপ্টেম্বর 'দি মর্নিং স্টার'-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, টিকেট বিক্রির আয় থেকে ১৫ হাজার ২ শ' পাউন্ড ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের জন্য পাঠানো হবে।

১৮ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ লিবারেল পার্টির বিশেষ সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে দলের নেতা জেরেমি থর্প বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থনদানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে জোরালো আবেদন জানান। বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভোগ উপশমের জন্য ব্রিটেনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপার তাঁর দল সরকারি কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা করেন।

এ সম্পর্কে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর অক্টোবর (১৯৭১) সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, মি. থর্প বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং আন্দোলনকারীদের সর্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্য তাঁর দলের সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।

১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের কনওয়ে হলে বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে 'অস্ত্র হাতে তুলে নাও' শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরী উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এনামুল হক (পরবর্তীকালে ড. এনামুল হক) নৃত্যনাটটি রচনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এই বিপ্লবী-আলেখ্য দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে। এই নৃত্যনাট্যটি ব্রিটেনের অন্যান্য শহরেও মঞ্চস্থ করা হয়। গণসংস্কৃতি সংসদের সম্পাদিকা ছিলেন মুন্নি রহমান। ফাহমিদা হাফিজ (মঞ্জু)ও এই সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[১০৫]

২১ সেপ্টেম্বর 'মুজিবনগর' সরকার প্রেরিত এক তারবার্তায় বলা হয়, জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য ১৬ সদস্য-বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিচারপতি চৌধুরী এই প্রতিনিধিদলের নেতা মনোনীত হয়েছেন। অবিলম্বে তাঁকে নিউইয়র্ক রওনা হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম বলেন, নিজের দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, এ ধরণের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জনগণের আস্থাপূর্ণ বেসামরিক সরকার গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধের আশঙ্কা এড়ানো সম্ভব।[১০৬]

নিউইয়র্কে বিচারপতি চৌধুরী ঃ

বিচারপতি চৌধুরী গোরিং স্ট্রীটের অফিস এবং পেমব্রিজ গার্ডেন্সের দূতাবাসে তাঁর অনুপস্থিতিতে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২৩ সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে নিউইয়র্কের পথে রওনা হন।[১০৭]

৮ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা প্রদত্ত এবং সংবাদে বলা হয়, লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের 'পলিটিক্যাল কাউন্সিলার' রেজাউল করিম পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেছেন। এ পর্যন্ত যেসব বাঙালি অফিসার হাই কমিশন থেকে পদত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মি. করিম সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পত্রিকাটির সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মি. করিম বলেন, পাকিস্তান সরকারের ভয়ানক নির্বুদ্ধিতা ও অপকর্মের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছেন। ৫ মার্চ দিবাগত রাতে পূর্ব বঙ্গে সংঘটিত হত্যাকান্ডের পর বিদেশে নিয়োজিত অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের মতো তিনিও নিদারুণ মানসিক যাতনা ভোগ করেন। পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞকে তিনি বিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম ঘটনা বলে উল্লেখ করেন।[১০৮]

৮ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত অপর এক সংবাদে বলা হয়, পাকিস্তান সরকারের বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে ঢুকে দুস্থদের মধ্যে কাপড়-চোপড় বিতরণ করার জন্য 'অপারেশন ওমেগা'র আরও দু'জন কর্মীকে গ্রেফতার করে যশোর জেলে পাঠানো হয়।

গত আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত 'ওমেগা'র কর্মীরা মোট ছ'বার বাংলাদেশে গিয়ে সাহায্যসামগ্রী বিতরণের চেষ্টা করেন। ইতোপূর্বে ১২ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে কিছু দিন জেলে আটক রাখার পর বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১০৯]

Dhaka University Institutional Repository

আর্জেন্টিনায় পাকিস্তান দূতাবাসে নিয়োজিত বাঙালি রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমিন ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৩ অক্টোবর তিনি লন্ডনে পৌঁছেই বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৪ অক্টোবর 'দি মর্নিং স্টার'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মি. মোমিন বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র বেআইনিভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছে। তারা পূর্ব বঙ্গে হত্যা, অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য দায়ী। যাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আশ্বস্ত বোধ করবে না।[১১০]

জেনেভা থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক চক্রের মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস্'-এর একটি প্রতিনিধিদল ডিসেম্বর মাসে ভারত সফর করবে। কমিশনের সদস্যরা পাকিস্তান সফরেও যাবেন বলে আশা করেন। ১৪ অক্টোবর লন্ডনের 'ইন্ডিয়া উইকলি' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, আগামী জানুয়ারি মাসের শেষে তদন্তকারী কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।[১১১]

বিশ্বের দুর্গত জনগণকে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' ও 'অক্সফ্যাম' নামে পরিচিত দুটি বিখ্যাত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটির শেষে একটি কুপন সংযোজিত হয়। এই কুপনটি পূরণ করে নিজ নিজ এলাকার পার্লামেন্ট সদস্যের কাছে পাঠানোর জন্য পাঠকদের অনুরোধ জানানো হয়। এই কুপনে বলা হয়, জাতিসংঘর সনদ অনুযায়ী প্রাপ্ত অধিকারবলে পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং দুর্গতদের সাহায্যদানের পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য দস্তখতকারী জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।[১১২]

ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের দুর্দশা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করার জন্য ২১ অক্টোবর 'অক্সফ্যাম' ৬০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় যাঁদের বিবৃতি, লিখিত বিবরণ ও সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিনেটর এড্ওয়ার্ড কেনেডি, মাদার তেরেসা, ড. ট্রেভর হাডলস্টোন, জেরাল্ড স্কার্ফ (কার্টুনিস্ট) এবং কিছু সংখ্যক সাংবাদিক ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য। ২১ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

'অক্সফ্যাম'-এর ডাইরেক্টর লেজলি কার্কলি বলেন, এই পুস্তিকাটি প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্টের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, আমেরিকান কংগ্রেস ও জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে পুস্তিকাটি বিতরণ করা হবে।[১১৩]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী (মিসেস গান্ধী ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) লন্ডনে পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টা পর বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ও 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ক্ল্যারিজেস হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে এই সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়।

মিসেস গান্ধীর সঙ্গে ইতোপূর্বে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে পুরনো সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মতো কথা বলতে শুরু করেন। ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে বিচারপতি চৌধুরীর সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি জানতে চান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এড্ওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সময় না দিয়ে তিনি এই সাক্ষাতের অনুরোধ জানিয়েছেন বলে মিসেস গান্ধী উল্লেখ করেন।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে তারা বলেন, ভারতে স্বীকৃতিদানের ওপর তাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে।

আবেগপূর্ণ স্বরে তিনি আরও বলেন, মিসেস গান্ধীর পিতা বেঁচে থাকলে তিনি শুধুমাত্র বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না। অবশ্য এর প্রতিদানে দেয়ার মতো কিছুই বিচারপতি চৌধুরীর নেই। বাংলাদেশ কখনও ভারতে করদরাজ্যে পরিণত হবে না। তবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারতের বন্ধু-রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই বন্ধুত্ব ভারতের কাম্য কিনা, ভারত তা বিবেচনা করবে।

মিসেস গান্ধী ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শোনার পর বিনীতভাবে বলেন, বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে বিচারপতি চৌধুরী সৌজন্য প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন। বিচারপতি চৌধুরীর উল্লিখিত প্রতিদান সম্পর্কে মিসেস গান্ধী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে তিনি একটিমাত্র প্রতিদান আশা করেন- তাহলো গণতন্ত্র। তিনি সামরিক শাসন দেখতে চান না।

উল্লিখিত সাক্ষাৎকালে বিচারপতি চৌধুরী মিসেস গান্ধীকে বলেন, লন্ডনের এক সভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। স্বীকৃতিদানের অধিকারী হলে তিনি বহু পূর্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস গান্ধী হাসিমুখে বলেন, মি. নারায়ণের মতো সরকারি-দায়িত্বমুক্ত নাগরিকের অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত। মানবতার খাতিরে তিনি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতে জনগণের স্বার্থের প্রতি নজর রাখা তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য। তিনি ভারতের ওপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারেন না। ভারতকে বিনা প্ররোচনায় যদি আক্রমণ করা হয়, তাহলে কি করে তার জবাব দিতে হবে, ভারত তা জানে।

উপযুক্ত সময়ে বিনা দ্বিধায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করবেন বলে মিসেস গান্ধী উপরোক্ত সাক্ষাৎকারকালে বিচারপতি চৌধুরীকে আশ্বাস দেন।'[১১৪]

৩০ অক্টোবর (শনিবার) লন্ডনের হেনরি থর্নটন স্কুলে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটি এই সম্মেলনের আয়োজন করে। ম্যাঞ্চেস্টার, লিড্স্, বার্মিংহাম, এক্সেটার, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করেন।

সকালবেলা ঘরোয়া অধিবেশনে কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করা হয়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। বিকেলবেলার অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী আলোচনা-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহান-স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ড. আজিজুর রহমান খান স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেন।

সম্মেলনে ছাত্ররা ঘোষণা করেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো সমাধান তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো রকম আপস-আলোচনায় তাদের আস্থা নেই। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গৌরবজনক পরিণতি তাদের কাম্য।

সম্মেলনের পর বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ-এর (পিপল'স কালচারাল সোসাইটি) উদ্যোগে 'অস্ত্র হাতে তুলে নাও' শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়।'[১১৫]

অক্টোবর মাসের শেষদিকে বিচারপতি চৌধুরী পাকিস্তানের প্রাক্তন-রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেনকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনের একটি হোটেলে মরিশাসের কৃষিমন্ত্রী স্যার আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন। কয়েক মাস আগে লন্ডনে তাঁর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেন, পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে বিচারপতি চৌধুরী মি. আবদুল মোমেনকে কথা বলার সুযোগ দেন। তিনি বাংলাদেশকে মরিশাসের স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে সমর্থনদানের জন্য স্যার আবদুর রাজ্জাককে অনুরোধ করেন। মোমেনের বক্তব্য শোনার পর তিনি বলেন: 'পাকিস্তান ভেঙে দেয়া ঠিক হবে না। অতীতের অন্যায় ক্ষমা করে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।'

মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিউসাগর রামগোলাম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর দলের মুসলমান সদস্যদের বিরোধিতার ফলে তা সম্ভব হয়নি।[১১৬]

৭ নভেম্বর বৃহত্তর লন্ডন এলাকার বাঙালিদের উদ্যোগে গঠিত ১৪টি এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে গ্রেটার লন্ডন কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠন করেন। এস এম আইউব এই সভায় সভাপতিত্বে করেন। ত্রিশজন প্রতিনিধি ও দর্শক এই সভায় যোগদান করেন।

'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির কর্মসূচীর সমন্বয়সাধন এবং প্রস্তাবিত জাতীয় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠন করা হয়। মি. আইয়ুব কমিটির আহবায়ক মনোনীত হন।[১১৭]

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত-বিরোধী প্রচারে চীনপন্থীরা মওলানা ভাসানীর নাম ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। ভারত ও বিদেশে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য ভারত সরকার মওলানা ভাসানীকে কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় দিনযাপন করতে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ভক্তদের এই মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১১ নভেম্বর বিচারপতি চৌধুরীর কাছে লিখিত এক পত্রে গৃহবন্দি থাকার সংবাদ দুরভিসন্ধিমূলক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে-কোনো জায়গায় যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি ভোগ করেছেন। বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিনি প্রকাশ্যে চলাফেরা করা এবং নির্বিচারে প্রত্যেককে সাক্ষাৎদান নিরাপদ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় বলে মনে করেন। পত্রের উপসংহারে তিনি বাঙালি শরণার্থীদের নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যদানের জন্য ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।'[১১৮]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতি চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধকালীন শেষবার) ঃ

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বিচারপতি চৌধুরী লন্ডন থেকে পুণঃরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার জন্য হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক সিটি, কলম্বিয়া, হোফস্ট্রা ও ইয়েল

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এম আই টি) ও হার্ভার্ড স্কুল অব ল' সফর করেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনাকীর্ণ সভায় তিনি বক্তৃতা করেন।[১১৯]

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাংলাদেশ ও ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ পরিচালনার জন্য পাকিস্তানের সামরিক চক্রের তীব্র নিন্দা করা হয়। ওয়ালি খান ও মুজাফফর আহমদ পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বাংলাদেশের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'মর্নিং স্টার' পত্রিকায় এই সভার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড ব্রকওয়ে বলেন, এই যুদ্ধের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষভাবে দায়ী। পূর্ব বঙ্গে সামরিক আক্রমণ চালিয়ে গণহত্যা শুরু করার পর তারা নিষ্ক্রিয় থাকার নীতি গ্রহণ করে। বৃহৎ শক্তিবর্গ ও জাতিসংঘ কর্তৃক পূর্ব বঙ্গ সমস্যার গণতন্ত্রসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দাবি উত্থাপন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার স্বীকারের মাধ্যমে সর্বাত্মক যুদ্ধজনিত বিপর্যয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যুক্তরাজ্য শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. নূরুল আলম বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে সমর্থনদানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ভারতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যারা পাকিস্তান টিকে থাকবে বলে বিশ্বাস করে তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুদান কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য এসেলেইন এল-আমীর বলেন, তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনসূচক একটি বাণী নিয়ে তিনি এসেছেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

বৃহত্তর লন্ডন এলাকার ১৪ টি বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে ১০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ৬ ডিসেম্বর লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনে টোরিদলীয় সদস্য ডানকান স্যান্ডস সিকিউরিটি কাউন্সিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভিটো' প্রয়োগের সমালোচনা করেন। ৭ ডিসেম্বর 'মর্নিং স্টার'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, শ্রমিকদলীয় সদস্যগণ তাঁর সোভিয়েত-বিরোধী মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। এঁদের মধ্যে জন স্টোনহাউসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপিত মার্কিন প্রস্তাব সমর্থন করতে অস্বীকার করার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা করেন।

৭ ডিসেম্বর 'মর্নিং স্টার'-এ প্রকাশিত উপরোক্ত সংবাদে আরও বলা হয়, প্রতিনিধিরা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে ইন্ডিয়া হাউসে প্রবেশ করেন। ভারতীয় হাই কমিশনার আপা বি. পন্থের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বলেন, ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নিয়েছে। বাংলাদেশ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।[১২০]

১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মহিলা সমিতির উদ্যোগে হাইড পার্ক এলাকার স্পিকার্স কর্নারের কাছে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলে দলে মহিলারা এই সভায় যোগ দেন। সভার পর মহিলার মিছিল সহকারে বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।[১২১]

১২ ডিসেম্বর বিকেলবেলা লন্ডনের হাইড পার্ক এলাকার স্পিকার্স কর্নারের কাছে প্রায় ১৫ হাজার প্রবাসী বাঙালীর এক গণসমাবেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করা হয়।

১৯ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক 'জনমত'-এ প্রকাশিত উপরোক্ত সংবাদে আরও বলা হয়, ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে প্রবাসী বাঙালিরা কোচযোগে লন্ডনে এসে এই সমাবেশে যোগদান করেন। সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাদানকারীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা রেজাউল করিম, শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর ও জন স্টোনহাউস এবং বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের নেতা ড. আসাবুল হক।[১২২]

১৩ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, হাইড পার্ক থেকে বাঙালীরা বিরাট মিছিল সহকারে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছায়। যুক্তরাজ্যে আওয়ামীলীগের প্রেসিডেন্ট গাউস খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়।

ডাউনিং স্ট্রীট থেকে প্রবাসী-বাঙালিরা অল্ডউইচে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনে গিয়ে একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পেশ করেন।[১২৩]

১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লন্ডনের মহাত্মা গান্ধী হলে ইন্ডিয়া লীগ আয়োজিত এক সভায় শ্রমিক দলীয় প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য ব্রিটেনের তৈরি থাকা উচিত। ১৩ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক সাহায্যদানের জন্যও ব্রিটেনের তৈরি থাকা কর্তব্য।[১২৪]

১৬ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীরা ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর যুক্তকমান্ডের কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ পান। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থনদানকারী বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য আরও কয়েক দিন অবস্থানের পর তিনি এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অপর সদস্যগণ ২২ ডিসেম্বর লন্ডনে ফিরে আসেন।

লন্ডনে ফিরে আসার পর বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পান। এই তারবার্তায় তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

বিচারপতি চৌধুরী টেলিফোনযোগে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন, ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী বাঙালিরা বাংলাদেশের জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছে; তাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে তিনি দেশে ফিরতে পারবেন না। তাছাড়া সাংগঠনিক কয়েকটা কাজ সমাধা না করে ব্রিটেন থেকে তিনি ফিরে যেতে পারেন না। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, বিদেশের বিভিন্ন সরকারের স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি ইচ্ছা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর থাকতে পারেন। তা যদি না চান, তাহলে নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ প্রয়োজন। তিনি যদি ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োজিত থেকে লন্ডনে ফিরে যেতে চান, তাহলে একজন অস্থায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করতে হবে। বিচারপতি চৌধুরী শিগগিরই দেশে ফিরবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।[১২৫]

২০ ডিসেম্বর লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে 'ইকোনমিক মিনিস্টার' পদে নিয়োজিত এ. এফ. এম. এহসানুল কবীর বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন।[১২৬]

২১ ডিসেম্বর প্যারী থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হয়, স্থানীয় পাকিস্তানি দূতাবাসে 'কমার্শিয়াল কাউন্সেলার' পদে নিয়োজিত মোসলেমউদ্দিন আহমদ এবং ব্রাসেলসে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে 'সেকেন্ড সেক্রেটারি' পদে নিয়োজিত খায়রুল আনাম বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছেন।[১২৭]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে স্বাগত জানানোর জন্য লন্ডনের হাইড পার্কে স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিচারপতি চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেলিফোনে শেখ আবদুল মান্নানকে বলেন, সভার তারিখ ২ জানুয়ারি (১৯৭২) ঠিক করা হলে তিনি তার আগেই লন্ডনে পৌঁছে যাবেন। তিনি আরও বলেন, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের নামে সব এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে এই সভা আহবান করতে হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন, জন স্টোনহাউস ও পিটার শোরসহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যেসব সদস্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

২ জানুয়ারি (১৯৭২) লন্ডনের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ ছিল। তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে কোচযোগে ৭/৮ হাজার উৎসাহী বাঙালি বিজয়ের আনন্দে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাইড পার্কে জমায়েত হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে সভার কাজ শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। জন স্টোনহাউস, পিটার শোর এবং অ্যাকশন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পল কনেটের প্রতিনিধি হিসেবে মিস মারিয়েটা প্রকোপে এবং আরও কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর পক্ষ থেকে তাসাদ্দুক আহমদ, বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক (ডক্টর) ও বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত কনভেনার শেখ আবদুল মান্নান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিচারপতি চৌধুরী জাতিসংঘে কিভাবে কাজ করেছেন, কিভাবে বাঙালির স্বপ্ন সফল হলো, কিভাবে তাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছে, বাঙালির ভবিষ্যৎ কেন উজ্জ্বল হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন।

তিনি আরও বলেন: 'সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গঠিত নতুন বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিরা শান্তিতে বসবাস করবে। বাংলাদেশের বাঙালিরা সভ্য জাতি হিসেবে গর্ববোধ করে। বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর মতো বর্বর অত্যাচারের নীতি অনুসরণ করবে না। গণহত্যা সম্পর্কিত 'জেনেভা কনভেনশন' যারা লঙ্ঘন করেছে, তাদের বিচার করা হবে।'

বিচারপতি চৌধুরী দৃঢ় কণ্ঠে বলেন: 'স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে না আসা পর্যন্ত বাঙালিরা তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।'[১২৮]

বিচারপতি চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাঙালি এবং সমর্থনদানকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই উপলক্ষ্যে বিচারপতি চৌধুরী 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর জন্য সংগৃহীত অর্থের সংক্ষিপ্ত হিসাব পেশ করেন। ব্যক্তি-বিশেষ ও বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটি সংগৃহীত অর্থের একটি বিরাট অংশ 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এ জমা দেয়া হয়নি বলে তিনি প্রকাশ করেন। শিগগিরই তা জমা দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।[১২৯]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রমিকদলীয় প্রাক্তন মন্ত্রী জন স্টোনহাউস, মহিলা সমিতির বেগম আনোয়ারা জাহান, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, জাকারিয়া খান চৌধুরী, এ্যাকশন বাংলাদেশের মারিয়েটা প্রকোপে, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য শামসুর রহমান এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ড. হাকিম।

৬ জানুয়ারি (১৯৭২) সন্ধ্যায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের অনুরোধ অনুযায়ী লন্ডন থেকে বিমানযোগে ঢাকার পথে রওনা হন। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছান এবং যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা তাঁকে পেয়ে মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ণতা অনুভব করেন। লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর সাথে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ঐদিন সাক্ষাৎ হয়নি। সাক্ষাৎ হয় ঢাকায় এক মহেন্দ্র ক্ষণে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পাবার প্রাক্কালে। এর পূর্বেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কলকাতা হয়ে ৮ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছান। ১২ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[১৩০]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক।
২. সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক এবং আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-২৩-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন। তবে ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন এটাকে ২৮-৩১ মার্চ লিখেছেন, সূত্রঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩২)।
৩. সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম এবং প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম।
৪. সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী ও ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন।
৫. সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু), নূরুল ইসলাম ও ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' চতুর্থ খন্ডঃ পৃষ্ঠা-(১-২২২ এবং ৫৯৭-৬৯৩); ত্রয়োদশ খন্ডঃ পৃষ্ঠা-(১-১৯৭); চতুর্দশ খন্ডঃ পৃষ্ঠা-(৩১৭-৫৪৯); পঞ্চদশ খন্ড-এ উল্লেখিত বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার; নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-(৯৩১-১০৫১) এবং আবদুল মতিনের বিভিন্ন গ্রন্থ।
৬. সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও মহিউদ্দিন আহমদ।
৭. সাক্ষাৎকারে রাজিউল হাসান (রঞ্জু)ও আবুল হাসান চৌধুরী এবং আবুল মাল আবদুল মুহিত, 'স্মৃতি অম্লান ১৯৭১', আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৯ এবং 'বাংলাদেশ ঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব', সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০০।
৮. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-২৪।
৯. শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-২৭।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-২৮-২৯।
১১. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯।
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-৩০-৩১।
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৯।
১৪. 'Bangladesh Newsletter', London, 12 May, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।
১৫. শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০।
১৬. ৬ মে 'দি মর্নিং স্টার'-এ প্রকাশিত সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯, ২০৪-২০৫।
১৭. ৬ মে 'দি ইভিনিং স্টার'-এ প্রকাশিত সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১২৯, ২০৪-২০৫।
১৮. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩।
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৮-৮০।
২০. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫।
২১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮-২৯।
২২. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬।
২৩. ১৩ মে 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৬-৫৭।
২৪. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. 'That this House, deeply concerned by the killing and destruction which has taken place in East Pakistan, and the possible shortage of food later this year, calls upon Her Majestey's Government to use their influence to secure and end to the strife, the admission of United Nations or other international relief organisations, and the achievement of political settlement which will respect the democratic rights of the people of Pakistan.'
[সূত্রঃ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৫৭, ১৯৯।]
২৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৬০।
২৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৬০-৬১।
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৬১।
২৯. 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃষ্ঠা-৬৭-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৬২-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।
৩০. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৬২ এবং সাক্ষাৎকারে শহীদুল হক ভূঁইয়া।
৩১. শেখ আবদুল মান্নানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৬২-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।
৩২. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৬৪।
৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৪।
৩৪. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯।
৩৫. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫।
৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৬।
৩৭. ঐ।
৩৮. ঐ এবং সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৩৯. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫।
৪০. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭।
৪১. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৮।
৪২. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৯।
৪৩. ঐ।
৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০।
৪৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৭০।
৪৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৭২।
৪৭. ১৬ জুন 'ডেইলি মিরর'-এ প্রকাশিত সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৭৩।
৪৮. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৬-১৪৭।
৪৯. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪।
৫০. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫।
৫১. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬।
৫২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।
৫৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০।
৫৪. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮।
৫৫. ঐ।
৫৬. ঐ।
৫৭ শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০-৬১।
৫৮. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।
৫৯. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩।
৬০. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬।
৬১. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৩।
৬২. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫।
৬৪. ঐ।
৬৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬।
৬৬. শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১।
৬৭. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮।
৬৮. এপ্রিল মাসের (১৯৭১) শেষের দিকে জন স্টোনহাউস পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর পক্ষ থেকে 'মুজিবনগর'-এ যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে ডাকটিকেট প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে জন স্টোনহাউস সরাসরি 'মুজিবনগর'-এর নির্দেশে ও দায়িত্বে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ ফান্ড কিংবা স্টিয়ারিং কমিটি ডাকটিকেট বাবদ কোনো অর্থ ব্যয় করেনি।
[সূত্রঃ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪।
৬৯. Sean MacBride: Senior Counsel, Irish Bar, Assistant Secretary-General, U.N. and U.N. Commissioner for Nambia, 1973-77: Irish Minister for External Affairs, 1984-51; One of the founders of Ammesty International and Chairman of its International Executive, 1961-75; President International Commission of Jurists: Nobel Peace Prize, 1974; Lenin International Prize for Peace, 1977.
[সূত্রঃ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১, ২০২।]
৭০. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৯১-৯২।
৭১. ঐ, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩।
৭২. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৩।
৭৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪।
৭৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে 'মুজিবনগর' সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস-আলোচনা চালাচ্ছেন বলে গুজব শোনা গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রকাশিত লরেন্স লিফসুল্টজ-এর 'Bangladesh: The Unfinished Revolution', এ এল খতিবের 'Who Killed Mujib?' এবং আরো কয়েকটি বইতে বলা হয়, 'মুজিবনগর' সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের অগোচরে কলকাতায় নিয়োজিত মার্কিন কন্স্যাল-জেনারেলের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস-আলোচনার প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগ দলভুক্ত কাজী জহিরুল কাইউম-এ সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের বিজয়' শীর্ষক বইতে প্রকাশিত হয়।

মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট ড. হেনরি কিসিংগারের স্মৃতিচারণমূলক 'The White House Years' বইতে (The India-Pakistan Crisis of 1971, Chapter 21) মি. কাইউমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্রঃ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-২০২-২০৩।
৭৫. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৮; শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২।
৭৬. 'এ্যাকশন বাংলাদেশ-এর আর একটি বিশেষ কার্যক্রম ছিল 'অপারেশন ওমেগা'। বাংলাদেশের ভেতরে দুর্গত জনগণের কাছে খাদ্য, ওষুধ ও বিবিধ ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছে দেয়াই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। ৩০ জুলাই প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়, পাকিস্তান সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের কথা জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইবে না।
সূত্রঃ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৩।
৭৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১০০।
৭৮. ঐ।
৭৯. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১-৭৩।
৮০. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৩।
৮১. 'Yesterday's treaty of 'friendship, peace and co-operation' between New Delhi and Moscow raised, ironically, only the prospect of more enmity, war and disaster

Dhaka University Institutional Repository

for the Sub-Continent. So also does Yahiya Khan's incredible decision to start the secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman this week. India and Pakistan are running out of all options but open conflict fast.'

[সূত্র: Editorial comment in 'The Guardian', London, 10 August, 1971. -এর সূত্র উল্লেখ করে ঐ, পৃষ্ঠা-১০৪, ২০৪।]

৮২. ঐ, পৃষ্ঠা-১০৪।

৮৩. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪।

৮৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৭।

৮৫. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৭।

৮৬. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮-৮৯।

৮৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৬-১৩৭।

৮৮. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১২।

৮৯. ঐ।

৯০. ঐ।

৯১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩।

৯২. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৩।

৯৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১১৪।

৯৪. 'Bangladesh Newsletter', London, Issue No, 10 September, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ ঐ, পৃষ্ঠা-১১৫-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

৯৫. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০ এবং সাক্ষাৎকারে মহিউদ্দিন আহমদ।

৯৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪১ এবং সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু)।

৯৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১০২-১০৭।

৯৮. ঐ, পৃষ্ঠা-১০৮।

৯৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১০৮-১১১ এবং সাক্ষাৎকারে রাজিউল হাসান (রঞ্জু)।

১০০. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৯-১৪০ এবং ডক্টর খোন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু)।

১০১. 'Bangladesh Newsletter', London, Issue No, 10 September, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৫-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

১০২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১১-১১৯।

১০৩. 'Bangladesh Newsletter', London, Issue No, 11 September, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

১০৪. ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে লিখিত এক খোলা চিঠিতে মসিয়ে মালরো পাকিস্তানকে নিন্দা, ভারতকে সমালোচনা করার জন্য আমেরিকাকে আক্রমণ এবং বাংলাদেশ সংগ্রামের প্রতি তাঁর সমর্থনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, তাঁর নেতৃত্বে ১৫০ জন অফিসার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি কার্যকর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে বিদেশি অফিসারদের সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছাবে বলে তিনি আশা করেছিলেন।

[সূত্র: 'International Herald Tribune', 20 December. 1971.- এর সূত্র উল্লেখ করে ঐ, পৃষ্ঠা-১২৯, ২০৪-২০৫।]

১০৫. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৪-১৪৬।

১০৬. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯-১৩০।

১০৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩০।

১০৮. জুন মাসের (১৯৭১) গোড়ার দিকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার এলাকায় সংগঠিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির অন্যতম নেতা তাসাদ্দুক আহমদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রবাসী সাংবাদিক আবদুল মতিন রেজাউল করিমকে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান কয়েকদিন আগে লন্ডনে আসেন। 'মুজিবনগর' সরকারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাসাদ্দুক আহমদের যোগাযোগ ছিল। তিনি (তাসাদ্দুক আহমদ) আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

মতিনকে বলেন, রেজাউল করিম যদি বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করতে রাজি হন, তাহলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন।

আবদুল মতিনের সঙ্গে গোপন আলোচনার কিছুকাল পর মি. করিম টেলিফোনযোগে বলেন, 'মুজিবনগর' সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে তিনি রাজি আছেন। অতঃপর একটি নির্দিষ্ট তারিখে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে মি. করিমের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তার খাতিরে 'মুজিবনগর' সরকারের প্রতিনিধির নাম মি. করিমকে তখনও পর্যন্ত বলা হয়নি।

কিছুকাল পর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাসাদ্দুক আহমদ আবদুল মতিনকে বলেন, মি. করিম বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। শিগগিরই লন্ডনের সংবাদপত্রে পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে তাঁর পদত্যাগের খবর প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই আশা তখন পূর্ণ হয় নি। ইতোমধ্যে চল্লিশজনেরও বেশি বাঙালি অফিসার পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন।

১৯৮৬ সালে লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারকালে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে মি. করিমকে নিয়ে লুলু বিলকিস বানু তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন আশা করা হয়েছিল, ১ আগস্ট ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে আয়োজিত গণসমাবেশে মি. করিম বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে সাক্ষাতের ৪ মাসেরও অধিক কাল পর মি. করিম পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে পদত্যাগ করেন।

[সূত্রঃ আবদুল মতিন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী', পৃষ্ঠা-১৬৪।]

১০৯. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩১।

১১০. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৩।

১১১. ঐ।

১১২. Action or Apathy, Where Do You Stand of Pakistan?

To-day the human race is on trial. So too is your personal philosophy of life. The consideration is whether or not concern for one's fellow man is strong enough to motivate action in helping to save millions of lives in East Pakistan, and the refugees who have crossed the border into India...

Two courses of action are imperative:

1. An international relief programme of enoumous dimension must be swung into operation without further delay.
2. A politica solution to the internal turmoil of East Pakistan must be found and implemented immediately.

Both these tasks are rightly the responsibility of the United Nations. Countries of our kind have the power, the resources, and the duty to ensure UN action to save these people. Please act now.

[সূত্রঃ Inserted as an advertisement in 'The Times' jointly by Oxfam fand War on Want on 19 October, 1971.- এর সূত্র উল্লেখ করে ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৩, ২০৫-২০৬।]

১১৩. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৩-৩৪।

১১৪. The following is an account of Mr. Justice Choudhury's meeting with Mrs. Indira Gandhi at Claridges Hostel in London on 31 October, 1971.

I (Mr. Justice Choudhury) told her (Mrs. Gandhi) that the Governments and the peoples of various countries (which he had visited) were full of sympathy for us. On the question of recognition, they had told me that recognition wuld be possible only when India recognised Bangladesh. I also said with some emotion: 'Had your revered father been alive, he could not have remained satisfied by merely giving shelter to the refugees.' Her pensive mood gave me full opportunity to express my sentements. I added: 'After all, I have nothing to offer by way of reward. Bangladesh will never be a vassal kingdom of India, but a free

Dhaka University Institutional Repository

and sovereign Bangladesh will be a friend of the close neighbour –India, if that is of any value.'

In recalling these words, I am struck by their irrelevance. But I was then in a rebellious mood. It was the propaganda of Pakistan I was denying everywhere. She did not give even the appearance of irritation. She watched my agitated mood with a flicker of a smile, calm, quiet and gazing at the carpet almost with shyness. Then she gently said: 'Justice Choudhury, it is kind of you to have mentioned friendship. I think even that should be left to the people of Bangladesh to decide when they are free.' She proceeded to say:

'You have spokedn about reward –the only reward I would expect from a free Bangladesh is democracy. I do not like military rule in a neighbouring country.'

At the same meeting in London, I also told Mrs. Gandhi that, during his recent visit to London, Mr. Jayprakash Narayan was asked at a meeting about the delay in recognition of Bangladesh. He replied: 'It is no use asking me. I would have recognised Bangladesh long ago had I the authority to do so.' She again said with a pleasant smile: 'I do not have his advantage of being a private citizen.' Then she said: 'Justice choudhury, on humanitarian grounds, I am giving every help to Bangladesh leaders, but you wil kindly appreciate that as Prime Minister of India, my primary responsibility is to the people of India, I can not provoke a war on India. If we are attacked even without provocation, we will know how to meet the situation.'

She assured me that she would recognise Bangaldesh at an appropriate moment without any hesitation.

[সূত্রঃ Excerpts from The Birth of Bangladesh by Mr Justice Abu Sayeed Choudhury whickh was incorporated in an anthology, Indira Gandhi –Statesmen, Scholars, Scientists and Friends Remember, published by Indira Gandhi Memorial Trust, New Delhi on 31 October 1985, the first anniversary of her death. এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৫-১৩৬, ২০৬-২০৭ এবং সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী (তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে গোপনে উক্ত হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন) এবং পরিশিষ্ট (ii)-এ সংযোজিত হয়েছে।]

১১৫. পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটির প্রথম আট মাসের কার্যবিবরণী.-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৭-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।

১১৬. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯০-৯১।

১১৭. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪০।

১১৮. Excepts from a letter to Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, written from 'Mujibnagar' on 12 November, 1971 by Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani:

'It is being maliciously mentioned in certain quarters that the Indian authorities have kept me in custody. I am absolutely free to move anywhere I like, but I try to remain in hiding. I do not think it is wise and possible to meet everybody and to travel from one place to another so openly in this highly critical situation...

The people of Bangladesh will ever remember the selfless and humanitarian help that the Indian Government is giving to the refugees from Bangladesh.'

[সূত্রঃ উল্লিখিত চিঠির ফটোকপি ঢাকায় 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'-এ সংরক্ষিত বলে জানিয়েছেন, আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪১-১৪২, ২০৭।]

১১৯. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

১২০. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৮।
১২১. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৯।
১২২. ঐ।
১২৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১৫০।
১২৪. ঐ।
১২৫. আবদুল মতিন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী', পৃষ্ঠা-১২০।
১২৬. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫২।
১২৭. ঐ,
১২৮. শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১০-১১২।
১২৯. ১৯৮৬ সালের ৩০ অক্টোবর লন্ডনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, প্রায় এক বছর যাবৎ তাগাদা দিয়ে চাঁদা সংগ্রহণকারী এ্যাকশন কমিটিগুলো ও ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে এক লক্ষেরও কিছু বেশি পাউন্ড আদায় করা সম্ভব হয়। কেন্দ্রীয় ফান্ডে মোট ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৮৩ পাউন্ড জমা হয়। তার মধ্যে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৭১ পাউন্ড বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ ফান্ডের বোর্ড অব ট্রাস্টি নয় মাসের আন্দোলন মোট ১১ হাজার ৪৩০ পাউন্ড ব্যয় করে। সংগ্রাম পরিচালনার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি মোট ২১ হাজার ৭৮২ পাউন্ড ব্যয় করে। ১৯৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফান্ডের অডিট রিপোর্ট এবং হিসেব বাংলাদেশ সরকারের প্রেসে ছাপানো হয় (বিজিপি-৭২-৭৩-৩১৯৫ ডি-১ এম)। লন্ডনস্থ দূতাবাস মারফত এ্যাকশন কমিটিগুলোতে রিপোর্টের কপি পাঠানো হয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ফান্ড সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে গুজব ছড়ানো হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জেমস্ জনসন এ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ব্রিটিশ সলিসিটার-জেনারেল পিটার আর্চারকে অনুরোধ করেন। ১৯৭৬ সালের ৫ ডিসেম্বর মি. জনসনের কাছে লিখিত এক পত্রে মি. আর্চার বলেন, পুলিশ এ সম্পর্কে তদন্ত করে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে সিদ্ধান্ত করে। ডাইরেক্টর অব পাবলিক প্রসিকিউশন এই সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানিয়েছেন। মি. আর্চারও ডাইরেক্টর অব পাবলিক প্রসিকিউশনের সঙ্গে একমত।

ব্রিটিশ বোর্ড অব ট্রেড গঠিত একটি কমিটিও ফান্ডের হিসাবপত্র পরীক্ষাকরে। ১৯৭৭ সালের ৩১মার্চ লিখিত এক রিপোর্টে বলা হয়, মি. স্টোনহাউস কিংবা অন্য কেউ বাংলাদেশ ফান্ড-এর অর্থ আত্মসাৎ করেন নি। [সূত্রঃ আবদুল মতিন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী' পৃষ্ঠা-২১৫।]
১৩০. সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী এবং ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

৩.৫ জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল

'বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা' অধ্যায়ে বিশ্ব দরবারে বাঙালি ও বাংলাদেশের দাবিগুলো তুলে ধরার এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি কিছু স্মৃতিকথা ও ক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যায়।

একটি জনসভার কথা উল্লেখ করে শেখ আবদুল মান্নান তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেনঃ

'৪ঠা এপ্রিল (রবিবার) আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশনস কমিটির উদ্যোগে সেদিন দুপুর বেলা হাইড পার্কে বাংলাদেশের সমর্থনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি সেখানে কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বক্তৃতা করি। সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আমরা ট্রাফালগার স্কয়ারে যাই। কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশের উদ্যোগে এখানেও একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গাউস খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার কার্য-পরিচালনা করেন বি. এইচ. তালুকদার। সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, সুলতান মাহমুদ শরীফ, হাজী আবদুল মতিন ও সাখাওয়াত হোসেন। কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে আমিও বক্তৃতা করি। সভার পর আমরা ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর বাস ভবনে একটি স্মারকলিপি পেশ করি।'

'সেদিন সন্ধ্যায় উত্তর লন্ডনের হ্যামস্টেট টাউন হলের শ্রমিক দলের প্রভাবশালী সদস্য জন এনালস্ এর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়। আমরা দলবদ্ধ হয়ে এই সভায় যোগদান করি। সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী লর্ড ব্রওয়ে, শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর (বর্তমান লর্ড শোর), ছাত্র নেতা তারিক আলী, লন্ডন আওয়ামী লীগের পক্ষে সুলতান মহমুদ শরীফ "বাংলাদেশের নিউজলিটার" এর সম্পাদক ফরিদ এস্. জাফরী ও মহিলা সমিতির লুলু বিলকিস বানু ।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড ব্রওয়ে পূর্ব বাংলার ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ দাবী করেন এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে কোন প্রকার সাহায্য না দেওয়ার জন্য শ্রীলংকার প্রতি আবেদন জানান। পিটার শোর পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হত্যাকান্ডকে পাকিস্তানের অভ্যান্তরিন ব্যাপার বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তারিক আলী বাংলাদেশের সংগ্রামকে ভিয়েতনামের সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আন্দোলনের ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মুক্তি আসবে, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ উপমহাদেশে সমাজতন্ত্রের বীজ বপন করা হবে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত সভায় বলি, '....বাংলাদেশের আদর্শের মধ্যে রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন। এই দুই আদর্শকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বন্ধুরা, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হবেন, আমাদের দুঃখ বেদনার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে সাহায্যের আবেদন জানাব।....'[১]

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা দানের জন্য ইংল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জনসংযোগের কর্ম তালিকা অনুযায়ী প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ব্রার্ডফোর্ডে। ৯ই মে সকাল বেলা স্থানীয় আহ্বায়ক কমিটি এই সভার আয়োজন করে। একটি জনাকীর্ণ হলে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন : "বন্দী হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বাংলার নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করে সংগ্রামী বাঙালী জাতির আশা ও আকাঙ্খারই প্রতিধ্বণি করেছেন।" তিনি (বিচারপতি) 'মুজিবনগর' সরকারের প্রতিনিধি-হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। সমগ্র জনতা "জয় বাংলা", "শেখ মুজিবের মুক্তি চাই" ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের অকুন্ঠ সমর্থন ঘোষণা করে।[২]

ব্রার্ডফোর্ড থেকে বিচারপতি চৌধুরী ও শেখ আবদুল মান্নান বার্মিংহাম পৌছান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশানের ড. মোশাররফ হোসেন তরফদার। বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত সভায় বার্মিংহাম এ্যাকশন কমিটির পক্ষথেকে জগলুল পাশা এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নানের বক্তৃতার পর বিচারপতি চৌধুরী প্রধান বক্তা হিসাবে তাঁর বক্তৃতা পেশ করেন।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, "২৫শে মার্চের যুদ্ধ অন্ধকারে নির্মম হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে এক নব জাগ্রত জাতির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই ন্যায় যুদ্ধে আপনারা সকলেই যোগদান করেছেন। আপনাদের সঙ্গে একজন নগণ্য বাঙালী হিসাবে আমিও এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম সমান অধিকার, এগিয়ে চলেছিলাম নিয়মতান্ত্রিক পথে। সেই সময় প্রতারণার দ্বারা সময় হরণ করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য এনে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শ্যামল বাংলার বুকে মা-বোনের ইজ্জত হরণ, লুন্ঠন আর গণহত্যার জন্য।"[৩]

৩০ শে মে প্রবীণ বাঙালী নেতা হাজী আবদুল মতিন এর উদ্যোগে ম্যাঞ্চেস্টার এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কবীর চৌধুরী এবং স্থানীয় বাঙালি ছাত্রদের নেতা মহিউদ্দিন আহমদ সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহয়তা করেন। বিরাট হলটিতে তিল ধারোনের স্থান ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতার ক্যাসেট বাজিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক ভাষণ শ্রোতাদের উপর অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তার করে। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর বক্ততায় ২৫শে মার্চের রাত থেকে ৩০ মে পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ দেন। তার সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন ও কর্মতৎপরতার বিবরণ দেন। শ্রোতারা "জয় বাংলা" ও "শেখ মুজিবের মুক্তিচাই" শ্লোগান দিয়ে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৪]

শেফিল্ড এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে ৫ই জুন স্থানীয় টাউন হল-এ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে জাকারিয়া খান চৌধুরী বলেন ঃ

"শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রীতিষ মজুমদার সভা অনুষ্ঠান এর ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে নিয়ে শেখ আবদুল মান্নান এবং আরও কয়েকজন সহকর্মী লন্ডন থেকে শেফিল্ড রওয়ানা হন।

হল-এ ঢোকার আগে প্রীতিষ মজুমদার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বিচারপতি চৌধুরী কে বলেন, 'স্যার আপনাকে একটি দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে। আমরাতো সভা করতে পারছি না। কারণ ওরা (পাকিস্তানীরা) হলের মধ্যে ঢুকেছে এবং চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।' আমিসহ স্টিয়ারিং কমিটির সকল সদস্য, ড. জোয়ারদার ও শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক গার্লিং তখন উপস্থিত ছিলেন। আমরা বললাম, হল-এ আমরা ঢুকবো এবং সভা হবেই। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য আমরা তৈরী আছি। হল-এ ঢোকার সময় বিরোধী পক্ষ গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা দুই-তিন টুকরা পাথর ছুড়ে মারে এবং "ব্যারিকেড্" তৈরী করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা "ব্যারিকেড্" ভেঙ্গে হলে ঢুকে পড়ি এবং বিচারপতি চৌধুরী বক্তৃতা করেন। পুলিশ দক্ষতার সাথে শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

প্রধান অতিথির বক্ততায় বিচারপতি চৌধুরী বলেন, 'আমরা একটি পবিত্র সাধনায় লিপ্ত। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপনে আমরা দৃঢ় সংকল্প। ব্রিটেনের মতই নির্বাচিত প্রতিনিধি বৃন্দ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

দেশ শাসন করবে। মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে; সংবাদ পত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে মানুষের মনে নিরাপত্তা বোধ স্থায়ী করতে হবে। সে মহৎ জীবনের লক্ষে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ় পদক্ষেপে।'

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক গার্লিং, আফরোজ চৌধুরী ও কবীর চৌধুরী। আমি ঐ সভায় বক্তৃতা করি। সুরাইয়া খানম নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতা আবৃত্তি করেন। বহু ইংরেজ ও ভারতীয় শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য প্রায় দু'শ ইউনিফর্ম- পরিহিত পুলিশ পাকিস্তানীদের প্রতি নজর রাখে।"[৫]

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর ২৭শে জুন বার্মিংহাম-এ দ্বিতীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিগবেথ হল-এ অনুষ্ঠিত এই সভায় বিচারপতি চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ২৫ শে মার্চের পর সংঘটিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলি বর্ণনা করেন। বাংলাদেশ সংগ্রামের ঐতিহাসিক ও আদর্শগত দিক সম্পর্কে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা দেন। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন, শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য জুলিয়াস সিলভার ম্যান ও ব্রুস ডগলাস্ ম্যান।

এ প্রসঙ্গে শেখ আবদুল মান্নান তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেনঃ

"এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। বার্মিংহামের সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। এ সুযোগ নিয়ে আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী তার দলের মুখপাত্র "গণযুদ্ধ" বিক্রি করার চেষ্টা করেন। এককালে আমরা যখন বামপন্থী হিসাবে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তখন মেস্‌বাহ উদ্দিন আমার সহকর্মী ছিলেন। ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট তখনও দ্বিধা বিভক্ত হয়নি। পরবর্তীকালে আমরা যারা ছ'দফা সমর্থন করি তারা মস্কোপন্থী এবং যারা তাঁর বিরোধীতা করেন তারা চীনপন্থী হিসাবে পরিচিত হন। চীনপন্থী মেসবাহ উদ্দিন তাদের পত্রিকা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে হলের বাইরে এসে দাঁড়ান। আমার সহকর্মী আজিজুল হক ভূঁইয়া একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করেন। তিনি মাইক্রোফোনের সামনে দাড়িয়ে বলেন, ভাইসব, এই হল-এর বাইরে চীনের এক চর আমাদের সভা "স্যাবোটাজ"করার জন্য দাড়িয়ে আছে। সে পত্রিকা বিক্রি করছে। ঘোষণা শোনার পর জনতা মেসবাহ উদ্দিনকে ঘিরে ফেলে উত্তম মাধ্যম দেওয়ার উপক্রম করে। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জনতার হাত থেকে মুক্ত করে হলের মধ্যে নিয়ে এসে বিচারপতি চৌধুরীর পাশে চুপচাপ বসে থাকার জন্য বললাম। সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। সভা শেষে তিনি ভিড়ের মধ্য দিয়ে সটকে পড়েন। তাকে মারমুখ জনতার হাতে থেকে রক্ষা করে আমি গর্ববোধ করিনি। প্রাক্তণ সহকর্মীকে বিপদ থেকে বাঁচানো আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করেছি।"[৬]

১৮ই জুলাই (রবিবার) স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে লন্ডনস্থ চীনা দূতাবাসের সামনে একটি বিক্ষোভ এবং দূতাবাস থেকে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ ও মিছিলে যোগদান করার জন্য ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি কোচযোগে লন্ডনে আসেন। জগলুল পাশার নেতৃত্বে বিরাট একটি দল বার্মিংহাম থেকে এসে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়। টনি হকও কয়েকটি কোচ-ভর্তি করে বাঙালীদের নিয়ে এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

বিক্ষোভ শেষে দূতাবাসে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় চীনের মহান নেতা মাওসে তুং এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয় 'চীনের জনগণ কোন দিন ভুল করবে না। পাকিস্তান তাদের বন্ধু-রাষ্ট্র-এই অযুহাতে তারা যদি পাকিস্তানকে সমর্থণ করেন তাহলে ইতিহাসের চোখে তারা দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন।'

দূতাবাস এলাকা থেকে মিছিল সহকারে প্রবাসী বাঙালিরা ডাউনিং স্ট্রীটে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।[৭]

পাকিস্তানী সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ১লা (রবিবার) আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পল কনেটের নেতৃত্বে গঠিত এ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিশ হাজারেরও বেশি বাঙালী যোগ দেয়। শতাধিক বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সদস্যদের লন্ডনে নিয়ে আসার জন্য বহু কোচ ভাড়া করা হয়। একমাত্র বার্মিং হাম থেকে ই ৭০টি কোচ লন্ডনে আসে।

জনসমাবেশে বক্তৃতাদান কালে বিচারপতি চৌধুরী বলেন ঃ 'বাংলাদেশ কখনও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পুত-পবিত্র ভূমি থেকে হানাদার পাক বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত না করা পর্যন্ত আমাদের আপোষহীন, বিরামহীন সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সংগ্রাম। হাজার হাজার কণ্ঠ "জয় বাংলা" শ্লোগানের মাধ্যমে বিচারপতি চৌধুরীর উদ্দীপনাময় ঘোষণাকে সমর্থন জানান।

'মুজিবনগর' সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে রফা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার বলে কিছু মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে তার উল্লেখ করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য শত্রু পক্ষ এই গুজব ছড়াচ্ছে। এই গুজব ভিত্তিহীন বলে প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদ তাঁকে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি চৌধুরী আরও বলেন, 'পূর্ব বঙ্গে নির্বিচার হত্যার মাধ্যমে গণহত্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক 'কনভেনশন' ভঙ্গের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্তব্য।

তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করার জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন লর্ড ব্রকওয়ে, পিটার শোর, রেজ প্রেন্টিস্, ব্রুস ডগলাজ-ম্যাস, লড গিফোর্ড, পল কনেট ও বগম লুলু বিলকিস বানু।[৮]

পাকিস্তানী কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে ১১ই অগাস্ট লন্ডনের হাইড পার্কে একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয়। আগের দিন রাত্রি বেলা প্রস্তাবিত সভা ও শোভা যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে আমরা তিনজন- শামসুর রহমান, আজিজুল হক ভূঁইয়া ও শেখ আবদুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন। প্রথমোক্ত দু'জন বলেন, যা' শোভনী এবং সবাই যা' মেনে নেবেন আমরা তাই করবো। শেখ আবদুল মান্নান বলেন, আমাদের সামনে জীবন-মরণ সমস্যা। পাকিস্তানী সামরিক চক্র যদি বঙ্গবন্ধুকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারে তাহলে আমাদের আন্দোলন স্তিমিত হবে এবং আমরা নিরাশ হয়ে পড়বো। নেতৃত্বহীন জাতি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর ওদিকে পাকিস্তানী সামরিক চক্র বঙ্গবন্ধুকে যদি ফাঁসিতে ঝুলায়, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আমাদের সর্বস্ব উৎসর্গ করার অঙ্গীকার অর্থহীন হয়ে পড়বে। শেখ আবদুল মান্নান-এর বক্তব্য সম্পর্কে প্রথমে মৃদু তর্ক এবং পরে গুরুতর মনোবিরোধ দেখা দেয়। তিনি তখন বলেন, পাকিস্তানী হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আমরা যদি গ্রেফতার হয়ে যাই এবং কেউ যদি আহত হন কিংবা কাউকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তাহলে ডাউনিং স্ট্রীটে স্মারকলিপি পেশ করার তুলনায় আমরা অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হব। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করা হলো।

শেখ আবদুল মান্নান তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেনঃ

"বিচারপতি চৌধুরী আমার প্রস্তাব সম্পর্কে সবার মতামত জানতে চাইলেন। শুধু ব্যারিস্টার সাখাওয়া হোসেন ও আমাদের অফিস সেক্রেটারী শামসুল আলম চৌধুরী আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। বিচারপতি চৌধুরী তখন বললেন, 'আমি যদি স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে থাকি, ত'হলে আগামীকাল পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে গিয়ে শহীদ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমরা বাঁচাতে পারবো, এটা আমি বিশ্বাস করি না। বঙ্গবন্ধুকে আমরা বাঁচাতে পারবো আমরা নিজেরা বেঁচে থেকে, মানুষের দরজায় ধাক্কা দিয়ে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় কাছে আমাদের দাবি পৌঁছে দিয়ে।"

আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ মেনে নিলাম। তিনি আমাদের উপদেষ্টা; তাঁর উপদেশ আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য। পরদিন হাইড পার্কের সভায় আমরা একত্র হই।"

বিচারপতি চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তাহানি কিংবা কোনও প্রকার ক্ষতি হলে বাঙালি জাতি কোনও দিন পাকিস্তানকে ক্ষমা তো করতে পারবে না। ক্ষমা শব্দটি বাঙালি ভুলে যাবে।' পাকিস্তানী কারাগারে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের ব্যাপারে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও চীনের নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানান।

স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে আমি ও আজিজুল হক ভূঁইয়া এবং শাখাওয়াত হোসেনসহ আঞ্চলিক কমিটিগুলির কয়েকজন নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় পাকিস্তান হাই কমিশনে অফিসার পদে নিয়োজিত লুৎফুল মতিন, ফজলুল হক চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

সভায় শেষে এক শোভাযাত্রা পিকাডিলিসহ বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণের পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর বাস ভবনে পৌঁছায়। পিটার শোর, মাইকেল বার্নস, ব্রুস্ ডগলাস-ম্যান, জন স্টোনহাউস এবং আরো কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ্-এর সরকারী দপ্তরের জনৈক অফিসারের হাতে একটি স্মারকলিপি দিয়ে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, 'শেখ মুজিব একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বিচার করার অধিকার কারও নেই। গোপন বিচার একেবারেই সভ্যতা বহির্ভূত। এই প্রহসন বন্ধকরা ও শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এটাই আমাদের আশা।'[৯]

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশ বিরোধী একটি জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে কয়েকজন পাকিস্তানী বাঙালি যোগদান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল হায়াত (মুক্তি সম্পাদক), আজহার আলী, আবদুল হামিদ এবং পাবনা জেলার আরও দু'তিনজন। বেগম আখতার সোলায়মান এই সভায় বক্তৃতা করেন। রাজাকারদের মুখপত্র 'মুক্তি' পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এ এই জনসমাবেশকে "অদ্ভুত সার্কাস" বলে অভিহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৯শে আগস্ট লন্ডন থেকে ২০/২৫ মাইল দূরবর্তী লুটন শহরে বাঙালিরা একটি জনসভার আয়োজন করে। বিচারপতি চৌধুরী জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে সভায় যোগ দিতে পারেননি। তার পক্ষ থেকে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কোনও সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। জাকারিয়া খান চৌধুরী ও আমি সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, ৫০০ থেকে ৭০০ জনের মত আমাদের সভায় হাজির হয়েছেন। তাদের ঘিরে রেখেছে এক থেকে দেড়-হাজার পাকিস্তানী। তারা বাঙালি নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করবে বলে ঘোষণা করে। দু'শ থেকে তিন'শ পুলিশম্যান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি সভাস্থলে পৌঁছানো মাত্রই একজন পুলিশ অফিসার এসে আমাকে বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠান না করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি আরও বললেন, এখানে বাঙালি ও পাকিস্তানীদের মধ্যে সংঘর্ষ হোক, আমরা তা চাই না।

আমি বললাম, আপনাদের অনুমতি নিয়েই স্থানীয় বাঙালিরা এই সভার আয়োজন করেছেন। এই সভা আজ এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। আমরা কোন আইন ভঙ্গ করছি না। এখানে কাউকে-এমন কি পাকিস্তানীদেরও আমরা আক্রমণ করবো না। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে। পাকিস্তানীদের আমরা পরামর্শ দেবো-খবরের কাগজ পড়া এবং টেলিভিশন দেখার জন্য। তা' হলেই তারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের কার্যকলাপের কথা জানতে পারবে। আমরা তাদের সৈন্যদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাবার জন্যই এখানে এসেছি। কেউই আমাদের বাঁধা দিতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সভার কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম।[১০]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৫৭।
২. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৯।
৪. ঐ।
৫. সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৬. শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০-৬১।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৬১।
৮. সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) এবং আবুল হাসান চৌধুরী।
৯. শেখ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫ এবং সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।

৩.৬ অর্থ সংগ্রহ ঃ বাংলাদেশ ফান্ড ঃ

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই বিলাতের প্রবাসীরা বিভিন্ন শহরে নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ শুরু করে। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সময়ের অভাবে বা পেশাগত কারণে সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে সমর্থ হয়নি তাঁরা (বিশেষ উল্লেখপূর্বক) সহ যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা সংগ্রাম পরিষদ পরিচালনার জন্য অর্থ দিয়ে অংশগ্রহণ করাকে তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করেছেন। তাই শুরু থেকেই সংগ্রাম পরিষদসমূহকে কোন আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিদেশে প্রচার ও সংগৃহীত অর্থ সুচারুভাবে পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে সাথে একটি কেন্দ্রীয় ফান্ড সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং উপর অর্পিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"এপ্রিল মাসে কভেন্ট্রিতে সম্মেলনের মাধ্যমে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের অব্যবহিত পরেই স্টিয়ারিং কমিটি এক সভায় 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি কেন্দ্রীয় ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভায় উক্ত ফান্ড গঠনের দু'টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ঃ

(ক) স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকল সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের সমন্বয় সাধন করা।

(খ) ফান্ডের অর্থ মুক্তিসংগ্রামের স্বার্থে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ড যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে সময়ের চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে খরচের ব্যবস্থা করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে প্রথমে হামব্রুজ ব্যাংক এবং পরে ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্যাংক 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর দু'টো একাউন্ট খোলা হয়। এই মর্মে বিলাতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রচারপত্র ও পত্রিকা মাধ্যমে অবহিত করা হয়।"[১]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ফান্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, জন স্টোনহাউস এবং ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে সদস্য নিয়োগ করে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের তিন সদস্যের মধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাঙালিদের পক্ষ থেকে বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করেন। অপর দুই সদস্যের মধ্যে জন স্টোনহাউস, একজন লেবার দলীয় প্রভাবশালী এম. পি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন এবং ইতোপূর্বে বাংলাদেশের পক্ষে পার্লামেন্টে ও বাইরে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ বৃটেনের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার অন্ ওয়ান্ট' নামে একটি এন. জিও-এর নেতৃত্বে ছিলেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতোমধ্যে ভূমিকা রেখে প্রবাসীদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। ডোনাল্ড চেসওয়ার্থের প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। তিনি প্রায় বিনা ভাড়ায় নাটিংহিল গেইটের পেমব্রিজ গার্ডেনের ভবনটি বাংলাদেশ মিশনের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ট্রাস্টের অপর সদস্য পার্লামেন্ট সদস্য জন স্টোনহাউস বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'ব্রিটিশ বাংলাদেশ ট্রাস্ট' গঠন করে অর্থ আত্মসাৎ করার কেলেংকারিতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং বৃটেন থেকে পালিয়ে যান। স্টোনহাউস মিয়ামি বীচে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন বলে খবর প্রচারিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ জীবিত গ্রেফতার করে বৃটেনে এনে বিচার করেন। একথা সত্য যে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের পক্ষে স্টোনহাউসের ভূমিকা এবং বাংলাদেশের স্ট্যাম্প প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া ফান্ড পরিচালনায় তাঁর সততা প্রশ্নাতীত ছিল। স্টোনহাউসের এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং বাংলাদেশের সম্মানিত নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। জন স্টোনহাউসের স্বাধীনতা উত্তরকালে ব্যক্তিগত কেলেংকারি ছাড়া প্রবাসীদের মধ্যে 'বাংলাদেশ ফান্ড' সম্পর্কে কোন বিরূপ সমালোচনা বা কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।[২]

মুক্তি সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালিদের অবদানের মধ্যে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁরা যে আর্থিক সাহায্য দান করেন তা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। সে সময় তাঁরা বিভিন্ন দেশে নিজেদের সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করেছেন। এছাড়া শুধু আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এ চাঁদা দান করেন ৪,০৬,৮৫৬ পাউন্ড।

'বাংলাদেশ ফান্ডে' গৃহীত চাঁদার মধ্যে বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা দান করেন শতকরা ৯৫ ভাগ। বাকী ৫ ভাগ আসে তখন যে অল্প সংখ্যক বাঙালি মধ্যপ্রাচ্য থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে।

'বাংলাদেশ ফান্ড' যে ৪,০৬,৮৫৬ পাউন্ড চাঁদা সংগৃহীত হয় উহা বিলাতের কোন কোন এলাকা এবং বাইরের কোন কোন দেশ হতে প্রেরিত হয় অডিটের হিসাব অনুযায়ী উহা নীচে দেওয়া গেলো ঃ

সারণি-৫৯

বাংলাদেশ ফান্ড (লন্ডনের এলাকা ভিত্তিক ও বহির্বিশ্বে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রেরিত) ঃ

লন্ডন ও দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা	১,৩২,০৫১ পাউণ্ড
মিডল্যাণ্ড এলাকা	১,১৬,৬১৩ পাউণ্ড
মাঞ্চেস্টার এলাকা	৪৪,৮৭১ পাউণ্ড
ইয়র্কশায়ার এলাকা	৪৪,৭৪৯ পাউণ্ড
স্টিয়ারিং কমিটির নিকট সরাসরি প্রেরিত চাঁদা	৩৩,৮০৪ পাউণ্ড
স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত চাঁদা	২,৪৯৮ পাউণ্ড
বিলাতের বাইরের প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রেরিত চাঁদা	২৪,২৭০ পাউণ্ড

অডিটেড হিসাব হতে প্রাপ্ত চাঁদাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও চাঁদার পরিমাণ নীচে দেয়া গেলো ঃ

সারণি-৬০

বাংলাদেশ ফান্ড ঃ এ্যাশন কমিটি ভিত্তিক অর্থ সংগ্রহ সংক্রান্ত তালিকা ঃ

লন্ডন ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা			
ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	চাঁদার পরিমাণ
১।	কাউন্সিল ফর দ্য পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ	58 BERWICK ST. LONDON, W.1	১৪,০৫২
২।	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি	HESSEL ST. LONDON, E.1	১১,২২৯
৩।	মৌলভীবাজার জনসেবা সমিতি	172 WARDOUR ST. LONDON, W.1	৫,১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	ISLINGTON, LONDON, N.1	৪,৫৭৫
৫।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (মতিউর রহমান)	24 WIDEGATEST, LONDON, E.1	৪,৩৭৩
৬।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	103 LEDBURY ROAD, LONDON, W.11	৩,৬৭৭
৭।	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি	5 FORDHAM ST. LONDON, E.1	২,৮১৫
৮।	স্টিয়ারিং কমিটি	11, GORING ST. LONDON	২,৪৯৮
৯।	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি	67 BRICK LANE, LONDON, E.1	১,৪৯৫
১০।	বাংলাদেশ মিশন	24 PEMBRIDGE GARDENS, LONDON, W.2	১,১২০
১১।	বাংলাদেশ যুব সংঘ	85 YORK ST. LONDON, W.1	৮০০
১২।	নর্থ এ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্ট এ্যাকশন কমিটি	33 DGMAR RD. LONDON, N.22	৭২৯
১৩।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	68 STREATHAM HIGH RD, LONDON S.W.16	২৪৩
১৪।	ওয়ালেস্টন্দ এ্যাকশন কমিটি	76 STOKE NEWINGTON RD. LONDON N.16	২৪৩
১৫।	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন	11 GLADSTONE AVE. LONDON, E.12	১৫০
১৬।	বাংলাদেশ কালচারেল এ্যাসোসিয়েশন	TOTTENHAM ST. LONDON, W.1	১৪০
১৭।	বাংলা ফ্যাসন	169 BRICK LANE, LONDON, E.1	১০০
	লন্ডনের পার্শ্ববর্তী ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা		
১৮।	লুটন এ্যাকশন কমিটি	5 DENILWORTH RD, LUTON	২০,২৬৬
১৯।	সেন্ট আলবান্স এইড কমিটি	56 STANHOPE RD.ST. ALBANS	৮,৬৮৩
২০।	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, ব্লেচলী	BLETCHLEY	৮,০৯৯
২১।	এনফিল্ড এ্যাকশন কমিটি	370 LINCOLN RD. ENFIELD	৫,৫৩৬
২২।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	58 STOKES CROFT, BRISTOL	৩,৫৬২
২৩।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	26 CHATHAM HILL, KENT	১,৫৩১
২৪।	আক্সব্রীজ এ্যাকশন কমিটি	10 MILLAVE, UXBRIDGE	৭৩৫
২৫।	বাংলাদেশ পিপল্স সোসাইটি	45 ST.PETER ST.CROYDON	১১৯
২৬।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	5 VICTORYA RD. SWINDON	১,৩৫৫
২৭।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	15 QUEENS RD, BRIGHTON	২,৩৩৫
২৮।	বাংলাদেশ সমিতি	27 FAWCETT RD, SOUTH SEA	১,৫১৬
২৯।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	125 HELEN ST.IPSWICH	২,৪১৫
৩০।	বাংলাদেশ ইমেন্স এসোসিয়েশন,লুটন	LUTON	১০৪
৩১।	বেঙ্গলী এসোসিয়েশন	74 PRINCE OF WALES RD. NORWICH	১০৪
৩২।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	18 ALEXANDER RD. BEDFORD	৩,৫৮৭
৩৩।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	60 OUTERFIELD RD, MIDDLESEX	৮৮১
৩৪।	বেঙ্গলী এসোসিয়েশন	17 HILLS RD. CAMBRIDE	২,৭০০
৩৫।	বেডফোর্ড এ্যাকশন কমিটি	98 FOSTER HILL RD. BEDFORD	৩,২৯৩
৩৬।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	SOUTH WALES	৬,১৭২
৩৭।	বাংলাদেশ সারভাইভেল কমিটি	5 DERBY RD. WEST CROYDON	৩,২০৭
৩৮।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	10 COWLEY MILL RD. MIDDLESEX	৬৯২
৩৯।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	EDETER	৪২৫
৪০।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	BOURNEMOUTH	৮৬৫
৪১।	বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন	LONDON	১,৩২৫
৪২।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	NEW PORT	২০০
৪৩।	বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ	SOUTHHALL, MIDDESEX	২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

মিডল্যাণ্ড এলাকা			
৪৪।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	93 STRATFORD RD. BIRMINGHAM	৬৫,৫৬৭
৪৫।	বাংলাদেশ রিলিফ এ্যাণ্ড এ্যাকশন কমিটি	19 MOSLEY RD. BIRMINGHAM	৯,৮৯৪
৪৬।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	40 CRESCENT, COVENTRY	৭,১০১
৪৭।	বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন	14 PARR ST.WEDNEBURY	৬,১২০
৪৮।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	72 COVENTRY ST. KIDDERMINSTER	৫,৪০২
৪৯।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	6 AVINGTON RD. LEICESTER	৫,২৫১
৫০।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	7 MAREFAIR, NORTHAMPTON	৪,৮৯৮
৫১।	বাংলাদেশ এ্যাকশন এ্যান্ড রিলিফ কমিটি	94 PARD LANE, TIPTON	৩,৮০০
৫২।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	1 MORLEY ST. LOUGHBOROUGH	৩,১০০
৫৩।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	WEDNESBURY	২,৩৬৫
৫৪।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	53 CHURCH ST. HALESOWEN	১,৮৬৬
৫৫।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	74 WYLDS LANE, WORCESTER	১,৮০৬
৫৬।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	NOTTINGHAM	১,৭৭০
৫৭।	বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন	52 WANDWORTH RD. MIDLAND	৮০০
৫৮।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	21 BRADDER ST. MANSFIELD	৪৫৯
৫৯।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	150 NEW JOHN ST. WORCESTER	৩১০
ম্যাঞ্চেস্টার এলাকা			
৬০।	ম্যাঞ্চেস্টার এ্যাকশন কমিটি	151 OXFORD RD. MANCHESTER-13	৪২,১০০
৬১।	ইস্ট বেঙ্গল এসোসিয়েশন	45 CAVENDESHPLACE NEWCASTLE-UPON-TYNE	১,৯৯৪
ইয়র্কশায়ার এলাকা			
৬২।	ব্রাডফোর্ড সংগ্রাম পরিষদ	10 CORNWALL RD. BRADFORD	১৪,৫০০
৬৩।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	6 THOMPSON RD. SHEFFIELD	৬,৭৩৬
৬৪।	বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট	10 LEICESTER GROVE, LEEDS	৬,২৯৯
৬৫।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	10 CLERK ST. SCUNTHORPE	৫,৫৬০
৬৬।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	42 VICTORIA ST. MIDDLESBOROUGH	৪,০৯৮
৬৭।	বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট	25 HOLKER ST. KEIGHLEY	৩,৪৫৫
৬৮।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	9 CORNWALL TERRACE, BRADFORD	২,৫৬০
৬৯।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	27 LISTER LANE, HALIFAX	১,৭৪৪
৭০।	সংগ্রাম পরিষদ, ক্ল্যাকহিটন	CLACKHEATON	৯০০
৭১।	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	33 ST.PEGLANE, CLACKHEATON	৮৫২
৭২।	বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ,	3 SCARBOROUGH ST. SOUTHBOROUGH	৮৩২
৭৩।	বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম কমিটি	42 VICTORIA ST. TEESIDE	৫৫০
৭৪।	মুক্তি সংগ্রাম কমিটি	45 KINGSHILL RD. HUDDERSFIELD	৫২৫
৭৫।	ব্রাডফোর্ড পপুলার ফ্রন্ট	86 UNDERCLIF ST. BRADFORD	১৪৫
৭৬।	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন	GLASGOW	২,৩০০
মধ্যপ্রাচ্য			
৭৭।	বাংলাদেশ এডুকেশন সেন্টার, কাতার	P. O. BOX 152, DOHA, QATER	৩,১০০
৭৮।	বাংলাদেশ ক্লাব, বাহরাইন	P. O. BOX 10, BAHRAIN	১,৪৯৭
৭৯।	বাংলাদেশ সমিতি আল-আইন	AL-AIN	১,৩৬৯
৮০।	আবুধাবী প্রবাসী বাঙালি	P. O. BOX 181, ABU DHABI	৬,৫৫৭
৮১।	দুবাই প্রবাসী বাঙালি	P. O. BOX 641, DUBAI	৪,৭৯১
৮২।	সৌদী আরব প্রবাসী বাঙালি	P. O. BOX 363 SAUDIARABIA	৪,০০২

Dhaka University Institutional Repository

৮৩।	লিবিয়া প্রবাসী বাঙালি	P. O. BOX 656, LIBYA	২,৩৮২
৮৪।	ওমান প্রাবাসী বাঙালি	P. O. BOX 155, MUSCAT, OMAN	১৮৪
৮৫।	পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রবাসী বাঙালি		৩৮৬

[৪]

উক্ত বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশী একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কাজী মুজিবুর রহমান, এ. সি. এ-কে অডিটর নিয়োগ করা হয়। তিনি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হাইকমিশনের) অডিট ও একাউন্টস ডিভিশনের পরিচালক এম. এ. লুৎফুল মতিনের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ ফান্ডের' একটি অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। বিলাতের প্রবাসী ও সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকলের অবগতির জন্য উক্ত রিপোর্টটি ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশ করা হয়। এখানে উলেখ্য যে, কাজী মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'ইউপিপি'র সহ-সভাপতি ছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি মানিকগঞ্জ থেকে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিলাহে------রাজেউন)। অডিট কার্যে সহযোগী লুৎফুল মতিন সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন।[৫]

এই অর্থ হতে প্রবাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমন্বয় সাধনের জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে খরচ হয় ৩৩,২১২ পাউন্ড। যুদ্ধ শেষে বিচারপতি চৌধুরী যখন দেশে ফিরে আসেন তখন 'বাংলাদেশ ফান্ড' হতে তিনি সাথে করে নিয়ে আসেন ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড এবং উহা বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা করেন। অতঃপর 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর অডিট সম্পাদনের পর সেই ফান্ডের অবশিষ্ট ২,৩০৩ পাউণ্ড লন্ডন হতে ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। **নিম্নলিখিত খাতে এই অর্থ ব্যয় হয় ঃ**

সারণি-৬১

স্টিয়ারিং কমিটির খরচ	২১,৭৮২	পাউন্ড
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মামলা খরচ	৩,২৫০	"
বিভিন্ন সংস্থাকে সাহায্য	২,২০০	"
বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ	২,১৯১	"
প্রচার অভিযান	২,৮০৮	"
মুক্তিবাহিনীর জন্য সরঞ্জাম পাঠানো	৯৬৯	"
ব্যাংক চার্জ	১২	"
	মোট ৩৩,২১২	"

[৬]

জমা ও খরচের উপরোক্ত হিসাব থেকে লক্ষণীয় যে, দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিলাতে যে পরিমাণ তৎপরতা ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার তুলনায় খরচের অংক খুবই নগণ্য। কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি ছাড়াও লন্ডনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, মহিলা পরিষদ, ডাক্তার সমিতি, গ্রিনক্রস সহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সংগঠন সক্রিয় ছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হাই হবোর্ণ ৩৫নং গ্যানেজেজ বিল্ডিংয়ে একটি অফিস পরিচালনা, ফ্যাক্ট শীট প্রকাশ, ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠান ও বহু সমাবেশ-মিছিল আয়োজনসহ বহু কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে।

এমনভাবে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আঞ্চলিক কমিটিসমূহ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও প্রচারে খরচ করেছে। এসকল খরচের অর্থ প্রতিটি কমিটি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করে প্রোগ্রাম ভিত্তিক খরচ করায় বাংলাদেশ ফান্ডে উক্ত অর্থ জমা হয়নি এবং তা উক্ত ফান্ড থেকে খরচ দেখানো হয়নি। সকল সংগ্রাম পরিষদের কি পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছিল তার হিসাব অডিট রিপোর্টে দেখানো হয়নি এবং তা জানাও সম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ফান্ডের ব্যালেন্স অর্থ দুই পর্যায়ে (প্রথম পর্যায়ে ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২,৩০৩ পাউন্ড) মোট ৩,৭৮,৮৭১ (তিন লাখ আটাত্তর হাজার আটশত একাত্তর) পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ সরকারের কাছে চেকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়।[৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে যে কয়জন ব্রিটিশ এম. পি. অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে জন স্টোনহাউস এর নাম উলেখযোগ্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জন স্টোনহাউস 'ব্রিটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে কিছু বাঙালি সম্পৃক্ত ছিলেন। 'ব্রিটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠার পর পত্র-পত্রিকায় এবং প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে একটি অপপ্রচার চালু হয় যে, 'বাংলাদেশ ফান্ড' এর অর্থ আত্মসাৎ করে জন স্টোনহাউস 'ব্রিটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট' নামে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। স্টিয়ারিং

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয় তার একজন ট্রাস্টি সদস্য ছিলেন জন স্টোনহাউস এবং সে কারণেই হয়তো উল্লেখিত অপপ্রচার হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জন স্টোনহাউসের 'ব্রিটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট'-এর সাথে 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর কোন যোগসূত্র ছিলো না। আগেও উলেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭২ সালেই 'বাংলাদেশ ফান্ডের' অডিট রিপোর্ট প্রকাশ হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে অবশিষ্ট অর্থ চেকের মাধ্যমে হস্তান্তরের পর 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে 'ব্রিটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট' এবং অন্যান্য অভিযোগে জন স্টোনহাউস অভিযুক্ত হলে বাঙালিদের মনে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে কয়েকজন বাঙালির প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ এ. পি. জেম জনসন ব্রিটিশ সলিসিটর জেনারেলের কাছে 'বাংলাদেশ ফান্ড' সম্পর্কে জানতে চান। প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে সলিসিটার জেনারেল মাননীয় এম. পি. জেম জনসনকে এক পত্রের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ফান্ড' সম্পর্কের তার কাছে চাওয়া তথ্যের বিষয় অবহিত করেন। উক্ত পত্রটি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' বইয়ে মুদ্রণ করেছেন (পৃষ্ঠা-৮৩) যা গবেষণার সুবিধার জন্য নিম্নে পুনঃমুদ্রণ করা হলো।

Royal court of Justice
London-wc 2A 2LL
Novemver, 1976

"Further to our conversation on the subject of the Bangladesh a long and searching enquiry into the affairs of the Fund, but in view of Director of Public prosecutions, no evidence has emerged which would justify a prosecution against anyone.

I have studied the position carefully and agree with the DPP.

(Signed)
Solicitor General
James Johnson Esq, M. P.
House of Commons,
London-SW 1A 0AA.

উপরোক্ত পত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে লন্ডনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের তদন্তে দেখা যায় যে, 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর তহবিল থেকে জন স্টোনহাউস বা অন্য কেউ কোন ফান্ড আত্মসাৎ করেন নাই।[৮]

এ পর্যায়ে মুক্তি সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালিদের অনন্য অবদান সম্বন্ধে মুক্তি বাহিনী ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান চিরঞ্জীব জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে লন্ডন সফর কালে জেনারেল ওসমানী প্রবাসী বাঙালিদের এক সভায় বলেছিলেন, "এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করেছিল তাঁদের পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত।"[৯]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নূরুল ইসলাম এবং জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৩. নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-১০৪৬; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড', পৃষ্ঠা-৬৭৪-৬৯৩।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১০৪৬-১০৫১; ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭৪-৬৯৩।
৫. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড', পৃষ্ঠা-৬৭৪-৬৯৩ এবং সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নূরুল ইসলাম এবং জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৬. প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪৬; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭৪-৬৯৩।
৭. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নূরুল ইসলাম এবং জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৮. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-৮৩ এবং সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নূরুল ইসলাম এবং জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৯. নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৫১।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন ঃ

মুজিবনগর সরকার বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধার জন্য কলকাতার বাইরে একটি দূতাবাস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে অবহিত করেন। বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদকে এক পত্রে লন্ডনে দূতাবাস স্থাপনের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। বৃটেনে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ক্ষমতা থাকলেও বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সরকার বেশ সহানুভূতিশীল ও নমনীয় ছিল। বিরোধী দল (শ্রমিক দল)-এর এম. পি.দের ছিল বাংলাদেশের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। এই সকল বিবেচনায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে লন্ডন-ই সব দিক থেকে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"ইতোপূর্বে স্টিয়ারিং কমিটির গোরিং স্ট্রীটের অফিসে বিচারপতি চৌধুরীসহ পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ বিলাতে আন্দোলনের সমন্বয়, প্রচার ও কূটনৈতিক যোগাযোগসহ সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে বিচারপতি চৌধুরী সাক্ষাৎ প্রদান করতে চাইলে স্টিয়ারিং কমিটির অফিস উপযুক্ত ছিল না। স্টিয়ারিং কমিটির অফিসটি মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অফিস হওয়ায় বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন বেমানান মনে হতো। এমতাবস্থায়, লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।"[১]

বিচারপতি চৌধুরী এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে মুজিবনগর সরকার থেকে অনুমতি নিয়েই ১ আগস্ট 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' আয়োজিত ট্রাফেলগার স্কোয়ারের জনসভায় লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, যখন দূতাবাস স্থাপনের জন্য উপযুক্ত এলাকায় অফিস খোঁজ করা হচ্ছিল, তখন জাকারিয়া খান চৌধুরী পশ্চিম লন্ডনের বেইজওয়াটার এলাকায় নটিংহীল গেইটের কাছে ২৪, পেমব্রীজ গার্ডেন ডোনাল্ড চেসওয়ার্থের তত্ত্বাবধানে একটি বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোর পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বিচারপতি চৌধুরীকে অবহিত করেন। ডোনাল্ড চেসওয়ার্থের নাম গবেষণাপত্রের বহু স্থানে উলেখ করা হয়েছে। তিনি 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর চেয়ারম্যান এবং বাঙালিদের একজন সাঁচ্চা সমর্থক হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। পেমব্রীজ গার্ডেনের উল্লেখিত বাড়িতে 'টক-এইচ' নামে এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের তিনি ওয়ার্ডেনের দায়িত্বে ছিলেন। ডোনাল্ড চেসওয়ার্থের কথা জানতে পেরে বিচাপতি চৌধুরী, শেখ আবদুল মান্নান ও জাকারিয়া চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে উক্ত বিল্ডিং এর নিচতলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর) দূতাবাস স্থাপনের জন্য ভাড়ায় নেয়ার প্রস্তাব দেন। ডোনাল্ড চেস্ওয়ার্থ বাংলাদেশের একজন বন্ধু ও সমর্থক হিসেবে সানন্দে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিল্ডিং এর মালিক ট্রাস্ট থেকে নামমাত্র ভাড়া ১০০ পাউন্ডে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ব্যবস্থা করে দেন। যে দেশকে কোন দেশ স্বীকৃতি দেয় নি, সেই দেশের দূতাবাস স্থাপনের জন্য বাড়ি ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ডোনাল্ড চেসওয়ার্থের সহযোগিতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য অতি সহজে একটি ঠিকানা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।[২]

স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল যে, 'বাংলাদেশ ফান্ড' থেকে দূতাবাসের জন্য কোন ব্যয় বহন করা যাবে না। তাই অফিস পাওয়া গেলেও ব্যয়ভার কিভাবে বহন করা হবে সেই বিষয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এবারেও সৌভাগ্যক্রমে দূতাবাসের প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ খরচের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। এ সময় ডাঃ মোশাররফ হোসেন জোয়ার্দারের মাধ্যমে লন্ডনে একটি হাসপাতালে ভর্তি বাঙালি বিশিষ্ট শিল্পপতি জহুরুল ইসলামের সাথে বিচারপতি চৌধুরী যোগাযোগ হয়। তিনি বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য বিচারপতি চৌধুরীর কাছে প্রস্তাব করেন। বিচারপতি চৌধুরী জহুরুল ইসলামের এই সহযোগিতা বাংলাদেশ দূতাবাসের খরচের জন্য গ্রহণ করতে রাজি হন। এরপর থেকে তিনি সুবিদ আলী ছদ্মনামে প্রতি মাসে দূতাবাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করেন এবং দূতাবাসের অর্থায়নের সমস্যার সমাধা হয়।[৩]

খন্দকার মোশাররফ হোসেন আরও বলেন ঃ

"২৭ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচাপতি চৌধুরী ২৪নং পেমব্রীজ গার্ডেনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ দূতাবাসের শুভ উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, বহির্বিশ্বে কলকাতার পর এই লন্ডনে স্থাপিত বাংলাদেশ দূতাবাসই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস। অনুষ্ঠান চলাকালে ব্রিটিশ পুলিশের একটি দল দূতাবাস ভবনের বিপরীতে রাস্তায় অবস্থান নেন। বাংলাদেশকে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম মনে করলেও বৃটেনসহ কোন দেশই (তখন পর্যন্ত) স্বীকৃতি দেয় নাই। এমতাবস্থায়, লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনকে ব্রিটিশ সরকার কিভাবে দেখবে তা নিয়ে নানান সন্দেহ ছিল। দূতাবাসের আনুষ্ঠানিকতায় ব্রিটিশ পুলিশ কোন হস্তক্ষেপ করে নি। পরের দিন পত্রিকার জানা গেল যে, পেমব্রীজ গার্ডেনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের প্রতিবাদ করে পাকিস্তান হাই কমিশন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক পত্র দেয় এবং 'পূর্ববঙ্গ' পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ দাবি করে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান হাইকমিশনের অনুরোধের বিষয় কর্ণপাত না করে বরং বাংলাদেশ দূতাবাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানী কেউ যেন কোন গন্ডগোল সৃষ্টি করতে না পারে তার নিরাপত্তার জন্য সেখানে পুলিশ প্রেরণ করেছিল।"[৪]

'দূতাবাস স্থাপনের পরপরই বিচারপতি চৌধুরী স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে পরিচালিত কার্যক্রম ভাগ করে দেন। স্টিয়ারিং কমিটির গোরিং স্ট্রীটের অফিস থেকে আগের মতোই সাংগঠনিক, সমন্বয় ও প্রচার কার্য পরিচালনা এবং পেমব্রীজ গার্ডেনের দূতাবাস কার্যালয় থেকে কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের সরকার ও দূতাবাসগুলোর সাথে যোগাযোগ সহ যাবতীয় কূটনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের মধ্যে রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ, মহিউদ্দিন আহমদ, লুৎফুল মতিন, শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম, এ. কে. নূরুল হুদা ও ফজলুল হক চৌধুরী প্রমুখ কর্মকর্তাদের নিয়ে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের শুভ যাত্রা শুরু হয়।'[৫]

'লন্ডনে দূতাবাস স্থাপনের পর বিচারপতি চৌধুরীর কাজের পরিধি ও ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দূতাবাসে এবং বিলাতে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ও স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে গোরিং স্ট্রীটের অফিসে প্রতিদিন তাঁকে বসতে হতো। তিনি দিনের প্রথম অংশ পূর্ব লন্ডনের স্টিয়ারিং কমিটি অফিসে এবং দ্বিতীয় প্রহরে পশ্চিম লন্ডনে দূতাবাস কার্যালয়ে অবস্থান করতেন। বিচারপতি চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী কূটনৈতিক এবং বিদেশী বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে দূতাবাসে এবং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বাঙালি নেতৃবৃন্দের সাথে সাধারণতঃ স্টিয়ারিং কমিটি অফিসে সাক্ষাৎ প্রদান করতেন। অনেকের ধারণা ছিল, দূতাবাস স্থাপনের পর হয়তো গোরিং স্ট্রীটের অফিসের গুরুত্ব কমে যাবে। কিন্তু কার্যতঃ তা না হয়ে উভয় অফিসের কর্মচাঞ্চল্য আরো বৃদ্ধি হয়েছিল।'[৬]

লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন শুধুমাত্র অফিস হিসেবে স্থাপিত হয় নি। এই দূতাবাস স্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং আত্মপ্রকাশের বার্তা বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়া সত্ত্বেও দূতাবাস স্থাপনে পাকিস্তানী কূটনৈতিক অনুরোধকে উপেক্ষা করে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না করে কার্যতঃ বাংলাদেশের অস্তিত্বকে 'মৌনতা সম্মতির লক্ষণ' হিসেবে মেনে নিয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। এই দূতাবাস স্থাপনের ঘটনায় কূটনৈতিক মহলে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং বাঙালিদের করেছিল উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত। বাংলাদেশ সরকার লন্ডনে দূতাবাস স্থাপনকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী বিচারপতি চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্রে লন্ডনে দূতাবাস স্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং দূতাবাসের সফলতা কামনা করেন।[৭]

২৪নং পেমব্রীজ গার্ডেনের এই ঐতিহাসিক ভবন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর দূতাবাস বর্তমান ঠিকানায় স্থানান্তর করা হলেও মুক্তিযুদ্ধ কালে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলন ও প্রবাসীদের দেশপ্রেমের প্রমাণ হিসেবে এই ভবনটি বর্তমানে বিলাতে প্রবাসী বাঙালিদের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে 'বাংলাদেশ সেন্টার' নামে সদর্পে বিদ্যমান আছে।[৮]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৭৯ এবং সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৩. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮০।
৪. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
৫. সাক্ষাৎকারে মহিউদ্দিন আহমদ।
৬. সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৭. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১।
৮. সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ নেকটাই, ব্যাজ, পতাকা ও বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশ ঃ

নেকটাই, ব্যাজ, পতাকা ইত্যাদি ঃ

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার কিছুকাল পর যুক্তরাজ্যের বাঙালিরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনসূচক ব্যাজ, নেকটাই, টি-শার্ট, বাংলাদেশের পতাকা এবং বিভিন্ন রকমের প্রতীক সম্বলিত জিনিসপত্র বিক্রি করতে শুরু করেন। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর স্টিয়ারিং কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, প্রবাসী বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য রুচিসম্মত ব্যাজ, নেকটাই, পতাকা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোনো জিনিস বাজারে ছাড়া হলে তা' না- কেনার জন্য স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়। ইতোমধ্যে বাজারে যে-সব জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল তার মধ্যে কয়েকটি ব্যাজ ও নেকটাই বিক্রি করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্য কয়েকটি ব্রাজ ও 'রেকগনাইজ বাংলাদেশ' লেখা টি-শার্ট বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় যোগদানকারী প্রবাসী বাঙালি এবং সহানুভূতি সম্পন্ন ইংরেজ বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনসূচক জিনিসপত্র অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেন। ২৭শে জুন বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত জনসভা উপলক্ষ্যে স্থানীয় এ্যকশন কমিটি সভাগৃহের এক দিকে কয়েকটি ছোট ছোট দোকান খোলেন। এই দোকানগুলিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের 'মনোগ্রাম' সম্বলিত নেকটাই, কাফলিঙ্ক ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।[১]

বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশ ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিভিন্ন বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে 'মুজিবনগর' সরকার বাংলাদেশ ডাকটিকেট প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্রিটিশ ডাকযোগাযোগ দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৎকালীন শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য জন্ স্টোনহাউসের (John Stonehouse) পরামর্শ অনুযায়ী এপ্রিল মাসের শেষদিকে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিরা 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে আন্দোলন পরিচালনা করেন। আন্দোলনের সমর্থনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গঠিত এ্যাকশন কমিটিগুলোকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ২৪ এপ্রিল ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি শহরে অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন এই কমিটির প্রধান উপদেষ্টা।

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার আগেই কয়েকজন শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনদানের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জন্ স্টোনহাউস ও ব্রুস ডগলাসম্যান (Bruce Douglasman)।

২৪ এপ্রিল (১৯৭১) 'দি টাইমস্'-এ এক সংবাদে বলা হয়, পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আগত শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য মি. ডগলাসম্যান ও মি. স্টোনহাউস সম্প্রতি কলকাতায় পৌছান। ২৩ এপ্রিল এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মি. ডগলাসম্যান বলেন, দক্ষিন ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে মার্কিন সৈন্যবাহিনী সংঘটিত অমানুষিক হত্যাকান্ডের মতো বহু ঘটনা পূর্ব বাংলায় প্রতিনিয়ত ঘটছে।

উল্লেখিত সফরকালে মি. স্টোনহাউস মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, বাংলাদেশ ডাকটিকেট প্রচলন করা হলে মুক্তাঞ্চল থেকে পাঠানো চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী মনসুর আলীও উপস্থিত ছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী মি. স্টোনহাউসকে জানান, মন্ত্রীসভা তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ডাকটিকেট প্রকাশের দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়। যথারীতি 'মুজিবনগর' সরকারের সিলমোহর সম্বলিত অনুমতিপত্রও তাঁকে দেয়া হয়।

লন্ডনে ফিরে আসার পর মি. স্টোনহাউস পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি গ্রাফিক্স শিল্পী বিমান মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের জন্য এক 'সেট' ডাকটিকেটের নকশা তৈরি করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। মি. স্টোনহাউস যখন পোস্টমাস্টার জেনারেল (ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী) ছিলেন তখন মি. মল্লিক ব্রিটিশ পোস্ট অফিসের জন্য গান্ধী স্মারক ডাকটিকেটের নকশা তৈরি করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২]

লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারকালে বিমান মল্লিক বলেন, ২৯ এপ্রিল (১৯৭১) মি. স্টোনহাউস তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ ডাকটিকেটের নকশা তৈরি করার অনুরোধ জানান। ৩ মে তিনি হাউজ অব কমন্সে গিয়ে মি. স্টোনহাউসের সঙ্গে এ সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনাকালে মি. স্টোনহাউস বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরীর নির্দেশমতো তিনি বাংলাদেশ ডাকটিকেটের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা, নকশা তৈরি ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মি. মল্লিককে দিতে চান।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নিরপরাধ বাঙালি জনসাধারণের ওপর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী মি. মল্লিকের জানা ছিল। নিপীড়িত জনসাধারণের দুর্দশার চিত্র তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি ভাবলেন, মি. স্টোনহাউসের প্রস্তাব গ্রহণ করলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধ্যমত সাহায্যদানের সুযোগ তিনি পাবেন। মি. স্টোনহাউসের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তিনি অবিলম্বে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কয়েক দিন পর মি. মল্লিক নিচে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করেন ঃ ক. দৈনন্দিন ডাক-ব্যবস্থার প্রয়োজনে বিভিন্ন মূল্যের আটটি ডাকটিকেট প্রচলন করা হবে, খ. ডাকটিকেটগুলোর মূল্য এক পাউন্ড রাখা হলে উৎসাহী ডাকটিকেট সংগ্রহকারীদের পক্ষে তা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে, গ. প্রথম দিনের খামের (First Day Cover) ওপর ৮টি ডাকটিকেটের একটি 'সেট' মানানসই হবে, ঘ. বলিষ্ঠ গ্রাফিক-চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাহিনী ও বিদ্যমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হবে, ঙ. ডাকটিকেটের ওপর অঙ্কিত প্রতিকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ প্রগতিশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, চ. ডাকটিকেটগুলোকে আকর্ষণীয় এবং বাংলাদেশের সংগ্রামের মর্মবাণী প্রচারের বাহক হিসেবে তুলনামূলকভাবে বড় আকারের ও রঙিন হতে হবে।

মি. স্টোনহাউসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে মি. মল্লিককে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা উভয়ে মি. মল্লিকের প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করে তাঁকে ডাকটিকেটের নকশা তৈরি করার দায়িত্ব দেন।

বিমল মল্লিক তখন কেন্টের ফোকস্টোন স্কুল অব আর্ট-এ প্রতি সপ্তাহে দু'দিন এবং এসেক্সের হারলো টেকনিক্যাল কলেজে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন হিসেবে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় চারশ' মাইল যাতায়াত করতে হতো। কাজেই তিনি সন্ধ্যার পর এবং সপ্তাহের শেষ দিকে নকশা তৈরির কাজ করতেন। ছ' সপ্তাহের মধ্যে তিনি নকশা তৈরির কাজ শেষ করেন। সাধারণত তিনি একাধিক বিকল্প-নকশা তৈরি করেন। ১৯৬৯ সালে গান্ধী স্মারক ডাকটিকেটের জন্য তিনি ১৭টি বিকল্প-নকশা তৈরি করেছিলেন। সময়াভাবের ফলে বাংলাদেশ ডাকটিকেটের জন্য তিনি একাধিক বিকল্প-নকশা তৈরি করতে পারেন নি। শুধু 'সাপোর্ট বাংলা দেশ' (Support Bangla Desh) লেখা ডাকটিকেটখানির একটি মাত্র বিকল্প-নকশা তৈরি করেছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী ও মি. স্টোনহাউস নকশাগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন। (পরবর্তীকালে 'বাংলা দেশ' শব্দ দুটি এক শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়)।

লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী বিমল মল্লিক বলেন, ডাকটিকেটগুলোর নকশা তৈরি করার সময় তিনি বিচারপতি চৌধুরী ও মি. স্টোনহাউসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। ডাকটিকেটে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য প্রতীক সম্পর্কে কোনো লিখিত নির্দেশ না থাকায় তিনি নিজেই গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক তিনি গ্রহণ করেন নি। শিল্পীর প্রাপ্য 'রয়ালটি' সম্পর্কে কোনো চুক্তিপত্রেও তিনি স্বাক্ষর করেন নি।

ব্রিটিশ দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর (War on Want) চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ (Donald Chesworth) প্রথম থেকেই বাংলাদেশ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তিনি ডাকটিকেগুলোর নকশা সঙ্গে নিয়ে 'মুজিবনগর' সরকারের অনুমোদনের জন্য কলকাতায় যান। কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে তিনি ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের ডাকটিকেটগুলো ছাপানোর জন্য জন স্টোনহাউস দক্ষিণ লন্ডনের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রিন্টার্স লিমিটেড-এর (Format International Security Printers Ltd.) যোগাযোগ করেন। তারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ছাপার কাজ সম্পন্ন করে। ২৬ জুলাই (১৯৭১) হাউস অব কমন্সের হারকোর্ট রুমে (Harcourt Room) অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী ঐতিহাসিক ডাকটিকেটগুলো এবং 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রদর্শন করেন।

পরদিন (২৭ জুলাই) লন্ডনের 'দি টাইমস্', 'দি গার্ডিয়ান', 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ', 'ডেইলি মিরর' ও 'দি মর্নিং স্টার'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় ডাকটিকেটগুলোর 'ফ্যাক্সিমিলি'সহ সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৪]

পরবর্তীকালে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বইতে বলেন, এই ডাকটিকেট প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। এর ফলে 'মুজিবনগর' সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, এই ধারণা বিদেশে সমর্থন লাভ করে। 'বাংলাদেশের ডাকটিকেটের একটিতে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল, অন্যটিতে ছিল ব্যালটবক্স। ব্যালটবক্স গণতন্ত্রের প্রতীক। আরেকটিতে শিকল ভাঙার ছবি। এর দ্বারা বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। একটি টিকেটে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। আরেকটি ডাকটিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তপাত দেখানো হয়েছে।'[৫]

ডাকটিকেট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পার্লামেন্টের সকল দলের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পিটার শোর (পরবর্তীকালে লর্ড শোর), জন স্টোনহাউস এবং আরো কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সমবেত পার্লামেন্ট সদস্য, সম্মানিত

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি ও সাংবাদিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। শিল্পী বিমান মল্লিক এই ডাকটিকেটগুলোতে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান।

২৯ জুলাই (১৯৭১) বাংলাদেশ ডাকটিকেট ও 'ফার্স্ট ডে কভার' বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল, ভারত, যুক্তরাজ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইসরাইল, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি কক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানকালে নতুন ডাকটিকেট ও 'ফাস্ট ডে কভার' নিলামে বিক্রয় করা হয়। আটটি ডাকটিকেট সম্বলিত প্রথম 'সেট' ও 'ফার্স্ট ডে কভার' বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী দু'শ ত্রিশ পাউন্ড দিয়ে ক্রয় করেন। দু'শ বিশ পাউন্ড দিয়ে দ্বিতীয় 'সেট' ও 'ফার্স্ট ডে কভার' ক্রয় করেন মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন বাঙালি সমর্থক। 'ফার্স্ট ডে কভার'-এর ওপর ছিল বিচারপতি চৌধুরী, জন স্টোনহাউস ও বিমান মল্লিকের 'অটোগ্রাফ'। নিলাম পরিচালনায় বিচারপতি চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী অনুষ্ঠানের শেষে মি. স্টোনহাউস জানান, ডাকটিকেট ও 'ফাস্ট ডে কভার' বিক্রয় করে কমপক্ষে এক হাজার পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছে।[৬]

যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালি নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন গাউস খান, মিনহাজউদ্দিন, শেখ আবদুল মান্নান ও আজিজুল হক ভূঁইয়া। মি. স্টোনহাউসের অনুরোধ অনুযায়ী শিল্পী বিমান মল্লিক ডাকটিকেটগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

আটটি ডাকটিকেট সম্বলিত প্রতি 'সেট'-এর মূল্য ছিল ২১ টাকা ৮০ পয়সা। তৎকালীন পাউন্ডের মূল্য ২০ টাকা হিসেবে মুদ্রায় ডাকটিকেটগুলোর মূল্য ছিল ১ পাউন্ড ৯ পেনি। আলাদাভাবে ডাকটিকেটগুলোর মূল্য এবং নকশা ও রঙের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত দশ পয়সা মূল্যের টিকেটে নীল, টকটকে লাল ও বেগুনি-লাল রঙ, খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকান্ড শীর্ষক ২০ পয়সা মূল্যের টিকেটে হলুদ, টকটকে লাল ও গাঢ় সবুজ রঙ, গ. সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জাতি শীর্ষক ৫০ পয়সার টিকেটে কমলা, হালকা বাদামি ও ধূসর রঙ, ঘ. বাংলাদেশের মানচিত্রসহ জাতীয় পতাকা সম্বলিত এক টাকার টিকেটে হলদে, টকটকে লাল ও সবুজ রঙ, ঙ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের পক্ষে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট প্রদান শীর্ষক দু'টাকার টিকেটে নীল, গাঢ় নীল ও ম্যাজেন্টা রঙ, চ. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাসহ শিকল ভাঙার চিত্র সংবলিত তিন টাকার টিকেটে সবুজ, গাঢ় সবুজ ও নীল রঙ, ছ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফটো সংবলিত পাঁচ টাকার টিকেটে সোনালিসদৃশ, কমলা, গাঢ় বাদামি ও হাফ-টোন কালো রঙ, এবং জ. বাংলাদেশকে সমর্থন করুণ শীর্ষক ১০ টাকার টিকেটে সোনালিসদৃশ, ম্যাজেন্টা ও গাঢ় নীল রঙ ব্যবহার করা হয়। ডাকটিকেটগুলোতে 'বাংলাদেশ' শব্দটি ইংরেজি ও বাংলায় দুটি পৃথক শব্দ হিসেবে লেখা হয়েছিল।

বাংলাদেশ ডাকটিকেট বিক্রয়ের জন্য 'বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সি' (Bangladesh Philatelic Agency) নামের একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ডাকটিকেট ও 'ফার্স্ট ডে কভার' বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফিলাটেলিস্টদের কাছে পৌঁছে দেয়।

২৯ জুলাই 'মুজিবনগর' সরকারও কলকাতায় ডাকটিকেট ও 'ফাস্ট ডে কভার' প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১ আগস্ট কলকাতার দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় ঃ 'প্রথম প্রকাশিত বাংলাদেশের ডাকটিকেট ও 'ফাস্ট ডে কভার' কেনার জন্য আবার (অর্থাৎ ৩০ জুলাই) শত শত ক্রেতা বাংলাদেশ মিশনের ফটকে গিয়ে ভিড় করে।'

১ আগস্ট দৈনিক 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বাংলাদেশের ডাকটিকেটগুলোর বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য সেদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন (রোববার) হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় বাংলাদেশ মিশনের ডাকটিকেট 'কাউন্টার' সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে 'মুজিবনগর' সরকার পরিচালিত 'ফিল্ড পোস্টঅফিস' থেকেও বাংলাদেশ ডাকটিকেট এবং 'ফার্স্ট ডে কভার' বিক্রয় করা হয়। একটি 'ফিল্ড পোস্টঅফিস' পাহারারত তিনজন মুক্তিযোদ্ধার ছবি পরবর্তীকালে লন্ডনের 'মর্নিংস্টার' পত্রিকায় ছাপা হয়।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আবুল হাসান মাহমুদ আলী বাংলাদেশ ডাকটিকেট এবং 'ফার্স্ট ডে কভার' যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য 'মুজিবনগর' সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক জরুরি নির্দেশ পান। ১৯৭১ সালে মি. মাহমুদ আলী নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট-জেনারেলের অফিসে ভাইস-কন্সাল পদে নিয়োজিত ছিলেন। ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। মে মাসে 'মুজিবনগর' সরকার তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করে।

সদ্য প্রকাশিত ডাকটিকেটগুলোর একটি 'সেট' নিয়ে মি. মাহমুদ আলী জাতিসংঘের সদর দপ্তরে নিয়োজিত 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর সংবাদদাতা ক্যাথলিন টেল্টসের (Ms. Kathleen Teltsch) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

ডাকনাম ছিল কিটি। মি. মাহমুদ আলী জানতেন, তাঁর দশ বছর বয়সী একটি পুত্র-সন্তান ছিল। ডাকটিকেটের 'সেট'টি তাঁর হাতে দিয়ে মি. মাহমুদ আলী বললেন, 'কিটি, স্বাধীন বাংলাদেশের এই নতুন ডাকটিকেটগুলো তোমার ছেলের জন্য এনেছি।' কিটি ডাকটিকেটগুলো দেখে খুশি হয়ে বললেন, এ সম্পর্কে প্রচারণার ব্যপারে তিনি সাহায্য করবেন। রবিবাসরীয় নিউইয়র্ক টাইমসের ডাকটিকেট বিভাগের সম্পাদককে তিনি মি. মাহমুদ আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর তিনজনে মিলে আলোচনা করে নিম্নে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঃ ১. মি. মাহমুদ আলী নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়োজিত সংবাদদাতা সিডনি শানবার্গের (Sydney Schanberg) সঙ্গে যোগাযোগ করে 'মুজিবনগর' এবং বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে নতুন ডাকটিকেট প্রকাশ সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করবেন, ২ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ ডাকটিকেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠাবেন নিউইয়র্ক টাইমসের লন্ডন সংবাদদাতা এবং ৩. সর্বশেষে ডাকটিকেট বিভাগের সম্পাদক রবিবাসরীয় সংখ্যায় বাংলাদেশ ডাকটিকেট সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

উল্লেখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগৃহীত বিভিন্ন সংবাদ এবং ডেভিড লিড্ম্যানের (David Lidman) প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট নিউইয়র্ক টাইমসের রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সংবাদপত্রের বাংলাদেশ ডাকটিকেট সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওয়াশিংটনের 'ইভিনিং স্টার' পত্রিকার সংবাদদাতা হেনরি ব্রাড্‌শ (Henry Bradshaw) প্রদত্ত সংবাদ ২৭ জুলাই প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে ৮টি ডাকটিকেটের ফ্যাক্সিমিলিও ছাপানো হয়। তাছাড়া বহুল প্রচারিত মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজউইক'-এর ৯ আগস্ট সংখ্যায় 'রিবেল স্ট্যাম্প' (Rebel Stamp) শিরোণাম দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[৭]

মি. স্টোনহাউস তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বইতে বলেন, বাংলাদেশ ডাকটিকেট এবং 'ফার্স্ট ডে কভার' গুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফিলাটেলিস্ট, সরকার ও সংবাদপত্রের দপ্তরে পৌঁছানোর ফলে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইন্টারন্যাশনাল পোস্টাল ইউনিয়নের সদর দপ্তরে পেশ করা এক অভিযোগে পাকিস্তান দাবি করে, ডাকটিকেটগুলো 'বেআইনি' বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু মুক্তাঞ্চল থেকে বাংলাদেশ ডাকটিকেট সম্বলিত চিঠি বিদেশের বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠানোর প্রমাণ হাজির করে 'মুজিবনগর' সরকার পাকিস্তানের অভিযোগ উপেক্ষা করে। বাংলাদেশের ডাকটিকেট ব্যবহার করে মুক্তাঞ্চল থেকে পাটানো বহু চিঠিপত্র বিদেশে বিলি করা হয়। আন্তর্জাতিক বিমান ডাকযোগে মি. স্টোনহাউসের নামে পাটানো ছিঠি হাউস অব কমন্সের নিজস্ব পোস্ট অফিসের সিলমোহরাঙ্কিত হয়ে হাতে পৌঁছায়।[৮]

বিজয় দিবসের ৪দিন পর (২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১) দশ পয়সা, পাঁচ টাকা ও দশ টাকা মূল্যের ডাকটিকেটগুলোর ওপর 'Bangla Desh Liberated' ও 'বাংলা দেশের মুক্তি' শব্দগুলো ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হয়।[৯]

উল্লেখিত পত্রিকার একই সংখ্যায় বলা হয়, ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ ডাকটিকেটের দ্বিতীয় সিরিজে মোট ১৫টি টিকেট বাজারে ছাড়া হয়। এই টিকেটগুলোর মূল্য ছিল যথাক্রমে ১ পয়সা, ২ পয়সা, ৩ পয়সা, ৫ পয়সা, ৭ পয়সা, ১০ পয়সা, ১৫ পয়সা, ২০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ৪০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ৭৫ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকা। বিমান মল্লিকের আঁকা প্রথম সিরিজের ৮টি ডিজাইনের তিনটি (১০ পয়সা), ২০ পয়সা ও ৫০ পয়সা) দ্বিতীয় সিরিজের ১৫ টি টিকেট ব্যবহার করা হয়। তাঁর মূল ডিজাইনগুলোতে 'বাংলা' কথাটি দুটি শব্দে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয় সিরিজের টিকেটে 'বাংলাদেশ' এক শব্দ হিসেবে দেখানো হয়। অতএব, ভিন্ন অক্ষর বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। অক্ষর বিন্যাস এবং এই অংশে রঙের ব্যবহার ছিল ত্রুটিপূর্ণ। বিমান মল্লিক বলেন, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। কেউ তাঁর অনুমতিও গ্রহণ করেন নি। তাঁর শিল্পকর্মকে এভাবে বিকৃত করার জন্য তিনি অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ণ হন।

১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ অবজারভার'-এ প্রকাশিত এক পত্রে কলকাতা থেকে এস. কে চৌধুরী ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রথম সিরিজের ডাকটিকেটগুলোর প্রশংসা করে বলেন, দ্বিতীয় সিরিজের ডাকটিকেটগুলোর ডিজাইন ত্রুটিপূর্ণ এবং রঙ নির্বাচনে সৌন্দর্যবোধের অভাব পীড়াদায়ক। তাছাড়া ইংরেজি ও বাংলা অক্ষরগুলো অবিন্যস্ত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। পত্রলেখক আরও বলেন, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ২০ পয়সা মূল্যের 'শহীদ স্মরণে' শীর্ষক ডাকটিকেটির নকশা দেখে তিনি সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছেন।[১০]

লন্ডনের 'স্ট্যাম্প কালেক্টিং' (Stamp Collecting) পত্রিকার ২৭ জুলাই (১৯৭২) সংখ্যায় ডাকটিকেট সম্পর্কিত ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখ করে বলা হয়, বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের ডাইরেক্টর-জেনারেল এ এম আহসানউল্লাহ এবং পোস্টমাস্টার জেনারেল ফরিদউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ ডাকটিকেটের দ্বিতীয় সিরিজের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, ডাকটিকেটের নকশা সম্পর্কে ঢাকায় অধিষ্ঠিত সরকারের অনুমোদন গ্রহণ না করেই ডাকটিকেটগুলো ছাপিয়ে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম ডাকটিকেট সংগ্রহকারী ও বিক্রেতা স্টানলি গিবন্‌'-এ (Stanely Gibbone) পক্ষ থেকে বলা হয়, ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত ডাকটিকেটের দ্বিতীয় সিরিজ বাংলাদেশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ডাকটিকেট হিসেবে তা মূল্যহীন।

বিতর্কিত ডাকটিকেটগুলোর প্রকাশক বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সির পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রথম সিরিজের তিনটি টিকেটের ওপর 'Bangla Desh Liberated' এবং 'বাংলা দেশের মুক্তি' ছাপানোর পর বাংলাদেশের তৎকালীন তাজউদ্দিন আহমদ ১৫টি টিকেট সংবলিত দ্বিতীয় সিরিজ ছাপানোর লিখিত অনুমতি দেন। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে তৎকালীন পোস্ট মাস্টার জেনারেল এ. আকন (A. Akon) নির্দিষ্টসংখ্যক ছাপানোর লিখিত নির্দেশ দেন। পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে টিকেটগুলো ঢাকায় সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকায় বিবিধ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মি. আকনকে সরিয়ে দিয়ে নতুন ডাইরেক্টর-জেনারেল নিয়োগ করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোনো কোনো ডাকটিকেটের নকশা সম্পর্কে দ্বিমত দেখা দেয়। বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত ডাকটিকেটটি ছিল এর মধ্যে অন্যতম। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকার জন্য নতুন নকশা গৃহীত হয়। তাছাড়া নতুন রাষ্ট্রের ডাকটিকেটে স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তীকালে আঁকা বিভিন্ন নকশা এবং জাতীয় জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মারক অথবা প্রতীক ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও আলাপ-আলোচনা অব্যাহত ছিল। এসব দ্বিতীয় সিরিজের টিকেটগুলো ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১১]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. শেখ আবদুল মান্নান, মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান, পৃষ্ঠা-১০৪।

২. 'Death of An Idealist', John Stonehouse. p.108.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৮১, ২১১।

৩. Biman Mullick won two international gold medals for the best Gandhi Centenary issued by any country in the world in 1969. He won the highest award for Fine Art in an All-India Inter-University Art Exhibition when he was studying literature at the Calcutta University. He came to London in 1960 to study at St. Martin's School of Art and has been practising in London as a graphic designer ever since.
[সূত্রঃ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮১, ২১১।]

৪. John Stonehouse, Labour M.P.told the Daily Mirror: 'They (Bangladesh stamps) are very dramatic. Most vivid than any I dealt with when I was Postmaster General. They should bring in very good revenue to Bangladesh and be of great interest to stamp collectors.
[সূত্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা-১৮২, ২১১।]

৫. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী. 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,' পৃষ্ঠা, ৯৪-৯৫।

৬. 'Amrita Bazar Patrika', Calcutta, 31 July, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৩, ২১১।

৭. 'American Response to Bangladesh Liberation War', A. M. A. Muhit, pp 395-398.

৮. 'When the stamps went round the world to philatelists, to Governments and to newspapers, they made a tremendous impact. Pakistan complained to the International Postal Union that the stamps were illegal, but we were able to demonstrate that envelopes bearing the stamps were posted inside Bangladesh. Many letters came to me by the International Mail, through India, addressed to the House of Commons, and I had the Commons Post Office date-stamp them with the official Seal. There was no disputing that evidence.'
[সূত্রঃ Death of An Idealist: A Nation is Born, John Stonehouse, p.18.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৮৫, ২১১।]

৯. Stamp Magazine, London, April 1972.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৫, ২১১।

১০. But shock came when I saw the set of fifteen stamps (1 February, 1972), using the three designs from original eight of the first set. No esthetic consideration was taken in choosing colours and it also contains typographical crudity. To detect it one does

Dhaka University Institutional Repository

not need to be an artist or a philatelist. Anyone with natural sensitivity would find that the stamps are unpleasing...

'My shock came when I saw 'Shaheed Smarane' stamp. The poor quality of design and prints, specially against the first set, is pathetic and appalling.'

[সূত্র ঃ Letter from S.K.Choudhury, of Calcutta, published in the Bangladesh Observer, Dhaka, 23 March, 1972.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৬, ২১১।]

১১. The statement continues: "The present Director-General in Dhaka has been working with a design committee on a new definitive issue that will be coming out soon. In the meantime, the Bangladesh Post Office has been using commemorative stamps printed in India.

[সূত্রঃ Stamp Collecting. London, 27 July, 1972.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৬, ২১২।]

৩.৯ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ ঃ

কাউন্সিলর ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন্ ইউ কে-র ১১ জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন একরামুল হক। তিনি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট (গাউস খান), জেনারেল সেক্রেটারি (শেখ আবদুল মান্নান), ট্রেজারার (আবদুল হামিদ) এবং অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা না করেই এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে তিনি বলেন, আমরা শীঘ্রই অস্ত্র ক্রয় করার উদ্যোগ নিচ্ছি। 'দি টাইমস্' পত্রিকার এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর ফলে 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' (পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর) সচকিত হয় এবং আমরা এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। বিচারপতি চৌধুরীকে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। তারা জানতে চেয়েছে, অস্ত্র ক্রয় করা সম্পর্কে আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিনা, না কি তা' আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র।[১]

শেখ আবদুর মান্নান স্মৃতি কথায় লিখেছেন ঃ

'অস্ত্র পাঠাবার কথা যারা প্রকাশ্যে বলেছেন, তাঁরা ভেবে দেখেননি-ভারতের অনুমতি নিয়ে, নাকি বিনা অনুমতিতে তা' পাঠানো হবে, কোথা দিয়ে কি করে পাঠানো হবে, অস্ত্র পাঠানো আদৌ প্রয়োজন কিনা। তা'ছাড়া প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় উত্থাপন করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এ কথা উৎসাহী ব্যক্তিরা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি।

'কাউন্সিলর ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ কে গঠিত হওয়ার পর গাউস খান আমাকে বলেন, ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা উচিত। আমি তাঁকে বললাম, আমাদের পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইতোমধ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে তারা নিপীড়িত শরণার্থীদের সাহায্য করবে, এটাই আমরা আশা করি। তা'ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদের শত্রু পাকিস্তান দূর্বল হবে। নিজেদের স্বার্থেই তারা আমাদের সাহায্য করবে। অতএব, তারা আমন্ত্রণ না জানানো পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো।

'পরবর্তীকালে ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হলে তিনি জানান, তাঁদের একজন অফিসার (ফার্স্ট সেক্রেটারি) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। তিনিই আমাদের জানাবেন, তাঁরা আমাদের সাহায্য করছেন কিনা এবং আমরা তাঁদের কি সাহায্য দিতে পারি। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই অফিসারের নাম ছিল আই সিং। ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের পার্শ্ববর্তী একটি রেস্তোরাঁর ওপরের তলায় আমি ও আজিজুল হক ভূঁইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে আমরা বললাম, ভারত সরকারের কাছে আমরা দাবি করি- মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমাদের অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সংগ্রামী জনগণকে আমরা সাহায্য করতে চাই। তাঁদের হাতে কিছু অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা অর্থ সংগ্রহ করছি। একই জায়গায় দু'টো বৈঠকের পর আমার নিজের ব্যস্ততার জন্য আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। আমার ধারণা হলো, আমাদের বন্ধু-দেশ প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করবে। কিন্তু তাঁরা আমাদের অস্ত্র সরবরাহের অনুমতি মঞ্জুর করবে না। আজিজুল হক ভূঁইয়াকে আমি বললাম, 'আপনি আলোচনা চালিয়ে যান। দেখুন, তাঁরা যদি কিছু অস্ত্র প্রতীক স্বরূপ পাঠাবার অনুমতি দেয়, তা'হলে লোকজনকে আমরা বলতে পারবো, আমাদের অস্ত্র যাচ্ছে।'[২]

২১ জুন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস্-হিউম বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় একঘন্টা যাবৎ আলোচনা করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের পর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অধিবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে শরণ সিং বলেন, ভারতের জন্য বৈদেশিক সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি লন্ডনে আসেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যদান স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময়ের পর শরণ সিং লন্ডনে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারপতি চৌধুরী শরণ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপা বি. পন্থ উপস্থিত ছিলেন। শরণ সিং বলেন, বিভিন্ন দেশ সফরকালে বিচারপতি চৌধুরী যদি বিপদগ্রস্থ হন, তা' হলে তিনি যেন ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা না করেন।

কথা প্রসঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভারত সরকারের অনুমতি চেয়েছেন। অনুমতি না পাওয়ার জন্য অস্ত্র পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। শরণ সিং বলেন, বিদেশ থেকে অস্ত্র না পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাচ্ছেন। তবে লন্ডন থেকে অস্ত্র পাঠাবার অনুমতি দেওয়ার আগে কয়েকটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে জন্যই অনুমতিদানে বিলম্ব হচ্ছে।

ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা অন্যান্য নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় হাই কমিশনারের বাড়িতে শরণ সিং-এর সঙ্গে অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। সদস্যরা তাঁকে ভারতের সীমানা পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। তিনি বললেন, "প্রথম কথা হলো-কত অস্ত্র আপনারা ক্রয় করতে পারবেন এবং কি পরিমাণ অর্থ আপনারা সংগ্রহ করেছেন? তা'ছাড়া অস্ত্র কার হাতে যাবে? কোন কোম্পানীর জাহাজে অস্ত্র পাঠাবেন? এ মুহূর্তে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রস্তুতি নেই। ভারত যুক্তিসঙ্গত কারণে এখনো বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি। এর চেয়েও কি ভালো হয় না-আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা যদি বিনা মূল্যে অস্ত্র সরবরাহ করি? আপনারা তো স্বাধীনতাই চান। আপনাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করুক, আর আপনারা অস্ত্র ক্রয়ের জন্য সংগৃহীত অর্থ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সরকারের জন্য জমা রাখুন।"

শরণ সিং-এর কথা যুক্তিসঙ্গত হলেও স্টিয়ারিং কমিটির অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাঁরা মনে করেন, অস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে না। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বাক-বিতন্ডা হয়েছে। পাকিস্তান হাই কমিশান অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটির তথাকথিত ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করে বিচারপতি চৌধুরীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালায় এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তথাপি উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখার ফলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এ জন্যে পরবর্তীকালে বিচারপতি চৌধুরী এবং আজিজুল হক ভূঁইয়া মাঝে-মধ্যে আফসোস করতেন।[৩]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. শেখ আব্দুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৮১।
২. ঐ, পৃষ্ঠা-৮১-৮৩।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৮১-৮৩ এবং সাক্ষাৎকারে আবুল কাশেম চৌধুরী (খালেদ) ও আনোয়ারুল হক ভূঁইয়া।

৩.১০ উদ্বুদ্ধকরণে সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা ঃ

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সমাবেশ, শোভাযাত্রা, লবিং ও সভা ইত্যাদি আয়োজনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার সুমহান লক্ষ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"এই তাগিদে সাড়া দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কিছু উৎসাহী নেতা ও কর্মী বিলাতে-প্রবাসী লেখক, কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীকে সংগঠিত করে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই সময়ে লন্ডনে উচ্চ শিক্ষার্থে অবস্থানকারী তৎকালীন ঢাকা মিউজিয়ামের পরিচালক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এনামুল হক এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হন। লন্ডন ডবিউ-সি-১ এ অবস্থিত টেভিস্টক পেসের ৫৯ নং সেমুর হাউসে মিসেস মুন্নী রহমানের বাসভবনে উক্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগে এক সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ (Bangladesh Peoples' Cultural Society) নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর কার্যালয় হিসেবে ৫৯ নং সেমুর হাউসে মিসেস মুন্নী রহমানের বাসভবনকে ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।"[১]

Dhaka University Institutional Repository

খন্দকার মোশাররফ হোসেন আরও বলেন ঃ

"বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা এবং মহিলা সমিতির নেত্রী মিসেস মুন্নী রহমান। অপরিসীম সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী বিলাতের বাঙালি মহিলাদের নেতৃত্বদানকারী সদাহাস্যময় সকলের মুন্নী আপা আজ আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। তিনি লন্ডনে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে........রাজেউন)। মিসেস মুন্নী রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ মুক্তিযুদ্ধকালে বিলাতের প্রবাসীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে এবং প্রেরণা যোগাতে এক বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সকল কর্মকান্ডের চালিকা শক্তি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর স্বামী বিশিষ্ট আইনজীবী ও তৎকালীন লন্ডনের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহান -সার্বক্ষণিক উৎসাহে মিসেস মুন্নী রহমান মুক্তিযুদ্ধ সময়ের নয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে একজন ''প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক'' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মিসেস মুন্নী রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে লন্ডনে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তিনি লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেন্টারের দায়িত্ব বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পরিচালনা করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিলাতের প্রবাসীরা তাঁদের একজন বলিষ্ঠ সংগঠককে হারিয়েছে।"[২]

৫৯ নং সেমুর হাউজের সভায় বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের পরিষদের পরিচালনার জন্য এনামুল হককে (জাতীয় যাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক) সভাপতি ও মিসেস মুন্নী রহমানকে সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত করে গঠিত ১৯ সদস্যবিশিষ্ট সংসদের অপর সদস্যরা ছিলেনঃ সহ-সভাপতি (৩ জন) শফিকুর রহমান, ফজলে লোহানী (বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব ও মরহুম) ও শহিদুল দাহার (নরথাম্পন), যুগ্ম সচিব (২ জন) মাহমুদ হাসান ও জাকিউদ্দিন আহম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক-বুলবুল মাহমুদ (বর্তমানে ব্যারিস্টার ও ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত); কোষাধ্যক্ষ-আনিস আহম্মদ (লন্ডনে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনমতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও বর্তমানে সম্পাদক); সদস্যবৃন্দ-লুলু বিলকিস বানু, জেবুন্নেসা খায়ের, আহমদ হোসেন জোয়ারদার, আবদুর রউফ (শিল্পী ও বাংলাদেশ ফিল্ম এন্ড আর্কাইভের ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ডি. এফ. পি.-এর সাবেক পরিচালক), এম. এ. রউফ (বর্তমানে লন্ডনে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট), মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম (লন্ডনে বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী), এ রাজ্জাক সৈয়দ, জিলুর রহমান খান (বর্তমানে ব্যারিস্টার ও সংসদ সদস্য) এবং ডঃ হুজ্জত আলী প্রামাণিক (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)।[৩]

১৯৭১ সালের জুন মাসে প্রচারিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের এক প্রতিবেদনে উক্ত সংসদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন, বাংলাদেশের ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতি বিদেশে প্রচার ও পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সংসদ গঠন করা হয়। এই সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী জনগণের মধ্যে মনোবল সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ এবং বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার অঙ্গীকার করে। উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণ-সংস্কৃতি সংসদ বিভিন্ন সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্যনাট্য প্রচার ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ প্রযোজিত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী আলেখ্য ''অস্ত্র হাতে তুলে নাও'' নামক নৃত্যনাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লন্ডন, মাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম সহ বিলাতের বিভিন্ন শহরে আমন্ত্রণক্রমে উক্ত নৃত্যনাট্যটি মঞ্চায়িত করা হয় এবং প্রবাসী মুক্তিকামী জনগণের প্রশংসা লাভ করে। ''অস্ত্র হাতে তুলে নাও'' নৃত্যনাট্যটি রচনা ও সুরারোপ করেন বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি এনামুল হক (ডক্টর)। আগস্ট মাসে রচিত নৃত্যনাট্যটি প্রথমে লন্ডনে মঞ্চায়িত হয় সেপ্টেম্বর মাসে। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মিসেস মুন্নী রহমান ও মিসেস ফাহমিদা হাফিজ (মঞ্জু)। নৃত্যনাট্যের কিষাণ ও কিষাণীর মুখ্য নৃত্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে এম. এ. রউফ ও মিসেস ফাহমিদা হাফিজ মঞ্জু। ''অস্ত্র হাতে তুলে নাও'' নৃত্যনাট্যটির মূল বক্তব্য জানার জন্য নিম্নোক্ত দু'টি অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

মুক্তি যদি পেতে চাও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাও
মুক্তি ফৌজে-নাম লেখাও।।
যার বুকে আছে দেশের টান
সে দিতে পারে নিজের প্রাণ
সাবাস বাংলার মজুর কৃষাণ
সাবাস বাংলার নওজোয়ান।।

সব বেদনার হবে শেষ
স্বাধীন হবে বাংলাদেশ
মুক্তি যদি পেতে চাও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও।।
এসো মজুর কিষাণ ভাই
এবার সবাই করবে লড়াই
সবার মুক্তি অবশেষে
আসবে আসবে বাংলাদেশে।।

বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ১৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে লন্ডনের রেড লায়ন স্কোয়ারে 'কনওয়ে হলে' বিলাত-প্রবাসী সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলন ও

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ এম. পি. পিটার শোর। উভয় দিনেই নৃত্যনাট্য "অস্ত্র হাতে তুলে নাও" এবং দেশের গান মঞ্চায়িত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন এবং স্থায়ীভাবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হওয়ায় উলেখিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হয়নি।[৪]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. ঐ।
৩. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২০৬।
৪. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড', পৃষ্ঠা-৬০০-৬০৯, ৬৩১-৬৩৩, ৬৬২-৬৭৩ ও ৬৯৩-এ উল্লেখিত ডঃ এনামূল হক-এর চিঠিপত্র ও বিভিন্ন প্রতিবেদন ;ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ঐ, পৃষ্ঠা-২০৬ এবং সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম.শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক, তিনি নিজেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সংগিত পরিবেশন করতেন)।

৩.১১ যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ভূমিকা ঃ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই যুক্তরাজ্য-প্রবাসী নেত্রীস্থানীয় বাঙালি মহিলারা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি- মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী পটভূমি ও বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

১৯৭১ সালে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী নেত্রীস্থানীয় বাঙালি মহিলারা দেশে ভয়ঙ্কর একটা কিছু হতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করেন। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের খবর পাওয়ার পর তাঁরা অবিলম্বে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেন। ২ এপ্রিল এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা 'বাংলাদেশ উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন ইন গ্রেট ব্রিটেন' (বাংলাদেশ মহিলা সমিতি) গঠন করেন। মিসেস জেবুন্নেসা বখ্স্ প্রতিষ্ঠানটির কনভেনার মনোনীত হন। প্রথম কয়েক মাস মিসেস সুফিয়া রহমান প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। জনসংযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মিসেস আনোয়ারা জাহান, মিসেস ফেরদৌস রহমান ও মিসেস মুন্নী রহমান।

পরবর্তীকালে জেবুন্নেসা বখ্স্ মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োজিত হন। আনোয়ারা জাহান ও খালেদাউদ্দীন যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল সেক্রেটারি এবং ট্রেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লিখেছেন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গঠিত হওয়ার পর প্রবাসী বাঙালি মহিলারা বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করতে শুরু করেন। তাঁরা স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত প্রতিটি সভায় যোগদান করেন। স্টিয়ারিং কমিটিকেও তাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁরা পোস্টার লিখেছেন, প্রচারপত্র প্রকাশ করেছেন এবং হাউস অব কমন্সে গিয়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থনদানের জন্য অনুরোধ জানান।

বিচারপতি চৌধুরী আরও বলেন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি অত্যন্ত কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা পৃথকভাবে কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। স্টিয়ারিং কমিটি ও অন্যান্য সমিতি বিভিন্ন সভায় যোগ দিয়ে লুলু বিলকিস বানু, আনোয়ারা জাহান, ফেরদৌস রহমান ও জেবুন্নেসা বখ্স্ বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের কাজে ব্যবহৃত পোস্টারগুলো লেখার ব্যাপারে তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। ফেরদৌস রহমানের বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, সবাই মিলে তৈরি করছেন পোস্টার ও বাংলাদেশের পতাকা। পল্ কনেট প্রতিষ্ঠিত 'অপারেশন ওমেগা' সম্পর্কিত কাজে মহিলা সমিতি যথেষ্ট সহায়তা করে।[২] কার্যক্রমের

নিচে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির মুক্তিযুদ্ধকালীন বিবরণ দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সংঘটিত গণ্যহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রবাসী বাঙালি মহিলারা ৩ এপ্রিল (১৯৭১) একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। প্রায় ৩০০ মহিলা এই মিছিলে যোগদান করেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জেবুন্নেসা বখ্স, আনোয়ারা জাহান, লুলু বিলকিস বানু, জেবুন্নেসা খায়ের, শেফালি হক, খালেদাউদ্দিন, পুষ্পিতা চৌধুরী ও সেলিনা মোলা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে জরুরি ৪ এপ্রিল তারবার্তা পাঠানো হয়।

মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকটি ছোট ছোট দল লন্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গিয়ে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এ সম্পর্কে একটি স্মারকলিপিও তাঁরা পেশ করেন।

বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে ১০ এপ্রিল জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করা হয়।

পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যদানকারী প্রতিষ্ঠান 'এইড পাকিস্তান কনসরটিয়াম' কে সাহায্যদান বন্ধ রাখার জন্য ১৩ এপ্রিল মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে অবেদন জানানো হয়। সেদিন লন্ডনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসেও একটি স্মারকলিপি পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তারা স্মারকলিপি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

মহিলা সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন দেশের 'ফার্স্ট লেডি'কে (রাষ্ট্রপ্রধানের সহধর্মিনী) ১৮ এপ্রিল পাঠানো তারবার্তার বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নারী-হত্যা ও ধর্ষণ এবং শিশু হত্যা বন্ধ করার ব্যাপারে ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে মহিলা সমিতির সদস্যারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে এম. পি.দের 'লবি' করেন। ঘন্টার পর ঘন্টা মহিলারা পার্লামেন্ট ভবনের দোরগোড়ায় আপেক্ষা করে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার এম. পি.দের চিরকুট পাঠিয়ে দেখা করেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতার কাহিনী বর্ণনা করে তাঁরা দুস্থ মানবতার প্রতি এম. পিদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া দেন। সবাই মন দিয়ে তাঁদের কথা শুনেছেন। কেউ হয়তো দুঃখ প্রকাশ করেছেন; কেউ-বা বলেছেন, তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব তা তিনি করেন।

মহিলা সমিতির সদস্যারা বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে পার্লামেন্টে আলোচনা, স্বাধীন বাংলাদেশকে ব্রিটিশ সরকারের স্বীকৃতিদান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এম. পিদের কাছে দাবি জানান। 'লবি'তে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারা জাহান, কুলসুমউল্লা, জেবুন্নেসা খায়ের, বেলা ইসলাম, বদরুন্নেসা পাশা (বার্মিংহাম) ও মিসেস শরফুল ইসলাম।

আসন্ন 'সিয়াটো'র অধিবেশন উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক বৈঠক অনুষ্ঠানকালে মহিলা সমিতির কয়েকজন সদস্য প্লাকার্ড হাতে নিয়ে ডাউনিং স্ট্রিটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্লাকার্ডে লেখা শোগানগুলোর মধ্যে ছিল: 'পাকিস্তানকে 'সিয়াটো' থেকে বহিষ্কার কর,' 'রক্তই যদি স্বাধীনতার মূল্য হবে তবে বাংলাদেশ অনেক দিয়েছে' এবং 'বাংলাদেশ আরেক মাইলাই।' বিক্ষোভ শেষে মহিলারা একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ব্রিটিশ ত্রাণকারী প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার অন্ ওয়ান্ট'-এর (War on Want) মাধ্যমে ৭ মে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের জন্য প্রায় এক টন ওজনের পুরাতন কাপড়-চোপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড শহরে ২২ মে তারিখে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির একটি শাখা অফিস খোলা হয়। পরে গ্লাসগো, সাউদাম্পটন ও ম্যাঞ্চেস্টারসহ মোট ৮টি শহরে শাখা খোলো হয়।

মহিলা সমিতির উদ্যোগে প্রায় তিনশ' বাঙালি মহিলা ৪ জুন লন্ডনের সেন্ট জেমস পার্কে সমবেত হয়ে মিছিল সহকারে 'সেইভ দি চিলড্রেনস ফান্ড', 'রেডক্রস' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান এইড'-এর অফিস হয়ে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যান। মহিলাদের কেউ কেউ নিজ নিজ শিশু-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে মিছিলে যোগদান করেন। বিভিন্ন প্লাকার্ড ও শ্লোগানের মাধ্যমে তাঁরা বাংলাদেশের ভেতরে এবং ভারতের শরণার্থী শিবিরে অসুস্থ ও অভূক্ত শিশুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধিকতর সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ জানান। পরদিন লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের কথা প্রকাশিত হয়। সাহায্যদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও ভারতের শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত শিশুদের জন্য ওষুধ, খাবার ও অর্থসাহায্য পাঠাবার খবর প্রচার করে।

পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ১৬ জুন মহিলা সমিতির সদস্যরা 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাকিস্তানকে সাহায্য দান বন্ধ করার দাবি সম্পর্কিত সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচী পালন উপলক্ষ্যে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

প্যারিতে অনুষ্ঠিত 'এইড পাকিস্তান কনসরটিয়াম'-এর বৈঠক চলাকালে বিক্ষোভে যোগদানের জন্য মহিলা সমিতির একজন প্রতিনিধিকে ১৮ জুন ফরাসি দেশে পাঠানো হয়।

মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল ২১ জুন লন্ডনে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থন এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্যদানের আবেদন জানিয়ে ২৪ জুন মহিলা সমিতি ব্রিটেনের ছ'শর বেশি ছাত্র ইউনিয়নের কাছে চিঠি পাঠায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৫ ও ২৬ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লন্ডনস্থ দূতাবাসের সামনে মহিলা সমিতির বিশিষ্ট সদস্যা মিসেস রাজিয়া চৌধুরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আবদুল হাই খানসহ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে অনশন পালন করেন।

জুলাই মাসে 'মুজিবনগর' সরকারের একজন প্রতিনিধি লন্ডনে আসেন। তাঁর কাছে অভাব-অনটনের কথা শোনার পর মহিলা সমিতি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দু'শ পাউন্ড দিয়েছেন বলে জেবুন্নেসা বখ্স্ 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ' বইটির লেখককে বলেন বলে আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন।[৩]

মহিলা সমিতি বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে ৬ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চারশ' শার্ট ও ট্রাউজারস পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

মহিলা সমিতি মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৭ আগস্ট কনওয়ে হলে একটি 'মীনাবাজার'-এর আয়োজন করে। সেখানে মেয়েদের নিজ হাতে রান্নাকরা খাবার ও হাতের কাজ বিক্রি এবং মহিলা-কিশোরদের গান-বাজনার আসর করে ৭০০ পাউন্ড সংগৃহীত হয়।

মহিলা সমিতির সদস্যরা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী শিশুদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ২১ আগস্ট একটি 'জাম্বল সেইল' (পাঁচমিশালি জিনিসপত্র সস্তা দরে বিক্রি) আয়োজন করে।

মহিলা সমিতি বাংলাদেশ আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেজওয়াটার এলাকায় ৫ সেপ্টেম্বর একটি সিনেমা হলে 'চ্যারিটি শো'র আয়োজন করেন। এই উপলক্ষ্যে মহিলারা নিজ হাতে তৈরি খাবার বিক্রি করে সংগ্রহ করেন।

মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা ৬ ও ১৩ অক্টোবর যথাক্রমে শ্রমিক ও টোরি দলের বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে অধিকতর সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য উভয় দলের সদস্যদের, বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাংলাদেশ সোসাইটি গঠনের ব্যাপারে মহিলা সমিতি ১১ অক্টোবর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাঙালি ছাত্রদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে। এই প্রচেষ্টায় অধ্যাপক আবুল খায়ের, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, জেবুন্নেসা খায়ের, লুলু বিলকিস বানু ও আনোয়ারা জাহান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

মহিলা সমিতি ২৪ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেলের কাছে বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তানী ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুটপাট সম্পর্কিত চিঠি এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশিত প্রতিবেদনের 'কাটিং' পাঠায়। বাংলাদেশ থেকে ইয়াহিয়া খানের দখলকারী সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ও জাতিসংঘের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এসব চিঠি ও প্রতিবেদনের 'কাটিং' পাঠানো হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানানোর উদ্দেশ্যে মহিলা সমিতির উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর হাইড পার্কের 'স্পিকার্স কর্নার'-এর কাছে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পর একটি মিছিল বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানায়।

বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহিলা সমিতি বিভিন্ন সময়ে মেলা, সিনেমা শো, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতীক সম্বলিত নেকটাই, ব্যাজ ক্যালেন্ডার ইত্যাদি বিক্রির ব্যাপারে শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং অল্পবয়সী সদস্যরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

মহিলা সমিতির তহবিল থেকে 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'কে এক হাজার পাউন্ড মূল্যের ডাক্তারি সরঞ্জাম কিনে দেয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সদ্য স্থাপিত শিশু হাসপাতালের আসবাবপত্র, ঘড়ি এবং খেলনা ইত্যাদি কেনার জন্য ১,৪৫০ পাউন্ড অনুদান হিসেবে দেয়া হয়।[৪]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. মিসেস আনোয়ারা জাহান ১৯৬৭ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডনে আসেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন এবং ক্রয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটেনের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'কমিশন ফর রেসিয়াল ইক্যুয়ালিটি'র সদস্য ছিলেন। বহিরাগত এশিয়ান, আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান মহিলাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা কমিশনার। তাছাড়া লন্ডনের বাঙালিদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম সমাজকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 'জাস্টিস অব পিস' পদে নিয়োজিত হন। লন্ডনের একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং পরে সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে দীর্ঘকাল কর্মরত থেকে ১৯৯৫ সালে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর গ্রহণ করেন।

২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা- ৮৮-১৪৭ এবং সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম।

৩. আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ঐ, পৃষ্ঠা-৮৮-১৪৭; 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃষ্ঠা-৪৯-৫৩-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬৬-১৬৮; 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' (বিভিন্ন সংখ্যা); মিসেস আনোয়ারা জাহানের 'গ্রেট ব্রিটেনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি: ইতিহাস ও কার্যক্রম' শীর্ষক নিবন্ধ, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৭ এবং সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

৩.১২ যুক্তরাজ্যস্থ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তৎপরতা ঃ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্নারে ছাত্র গণসমাবেশ ও শোভাযাত্রা শেষে পাকিস্তান স্টুডেন্টস হোস্টেলে অনুষ্ঠিত বাঙালি ছাত্রদের এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি' গঠিত হয়। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়সহ এ গবেষণাপত্রের বিভিন্ন অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট-তে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"৭ মার্চ হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্নারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনে জাতীয়তাবাদী গ্রুপের ছাত্র নেতা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। সভায় সর্বসম্মতভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছিলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর), নজরুল ইসলাম, এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, সুলতান মাহমুদ শরীফ, শফিউদ্দিন মাহমুদ বুলবুল, এ. ইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি), জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, লুৎফর রহমান সাহজাহান, আখতার ইমাম ও কামরুল ইসলাম।"[১]

বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণার পর "বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি" এর নাম পরিবর্তন করে "যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" বা "বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি ইন ইউকে" রাখা হয় এবং কমিটিকে সম্প্রসারিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রচারণা ও জনমত সৃষ্টির কাজে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিটির কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য তিন জন আহবায়ক নিযুক্ত হন। যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন মোহম্মদ হোসেন মঞ্জু, খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর) এবং নজরুল ইসলাম। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে ১২ এপ্রিল তারিখে মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু ও সুলতান মাহমুদ শরীফ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ এবং মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগে স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা গমন করেন। মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুর অনুপস্থিতিতে খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর)-এর উপর বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সকল কর্মকান্ড পরিচালনায় দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপর আহবায়ক (৩) নজরুল ইসলাম ৩৫ নং হোবর্নে গ্যামেজেজ বিল্ডিং-এ তাঁর নিজস্ব অফিসটিকে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস হিসাবে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময়ে উপরোক্ত অফিস থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের সপক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছে যার বিবরণ গবেষণা পত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্ব ও কর্মকান্ড সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের তৎকালীন বৈদেশিক প্রতিনিধি, স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর তাঁর 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' গ্রন্থে এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল মতিন তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি' বইয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[২]

৭ মার্চে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে আবেদন এবং মেমোরেন্ডাম প্রদান শুরু করে। মার্চ মাসে "Mass killing in East Bengal'' An appeal in the name of humanity" এবং "An appeal to the British Journalists" শিরোণামে কয়েকটি মেমোরেণ্ডাম প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে সকল অসংখ্য আবেদন ও মেমোরেণ্ডাম প্রকাশ ও প্রচার করা হয় তার মধ্যেঃ (১) ৭ এপ্রিল প্রেরিত "An appeal to the members of British Parliament, (২) ১২ মে প্রদত্ত "An appeal to the conscience of the Parliament" (৩) ১৩ মে প্রেরিত "One more appeal to the mother of Parliament" (৪) ১৯ জুলাই প্রদত্ত "Appeal to the members of the American Bar Association" আবেদন সমূহ বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বজনমতকে আকৃষ্ট করেছে। বৃটেনের পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সফরের বিরোধিতা করে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ২৩ এপ্রিল প্রেস কনফারেন্স, ২২ জুলাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী এবং

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান কর্তৃক প্রচারিত হোয়াইট পেপারের প্রতিবাদ করে ৭ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বিশেষভাবে উলেখযোগ্য করা যায়।[৩]

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পূর্ণ সময়ে ইস্যু ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা, ব্রিটিশ এম. পি. এবং বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তথ্যমূলক বিবরণী "ফ্যাক্ট সীট" প্রকাশ করে। উক্ত সময়ে মোট ২০ টি ফ্যাক্ট সীট প্রকাশিত হয়। প্রথম ফ্যাক্ট সীট (Fact sheet -1) প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭১ এবং সর্বশেষ ফ্যাক্টসীট প্রকাশিত হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। এ ছাড়া ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচারের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (১) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের ঘোষণা "Peoples Republic of Bangladesh: (2) Conflict in East Pakistan: Background & Prospect: (3) The murder of a people: (4) Why Bangladesh এবং (5) Six months of Liberation struggle নামে পাঁচটি পুস্তিকা প্রকাশ করে উপরোক্ত পুস্তি কাগুলো বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে বিশেষ করে ব্রিটিশ এম. পি. সুধী ও সাংবাদিকদের বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সমর্থন সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রেখেছে।[৪]

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ৪টি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। ২৩ মার্চে 'দি টাইমস্' পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন সম্বলিত অপর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। লন্ডনে অনুষ্ঠিত আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগদানকারী আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় অর্দ্ধপৃষ্ঠা ব্যাপী "An open letter to the Delegates of the American Ban Association from the people of Bangladesh" শিরোণামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ১৬ আগস্ট 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবর রহমানের গোপন বিচারের প্রতি বিশ্ববিবেককে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ "Wake up world: Please act immediately to stop camera trial" শিরোণামে অপর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। এছাড়া, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বৃটেনে অসংখ্য লিফলেট ও পোষ্টার প্রকাশ করে।[৫]

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উপরোক্ত প্রচার প্রচারণা ছাড়াও অনশন ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ, লবিং, বিভিন্ন সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ, বৃটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কর্মসূচী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে।

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের পক্ষে বিলাতে কর্মকান্ড পরিচালনায় যে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বোরোচিত আচরণকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের সামনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি) এবং আফরোজ আফগান চৌধুরী অনশন ধর্মঘট (২৮ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ) পালন করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্বলিত স্মারকলিপি ও প্রচারপত্র মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে প্রদান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মার্কিন দূতাবাসের সামনে অনশন ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করে। অনশনে অংশ গ্রহণ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আবদুল হাই ও রিজিয়া চৌধুরী।[৬]

বৃটেন ও ইউরোপ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিভিন্ন সম্মেলনে লবিং, প্রচারপত্র ও বুকলেট বিতরণ ইত্যাদি কার্য পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে' বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ও জনমত পত্রিকার সম্পাদক এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করা হয়। রুমানিয়ায় অনুষ্ঠিত 'বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি' সম্পর্কিত 'পাগওয়াশ' সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক (১) এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সম্মেলনে ৭০টি দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি প্রচারণা লবিং এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর), এ. কে. নজরুল ইসলাম এবং এ. এইচ. প্রামাণিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যোগদান করে। স্থানীয় বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা, লবিং এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। হল্যান্ডে গঠিত 'ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ' এর আমন্ত্রণে খন্দকার

Dhaka University Institutional Repository

মোশাররফ হোসেন (ডক্টর) ও এ. কে. নজরুল ইসলাম হল্যান্ড ও বেলজিয়াম সফর করে বিভিন্ন সভা ও প্রেস কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি ও শরণার্থী শিবিরের অবস্থা সরজমিনে দেখার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক (১) এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং সুলতান মাহমুদ শরিফ কলকাতা সফরে যান। বৃটেনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে লন্ডন এবং বিভিন্ন শহরের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার জন্য সেই সব সম্মেলনের যোগদান করেন। ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে, স্কারবরা শহরে অনুষ্ঠিত লিবারেল পার্টির সম্মেলনে এবং লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ সোসালিষ্ট ইয়থস্'-এর সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।[৭]

এছাড়াও বৃটিশ এ. পিদের সাথে দেন-দরবার (লবিং), বৃটিশ এম. পি.দেরকে বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয় রাখার ব্যাপারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বিলাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রচার কার্য পরিচালনায় ছাত্র সমিতি গঠন করে ব্রিটেনে পাঠরত বাঙালি ছাত্ররা অবদান রাখে। খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর)-এর উদ্যোগে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি গঠন ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন (ULU) বিল্ডিং এ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ ষ্টল' স্থাপন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে ছাত্র-জনমত সৃষ্টিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির প্রথম সভাপতি হিসেবে খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নূরুল আবসার দায়িত্ব পালন করে। খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডক্টর)-এর অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন খলিফা এ. মালিক। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কিছু বৃটিশ যুব-কর্মীকে সংগঠিত করে 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' এবং কিছু সংস্কৃতিমনা বাঙালিদের সংগঠিত করে 'বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ' গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

উপরোক্ত কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালনা করা যাঁদের অক্লান্ত ও আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলের নাম স্মরণেও নেই এবং উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। তবুও যাঁদের নাম উল্লেখ করতেই হয় তাঁরা হলেনঃ এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, এ. কে. নজরুল ইসলাম, এ. টি. এম ওয়ালী আশরাফ, সুলতান আহমুদ শরীফ, এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি), শফিউদ্দিন মাহমুদ বুলবুল, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, লুৎফর রহমান শাহজাহান, আফরোজ আফগান চৌধুরী, এম. ইয়াহিয়া, মাহমুদ আবদুর রউফ, শ্যামা প্রসাদ ঘোষ, আনিস আহম্মদ, আখতার ইমাম, এ. কে. এম. সামসুল আলম, এম. মজিবুল হক, ফজলে রাব্বি খান, নজরুল আলম, মমতাজ উদ্দিন, রাজিয়া চৌধুরী, এম. আই চৌধুরী, জাকিউদ্দিন আহম্মদ, আবদুস সামাদ (বাংলাদেশ), সামসুল আবেদীন, রফিকুল ইসলাম মিয়া, আবদুলাহ ফারুক, সৈয়দ মোজাম্মেল আলী, মোঃ আবুল হাশেম, আমিনুল হক, খলিফা এ. মালিক, সৈয়দ মোজাম্মেল আলী, মোঃ আবুল হাশেম, এম. নূরুল আবছার, এম. এম. মুস্তাফিজুর রহমান, রফিকুল হক ভুইয়া, আহম্মদ হোসেন জোয়ারদার, আখতার ফেরদৌস লাকী, সৈয়দ মোকররম আলী, বেগম আজিজা এমাদ, রাবেয়া ভুইয়া, সুরাইয়া খানম, এ. এম. চৌধুরী মঞ্জু, সৈয়দ ফজলে এলাহী এবং সৈয়দ সফিউলা প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ।[৮]

বিলাতে প্রথম জাতীয় ছাত্র সম্মেলন ঃ

সংগ্রাম পরিষদ সমূহের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লন্ডনে একটি জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঞ্চলিক প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত মতানৈক্যের কারণে সংগ্রাম পরিষদ সমূহের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে ছাত্ররা অন্যান্য সংগ্রাম কমিটির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় বিলাতে আন্দোলন সংগঠন, সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লন্ডন এস ডব্লিউ-৪ এর ক্লাপহাম কমনস্থ (সাউসাইড) হেনরী থরন্টন স্কুল মিলনায়তনে ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবরে উক্ত ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"উক্ত জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। আমাকে এই কমিটির আহবায়ক এবং এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ (বাংলাদেশ পার্লামেন্ট সাবেক এম. পি.), এম. আলতাফ হোসেন (বার-এট-ল), এ. রেজা খান (বার-এট-ল), ড. হুজ্জত আলী প্রামাণিক (বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক) এবং মাজেদ সওদাগর (বর্তমান লন্ডনে ব্যবসায়ী) প্রমুখকে সদস্য মনোনীত করা হয়। ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। লারকুলা লিমিটেড স্মরণিকাটি মুদ্রণের কাজ সম্পাদন করে। স্মরণিকায় বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতায় উদ্ধৃতি, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বাণী, পররাষ্ট্র ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদের বাণী ও মুক্তিযুদ্ধের সার্বাধিনায়ক

Dhaka University Institutional Repository

কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানীর বাণী ছাপানো হয়। মুজিবনগর থেকে প্রেরিত বানীতে দেশেকে মুক্ত করার দৃপ্ত অঙ্গীকার, মুক্তিযুদ্ধকালে বিলাতে প্রবাসী বাঙালি ছাত্রদের ভূমিকার প্রশংসা ও সম্মেলনের সফলতা কামনা করা হয়। ইংরেজীতে মুদ্রিত এই স্মরণিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বক্তৃতার মধ্যে থেকে "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম......" অংশটি, উদ্ধৃতি হিসেবে স্থান পায়। এ ছাড়া মার্চ মাস থেকে শুরু করে তৎপরতা, বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রেরণ, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন স্মরণিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্মরণিকা "আমাদের সংগ্রাম" (Our Struggle) শিরোণামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করা হয়।"

ডঃ মোশাররফ আরও বলেন ঃ

"বাঙালি ছাত্রদের এই প্রথম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক বিশেষ প্রতিনিধি ও স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। একদিনের এই সম্মেলনকে ৫টি অধিবেশনে বিভক্ত করা হয়। শুধুমাত্র বাঙালি ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১১ টায়। এই অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গৃহীত কর্মসূচী, সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য তৎপরতা ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা করা হয়। দুপুর ২ টায় মধ্যাহ্ন ভোজের পর শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে আগত প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর উদ্বোধনী ভাষণের পর নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের মধ্যে রাখেন পূর্ব লন্ডনের স্ট্রেপনি থেকে নির্বাচিত ব্রিটিশ এম. পি. পিটার শোর, ইয়ং লিবারেল পার্টির চেয়ারম্যান পিটার হেইন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ফিলিপ ক্লার্ক, ফ্রান্স ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং বিলাতে অবস্থানরত বাংলাদেশের তৎকালীন এম. এন. এ সৈয়দ আবদুস সুলতান। কমিটির আহবায়ক হিসেবে আমার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়।"[৯]

চা বিরতির পর বিকাল ৪-৩০ মিনিটে সকলের জন্য উন্মুক্ত তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রহমান সোবহান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন রিডার), অর্থনীতিবিদ ডঃ আজিজুর রহমান খান এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার প্রতিবেদক মার্টিন এডমি। আলোচনা সভায় বক্তাগণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে বাংলাদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গত উলেখযোগ্য যে, ইতোপূর্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অবাস্তব বলে পাকিস্তান সরকার অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। এই সকল অপপ্রচারের উপযুক্ত প্রতিউত্তর হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ আলোচনা সভায় গুরুত্ব লাভ করেছিল। সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ "অস্ত্র হাতে তুলে নাও" শীর্ষক নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। উক্ত নৃত্যনাট্যটি রচনা ও পরিকল্পনা করেন ডঃ এনামুল হক (জাতীয় মিউজিয়ামের সাবেক মহাপরিচালক) এবং পরিচালনা করেন গণসংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস মুন্নী রহমান ও নৃত্য শিল্পী মিসেস ফাহমিদা হাফিজ মঞ্জু। পঞ্চম অধিবেশনে শুধুমাত্র বাঙালি ছাত্রদের উপস্থিতিতে বিলাতে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০]

সারাদিনব্যাপী সম্মেলনে ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়; যার উল্লেখযোগ্য অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ (১) বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সম্মেলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে পুনরায় স্বাগত জানায় এবং মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত যে কোন ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। (২) সম্মেলন বিশ্ব জনমতকে জানিয়ে দিতে চায় যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক সমাধান বাঙালিরা মেনে নেবে না। (৩) সম্মেলন পাকিস্তান জান্তার হাতে বন্দী বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে এবং তাঁদের উপর যাতে কোন নির্যাতন না হয় তার নিশ্চয়তা দানের জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সরকারে কাছে আহবান জানায়। (৪) সম্মেলন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানায়। (৫) ছাত্র সম্মেলন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জনগণের সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জন্য অভিনন্দন জানায় এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য কামনা করে। (৬) লন্ডনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তিম অভিবাদন জানায় এবং তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করে। (৭) সম্মেলন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের ভারতে আশ্রয়দান এবং সাহায্য প্রদানের জন্য ভারতের জনগণ ও সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। (৮) সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের দেশের অভ্যন্তরে এবং প্রবাসে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় এবং তাদের যে কোন ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার আহবান জানানো হয়। (৯) বৃটেনে বাঙালি ছাত্রদের বিভিন্ন সাহায্য প্রদান এবং বাংলাদেশের ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য সম্মেলন বিলাতের জনগণ ও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিলাতে বাংলাদেশের ছাত্রদের এই প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে যে সকল ব্যক্তি ও সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, বিলাতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন, স্টিয়ারিং কমিটি, লিংক ফোরাম, শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ, লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'জনমত' এবং বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের নাম উলেখযোগ্য।

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৬৫-৬৬ এবং সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড', পৃষ্ঠা-(১-২২২) ও (৫১৭-৬৯৩)।
৫. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৬৬-৬৭।
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭ এবং সাক্ষাৎকারে এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু।
৮. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) এবং এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু; স্মৃতিচারণ আনিস আহমেদ, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-১৮৫-১৮৭।
৯. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
১০. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-২০২-২০৩।
১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৪।

৩.১৩ যুক্তরাজ্যস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা ঃ

এ প্রসঙ্গে গবেষণাপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে; তথাপি এ অধ্যায়ে যুক্তরাজ্যস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যায়।

১০ ই এপ্রিল লন্ডনের অল্ডউইচ্ এলাকায় অবস্থিত বুশ্ হাউসে বি বি সি'র বৈদেশিক সার্ভিসের বাংলা বিভাগ বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার প্রচার করে। সিরাজুর রহমান ও শ্যামল লোধ এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারের পর তিনি বুশ হাউস থেকে বেরিয়ে আসার সময় তৎকালীন পাকিস্তানী দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মহিউদ্দিন তাঁকে বলেন, "স্যার, আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি। আপনারা ডাকলেই আমাকে পাবেন।" লন্ডনে তখনও প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক অফিস স্থাপিত হয়নি বলে বিচারপতি তাঁকে হাই কমিশন থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা সেই মুহূর্তে বলেননি।

এ প্রসঙ্গে শেখ আবদুল মান্নান তাঁর স্মৃতি কথায় বলেন ঃ

'মহিউদ্দিন আহমদ স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। পাকিস্তান দূতাবাসের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে-এ ধরণের কোনও প্রতিশ্রুতি আমরা তাঁকে দিইনি। আমরা তাঁকে শুধু বলেছি, গোপনীয়তা রক্ষা করুন। পাকিস্তান হাই কমিশানে আপনার থাকার প্রয়োজন আছে। আপনি উতলা হবেন না; দেশের জন্য কাজ করে যান। সে জন্যই আপনাকে আপাততঃ ওখানে থাকতে হবে। দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে মহিউদ্দিন অজানা পথে পা বাড়াবার জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে পথ অজানা ছিল না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল তাঁর মানসপটে। ৭ ই মার্চের ঘোষণা তাঁর দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করেছে।

'১লা আগস্ট এ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিচারপতি চৌধুরীর বক্তৃতার পর অপ্রত্যাশিতভাবে মহিউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের জন্য কাজ করবেন বলে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমি একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে চাই।" তিনি আরও বলেন, পূর্ব বঙ্গে গণহত্যা হয়নি বলে পাকিস্তান সরকার যে প্রচারণা চালাচ্ছে, তা' মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের সভায় যোগদানের জন্য রওয়ানা হওয়ার আগে বিচারপতি চৌধুরী মহিউদ্দিন আহমদের টেলিফোন "কল" পান। মহিউদ্দিন তাঁকে বলেন, তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত। বিচারপতি তাঁকে সপরিবারে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য বলেন। সেখান থেকে তাঁরা দু'জনে সরাসরি ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে যান। পরদিন 'দি টাইমস্' ও 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত পত্রিকায়

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সরকারকে উপেক্ষা করে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মহিউদ্দিনের বক্তৃতাদানের ছবি প্রকাশিত হয়। ভারতের বাইরে নিয়োজিত বাঙালি কূটনৈতিক অফিসারদের মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদ সর্বপ্রথম পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।'[১]

এ প্রসঙ্গে ইরাকে নিয়োজিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ-এর কথা এসে যায়।

২১ আগষ্ট (শনিবার) সকালবেলা ইরাকে নিয়োজিত পাকিস্তানী। রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ টেলিফোনযোগে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি ইরাক থেকে গোপনে লন্ডনে চলে এসেছেন। এখান থেকে তিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে জানান।

শেখ আবদুল মান্নান তাঁর স্মৃতি কথায় বলেন ঃ

'সেদিন বিকেলবেলা স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. ফতেহ্ বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ত্যাগ করার দিন তিনি দূতাবাস থেকে বেরিয়ে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে দূতাবাসের একাউন্ট থেকে পঁচিশ হাজার পাউন্ড তুলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় সেই অর্থ "মুজিবনগর" সরকারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর সপরিবারে ট্যাক্সিযোগে ছ'শ মাইল পাড়ি দিয়ে কুয়েত থেকে বিমানযোগে লন্ডনের পথে রওয়ানা হন। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ২০ জন বাঙালী কূটনৈতিক অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে মি. ফতেহ্ সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন।

'বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথা 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি'তে লিখেছেন, কিছুকাল পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে তাঁকে বলা হয়, পাকিস্তান হাই কমিশান মি. ফতেহ-র বিরুদ্ধে এক অভিযোগ পেশ করেছে। ইরাকের ব্যাংক থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্থ তুলে নিয়ে আসার অভিযোগে মি. ফতেহ্-কে পাকিস্তান সরকারের হস্তে অর্পণ করার সরাসরি অনুরোধ আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পররাষ্ট্র দপ্তর আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মিঃ ফতেহ্ বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য 'মুজিবনগর' যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। পাকিস্তান সরকারের মতলব টের পাওয়ার পর অবিলম্বে তাঁর 'মুজিবনগর'-এ চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয়।'[২]

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন রেজাউল করিম ছিলেন লন্ডনস্থ পাকিস্তানী দূতাবাসে নিয়োজিত পলিটিক্যাল কাউন্সেলার। বাঙালী অফিসারদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং উচ্চতম পদের অধিকারী।

শেখ আবদুল মান্নান বলেন ঃ

'স্বভাবতঃই আমরা আশা করেছিলাম তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশের এই দুর্দিনে এগিয়ে আসবেন। তিনি আসেননি; আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি। আমাদের প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি 'না'-ও বলেননি, "হ্যাঁ"-ও বলেননি। তারপর লুলু বিলকিস বানু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর সঙ্গে রেজাউল করিমের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। করিম সাহেব বিচারপতি চৌধুরীর মাধ্যমে আমাকে জানান, তিনি যে ফ্ল্যাটে থাকেন, তা'ছেড়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে। যদি ছেড়ে দিতেই হয়, তা' হলে পাকিস্তান হাই কমিশনের পদমর্যাদার সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দিতে হবে। তাঁর মানসম্মানের প্রশ্ন আছে। তাঁর "সারভেন্ট" থাকা দরকার। গাড়ি আছে, গাড়ি থাকা দরকার। কত টাকা হলে তিনি জীবনধারণ করতে পারবেন, তা'ও তিনি জানান। স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়। সদস্যদের অধিকাংশই বলেন, যে-কোন মূল্যেই হোক, তাঁকে আমাদের পাওয়া দরকার। আমি এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছি। বলেছি, আমাদের পক্ষে আসার জন্য যে-কোনো মূল্য দিতে আমরা তৈরি নই। তিনি যদি আমাদের পক্ষে আসতে চান, তবে তিনি আসতে পারেন।

'আমার মনে হয়, 'মুজিবনগর' সরকার বিচারপতি চৌধুরীকে বলেছিলেন-

রেজাউল করিমের "ডিফেক্শান" আমাদের জন্য প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ আক্রমণ করার পর পাকিস্তান হাইকমিশন তাঁকে মিসরে পাঠিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করার জন্য। তাঁর মিসরে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের কাছে "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘাঁ" বলে মনে হয়েছিল। এ কথা ভেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও তাঁর "ডিফেক্শান"-এর প্রতি আকৃষ্ট হইনি।

'অক্টোবর মাসে রেজাউল করিম যখন আমাদের পক্ষে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন, তখন তাঁর মন খানিকটা নরমও হয়েছে। যে-সব দাবি-দাওয়া তিনি করেছিলেন, তার সবগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বিচারপতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা'পালন করা হয়। আমি মনে করি, যারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত, দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না, আমি কোন্ দিকে থাকবো, আমার অবস্থা কি হবে, আমার পদোন্নতি হবে কিনা, যদি বাংলাদেশ না হয়, তা'হলে আমার কি হবে-এই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে যারা ক্ষতবিক্ষত, তারা 'ডিফেক্ট" না করলেই ভালো করতেন।

'রেজাউল করিম যখন আসলেন তখন আমরা ২৪ নম্বর প্রেমব্রিজ গার্ডেনে বাংলাদেশ মিশনের অফিস খুলেছি। বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন হাই কমিশনার এবং বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত। রেজাউল করিম সিনিয়ার অফিসার হিসাবে যে

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করেছেন, তা' ছিল প্রশংসনীয়। বিচারপতির অনুপস্থিতিতে তিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার কালে পাকিস্তানের সমর্থক ব্যারিষ্টার আব্বাস আলীকে যেভাবে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মোকাবিলা করেন, তা' নিঃসন্দেহে আমাদের আন্দোলনের সহায়ক হয়েছে। সে জন্য আমি মনে করি, যার যা'প্রাপ্য তাকে তা' দেওয়া উচিত। যদি পূর্ববর্তী সময়ের সন্দেহ পরবর্তী সময়ের, ভালো কাজের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হয়, তা' হলে তিনি মাপ পেয়ে গেছেন। ইতিহাস এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলবে।'

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. শেখ আব্দুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৭০-৭১ এবং ঢাকায় সাক্ষাৎকারে মহিউদ্দিন আহমদ।

২. ৮ই অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা প্রদত্ত এক সংবাদে বলা হয় লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশানে নিয়োজিত পলিটিক্যাল কাউন্সিলার রিজাউল করিম পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক বছর আগে রেজাউল করিমের সঙ্গে 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর লন্ডন সংবাদদাতা আবদুল মতিনের সঙ্গে পরিচয় হয়। জুন মাসের প্রথম দিকে তাসাদ্দুক আহমদের সঙ্গে পরামর্শ করে মি. করিমকে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। অধ্যাপক রেহমান সোবহান মাত্র দিন কয়েক আগে লন্ডনে এসেছেন। 'মুজিবনগর' সরকারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর সঙ্গে তাসাদ্দুক আহমদের যোগাযোগ ছিল। তিনি আবদুল মতিনকে বলেন, রেজাউল করিম যদি বাংলাদেশের পক্ষে যোগাদান করতে রাজী হন, তা'হলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম লন্ডনের হল্যান্ড পার্ক টিউব স্টেশানের নির্জন পরিবেশে মি. করিম আবদুল মতিন সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন। নিকটবর্তী একটি জনমানবহীন একটি রাস্তার এক পাশে পার্ক করা গাড়ীতে বসে আবদুল মতিন বলেন, তিনি যদি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে রাজী হন, তা'হলে 'মুজিবনগর' সরকারের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হবে। কয়েকদিন পর টেলিফোনযোগে তাঁর সম্মতিসূচক উত্তর পাওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট তারিখে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন পর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাসাদ্দুক আহমদ আবদুল মতিনকে জানান, মি. করিম বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। আরও চার মাস অপেক্ষা করার পর তিনি তাঁর পদত্যাগ ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ৪০০ জনেরও বেশি বাঙালি অফিসার পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ১৯৮৬ সালে লন্ডনে এক সাক্ষাৎকার কালে বিচারপতি চৌধুরী আবদুল মতিনকে বলেন, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে লুলু বিলকিস বানু রেজাউল করিমকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন আশা করা হয়েছিল, ১লা অগাস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে আয়োজিত গণসমাবেশে মি. করিম বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা-করবেন। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি'," আবদুল মতিন, র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, পৃষ্ঠা-১৬৪); বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর স্মৃতিকথা- 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি'-এর উল্লেখ করে শেখ আদুল মান্নান, ঐ, পৃষ্ঠা-৭১-৭২ এবং সাক্ষাৎকারে মহিউদ্দিন আহমদ।

৩। শেখ আদুল মান্নান, ঐ, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩।

৩.১৪ যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যেল এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা ঃ

ষাটের দশক থেকেই বিলাতে প্রবাসী বাঙালি চিকিৎসকরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেশ সংগঠিত ছিলেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই বিলাতে বসবাসকারী চিকিৎসকরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবদান রাখার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই লন্ডন ভিত্তিক ও বিভিন্ন শহরে 'বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। চিকিৎসকদের সংগঠিত করার ব্যাপার যাঁরা অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ মোশাররফ হোসেন জোয়ার্দার, ডাঃ আব্দুল হাকিম, ডাঃ সামসুল আলম, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদার, ডাঃ কাজী ও ডাঃ আহম্মেদ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

উল্লেখিত শ্রেণীর সার্বিক কর্মকান্ড 'বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা' অধ্যায়সহ প্রসঙ্গক্রমে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা অত্র গবেষণাপত্রের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে বিধায় তাঁদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অত্রপত্রের পরিসরের কথা চিন্তা করে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হলো না।

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. তাজুল মোহাম্মদ, 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ', পৃষ্ঠা- ১৫-১৮; ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা- ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৫ যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভূমিকা ঃ

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

১৯৮৭ সালের প্রথমদিকে এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান খান আবদুল মতিনকে বলেন, ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কভেন্ট্রি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন। কারণ, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। এর ফলে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গাউস খান অস্বস্তি বোধ করেন।

কভেন্ট্রি সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির পরিবর্তে আঞ্চলিক এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি না থাকায় আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে এবং কমিটি দৈনন্দিন কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। গাউস খানের 'এলাহাবাদ' রেস্তোরাঁর ওপরতলায় স্টিয়ারিং কমিটির জন্য বিনা ভাড়ায় অফিস দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি নিরুৎসাহিত বোধ করেন।[১]

বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ 'লন্ডনের বিভেদকে এড়িয়ে ২৫ এপ্রিল এই শহরে সকল দলকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়। এই সভাতেও আপসের জন্য শেখ আবদুল মান্নানসহ কয়েকজন কর্মী যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। সভায় আওয়ামী লীগ নেতা গাউস খান সভাপতি, মিনহাজউদ্দিন সহ-সভাপতি এবং ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রথমে মিনহাজউদ্দিনের নাম সভাপতি রূপে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু শেখ আবদুল মান্নান এবং আরো কয়েকজন বাঙালি নেতার অনুরোধে মিনহাজউদ্দিন সহ-সভাপতি হতে সম্মত হন।'[২]

শেখ মান্নান লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ২৪ এপ্রিল কভেন্ট্রি সম্মেলন থেকে কোচযোগে লন্ডন থেকে ফিরে আসার পথে তিনি 'কাউন্সিল ফর দি রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ কে' ভেঙে দিয়ে লন্ডন এলাকার জন্য নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির এক শাখা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আপসের মনোভাব নিয়ে গাউস খান অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে 'লন্ডন অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' গঠিত হয়। গাউস খান খুশি হন নি। তিনি আশা করেছিলেন, কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কমিটিতে তাঁর স্থান হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি লন্ডন কমিটির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করতে রাজি হন।

বাংলাদেশ সমর্থক ভারতীয় জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্মানার্থে লন্ডন কমিটি ৪ জুন একটি চা-চক্রের আয়োজন করে। এই সমাবেশে লন্ডন কমিটির পক্ষ থেকে গাউস খান এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

লন্ডন কমিটির উদ্যোগে ৬ জুন পূর্ব লন্ডনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন ঃ 'এই সভায় আমি পুনরায় লক্ষ্য করলাম যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পূর্ণ নিবেদিত বাঙালিদের মধ্যে তখনও লন্ডন কমিটির নেতৃত্ব নিয়ে চাপা কোন্দল রয়েছে।'[৩]

স্টিয়ারিং কমিটিকে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হয়নি। আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টা সফল না হওয়া সত্ত্বেও নীতিগতভাবে কমিটির বিরোধিতা না করে গাউস খান ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজস্ব পন্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা টেলিফোন ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সদস্যদের স্থানীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ দেয়ার নির্দেশ দেন।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লন্ডনের হাইড পার্ক, ট্র্যাফালগার স্কয়ার ও কনওয়ে হল এবং বার্মিংহাম, কার্ডিফ, লুটন, ম্যাঞ্চেস্টার ও অন্যান্য শহরে প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ-মিছিল হাইড পার্ক থেকে চীন ও মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। গাউস খান মিছিলের নেতৃত্ব দেন। ১ আগস্ট ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় গাউস খান উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন।

আওয়ামী লীগের কর্মতৎপরতার ফলে পাকিস্তান-সমর্থক বাঙালিরা গাউস খান ও আতাউর রহমান খানকে নানা রকম ভীতি প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ না করলে তাঁদের রেস্তোরাঁর ক্ষতিসাধন করা হবে, তাঁরা দেশে ফিরতে পারবেন না এবং তাঁদের দেশের আত্মীয়-স্বজনকে খতম করা হবে ইত্যাদি নানা ধরণের ভীতি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁরা আন্দোলন পরিত্যাগ করেন নি। ভীতি প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের চিনতে পেরেছিলেন বলে আতাউর রহমান খান বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আতাউর রহমান খানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে সেন্ট্রাল লন্ডন পলিটেকনিকের ডাইরেক্টর কলিন এ্যাডামস বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের প্রায় সকল বৈঠক ও সভায় তিনি যোগদান করেন। তাছাড়া আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভার জন্য বিনা ভাড়ায় পলিটেকনিকের মিলনায়তন ব্যবহার করার অনুমতিও তিনি দেন।

আন্দোলনের প্রথম দিকে আতাউর রহমান খান শ্রমিকদলীয় সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করার অনুরোধ জানান।

কিছুকাল পর পূর্ব লন্ডনে বসবাসকারী আবদুল মালেকের সহায়তায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ প্রভাবশালী শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোরের (পরবর্তীকালে লর্ড শোর) সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অকপট সমর্থক মি. শোর লন্ডনের যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হন, সে এলাকায় বহুসংখ্যক বাঙালি বসবাস করেন। মি. মালেকও সেই এলাকার পুরনো অধিবাসী।

১৯৮৪ সালে গৃহীত এক সাক্ষাৎকারে মি. মালেক আবদুল মতিনকে বলেন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে পিটার শোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হন। এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ব্যারিস্টার রুহুল আমিনের সহায়তায় এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন গাউস খান, তৈয়েবুর রহমান, মিম্বর আলী, আতাউর রহমান খান ও আবদুল মালেক। এই বৈঠকে পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মি. মালেক এ ব্যাপারে মি. শোরের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪]

সপ্তাহখানেক পর প্যাডিংটন স্ট্রিটে আতাউর রহমান খানের 'রাজপুত' রেস্তোরাঁয় মি. শোরের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে আওয়ামী লীগের ১৫/১৬ জন নেতাকর্মী যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান (ছানু মিয়া) এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর আওয়ামী লীগের অনুরোধে মি. শোর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সপ্তাহ দুয়েক পর মি. শোর বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য হাউস অব কমন্সে একটি সভার আয়োজন করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভূক্ত পার্লামেন্ট সদস্য এই সভায় যোগ দেন। গাউস খান, পিটার শোর এবং আরো কয়েকজন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ভারতের প্রাক্তন দেশরক্ষা মন্ত্রী মি. কৃষ্ণমেনন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি লন্ডনে আসেন। তিনি আতাউর রহমান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 'রাজপুত' রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের পর গাউস খান তাঁর সম্মানার্থে এক ঘরোয়া ভোজসভার আয়োজন করেন। লন্ডনে নিয়োজিত ভারতীয় হাই কমিশনার আপা বি. পন্থ গাউস খানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে মি. খানের সাক্ষাৎকালে তৈয়েবুর রহমান, ম্যাঞ্চেস্টারের আবদুল মতিন ও বার্মিংহামের এ. কে. এম হক উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বলে আওয়ামী লীগ মহল প্রকাশ করে।

লন্ডনে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার প্রতিনিধি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া উইকলি'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ড. তারাপদ বসু যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি আওয়ামী লীগকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম (পরবর্তীকালে লর্ড হিউম) পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রবাসী বাঙালিরা তাঁর এই মন্তব্যে মর্মাহত হন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইসহাক ও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি ছাত্র তৎকালীন রক্ষণশীল দলীয় (টোরি) পার্লামেন্ট সদস্য কুইনটিন হগের (পরবর্তীকালে লর্ড হেইলশ্যাম) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্যার আলেক ডগলাস হিউমকে এই উক্তি প্রত্যাহারে রাজি করানোর জন্য অনুরোধ করেন। অন্যান্য মহল থেকেও তাঁকে এ ধরণের অনুরোধ জানানো হয়। কিছুকাল পর স্যার আলেক বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয় বলে ঘোষণা করেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে 'মুজিবনগর' সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আবদুস সামাদ আজাদ জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নিউইয়র্কের পথে রওনা হয়ে লন্ডনে পৌঁছান। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রবাসী বাঙালি ও তাদের সমর্থকদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে লন্ডনের রুমসবারি হোটেলে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সভায় মি. আজাদ বক্তৃতা করেন। গাউস খান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এরপর মি. আজাদ ইংল্যান্ডের কয়েকটি শহরে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি গুরুত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ২৯ অক্টোবর লন্ডনে পৌঁছান। লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে গাউস খানের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। এই সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে আওয়ামী লীগ মহল মনে করে।[৫]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৭৬।
২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-২৬।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৫০।
৪. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৮।
৫. আবদুল মতিন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি,' পৃষ্ঠা-২২৮-২৩২; স্মৃতিচারণ আতাউর রহমান খান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৬৬; নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', পৃষ্ঠা-৯৮৮-১০৩৬।

৩.১৬ যুক্তরাজ্যস্থ বাম প্রগতিশীলদের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি বাম প্রগতিশীলদের ভূমিকা ছিল উলেখ করার মতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেনের মতে, ষাটের দশকে যেমনিভাবে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সোচ্চার ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লাভ করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে বিলাতে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে একই লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে ষাটের দশকে বিলাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ সাংগঠিত হতে দেখা যায়। যে সকল রাজনৈতিক দল সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে আওয়ামীলীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিলাত প্রবাসীদের কাছে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নাম সংগ্রামের অগ্নিমশাল হিসেবে চিহ্নিত ছিল। মাওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও সেই কারণে বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের আকৃষ্ট করেছিল এবং বিলাতের বিভিন্ন শহরে বিস্তারলাভ করেছিল। মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ বিলাতে সংগঠিত করার ব্যাপারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন কর্মীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমাজকর্মী শেখ আব্দুল মান্নান, আব্দুস সবুর, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদার, সাইদুর রহমান (ব্যারিস্টার), শ্যামা প্রসাদ ঘোষ (ডাকসুর প্রাক্তন ভি. পি.), নিখিলেশ চক্রবর্তী, এম ইয়াহিয়া (ব্যারিস্টার) প্রমুখ ন্যাপ সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ষাটের দশকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিলাত ভ্রমণে যান এবং বাঙালি অধ্যুষিত শহরগুলোতে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন। মাওলা ভাসানীর বিলাত ভ্রমণের ফলে বিলাতে ন্যাপের সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃতি লাভ করে। অবশ্য পরবর্তীতে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্তি হওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া বিলাতের ন্যাপেও বিস্তারলাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপ বিভক্ত হওয়ার ফলে তার প্রতিক্রিয়ায় বিলাতের ন্যাপেও বিভক্তি আসে। খায়রুল হুদা, মাহমুদ এ. রউফ, ডাঃ নূরুল আলম ও হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মোজাফফর পন্থী ন্যাপ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিলাত আন্দোলনে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখে।[২]

আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ছাড়াও বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কিছু কর্মী সক্রিয় ছিলেন। এদের মধ্যে তাসাদ্দুক আহমদ, ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেন, ব্যারিস্টার জিয়া উদ্দিন মাহামুদ, ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান সাহজাহানের নাম উল্লেখযোগ্য। তাসাদ্দুক আহমদ এককালীন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি লন্ডনের কেন্দ্রে অবস্থিত 'গঙ্গা' রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন; যা বিলাত প্রবাসী প্রগতিশীল কর্মীদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বর্তমানে গঙ্গা রেস্টুরেন্টের অস্তিত্ব আর নেই।[৩]

এ প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম বলেন ঃ

"মূলতঃ ষাটের দশকেপূর্ব বঙ্গ থেকে যাঁরাই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত গমন করতেন তাঁদের পারিবারিক পটভূমি বিশেষণ করলে দেখা যায় তারা অধিকাংশই উচ্চ মধ্য বিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত এবং পূর্ব বঙ্গের সমাজ গঠনে এবং রাজনীতিতে এ সব পরিবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছিলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামেই খুঁজলে এসব পরিবারের একটা ভূমিকা পাওয়া যায়।"[৪]

জাকারিয়া খান চৌধুরীর মতে ঃ

"ষাটের দশকে মেধাবী ছাত্র বলতেই বাম ঘরানায় বোঝাতোঃ মার্ক্স-লেলিনের ভক্ত নেই এটা খুঁজে পাওয়া ছিল ভার, অন্তত মনে মনে হলেও বা প্রগতিশীল নামে হলেও এঁরা ছিলেন সমাজতন্ত্রের অর্থাৎ বাম রাজনীতির ভক্ত। তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

স্বি'মেরু কেন্দ্রিক বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লকের মধ্যেও একটা সুক্ষ ভাগ হিসেবে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে মাওলানা ভাষানী পন্থী (পিকিং পন্থী) ন্যাপ, মোজাফফর পন্থী (রাশিয়া পন্থী) এবং মতিয়া পন্থী (মডারেট) বিরাজমান ছিল।[৫]

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর এম. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন ঃ

"মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁদের গুরু মাওলানা ভসানী বঙ্গবন্ধুর নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন ও সমর্থন জানিয়েছেন' 'মুজিব নগর সরকারের উপদেষ্টা পদ' গ্রহণ করেছেন এবং লন্ডন আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিটক পত্র পাঠিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন- এই যুক্তিতে ভাসানী পন্থী একটা গ্রুপ বিচাপতি চৌধুরীর আন্দোলনে আনুগত্য প্রকাশ করে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করলেও অধিকাংশ ছিলেন বঙ্গবন্ধু ও বিচারপতি চৌধুরীর সমালোচক এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর সহায়তা ছাড়াই সুদীর্ঘায়িত আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী। অবশ্য যুক্তরাজ্যে এঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এঁদের মধ্যে কট্টর পিকিং পন্থীরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতা করেছেন।"[৬]

তিনি আরও বলেন ঃ "মোজাফর পন্থী ন্যাপ ও ষাটের দশকের প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী আব্দুল মান্নান, আজিজুল হক ভূঁইয়া ও তাসাদ্দুক আহমদরা মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির আন্দোলনে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছেন।

আর একটি গ্রুপ যাঁদের কথা আগেই বলেছি যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাম মানসিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র সমাজ (প্রকাশ্য নয়, হৃদয়ে, মেধায় ,মননে) ছিল মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত বিলাত আন্দোলন এবং এর পুরোধা আবু সাঈদ চৌধুরীর মূল চালিকা শক্তি"[৭]

উল্লেখিত শ্রেণীর সার্বিক কর্মকান্ড অত্র গবেষণাপত্রের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে বিধায় তাঁদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অত্রপত্রের পরিসরের কথা চিন্তা করে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হলো না।

টীকা ও তথ্য সূত্র ঃ

১. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা- ১৩।
২. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪ এবং সাক্ষাৎকারে প্রফেসর এম. ডঃ মোফাখখারুল ইসলাম।
৩. সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম।
৪. সিলেটে সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।
৫. সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৬. সাক্ষাৎকারে প্রফেসর এম. মোফাখখারুল ইসলাম।
৭. ঐ।

৩.১৭ যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থকারী পাকিস্তানী ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ঃ

যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী পাকিস্তানী ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ও সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়সহ অত্র গবেষণাপত্রের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে তাঁদের সম্পর্কে সামান্য উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, ১৯৭১ সালে সামরিক শাসকবর্গ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল, পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের এতে সমর্থন ছিল না। তাঁরা জানতেও পারেনি যে, বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে। বাঙালিদের কাছে এই যুক্তি ভালো মনে হয়, কেননা স্বাধীনতার পরেও পাকিস্তানী জনসাধারণের এমন কোন ভূমিকা দেখা যায়নি যাতে মনে হতে পারে তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল অথবা বাংলাদেশে গণহত্যার বিরোধীতা করেছিল। বরং তাঁরা বরাবরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছে, বাঙালি মুসলমানকে তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমান মনে করেছে এবং একাত্তর সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের দালালদের কারসাজি বলে মনে করেছে। এখনও তাঁদের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে বলে অকাট্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় একাত্তর সালের ষোল ডিসেম্বরের পরেও যেমন বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ বলে অভিহিত করা হয়েছিল, তেমনি এখনও সম্ভব হলে পত্রপত্রিকাগুলো সেরকমই লিখতো, কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলে ঘুরিয়ে-পেচিয়ে এমন ভাবে বাংলাদেশের কথা উত্থাপন করে যে, এসব রিপোর্ট পড়লে মনে হতে পারে বাঙালি একাত্তরে কতো বড় ভুল যে করেছিল, যার মাশুল তাকে এখন পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত থাকলে বাঙালি দুধে-ভাতে থাকতে পারতো; এখন পাকিস্তানী সাহায্য নিয়েও তাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। সাধারণ পাকিস্তানীর মনে বাঙালির প্রতি সত্যিকার কোন শ্রদ্ধা মুক্তিযুদ্ধকালেও ছিলেন না এখনও আছেন বলে মনে হয় না। মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীরা মুক্তিযুদ্ধকালেও এগিয়ে এসেছিলেন; এখনও এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের দাবিতে। কিন্তু গরিষ্ঠসংখ্যক পাকিস্তানী নাগরিক বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে মেনে নিতে মুক্তিযুদ্ধকালেও রাজি ছিলেন না এখনও তাতে রাজি নন। তাঁরা মনে করে যে,

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী একাত্তর সালে পাকিস্তানের অখন্ডতা বিনষ্টকারীদের হত্যা করে কোন প্রকার অন্যায় করেন নি। এমনটি কখনও শোনা যায়নি যে, নিয়াজি-ফরমান আলী-টিক্কা খানদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে কোন শ্লোগান উচ্চারিত মুক্তিযুদ্ধকালে হয়েছিল বা পরেও হয়েছে; নিদেন পক্ষে তাঁদের গাড়ির উপর কেউ ঢিল ছুড়েছিল বা পরেও ছুঁড়েছে। অথচ বাংলাদেশে টনি ব্লেয়ার, জর্জ ডব্লিউ. বুশদের গণ-আদালতে বিচার করে প্রতীকী ফাঁসি দেওয়া হয়, তাঁরা ইরাক আক্রমণ করেছেন বলে। পাকিস্তানী নাগরিকদের কেউ কোনও দিন নিয়াজী বা টিক্কা খানদের বিচারের জন্য গণ-আদালত গঠনের কথা ভেবেছেন বলে গুজবও শোনা যায়নি।[১]

যুক্তরাজ্য-প্রবাসী পশ্চিম পাকিস্তানীরা স্বদেশের মতো স্বাভাবিক কারণেই প্রায় সবাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধীতা করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রথমদিকে মুষ্টিমেয়সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের সমালোচনা করেছেন এবং নিন্দা জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম।[২]

তবে মুক্তিযুদ্ধকালে যুক্তরাজ্যে অবস্থানকারী পশ্চিম পাকিস্তানীরা টেবিল টক বা তর্কে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালিদের নাতানাবুদ করে দেবার চেষ্টারত থাকতো এই যুক্তিতে যে, বাঙালিরা ভারতের খপ্পরে পড়ে গেছে, একই সাথে পাকিস্তান প্রশ্নে পৃথিবীও ভুল করছে; তাঁরা মনে করতো ভারত তাঁদের দেশকে ভাঙতে চায়; এই দুচিন্তা থেকেই তাঁরা উম্মাদ শিশুর মতো আচারণ করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধব যাঁরা ছিলেন তর্ক শেষে চলে যাবার সময় কেউ কেউ পরিবারের খোঁজ-খবরও নিয়ে যেতেন; তবে এটা ছিল হাতে গোনা। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালিদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতা-হাতির ঘটনাও ঘটতো। একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যায় যতোই থাকুন না কেন প্রকাশ্যে বাঙালিদের মোকাবেলা করতে দুঃসাহস খুব একটা দেখাতেন না বলে প্রফেসর এম. মোফাখখারুল ইসলাম জানিয়েছেন।[৩]

তথাপি দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীরা মুক্তিযুদ্ধকালে এগিয়ে এসেছিলেন বিশেষ করে বাংলাদেশে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী আপরাধ ও ইয়াহিয়ার নৃশংস তান্ডব লীলা বন্ধ প্রশ্নে।

এঁদের মধ্যে সাংবাদিক কলিম সিদ্দিকী ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে কলাম লিখে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক ও বাঙালিদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন বলে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন উল্লেখ করেছেন।[৪]

বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের কয়েকজন উৎসাহী সমর্থক নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর ২৭ মার্চ (শনিবার) একটি ইংরেজী 'নিউজলেটার' (এ সম্পর্কে আলাদা একটি অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ মার্চ (মঙ্গলবার) 'নিউজলেটার'-এর প্রথম সাংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি 'খোলা চিঠি' এবং মার্চ মাসে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বাঙালিদের উদ্যোগে গঠিত এ্যাকশন কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'খোলা চিঠি'-তে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে অবিলম্বে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তিদান, আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সৈন্য বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার দাবি এবং হত্যা ও অমানুষিক নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের দাবি সমর্থন করার জন্য আকুল আবেদন জানানো হয়। উল্লেখ্য প্রখ্যাত পাকিস্তানী সাংবাদিক ও প্রাক্তন কূটনৈতিক ফরিদ এস. জাফরী 'নিউজলেটার' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সামরিক হস্তক্ষেপের পর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বিনা দ্বিধায় তিনি 'নিউজলেটার'-এর ঠিকানা হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করার অনুমতি দেন। এম. কে. জানজুয়া, তাসাদ্দুক আহমদ, মিসেস রোজমেরী আহমদ, ড. প্রেমেন আড্ডি ও আবদুল মতিন ('মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য' গ্রন্থের লেখক) সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার কমোডোর এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী মি. জানজুয়া 'কমিটি ফর জয়েন্ট এ্যাকশন এগেনস্ট মিলিটারি ডিক্টেটারশীপ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে প্রচারকার্য চালান।[৫]

'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত (৩১ মার্চ, ১৯৭১) এক পত্রে তারিক আলী, হমজা আলাভী, মোহম্মদ আখতার ও নাসিম বাজওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সোশ্যালিস্টদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে অভিনন্দন জানান। সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিদের শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করে পূর্ব বাংলার ৭ কোটি অধিবাসীকে দেশদ্রোহিতার অপবাদ দেয়ার জন্য তাঁরা ইয়াহিয়া খানকে নিন্দা করেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু করা ছাড়া বাঙালি জনসাধারণের আর কোনো উপায় ছিল না বলে পত্রলেখকরা মনে করেন। তাঁরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য মি. ভূট্টোকে দায়ী করেন।

উল্লিখিত তারিখে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত আরও একটি পত্রে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর মোহাম্মদ খান জানজুয়া (এম. কে. জানজুয়া), কর্নেল ইনায়েত হোসেন ও ফরিদ এস, জাফরী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ইচ্ছ অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার মেনে নেয়ার দাবি জানান। শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত পার্টি ও তাঁর নেতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ চূড়ান্ত অবমাননাকর বলে তাঁরা মনে করেন।[৬]

পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ২৬ জুলাই (১৯৭১) লন্ডনে এক সভায় মিলিত হয়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও পশ্চিম পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমর্থক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থকদের কর্ম প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন কমিটির প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়। সদস্যদের প্রত্যেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন এয়ার কমোডর এম. কে. জানজুয়া কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।'[৭]

টীকা ও তথ্যসূত্রঃ

১. মাসুদা ভাট্টি, 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃটিশ দলিলপত্র', পৃষ্ঠা- ৯৯-১১০ এবং সাক্ষাৎকারে হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ও ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম।
৩. সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল।
৪. সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
৫. আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১৫।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৩২।
৭. 'Bangladesh Newsletter', Issue No, 7 August, 1971.- এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০, ২০২।

৩.১৮ প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা পুস্তিকার ভূমিকা ঃ

সাপ্তাহিক জনমত ঃ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে লন্ডনের একমাত্র বাংলা পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক 'জনমত'। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ছ'দফা পুস্তিকা হিসেবে ছাপিয়ে বিতরণ করার পর প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। তখন রাজনীতি-সচেতন বাঙালিরা যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করেন। ১৯৬৮ সালে লন্ডনের কেনসিংটন এলাকায় অবস্থিত 'তাজমহল' রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ওয়ালি আশরাফ, সুলতান মাহমুদ শরীফ, সালাহউদ্দিন, আনিস আহমদ এবং আরো কয়েকজন একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক 'জনমত' প্রকাশিত হয়।[১]

বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

সাপ্তাহিক 'জনমত' প্রসঙ্গে আনিস আহমেদ তাঁর স্মৃতি কথায় বলেন যে, 'উনিশশ' উনসত্তরে প্রতিষ্ঠিত বিলেতের প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'জনমত' যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিল সেটাও হবে এই ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দখলদার বাহিনী ও পাকিস্তানের বর্বর সরকার যখন বাংলাদেশের সব ক'টি পত্রিকাকে গলা চাপা দিয়ে ধরেছিল, স্বাভাবিকভাবেই সে সময়ে জনমত-এর উপর পড়েছিল এক বিরাট দায়িত্ব। বিশেষ করে ব্রিটেনের মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বিশ্বজনমতের কেন্দ্রস্থল লন্ডন থেকে প্রকাশিত বলে 'জনমত' কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। এবং এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে 'জনমত' কতটুকু সফল হয়েছিল, তা কেবল ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিরাই সঠিকভাবে বলতে পারবেন। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর সৈনিক মরহুম ওয়ালী আশরাফ 'জনমত'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছাড়াও সে সময়ে ছিলেন প্রধান সম্পাদক। আমি ছিলাম পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। উল্লেখ্য, এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্নেই আমাদের ঘোষণা ছিল যে, এই পত্রিকা বাংলার নিপীড়িত ও সংগ্রামী জনগণের আপোষহীন মুখপাত্র হিসেবে নিবেদিত থাকবে।' তিনি আরও বলেন যে, 'আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের প্রতিবাদে এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সপক্ষে এই পত্রিকাটি ঠিক যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আহ্বানকে আহ্বানকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে 'জনমত' ছিলো সোচ্চার।'[২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডন সফরে আসেন। তখন 'জনমত' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ওয়ালি আশরাফ ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনিস আহমদ বঙ্গবন্ধুর হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে ওয়ালি আশরাফ বলেন ঃ "কথা প্রসঙ্গে তাঁকে (শেখ মুজিব) বললাম, এখন আপনি ছ'দফার বদলে এক দফা বলছেন না কেন? উনি হেসে বললেন, তোরা বল। আমরা

Dhaka University Institutional Repository

বুঝলাম, আমাদের কী নির্দেশ দিলেন। আমরা এরপর 'জনমত'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোণাম দিলাম-'স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালিদের গত্যন্তর নেই।'[৩]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সাপ্তাহিক 'জনমত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি, 'মুজিবনগর' সরকারের কার্যকলাপ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী সৈন্যদের হত্যাকান্ড, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ, যুক্তরাজ্যে সংগঠিত এ্যাকশন কমিটিগুলোর কার্যকলাপ সম্পর্কিত রিপোর্ট এবং বিদেশী সংবাদ 'জনমত'-এ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক ও বিচারপতি চৌধুরীর বিশ্বস্ত সহকর্মী শেখ আবদুল মান্নান বলেন যে, 'পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ওয়ালী আশরাফ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনিস আহমদ এবং আরো অনেকে যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালি যাঁরা ইংরেজি জানেন না, তাঁদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পৌছে দেয়া ছাড়াও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি এবং বাংলাদেশ বিরোধী পাকিস্তানীদের অপপ্রচারের পাল্টা জবাব এবং তাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে পত্রিকাটি আমাদের সংগ্রামের সহায়তা করে।'[৪]

'সাপ্তাহিক জনমত' প্রসঙ্গে জাকারিয়া খান চৌধুরী বলেনঃ

"বাংলার অবিসংবাদিত নেতা মহান মানবতাবাদী রাজনীতিবিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে স্বাধীনতার ডাক দিলেন (৭মার্চ, ১৯৭১)। বিশাল গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সেই স্বাধীনতার ডাক ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রতিটি প্রান্তরে। ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিল সর্বস্তরের মানুষ। হায়েনার মতো ক্ষিপ্র হয়ে উঠল বেনিয়া পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। একদিকে মুক্তির প্রবল স্পৃহায় উদ্বেল বাঙালি জাতি আর অন্যদিকে পশ্চিমা দস্যুদের দাবিয়ে রাখার ঘৃণ্য প্রস্তুতি। 'জনমত'- একথা বৃটেনস্থ বাঙালিদের জানিয়েছিলো।"[৫]

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে 'সাপ্তাহিক জনমত'-এর ভূমিকা ছিল ব্যাপক, কারণ এই পত্রিকাই ছিল প্রবাসী বাঙালির একমাত্র কণ্ঠস্বর। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক) বলেন ঃ

'জনমত প্রধানত যে কারণে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিহ্নিত হতে পারে, তা হলো এই পত্রিকাটি কলামের মাধ্যমে বিলেতে প্রবাসী বাঙালি, বিশেষ করে এখানকার ছাত্র ও যুবসাজকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করে। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্বভাবতই এই পত্রিকাটিকে এক বিরাট শক্তি ও অস্ত্র হিসেবে সঙ্গে পেয়েছিলেন। বিলেতে ছাত্র ও যুব সমাজ সে সময়ে বস্তুত ভিন্নমুখী রাজনীতি ও মতবাদে বিভক্ত ছিল। সুতারাং এদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এবং ঐক্যমতে পৌছে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে তোলার বিরাট দায়িত্ব ছিল 'জনমত'-এর উপর। 'জনমত'-এর কলামে ও সম্পাদকীয়তে একাধিকবার প্রবাসী বাঙালিকে ঐক্যের জন্যে আহ্বান জানানো হয় এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আহ্বানের সাড়া দেন। বালহামের টেম্পর্লি রোডস্থ জনাব ওয়ালী আশরাফের বাসভবন ও 'জনমত' দফতরে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সভায় যুব ও ছাত্র নেতারা অংশগ্রহণ করে। এরই এক ফলশ্রুতি ছিল প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিষ্ঠা। শুরুতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তথ্যপত্রগুলো প্রকাশনার দায়িত্বে 'জনমত' পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিল।

তিনি আরও বলেনঃ

"বিলেতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এ্যাকশন কমিটি গঠনের সংবাদ এবং কর্মকর্তাদের সকলের নাম 'জনমত'-এ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও গোরিং স্ট্রীটের এক অফিসে সমগ্র যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভা, কভেন্ট্রি সম্মেলন এবং স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিষ্ঠার খবর 'জনমত'-এ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। 'জনমত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রত্যন্তর থেকে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চাঞ্চল্যকর ও সচিত্র কাহিনী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধরত সাংবাদিকদের প্রতিবেদন ও প্রবাসীদের লেখা চিঠি পত্র 'জনমত'-এর পৃষ্ঠা ভরে থাকতো। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রতিটি সভা ও সম্মেলনে যোগদানের খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা কার্যত বাধ্যবাধকতা ছিল।"[৬]

মুক্তিযুদ্ধে জনমত পত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে আনিস আহমেদ তাঁর স্মৃতিকথায় আরও বলেন যে, '২৫ মার্চ ১৯৭১। বিশ্বের ইতিহাসে এই দিন ঘৃণ্যতম হিংস্রতায় চিহ্নিত সময়। পাকিস্তানী সেনা-দস্যুরা এদিন গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে বর্বর এক দানবীয় নিষ্ঠুরতায় সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। রাজধানী ঢাকা সহ সমগ্র দেশের উপর লেলিহান থাবা বিস্তার করে তারা নারকীয় এক হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। যে হত্যাকান্ড ছিল ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী নিধনযজ্ঞের চেয়েও ভয়ংকর। ভিয়েতনামে আমেরিকা বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত মাইলাই হত্যাকান্ডের চেয়েও নির্মম আর পাশবিক।

পাকিস্তানী সামরিক শাসক কুখ্যাত আইয়ুব খান, জল্লাদ ইয়াহিয়া খান আর মুখোশধারী রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভুট্টোর ত্রিপক্ষীয় বাঙালি হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রকে মদদ যোগায় আগ্রাসনবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদী আরবসহ কয়েকটি দেশ। সেই সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামসহ বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারত থেকে আগত

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানদের বৃহৎ অংশ এবং অবাঙালি বিহারী সম্প্রদায়। যারা রাজাকার, আলবদর, আলসামস প্রভৃতি বাহিনী গঠনের মাধ্যমে মুক্তিকামী স্বদেশবাসীকে হত্যায় সহযোগিতা করে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সাপ্তাহিক 'জনমত'-এর প্রতিটি সংখ্যায় গুরুত্বসহকারে ছাপা হয় এসব সংবাদ।'

তিনি আরও বলেন যে, 'বাঙালির জীবনের নেমে আসা ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ আর ভয়াবহ হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে সমগ্র বিশ্ববাসী। অনিবার্য হয়ে ওঠা স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ বাঙালিরা শুরু করে সশস্ত্র সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ আর সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে সংগঠিত স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন যোগায় বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশ। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁদের সরকার ও জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে বাঙালিদের চরম দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন। দেশত্যাগী এক কোটি শরণার্থীকে ভারত ঐ সময়ে আশ্রয় দিয়ে তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। অবশেষে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী জয় বাংলা শ্লোগানে উদ্দীপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয় আগ্রাসী শক্তি। ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর অতন্দ্র প্রহরীর মতো অবলোকন করে তা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে সাপ্তাহিক 'জনমত'। বাঙালিজাতির ইতিহাসে 'জনমত' পত্রিকার ভূমিকা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।'[৭]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ও তৎকালীন গণতন্ত্রী দলের সেক্রেটারি-জেনারেল মাহমুদ আলীকে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে পাঠান। তাঁদের ভাতাদান সম্পর্কিত সরকারি দলিলের 'ফ্যাক্সিমিলি' সাপ্তাহিক 'জনমত'-এর ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর জন্য পাকিস্তানের বর্বর সরকার এই সময়ে কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী বাঙালিকে যুক্তরাজ্যে পাঠিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনকে বানচাল করার প্রচেষ্টা চালায়। পাক সরকার এই সমস্ত দালালদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান ও তাঁর স্বামী এস. সোলায়মান অন্যতম। তাঁদের ভাতাদান সম্পর্কিত সরকারি দলিলের 'ফ্যাক্সিমিলি' সাপ্তাহিক 'জনমত'-এর ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৮]

বাংলাদেশ নিউজলেটার ঃ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটেনে প্রকাশিত সর্বপ্রথম পত্রিকা ছিল একটি ইংরেজি 'নিউজলেটার'। বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের কয়েকজন সমর্থক প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর ২৭ মার্চ (শনিবার) একটি ইংরেজি সংবাদ বুলেটিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন 'দি গ্যাঞ্জেস' রেস্তোরাঁর মালিক তাসাদ্দুক আহমদ, তাঁর স্ত্রী রোজমেরী আহমদ ও সাংবাদিক আবদুল মতিন। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ মার্চ (মঙ্গলবার) 'নিউজলেটার'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ আন্দোলনের অকুণ্ঠ সমর্থক ফরিদ জাফরী সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার কমোডোর এম কে জানজুয়া সম্পদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিছুকাল পর ড. প্রেমেন আডিডও এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। পত্রিকাটি এপ্রিল মাসে সাপ্তাহিক, মে মাসে পাক্ষিক এবং জুন মাস থেকে মাসিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এ প্রবাসী বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবরণ, 'মুজিবনগর' সরকারের কার্যক্রম, মুক্তিবাহিনীর সামরিক তৎপরতা, বাংলাদেশ আন্দোলনে বিদেশী সমর্থকদের অবদান, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কিত খবর এবং বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবর ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি পরিস্কার চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছে খোলা চিঠি' এবং মার্চ মাসে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশের সমর্থনে গঠিত এ্যাকশন কমিটি কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। খোলা চিঠিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের অন্তর্নিহিত কারণ উল্লেখ করে অবিলম্বে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দান, আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার দাবি এবং হত্যা ও অমানুষিক নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের দাবি সমর্থন করার জন্য আহবান জানানো হয়।

প্যারী থেকে 'লাল সালু'র লেখক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ফরাসি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এ প্রকাশের জন্য পাঠান। তাঁর স্ত্রী এ্যানমারী ওয়ালিউল্লাহ এসব সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য অনুবাদ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দু'মাসেরও বেশ কিছু কাল আগে (১০ অক্টোবর, ১৯৭১) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এ প্রকাশিত সংবাদ, মন্তব্য ও নিবন্ধগুলো রোজমেরী আহমদ তাঁর আই.

Dhaka University Institutional Repository

বি. এম টাইপরাইটারের সাহায্যে টাইপ করেন। পত্রিকাটি ছাপানো ও ডাক খরচের দায়িত্ব বিনা দ্বিধায় তাসাদ্দুক ও রোজমেরী আহমদ গ্রহণ করেন।

'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর উদ্যোগে **'বাংলার কথা'** শীর্ষক একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে সংগ্রামরত বাঙালি, তাদের সমর্থক, পার্লামেন্ট সদস্য, সরকারি অফিসার এবং বিদেশী দূতাবাসে পৌঁছে দেয়া ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' নিয়মিতভাবে পাঠানো হয়। এর ফলে বাংলাদেশে আন্দোলনে জড়িত প্রবাসী বাঙালি ও প্রগতিশীল পাকিস্তানী এবং বিদেশী সমর্থনকারীদের কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' গ্রুপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[৯]

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নামটি কি এক শব্দ, নাকি দু'শব্দবিশিষ্ট সে সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'মুজিবনগর' সরকারের পক্ষ থেকে লন্ডনে প্রকাশিত ডাকটিকেটে বাংলাদেশ নাম দু'শব্দ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ সম্পর্কে গ্রাফিক শিল্পী বিমান মালিককে কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নি বলে তিনি ডাকটিকেটের ডিজাইনে বাংলাদেশ দুটি পৃথক শব্দ হিসেবে দেখান। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তাসাদ্দুক আহমদ ডাকযোগে 'মুজিবনগর' সরকার প্রকাশিত একটি ইংরেজি বুলেটিন পান। এই বুলেটিনের শীর্ষে ইংরেজিতে বাংলাদেশ নামটি 'বাংলা' ও দেশ' আলাদা করে ছাপানো ছিল। তাসাদ্দুক আহমদ চিঠি লিখে তাঁদের জানালেন-ডয়েচল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নামের মতো বাংলাদেশ নামটিও এক শব্দ হওয়া উচিত। এই যুক্তি গৃহীত হওয়ার পর তাসাদ্দুক আহমেদ লন্ডনে 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকায় চিঠি লিখে বললেন, Bangla এবং Desh শব্দ দুটি এক সঙ্গে Bangladesh হিসেবে 'মুজিবনগর' সরকারের দলিলপত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই চিঠির সঙ্গে তিনি 'মুজিবনগর' সরকারের 'লেটারহেড'-এর 'ফ্যাক্সিমিলি' পাঠিয়েছিলেন। 'দি টাইম্‌স্'-এ তাসাদ্দুক আহমদের চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রে বাংলাদেশ নামটি এক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তৎকালে তাসাদ্দুক আহমদ এ সম্পর্কে একটি 'বুলেটিন' প্রকাশ করেন।[১০]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হল্যান্ড থেকে লন্ডনে ফিরে আসার পর ২৩ জুন স্টিয়ারিং কমিটির এক বৈঠকে **'বাংলাদেশ টু-ডে'** শীর্ষক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বৈঠকে শেখ আবদুল মান্নান সভাপতিত্ব করেন। পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমীর আলী, ড. কবীর উদ্দিন আহমদ (ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক) এবং আরো কয়েকজন উৎসাহী কর্মী। সুরাইয়া খানম, শিল্পী আবদুর রইফ এবং মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীও এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। ১ আগস্ট পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'সংবাদ পরিক্রমা' শীর্ষক বুলেটিনও ১১ নম্বর গোরিং স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হয় স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে। স্টিয়ারিং কমিটি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি আয়োজিত সভার রিপোর্ট 'সংবাদ পরিক্রমা'য় প্রকাশিত হয়। মহিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী এসব রিপোর্ট তৈরি করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংস্থায় এসব রিপোর্ট প্রেস বিজ্ঞপ্তি হিসেবে পাঠানো হয়। গোরিং স্ট্রীট থেকে আফরোজ চৌধুরীর সম্পাদনায় **'বাংলার রণাঙ্গণ'** শীর্ষক আরো একটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

'জয় বাংলা' শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা উত্তর ইংল্যান্ডের লিডস শহরে বসবাসকারী বাঙালি কর্মীরা প্রকাশ করেন। লিডসে অধ্যয়নরত ছাত্র মোহাম্মদ নূরুল হোদা পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

'জয় বাংলা' শীর্ষক আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'লন্ডন এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র হিসেবে । আমীর আলীর সম্পাদনায় পত্রিকাটির মোট ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বার্মিংহাম শহরে একটি উৎসাহী বাঙালি গ্রুপের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট' গঠিত হয়। ১৪ মার্চ লন্ডনের হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশের পর সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে বার্মিংহাম এ্যাকশন কমিটি নাম গ্রহণ করে। এই কমিটি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে 'বিদ্রোহী বাংলা' শীর্ষক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

'বাংলাদেশ' নামে আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় উত্তরে লন্ডনের এজওয়ার এলাকা থেকে । বি. করিম পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর লন্ডন থেকে বাংলাদেশ-বিরোধী 'পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্ট'-এর মুখপত্র হিসেবে **'মুক্তি'** নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন পাকিস্তানপন্থী বাঙালি আবুল হায়াত। উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য পাকিস্তান সরকার লন্ডনস্থ দূতাবাস মারফত প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে। এ সম্পর্কিত একটি গোপন দলিল ১০ অক্টোবর লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস্'-এ ফাঁস করে দেয়া হয়। পত্রিকাটির মাধ্যমে আবুল হায়াত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। বিচারপতি চৌধুরী সম্পর্কে একাধিক মিথ্যা ও মানহানিকর গুজব পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। আবুল হায়াত ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। মুক্তিযুদ্ধকে তিনি ভারতীয় হিন্দুদের

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান-বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করেন। **'মুক্তি'** পত্রিকায় কখনো কখনো ইংরেজিতে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইংরেজি লেখাগুলো পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে চীনপন্থী বাঙালিরা নিজেদের আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁদের মুখপত্র হিসেবে বাংলায় **'গণযুদ্ধ'** এবং ইংরেজিতে **'পিপল্‌স ওয়ার'** শীর্ষক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, মেসবাহউদ্দিন, জগলুল হোসেন ও ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাজাহান। প্রথম দিকে এর সাথে জড়িত ছিলেন বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম। পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। এ সম্পর্কেসাক্ষাৎকার অংশে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাঁরা 'গণযুদ্ধ' বিক্রির চেষ্টা করেছেন। পত্রিকা বিক্রি করতে গিয়ে তাঁরা অনেক জায়গায় স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সমর্থকদের হাতে নাজেহালও হয়েছেন।[১১]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃষ্ঠা- ৪৫-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন- 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫- পৃষ্ঠা-১৭২-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।
২. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-১৮৬।
৩. 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃষ্ঠা-৪৫-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন- প্রগুক্ত, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫- পৃষ্ঠা-১৭২-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।
৪. 'বিলেতে বাংলার যুদ্ধ', মজনু-নুল হক, পৃ. ৪৫-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন- 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫- পৃষ্ঠা-১৭২-এ উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন।
৫. সাক্ষাৎকারে, জাকারিয়া খান চৌধুরী
৬. সাক্ষাৎকারে, বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক)
৭. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭।
৮. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৩।
৯. ঐ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী,' পৃষ্ঠা, ২৭, ২২৪-২২৬।
১০. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৪।
১১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-৫২, ১২২, ১২৬, ১৫২; শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৬৬-৬৯, ১০৫-১০৬; আবদুল মতিন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাস বাঙালী', পৃষ্ঠা-১৯-২০, ৭১, ৮০, ১৬৫, ২২৯ এবং সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম।

৩.১৯ যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের তৎপরতা ঃ

যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালিরা প্রায় সবাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিছুসংখ্যক বাঙালি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বলে অপেক্ষমান শ্রেণী হিসেবে নিষ্ক্রিয় ছিলেন; যাঁদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। কারণ তাঁরা অনেকে আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। আবার বাংলাদেশে তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির দিকে খুবই নজর রাখছিলেন। পৃথিবীর সকল আন্দোলনেই এমন সুবিধাবাদীর দল পাওয়া যায়, তবে দুর্বল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য এটা দোষের নয় বলে মনে করেন প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে যুক্তরাজ্যে দো-দুল্যমান অবস্থায় থাকা বা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় থাকা বাঙালির সংখ্যা যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙালিরা যতোটুকু ধারণা করেছিলেন এই সংখ্যাটি তার চেয়ে বেশি ছিল বলে প্রফেসর এম. মোফাখখারুল ইসলাম মনে করেন। তবে খুব অল্পসংখ্যক বাঙালি প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করেন। এদের সংখ্যা দু'ডজনের বেশি হবে না বলে স্টিয়ারিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শেখ আবদুল মান্নান মনে করেন। বাঙালি হয়েও ব্যারিস্টার আব্বাস আলী, আজহার আলী, আফজাল হামিদ, আবদুল হক, আবুল হায়াত এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তান সরকারের সাথে পুরোপুরি সহায়তা এবং প্রকাশ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন।

মাওপন্থী বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেন নি। তাঁরা বিচারপতি চৌধুরী নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে পৃথকভাবে আন্দোলন করেন।

স্মৃতিকথায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেনঃ 'সেই দিন (১ মে, ১৯৭১) অপরাহ্নে বামপন্থী বাঙালিদের একটি সভা কনওয়ে হলে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। তবে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

দলের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও সর্বহারাদের কল্যাণ সাধিত হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। শেখ আবদুল মান্নান ও ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন।'[১]

তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলনের দুটি ধারার মধ্যে একটি মস্কোপন্থী এবং অন্যটি চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিল। মস্কোপন্থীরা বঙ্গবন্ধুর ছ'দফার পক্ষে এবং চীনপন্থীরা বিপক্ষে ছিলেন। ছ'দফার সঙ্গে যাঁরা একমত তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাইদুর রহমান মিয়া, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, নিখিলেশ চক্রবর্থী, ডা. সাইদুর রহমান ও হাবীবুর রহমান। ছ'দফার যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাজাহান, জগলুল হোসেন এবং আরো অনেকে।

গাউস খানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ 'কাউন্সিল ফর দি পিপল'স রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ কে' গঠিত হওয়ার পর ২২ নম্বর উইন্ডমিল স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। একটি বামপন্থী পত্রিকার সংবাদদাতা জানতে চান, উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কমিউনিস্ট বা মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাস করেন কিনা। তখন জিয়াউদ্দিন মাহমুদ হাত উঁচু করে বলেন, তিনি মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট এবং মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রতি আস্থাশীল। এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তব্য তিনি দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যমে কীভাবে দেশের মুক্তি আসবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন, সেই মুক্তি হবে আসল মুক্তি, অন্যের ওপর নির্ভরশীল মুক্তি আসবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন, সেই মুক্তি হবে আসল মুক্তি, অন্যের ওপর নির্ভরশীল মুক্তি নয়। 'সম্প্রসারণবাদী' ভারত এবং 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' রাশিয়ার সেখানে কোনো প্রভাব থাকবে না। আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হবো।

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত (২৪ এপ্রিল) হওয়ার পর লন্ডনের রেড লায়ন স্কোয়ারে অবস্থিত কনওয়ে হলে জিয়াউদ্দিন মাহমুদ পরিচালিত একটি জনসভায় লন্ডন এ্যাকশন কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে সাখাওয়াত হোসেন এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান যোগদান করেন। জিয়াউদ্দিন তাঁর বক্তৃতায় দাবি করেন, তিনি ঢাকা জেলে তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে একই সেলে বন্দি ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরীকে তিনি চিত্রিত করেন একজন ভূস্বামী ও সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কেও জিয়াউদ্দিন প্রশ্ন করেন। জগলুল হোসেন, ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাজাহান এবং আরো কয়েকজন বক্তৃতা করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলিভাবেই নিজেদের নকশালপন্থী বলে দাবি করেন।[২]

মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালি হয়েও যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবুল হায়াতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দেশের বাড়ি বৃহত্তর সিলেট জেলায়। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের অধিকাংশ এই অঞ্চলে থেকে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা চালান। পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী প্রচারণা চালাবার জন্য আবুল হায়াতের সম্পাদনায় 'মুক্তি' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অজুহাতে ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ-বিরোধী এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হায়াত। ১৬ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, দু'সপ্তাহ আগে ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশ সমর্থক বাঙালিদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশের জবাব হিসেবে 'পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্ট' এই সমাবেশের আয়োজন করে। এপ্রিল মাসে আবুল হায়াতের নেতৃত্বে বার্মিংহামে প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করে। পূর্ববঙ্গে গণহত্যা সংঘটনের অভিযোগ অস্বীকার করে পাকিস্তান হাই কমিশন প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র এই সমাবেশে বিলি করা হয়।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. কিয়ারনান ১৯ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেন, বহুসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী তাদের বর্বর সরকার এবং পূর্ববঙ্গে তাদের সামরিক বাহিনী সংঘটিত পাশবিক অত্যাচারের সমর্থনে ১৫ আগস্ট লন্ডনে যে সমাবেশের আয়োজন করে, তার সংবাদ অবগত হয়ে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন। এই সমাবেশ থেকে মনে হয়, অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই রাজনৈতিক দৃষ্টিহীনতা, গোঁড়ামি এবং নিন্দনীয় নেতৃত্বের মনোভাব সঙ্গে এসেছে। এসব নিজের দেশে রেখে আসা উচিত ছিল। ২৩ আগস্ট উল্লেখিত পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবাদপত্রে আবুল হায়াত নিজেকে পূর্ব পাকিস্তানী হিসেবে পরিচয় দিয়ে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই 'পূর্ব বঙ্গে'র নাগরিক বলে দাবি করেন।

যুক্তরাজ্যে গোঁড়া পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ব্যারিস্টার আব্বাস আলী। তিনি ইংল্যান্ডে আইনের ছাত্র হিসেবে বিচারপতি চৌধুরী সমসাময়িক ছিলেন। ভারত-বিভাগের আগে বিচারপতি চৌধুরী যখন এ দেশে আসেন, তার আগেই আব্বাস আলী আসেন। লন্ডন অবস্থানকালে তাঁকে দেখাশোনা করার অনুরোধ জানিয়ে বিচারপতি চৌধুরীর পিতা আব্বাস আলীকে চিঠি লেখেন। লন্ডনের ছাত্রজীবনে তাঁর সৌজন্যের কথা স্মরণ করে বিচারপতি চৌধুরী আব্বাস আলীর কাছে ঋণী বোধ করেন। আব্বাস আলীর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সত্তরের দশকের শেষদিকে আব্বাস আলী গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে দেখতে যান। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। আব্বাস আলী বিচারপতি চৌধুরীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং কথা বলতে রাজি হলেন না। বিচারপতি চৌধুরী আন্তরিক কণ্ঠে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, আমি তোমাকে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে দেখা করতে এসেছি। তুমি অতীতে আমার সঙ্গে যে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছ তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এসেছি; কিন্তু আব্বাস আলী কোনো কথা বললেন না।

মৃত্যুর আগে আব্বাস আলী নির্দেশ রেখে যান, তাঁকে যেন পাকিস্তানে কবর দেয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কবরের পাশে যথারীতি মর্যদার সঙ্গে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ড. মোহর আলী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য লন্ডনে আসেন। ৭ জুলাই (১৯৭১) 'দি টাইমস্'-এর চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁরা দাবি করেন, ২৫ মার্চ কিংবা তারপর চট্টগ্রাম কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে নি। তাঁরা স্বীকার করেন, ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এবং জগন্নাথ হলের আশপাশে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে নয়জন শিক্ষক মারা যান। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হল দুটি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সামরিক আক্রমণের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার না করলে এই 'দুঃখজনক' ঘটনা এড়ানো যেতো বলে তাঁরা দাবি করেন।

দেশপ্রেমিক বাঙালিরা ইউরোপ, আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে সাজ্জাদ হুসাইন ও মোহর আলী পরিবেশিত নির্লজ্জ মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হন। ১৬ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম. হোসেন এবং বাংলার অধ্যাপক এম. ইসলাম উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সাজ্জাদ হুসাইনের পাকিস্তানপ্রীতি এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাজির করেন।

পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর জন্য বেসরকারিভাবে যাঁদের বিদেশে পাঠায়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান। তিনি তাঁর স্বামী এস. এ. সোলায়মানের সঙ্গে ২০ জুলাই লন্ডনে এসে হাজির হন। তাঁর বক্তব্য ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তানে যে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে তা গৃহযুদ্ধ এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ঢাকায় গণহত্যার সম্পর্কে ভারতীয় প্রচার ভিত্তিহীন।

বেগম সোলায়মান পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সংঘটিত গণহত্যাকে সমর্থন করে জুন মাসে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, তাঁর পিতা বেঁচে থাকলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করতেন।

বেগম সোলায়মান ও তাঁর স্বামী লন্ডনে এসে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তান সমর্থক হিসেবে পরিচিত ব্যারিস্টার আব্বাস আলী, আজহার আলী, আফজাল হামিদ, আবদুল হক এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক আবুল হায়াত তাঁদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেন। কয়েকজন পাকিস্তান সমর্থন পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গেও তাঁরা দেখা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিগ্ ডেভিডসন এবং মিসেস জিল নাইট (পরবর্তীকালে ডেইম্ নাইট)। তবে বাঙালি মহলে বেগম সোলায়মান সুবিধা করতে পারেন নি। দেশপ্রেমিক বাঙালিরা তাঁকে আমল দেন নি।

স্টিয়ারিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শেখ আবদুল মান্নানের সঙ্গে শিগগিরই বেগম সোলায়মান টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন ঃ 'মান্নান ভাই, 'জেনোসাইড' (গণহত্যা) হয় নি, অফিসার হত্যা করা হয় নি, সব ভারতীয় 'প্রোপাগান্ডা'। 'বর্ডারে' কিছুসংখ্যক 'রিফিউজি' রয়েছে; ওরা তাদের লাশ দেখিয়ে দিয়েছে। আর ইউনিভার্সিটির ওখানে ওরা কয়েকজন ছাত্র মেরে তাদের ফটো বাইরের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

শেখ মান্নান বলেন 'আপনি তো অনেক কিছুই জানেন; নিহত অধ্যাপকদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে; তাঁরা কি তা হলে বেঁচে আছেন? আপনি কি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন? তাঁরা জীবিত কি মৃত-সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?'

বেগম সোলায়মান বললেন ঃ 'আমি কি করে যাব?'

শেখ মান্নান বলেনঃ 'আপনার জন্য তো পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুন। খোঁজখবর না নিয়ে এখানে এসে বিচারপতি চৌধুরীকে টেলিফোন করবেন না।'

শেখ মান্নানের মুখে বেগম সোলায়মানের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি চৌধুরী শহীদ সোহরাওয়ার্দী পুত্র রাশেদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রস্তাব করেন। স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এ্যাভনে অবস্থিত কাশ্মীর রেস্তোরাঁ'র মালিক আরব আলীর সঙ্গে রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর পরিচয় ছিল। রাশেদ তখন রয়াল সেক্সপিয়ার থিয়েটার কোম্পানির সদস্য হিসেবে স্ট্র্যাফোর্ডে থাকতেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরব আলী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজের গাড়িতে করে রাশেদ সোহরাওয়ার্দীকে স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে নিয়ে আসেন। বিচারপতি চৌধুরী পরামর্শ অনুযায়ী রাশেদ সোহরাওয়ার্দী বেগম সোলায়মানের বিবৃতির প্রতিবাদ জানাতে রাজি হন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি 'মুজিবনগর' সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কাছে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রের বক্তব্য যথাসময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এক লিখিত পত্রে ৭ অক্টোবর রাশেদ সোহরাওয়ার্দী বলেনঃ 'পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর উদ্যোগে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের মুক্তি সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থক। রাজনীতিতে জড়িত না থাকায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বিবৃতি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। আমাদের পরিবারের একজন সদস্য (বেগম সোলায়মান) তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে আমার প্রিয় পিতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন বলে বুঝতে পারার পর আমার বক্তব্য পেশ করা অবশ্যকর্তব্য বলে আমি মনে করি।

"আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বিজয় আমি কামনা করি। গত ২৪ বছর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তান তাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ করে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্বাধীনে রাখে। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী গণহত্যা ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধজনক কর্মকাণ্ড শুরু করার পর তারা (বাংলাদেশের জনগণ) অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা আক্রমণকারী সৈন্যদের উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে গিয়ে দেখবো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা শান্তি ও সম্প্রীতিমূলক পরিবেশে জীবন-যাপন করছে।

বাংলাদেশ সরকারকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সরকারের সদস্যবৃন্দের সবাই আমার পিতার সহকর্মী এবং স্নেহের পাত্র ছিলেন।"[৩]

মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান সরকার যাঁদের বিদেশে পাঠায় তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর (পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ অবজারভার') মালিক হামিদুল হক চৌধুরী এবং তৎকালীন গণতন্ত্রী দলের সেক্রেটারি-জেনারেল মাহমুদ আলী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুলফিকার আলী ভুট্টো মাহমুদ আলীকে দালালির পুরস্কার হিসেবে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হামিদুল হক চৌধুরী ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করে লন্ডনে পৌঁছান। ইতোমধ্যে মাহমুদ আলীও লন্ডনে পৌঁছান। তাঁরা উভয়ে বেজওয়াটার এলাকার ব্যয়বহুল রয়াল ল্যাঙ্কাস্টার হোটেলে ওঠেন। পাকিস্তান সরকার তাঁদের ব্যয়ভার বহন করে। তাঁদের ভাতাদান সম্পর্কিত দলিলের 'ফ্যাক্সিমিলি' লন্ডনের সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকার ৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।

মি. চৌধুরী ও মি. আলী লন্ডনে মাত্র কয়েক দিন অবস্থান করেন। কয়েকটি বাঙালি রেস্তোরাঁয় গিয়ে তাঁরা ঘরোয়া আলাপ-আলোচনাকালে ভারতের তথাকথিত দুরভিসন্ধির কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা দাবি করেন, ১৯৪৭ সালে ভারত দেশ-বিভাগ মেনে নেয় নি। তাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছে। ব্যারিস্টার আব্বাস আলী এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে মি. চৌধুরী এবং মি. আলীকে বলা হয়, জনসভায় বক্তৃতাদান করার চেষ্টা করা হলে তাঁদের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে। তার ফলে তাঁরা জনসভায় বক্তৃতাদানের পরিকল্পনা ত্যাগ করে আমেরিকায় চলে যান। হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলী পূর্ববঙ্গে হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের লক্ষ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্দেশে ও সহায়তায় গঠিত শান্তি কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন।[৪]

উল্লেখযোগ্য

এ পর্যায়ে উপরোল্লিখিত তথ্য ও অন্যান্য সূত্রের আলোকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যক্রমের নিম্নরূপ একটা ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া যায় ঃ

১ জুন লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের মুখপত্র 'পাকিস্তান নিউজ'-এ পূর্ব বঙ্গের ৫৫ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর নামে প্রচারিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। মে মাসে নিউইয়র্কের 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি এমেরিটাস' পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক বিবৃতি প্রচার করে। মার্কিন শিক্ষাবিদদের বিবৃতির অসারতা প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক-চক্র মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব বঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের নামে ১৬ মে ঢাকা থেকে প্রচারিত এই বিবৃতিতে বলা হয়, সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে তথাকথিত চরমপন্থীরা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে একতরফাভাবে স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে এবং যারা এর বিরোধিতা করে তারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মেশিনগান ও মর্টার সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস জগন্নাথ হলকে গোপন অস্ত্রাগারে পরিণত করে হলের প্রাঙ্গন মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এই সশস্ত্র প্রচেষ্টা বানচাল কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এই সশস্ত্র প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে বলে বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, কাজী দীন মোহাম্মদ, শামসুল হুদা চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তানপন্থীর নাম দেখে প্রবাসী বাঙালিরা এই বিবৃতি পাকিস্তানী অপপ্রচারের উদাহরণ বলে নিশ্চিত হন।[৫]

মে মাসের গোড়ার দিকে করাচির ইংরেজি দৈনিক 'দি ডন' পত্রিকার লন্ডন সংবাদদাতা নাসিম আহমদ 'দি রয়াল কমনওয়েলথ সোসাইটি'র এক সভায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে তাঁকে বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সভায় উপস্থিত বাঙালি শ্রোতারা নাসিম আহমদের অশালীন উক্তির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জানায়। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বিচারপতি চৌধুরীকে হাইকোর্টের জজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আওয়ামী লীগের ছয়-দফা সম্পর্কে বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণ জানান। পাকিস্তান হাই কমিশনার সালমান আলী এই আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করার জন্য দাবি জানান। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ এই দাবি উপেক্ষা করেন। এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য সালমান আলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ৮ জুন 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপ অনুচিত বলে স্যার আলেক মন্তব্য করেন। পাকিস্তানপন্থী বাঙালি ডেপুটি হাই কমিশনার সেলিমুজ্জামান ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে সোসাইটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। ১২ জুন 'দি টাইমস্'- এ প্রকাশিত এক সংবাদে পাকিস্তানের হাই কমিশনারের মনোভাব 'উদ্ধত' বলে উল্লেখ করা হয়।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আলস্টারের ইউনিয়নপন্থী পার্লামেন্ট সদস্য জেমস্ কিল্‌ফেডার, শ্রমিকদলীয় সদস্য জেমস্ টিন এবং টোরি দলীয় সদস্য মিসেস জিল নাইট (পরবর্তীকালে ডেইম্ নাইট) পাকিস্তান সফরে যান। 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রেরিত একাধিক তারবার্তায় মিসেস নাইট নিজেকে পাকিস্তান ও ইয়াহিয়া খানের অন্ধভক্ত বলে প্রমাণ করেন।

১৪ জুন 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক তারবার্তায় মিসেস নাইট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন। এই সাক্ষাৎকারকালে শেখ মুজিবকে পূর্ব বঙ্গ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে ইয়াহিয়া খান বলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা বহু লোককে হত্যা করেন। এই তারবার্তায় আরও বলা হয়, শেখ মুজিবের সৈন্যবাহিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পূর্ববঙ্গে নিয়োজিত প্রত্যেক পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল বলে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন। এই পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী তড়িৎগতিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

১৬ জুন 'দি টাইমস্' পত্রিকায় একটি সন্দেহজনক সংবাদ প্রকাশিত হয়। রাতারাতি গজিয়ে ওঠা 'এশিয়ান নিউজ সার্ভিস' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা পালিয়ে গিয়েছিলেন তারা ফিরে আসতে শুরু করেছেন। ঢাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাজারগুলোতে আবার বেচাকেনা শুরু হয়েছে। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ছোট শহরগুলোর শাসনভার গ্রহণ করেছেন। ... পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আওয়ামীলীগ দলভুক্ত ১৬৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ব্যাপক ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে সামরিক সরকারের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর আরও বহু সদস্য এদের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ... প্রাক্তন চিফ জাস্টিস ও আইনমন্ত্রী কর্নেলিয়াস এবং প্রাক্তন এটর্নি জেনারেল মঞ্জুর কাদির একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নে ব্যস্ত রয়েছেন। ... ঢাকার জনৈক মধ্যবিত্ত বাঙালি কেরানির মন্তব্য থেকে পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। এই কল্লোকনিবাসী কেরানি বলেন: 'আমরা চাই শান্তি; বাংলাদেশ না পাকিস্তান তা আমরা জানতে চাই না।'

১৯ জুন 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক তারবার্তায় মিসেস জিল্ নাইট বলেন, পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপক সফরকালে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সংঘটিত গণহত্যার কোনো প্রমাণ পান নি। বরং আওয়ামী লীগের 'চরমপন্থী' সদস্যদের নৃশংসতার প্রমাণ পেয়ে তিনি বিচলিত হয়েছেন। ঢাকার নতুন শহর থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য জহিরুদ্দিন তাঁকে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন তিনি সমর্থন করেন না। পাকিস্তান সরকার শান্তি ফিরিয়ে আনবে বলে তিনি (জহিরুদ্দিন) বিশ্বাস করেন। করাচি থেকে প্রেরিত মিসেস নাইটের এই তারবার্তায় পাকিস্তান সামরিক চক্রের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

২৭ জুন 'দি সানডে টাইমস'-এর রাজনৈতিক ভাষ্যকার হুগো ইয়াং এক নিবন্ধে বলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি নেতৃবৃন্দের 'হাস্যকর নির্বুদ্ধিতার' জন্য রক্ষণশীল দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মিসেস জিল্ নাইটের নেতৃত্বে প্রেরিত পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের সফরকে সামরিক সরকার অন্তত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তাদের অপপ্রচারের স্বপক্ষে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যাপক হারে হত্যা করেছে বলে মিসেস নাইট এখন স্বীকার করছেন। এর জন্য পাকিস্তানকে ভুল বোঝা উচিত হবে না বলে তিনি (মিসেস নাইট) মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মি. ইয়াং ১৪ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর তারবার্তায় উল্লেখ করেন। উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তারবার্তায় মিসেস নাইট বলেন, সামরিক বাহিনী সংঘটিত ব্যাপক হারে হত্যার কোনো প্রমাণ তিনি পান নি। হত্যা সম্পর্কিত খবরগুলো পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিদেশী সংবাদপত্রগুলো পূর্ব বাংলার 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরে না আসার জন্য দায়ী বলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মিসেস নাইট ইঙ্গিত করেন।

বিগত সপ্তাহে 'দি সানডে টাইমস্'- এর সংবাদদাতাকে বলেন: 'জরুরি অবস্থার চরম পর্যায়ে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি নিশ্চিত; কিন্তু এখনও তা ঘটছে বলে আমি মানতে রাজি নই।'

মি. ইয়াং প্রকাশ করেন, ব্রিটেন ও পাকিস্তান প্রায় একই সঙ্গে পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের পাকিস্তান সফরের প্রস্তাব করে। ১৪ মে পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনাকালে পররাষ্ট্র ব্যাপারে শ্রমিকদলীয় মুখপাত্র ডেনিস্ হিলি এ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন। সরকার ও বিরোধীদল একমত হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল, পররাষ্ট্র দপ্তর, পার্লামেন্টের কর্মসূচি নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী উইলিয়াম হোয়াইট্‌ল' এবং রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের চিফ হুইপ যথাক্রমে ফ্রান্সিস পিম ও বব্ মেলিস্ এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

১৪ মে পাকিস্তান হাই কমিশন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে পাঠাবার উদ্যোগে গ্রহণ করে। ব্রিটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী উভয় সরকারের সম্মতি নিয়ে পার্লামেন্টের প্রবীণ সদস্যদের পাঠানো হবে এবং ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ব্যয়ভার বহন করবে বলে আশা করা হয়েছিল। পাকিস্তানিরা প্রবীণ সদস্যদের পরিবর্তে তাদের মনোনীত সদস্যের আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্লামেন্টের 'হুইটসান' ছুট শেষ হওয়ার আগেই পাকিস্তান মিসেস নাইট ও তাঁর সঙ্গীদের আমন্ত্রণ জানায়। পার্লামেন্টের ৬৩০ জন সদস্যের মধ্যে এই তিনজনকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হয়, সে সম্পর্কে পাকিস্তান হাই কমিশনে নিয়োজিত কাউন্সেলার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি বলে মি. ইয়াং উল্লেখ করেন।

উল্লিখিত প্রতিনিধিদলের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে রক্ষণশীল দলীয় সদস্য স্যার ফ্রেডারিক বেনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পার্লামেন্ট সদস্যদের সমবায়ে গঠিত এ্যাংলো-পাকিস্তান গ্রুপের চেয়ারম্যান। তিনি 'স্টার অব পাকিস্তান' পদক ধারণা করে গর্ব বোধ করেন। তাঁর পিতা মি. জিন্নাহর বন্ধু ছিলেন বলে তিনি পার্লামেন্টে বক্তৃতাদানকালে প্রকাশ করেন।

সর্বদলীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল পাঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি ও বিরোধীদলের সদস্যরা ছুটির শেষে ৮ জুন পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মিসেস নাইটের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদল ১১ জুন পাকিস্তান রওয়ানা হবেন বলে জানতে পারেন। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিনিধি পাঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা মিসেস নাইট ও তাঁর সঙ্গীদের সফর বাতিল করার চেষ্টা করেন। প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রী জেমস্ র‍্যামসডেন ও মি. হিলির নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে তাঁদের তিনজনকে গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়। ১০ জুন এই নবগঠিত প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নাম যখন ঘোষণা করা হয়, তখন পর্যন্ত কয়েকটি জরুরি কাজ সমাধা করা হয় নি। প্রতিনিধি ভারত অথবা পাকিস্তানে যাবে, নাকি উভয় দেশে যাবে, তা স্থির করা হয় নি। ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার আগে বিদেশ সফররত মি. হিলির সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে মিসেস নাইট ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের পথে রওনা হন।

পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলো মিসেস নাইটের পাকিস্তান-প্রীতি সম্বল করে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ও ভারতবিদ্বেষী প্রচারণায় মনোনিবেশ করে। রেডিও পাকিস্তানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিসেস নাইট বলেন, ব্রিটিশ সংবাদপত্রে অত্যধিক পরিমাণে 'উড়ো-খবর ও একতরফা ভারতীয় প্রচারণা' ছাপানো হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ব্রিটিশ টেলিভিশনের সংবাদ পরিক্রমায় জিল নাইটের পূর্ব বাংলা সফর সম্পর্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই চলচ্চিত্রে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক জনসমাবেশ আলোচনারত মিসেস নাইটকে দেখানো হয়। এই সমাবেশ মুসলিম লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান দেশে কোনো গোলযোগ কিংবা অশান্তি আছে কি না জিজ্ঞেস করার জন্য মিসেস নাইটকে অনুরোধ করেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সমাবেশের মধ্যে থেকে বলা হয়, দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল।

পূর্ব লন্ডনের প্রবীন সমাজকর্মী আবদুল মালেক ১৯৮৪ সালের মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, উল্লিখিত সংবাদ-পরিক্রমা দেখার পর তিনি গভীর রাতে শ্রমিকদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোরের সঙ্গে টেলিফোনযোগে আলাপ করেন। মি. শোরকে তিনি বলেন, অবিলম্বে এই মিথ্যা প্রচারণার জোরালো প্রতিবাদ না করা হলে বাংলাদেশ সম্পর্কে পার্লামেন্টে উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি ইতোমধ্যে যাঁরা সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। তিনি মি. মালেককে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদপত্র নিয়ে পরদিন পার্লামেন্টে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। মি. মালিক তাঁর কন্যার সাহায্যে একটি প্রতিবাদপত্র টাইপ করে পরদিন মি. শোরের হাতে পৌঁছে দেন। মি. শোর এই প্রতিবাদপত্র নিয়ে শ্রমিকদলীয় নেতা মি. হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে আলাপ করেন। পার্লামেন্ট-বহির্ভূত বাংলাদেশ সমর্থক মহলও পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা বন্ধের দাবি জানায়। বিচারপতি চৌধুরীও এ ব্যাপারে কর্মতৎপরতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের প্রতি সমর্থনকারী পার্লামেন্ট সদস্যদের সহায়তায় আরও চারজন সুপরিচিত সদস্যকে বাংলাদেশ ও ভারত পরিদর্শনের জন্য তিনি রাজি করান। এঁদের মধ্যে ছিলেন রক্ষণশীল দলভুক্ত জেমস্ র‍্যামসডেন ও টৌবি জ্যাসেল এবং শ্রমিক দলভুক্ত আর্থার বটমলি রেজ প্রেন্টিস। ২১ জুন তাঁরা লন্ডন ত্যাগ করেন।'

'বাংলাদেশ নিউজলেটার'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফরিদ এস. জাফরী জুন মাসে লিখিত এক খোলা-চিঠিতে মিসেস জিল্ নাইটের পাকিস্তান-প্রীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই চিঠিতে বলা হয়, আপনি যদি 'দি সানডে টাইমস্'-এ প্রকাশিথ এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের 'গণহত্যা' শীর্ষক বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ে থাকেন, তা হলে আপনি নিশ্চয় হত্যাযজ্ঞের স্থান ও কাল এবং নিহতদের নাম-ঠিকানা লক্ষ্য করেছেন। এসব প্রামাণ্য তথ্য আপনি কি অস্বীকার করতে চান? হিন্দু ও মুসলমানদের জ্বালিয়ে দেয়া বাড়িঘর কি আপনি দেখেছেন? পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রে হিন্দুদের সমূলে উৎখাত করে দেশত্যাগে বাধ্য করার দাবি সম্পর্কিত খবর কি আপনি পড়েছেন? পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ইসলামাবাদে গিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর বাস্তুত্যাগীদের দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে হওয়া আপনার নিরপেক্ষতার অভাব প্রমাণ করে। আপনি স্বেচ্ছায় নিতান্ত বোকার মতো পাকিস্তান সরকারে মিথ্যা প্রচারণার শিকার হয়েছেন বলে আমরা অবাক হচ্ছি। মানবাধিকারে সমর্থক না হয়ে আপনি নিজেকে খুনি সরকারে অন্ধ-সমর্থক বলে প্রমাণ করেছেন। ব্যাপারটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও আপাতবিরোধী সত্য, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। মহান মুক্তিযোদ্ধাদের চরম আত্মত্যাগ ও কষ্টভোগ সম্পর্কে আপনার অযৌক্তিক মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা ও ক্ষোভ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে আপনার লজ্জাকর ভূমিকা সম্পর্কে রায় দেয়ার ভার আমরা ব্রিটেনের জনগণের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

১ জুলাই 'দি টাইমস' -এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পাকিস্তান সফরকারী তথাকথিত পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের নেত্রী হিসেবে মিসেস জিল্ নাইটের যোগ্যতা সম্পর্কে খ্যাতনামা সাংবাদিক বার্নার্ড লেভিন সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফর করে নিরপেক্ষ মতামত দেয়া মিসেস নাইটের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৬]

৭ জুলাই 'দি টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ড. মোহর আলীর যুক্তভাবে স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ চিঠি হয়। লন্ডনের রয়াল গার্ডেন হোটেল থেকে লিখিত এই চিঠির মাধ্যমে তাঁরা উভয়েই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের সামরিক চক্রের সমর্থনের নির্জলা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেন। বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার জন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকার সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন ও মোহর আলীর ব্যয়বহুল সফরের ব্যবস্থা করে।

উল্লিখিত চিঠিতে তাঁরা বলেন, গ্রেট ব্রিটেনের বহু লোক মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ বহুসংখ্যক বাঙালিকে মার্চ মাসের ২৫/২৬ তারিখে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে-একথা জানতে পেরে তাঁরা (সাজ্জাদ হুসাইন ও মোহর আলী) বিস্মিত হয়েছেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, বুদ্ধিজীবীদের বেপরোয়াভাবে হত্যা করা হয় নি। ২৫ মার্চ কিংবা তারপর চট্টগ্রাম কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপককে হত্যা করা হয় নি। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলের আশপাশে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে নয়জন অধ্যাপক মারা গিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এই ছাত্রাবাসগুলোকে ঘাঁটি করে সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ না করলে এই প্রাণহানি এড়ানো যেতো। তাঁদের 'ব্যক্তিগত বন্ধু' অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা গুলির আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে তিন দিন পর মারা যাওয়ার আগে তাঁর বন্ধুদের কাছে নাকি বলেছেন, আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁর বাড়িতে না ঢুকলে তিনি সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ এড়াতে পারতেন।

তাঁরা দাবি করেন, ২৫ মার্চ ঢাকা ও রাজশাহীর ছাত্রাবাসে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী ৩ মার্চ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেয়ার ফলে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রাবাস ত্যাগ করে। এই সুযোগে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলকে অস্ত্রাগারে পরিণত করে।

মার্চ মাসে সামরিক আক্রমণের আগে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করছিল বলে তাঁরা মনে করেন। তখন নাকি জনসাধারণের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যাদের মতভেদ ছিল তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং ১৩ এপ্রিল সৈন্যবাহিনীর রাজশাহী দখল করার আগে, আওয়ামী লীগের আদর্শের প্রতি আস্থাহীন অধ্যাপকদের হত্যা করার জন্য বারবার চেষ্টা করা হয় বলে তাঁরা দাবি করেন। অবাঙালি অধ্যাপকদের তখন ঘরবন্দি করে রাখা হয়। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী এই অরাজকতা দমন না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অবাঙালি অধ্যাপকের মৃত্যু অবধারিত ছিল বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।'[৭]

জুলাই মাসের শেষ দিকের আরও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের সামরিক সরকার কিছুসংখ্যক পাকিস্তান-ভক্ত বাঙালিকে সরকারি খরচে বিদেশে পাঠায়। নেজামে ইসলামের নেতা মৌলবী ফরিদ আহমেদ এদের অন্যতম। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফরকালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সংঘটিত হত্যাযজ্ঞকে তিনি 'ইসলামি জেহাদ' বলে দাবি করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি ভারতে কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পরিচালিত 'ইসলামি জেহাদ'কে সমর্থন করা মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।'[৮]

মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ফরিদ আহমদের এই প্রচার অভিযান ফলপ্রসু হয় নি। তাই তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। করাচি ফিরে গিয়ে তিনি এক গাঁজাখুরি কাহিনী সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন রিডার রেহমান সোবহান এবং লন্ডন প্রবাসী 'কমিউনিস্টপন্থী' পাকিস্তানী ছাত্রনেতা তারিক আলী ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত এক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বৈরুতে পৌঁছান। বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় তাঁরা বক্তৃতাদানের চেষ্টা করেন। কর্তৃপক্ষ এই সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ভারতীয় দূতাবাসগুলোর উদ্যোগে তাঁদের জন্য অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা আরব দেশগুলোর অনুমতির অভাবে পরিহার করা হয়। এই প্রতিনিধিদলের সব খরচ ভারত সরকার বহন করে এবং ভারতীয় অফিসারগণ সর্বদা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। পাকিস্তানী সংবাদপত্রে উপরোক্ত মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক কাহিনী ফলাও করে প্রকাশ করা হয়।'

২ আগস্ট লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনারের 'চ্যান্সেরি' বিভাগের অফিসার বখতিয়ার আলী স্বাক্ষরিত এক দলিলে প্রকাশ, ইয়াহিয়া খানের পক্ষে প্রচারণা চালাবার জন্য যুক্তরাজ্য সফরকারী বেগম আখতার সোলায়মান (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা) ও তাঁর স্বামী এস এ সোলায়মানকে ভাতা বাবদ নগদ অর্থ দেয়া হয়। ২০ জুলাই থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য দৈনিক সাড়ে সাত পাউন্ড হিসেবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মোট ৪২০ পাউন্ড গ্রহণ করেন। সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে বেগম সোলায়মান পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিদেশ সফরকালে তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোনো টাকা নেবেন না। বি বি সি'র উর্দু সার্ভিস প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারকালেও তিনি জোর গলায় বলেন, পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে তিনি কোনো টাকা গ্রহণ করেন নি।

লন্ডনের সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকায় ভাতাদান সম্পর্কিত সরকারি দলিলটির 'ফ্যাক্সিমিলি' ১৯৭১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ছাপানো হয়। উক্ত দলিল সম্পর্কিত সংবাদ 'বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নগ্নরূপ' শিরোণাম দিয়ে প্রকাশিত হয়।'

৫ আগস্ট পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশকরে। 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বাঙালিরা সবকিছুর জন্য দায়ী বলে এই তথাকথিত দলিলে অভিযোগ করা হয়। ৬ আগস্ট 'দি টাইমস্' ও 'দি গার্ডিয়ান'-এ দলিলটির সারমর্ম প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত দলিলে বলা হয়, সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনাকালে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জন্য প্রকারান্তরে স্বাধীনতা আদায়ের চেষ্টা করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা করেন।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত এই দলিলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়: ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের 'জাতীয়তাবাদী' আওয়ামী লীগ এক লক্ষ পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে; ২. ২৬ মার্চ সকালবেলা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য আওয়ামী লীগ একটি পরিকল্পনা তৈরি করে; ৩. ভারতের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে আওয়ামী লীগ তাদের পরিকল্পনা তৈরি করে এবং ভারত অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

দলিলটির পরিশিষ্টে বলা হয়, চট্টগ্রাম এলাকা পাঁচ দিন যাবৎ বিদ্রোহীদের দখলে থাকাকালে ১০ থেকে ১২ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। তাছাড়া বগুড়া ও খুলনায় যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৮ হাজার বিহারিকে হত্যা করা হয়।

এই মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বঙ্গে তাদের সামরিক বাহিনী সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের জন্য আওয়ামী লীগ ও ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদপত্রগুলো 'শ্বেতপত্রে'র বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে।[৯]

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমদিকে 'পাকিস্তান অবজারভার' (বর্তমানে 'বাংলাদেশ অবজারভার') পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করে লন্ডনে পৌঁছান। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য তাঁকে এবং গণতন্ত্রী দলের নেতা মাহমুদ আলীকে (বর্তমানে পাকিস্তানের নাগরিক) বিদেশে পাঠানো হয়। লন্ডনে তাঁরা বিখ্যাত রয়াল ল্যাঙ্কাস্টার হোটেলে অবস্থান করেন। পাকিস্তান সরকার তাঁদের ব্যয়ভার বহন করে। ভাতাদান সম্পর্কিত সরকারি দলিলের 'ফ্যাক্সিমিলি' লন্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনমত'-এর ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।'[১০]

ল্যাঙ্কাস্টার হোটেল থেকে টেলিফোন করে হামিদুল হক চৌধুরী লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক আবদুল মতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।'[১১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনাকালে মি. চৌধুরী বলেন, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা চায় না। বিগত নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার 'ম্যান্ডেট' তাঁকে দেয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

মি. মতিন বলেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে।

মি. চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ও সাহস আওয়ামী লীগের নেই। বাঙালিদের সাহসের অভাব সম্পর্কে তিনি ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে গল্প বললেন। পতেঙ্গায় বিমানবন্দরের 'কন্ট্রোল টাওয়ার' দখলকারী বাঙালি সৈন্যরা খাকি পাঠান সৈন্যদের দেখেই হাতের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে 'সেলুট' দিয়ে দাঁড়ায়। ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, এদের নিয়ে শেখ মুজিব যুদ্ধ করবে!

মি. মতিন বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাঙালিদের আর কোনো উপায় নেই।

মি. চৌধুরী বললেন, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ ভারতের হাতের-পুতুল মাত্র। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান দখল করে তাহলে মুসলমানরা এক হাজার বছর ধরে হিন্দুদের গোলাম হয়ে থাকবে।

আবদুল মতিন তাঁর যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা করেন। মি. চৌধুরী শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি এ ব্যাপারে মাহমুদ আলীর সঙ্গে কথা বলো। সে তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে।

মি. মতিনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মি. চৌধুরী তাঁকে মাহমুদ আলীর রুমে নিয়ে যান। তাঁর মুখেও একই যুক্তি শোনা গেল।

হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলী কয়েক দিন লন্ডনে ছিলেন। কয়েকটি বাঙালি রেস্তোরাঁয় গিয়ে তাঁরা ঘরোয়া আলোচনাকালে ভারতের তথাকথিত দুরভিসন্ধির কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, ভারত ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগ মেনে নেয়নি। তাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগকে তারা সমর্থন করছে। ব্যারিস্টার আব্বাস আলীসহ মাত্র অল্প কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী বাঙালি মাহমুদ আলী ও হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গোলযোগের আশঙ্কায় তাঁরা প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে জনসভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।'[১২]

১৫ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশ-বিরোধী একটি জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' এই জনসমাবেশকে 'অদ্ভুত সার্কাস' বলে অভিহিত করে।

লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কয়েকজন বাঙালি 'কুইসলিং' যোগদান করে। এদের নেতা মোহাম্মদআবুল হায়াত পাকিস্তানি অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণার জন্য 'মুক্তি' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে।

টোরিদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য এবং লন্ডনস্থ পাকিস্তান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জন বিগ ডেভিডসন এম.পি. তাঁর বক্তৃতায় পাকিস্তানী গণতন্ত্রের প্রশংসা করেন। অন্যান্য বক্তা মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, বি বি সি এবং ব্রিটিশ শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন।

১৬ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, দু'সপ্তাহ আগে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থক বাঙালিদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশের পাল্টা জবাব হিসেবে 'পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্ট' ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত জনসমাবেশের আয়োজন করে। এপ্রিল মাসে আবুল হায়াতের নেতৃত্বে বার্মিংহামে এই প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করে।

পূর্ব বঙ্গে গণহত্যা সংঘটনের অভিযোগ অস্বীকার করে পাকিস্তান হাই কমিশন প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের জনসমাবেশে বিলি করা হয়। কয়েকটি প্ল্যাকার্ডে ইয়াহিয়া খানের ছবি দেখা যায়। এই ছবিগুলো পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে সরবরাহ করা হয় বলে 'দি গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

১৬ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম. হোসেন এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এম. ইসলাম লিখিত একখানি চিঠি 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে তাঁরা গত ৭ জুলাই প্রকাশিত ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন ও ড. মোহর আলীর চিঠির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

ড. সাজ্জাদ হুসাইন ও হ. মোহর আলী তাঁদের চিঠিতে বলেন, চট্টগ্রাম কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বাঙালি অধ্যাপককে হত্যা করা হয় নি। এর উত্তরে অধ্যাপক এম. হোসেন ও অধ্যাপক এম. ইসলাম বলেন, ১৩ এপ্রিল রাজশাহী দখল করার পর পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী গণিতশাস্ত্র বিভাগের হাবিবুর রহমান ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের এস. আর. সমাদ্দারকে তাঁদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। ড. সাজ্জাদ হুসাইন তখন পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত উপাচার্যের বাসভবনে বসবাস করছিলেন। এই হত্যাকান্ডের খবর তাঁর অজানা থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম-বিরোধী পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্টের কনভেনার মোহাম্মদ আবুল হায়াতের দস্তখতে প্রেরিত একখানি চিঠি ২৩ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে ১৯ আগস্ট প্রকাশিত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্টর কিয়েরনানের চিঠির বালকসুলভ প্রতিবাদ করা হয়। অধ্যাপক কিয়েরনান ১৫ আগস্ট ট্র্যাফালগার স্কয়ারে ইয়াহিয়ার সমর্থনে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে উল্লেখ করে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। আবুল হায়াত নিজেকে পূর্ব পাকিস্তানী হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলে, জনসমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই পূর্ব বঙ্গের নাগরিক।

অধ্যাপক কিয়েরনান তাঁর চিঠিতে বলেন, পাকিস্তানে জনজীবন সভ্যতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা চলে না এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের মান অত্যন্ত নিচু। আবুল হায়াত তার প্রতিবাদ করে বলেন, 'ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগে আমরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) ৮শ' বছর যাবৎ শাসন করেছি। তিনশ' বছরব্যাপী মোগল শাসনের পূর্বে এবং পরবর্তীকালে দেশে অধিকতর শান্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। ব্রিটিশ রাজের অভ্যুদয়ের ফলে আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) দুর্দশা শুরু হয়।

চিঠির উপসংহারে আবুল হায়াত বলেন, পাকিস্তানের 'নিচু মানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব' সমাজের সবচেয়ে বেশি পাশ্চাত্যমুখী অংশ থেকে এসেছে।'[১৩]

২৮ আগস্ট সংবাদপত্র পড়ে বোঝা গেল, পুলিশ কেন পাহারাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশ মিশনে অনুষ্ঠান চলার সময় পাকিস্তানি হাই কমিশনার সালমান আলী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে মিশন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। প্রতিমন্ত্রী জোসেফ গডবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মি. আলী বলেন, তাঁর দেশের এক অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান। এই অংশের নাম বদল করে বাংলাদেশ নাম নিয়ে লন্ডনে দূতাবাস স্থাপন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননাকর। ব্রিটেন পাকিস্তানের বন্ধু-রাষ্ট্র। অতএব, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য।

মি. গডবার মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনে বলেন, এ ধরনের নাম ব্যবহার ব্রিটেন সমর্থন করে না। পাকিস্তান সরকারকে ব্রিটেন প্রদত্ত স্বীকৃতি অব্যাহত রয়েছে। অতএব, বাংলাদেশ মিশনকে কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়ার প্রশ্ন অবান্তর। প্রায় এক ঘন্টাকাল আলোচনার পর মি. আলী তাঁর কূটনৈতিক চাল সফল হয়েছে বলে অনুমান করে পররাষ্ট্র দপ্তর ত্যাগ করেন।

পাকিস্তানের প্রতিবাদ সম্পর্কে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যে আলোচনার মর্ম অপ্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও পরিষ্কার বোঝা যায়, পাকিস্তানীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই বাংলাদেশ মিশনের বাইরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'[১৪]

৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান সরকার তাদের দূতাবাসে নিয়োজিত কূটনৈতিক অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। বাঙালি কূটনৈতিক অফিসার এবং কর্মচারীদের বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই নজিরবিহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৩ সেপ্টেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, এ যাবৎ বিশজন বাঙালি কূটনৈতিক অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এঁদের মধ্যে দু'জন লন্ডন এবং চৌদ্দজন ওয়াশিংটন দূতাবাসে নিয়োজিত ছিলেন। পাকিস্তানের কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করে তাঁরা নির্বিঘ্নে দেশ-দেশান্তরে সফর করেছেন।

১০ অক্টোবর 'দি সানডে টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের একটি গোপন দলিলে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ৩ আগস্ট 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ-বিরোধী একটি বিজ্ঞাপনের ব্যয়ভার পাকিস্তান সরকার বহন করে। 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উদ্যোক্তা হিসেবে তথাকথিত 'পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্ট'-এর নাম উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তানপন্থী 'বাঙালি' আবুল হায়াত ফ্রন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তান হাই কমিশনের নিয়োজিত প্রেস কাউন্সিলর আবদুল কাইয়ুম সরকারি তহবিল থেকে ২,৬৪০ পাউন্ড ব্যক্তিগত নামে গ্রহণ করে 'সলিডারিটি ফ্রন্ট'-এর প্রতিনিধির হাতে দেন। 'দি সানডে টাইমস্'-এ গোপন দলিলটির 'ফ্যাক্সিমিলি' প্রকাশিত হয়।'[১৫]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম এবং প্রফেসর এম. মোফাখখারুল ইসলাম; বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-২৭; শেখ আবদুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-১৬।

২. শেখ আবদুল মান্নান, ঐ, পৃষ্ঠা-১৬, ২৮, ৫৬।

৩. My sympatheis and full support were with the liberation movement of the people of Bangladesh as soon as I learnt of the genocide commited by the army of West Pakistan. Not being in politics I did not think a statement from me personally was necessary. But since it has become apparent that the image and memory of my beloved father, Huseyn Shaheed Suhrawardy, are being sought to be tranished by one member of my immediate family by her recent statements, I felt it incumbent upon me to speak out.

"I would like to express in unequivocal terms that I wish the liberation movement of the people of Bangladesh all success. They have been economically exploited and polittically dominated by West Pakistan for the past twenty four years and they

Dhaka University Institutional Repository

have now been forced to take up arms to resist the genocide and other heinous crimes that have been and are being perpetrated by the West Pakistan army.

'I have no doubt in my mind that the brave freedom-fighters will succeed in achieving full independence by ejecting the invading army.

'I eagerly look forward to going to Bangladesh in the near future to see that in an independent, sovereign republic, people of all faiths and political affiliations are living in peace and harmony.

'I also convey my greetings to the Government of Bangladesh, the members of which were all colleagues of my father and who were great objects of his affection."

[সূত্রঃ Rashid Suhrawardy. London, 7 October, 1971, এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি', পৃষ্ঠা-২১২; 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-৯০, (৯১-৯২), (৯৩-৯৪)।]

৪. আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১১৪-১১৬।

৫. বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত বিবৃতির মূল ভাষ্য 'A Statement by East Pakistan Scholars and Artists' শিরোণাম দিয়ে ইংরেজি পুস্তিকা হিসেবে পাকিস্তান সরকার প্রকাশ করে। বুদ্ধিজীবীদের নামের পাশে তাঁদের স্বাক্ষরের 'ফ্যাক্সিমিলি' প্রকাশিত হয়। পুস্তিকার শিরোণামপত্রে ছ'জনের স্বাক্ষর রয়েছে। নামের তালিকায় 'কবীর চৌধুরী', পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা' ছাপানো রয়েছে। কিন্তু পাশে তাঁর স্বাক্ষর নেই।

বেগম সুফিয়া কামাল এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে রাজি হন নি। তিনি জানিয়েছেন, রেডিওর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর স্বাক্ষর দেয়ার জন্য এসেছিলেন; কিন্তু তিনি স্বাক্ষরদানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

[সূত্রঃ 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়?' (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৮।]

৬. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭, ৭২-৭৩, ২০০-২০১, ৭৫, ৮১-৮২, ৮৪।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষকদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তিটি ছিলেন ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন বাঙালি অধ্যাপক এবং দু'জন বাঙালি অফিসারের একটি তালিকা তৈরি করে তিনি সামরিক হেডকোয়ার্টারসে পেশ করেন। তালিকাভুক্ত অধ্যাপকদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে চার ধরণের শাস্তিঃ ১. হত্যা, ২.কারাদণ্ড, ৩.চাকরি থেকে বহিস্কার এবং ৪. ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করার সুপারিশ করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের অনেকেই আল-বদর বাহিনীর হাতে নিহত অথবা নির্যাতিত হন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রস্তুত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রাদেশিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে সাজ্জাদ হুসাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৭২ সালে সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পাওয়ার পর সাজ্জাদ হুসাইন সৌদি আরবে গিয়ে কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন।

[সূত্রঃ 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়?' (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা-৮৪, ১৫৭, ১৮২ এবং '১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা', সম্পাদনা ঃ রশীদ হায়দার, পৃষ্ঠা- ৮৯-৯২।]

৮. মৌলবী ফরিদ আহমদ ১৯৭১ সালে গঠিত রাজাকারদের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান 'পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল'-এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ১৪০-সদস্যবিশিষ্ট ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়। নেতাদের মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়ার ফলে ১০ এপ্রিল মূল কমিটির বিরোধী অংশটি মৌলবী ফরিদ আহমদকে সভাপতি করে একটি ৯-সদস্যবিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে। প্রাক্তন প্রাদেশিক পি. ডি. পি. প্রধান নুরুজ্জামানকে এই স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

[সূত্রঃ 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়?' (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা-৩০-৩২।]

৯. 'Bangladesh Newsletter', London Issue No, 7 August, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-৯৪, (৯৯, ২০৩), (৯৯-১০০)।]

১০. Pakistan High Commisssion, London, Official Order No. HOC/7/71, 11 August, 1971.

The following further payments may be made to Mr. Hamidul Huq Choudhury and Mr. Mahmud Ali.

1. a. $75.00 each as contingencies for entertainment chargeable to the Government.

Dhaka University Institutional Repository

b. $ 50.00 each to be refunded in Pakistan currency on their return.
c. D.A.for transit and stay at London as admissable to Category I officials.
2. Sanction in respect of admissibility of TA and DA at Category I officials is SSP/69/71 dted 19 June, 1971.
3. Sanction for payment of refundable and non-refundable foreign exchange has not been received but instructions are contained in telegram No. 59-81 dated 10 August, 1971 from the Ministry of Foreign Affairs.
4. Expenditure is debitable to 35-FA-2 Delegation to UN and other International Conference etc.
[সূত্রঃ (signed) Bakhtiar Ali, Head of Chancery.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৯৫, ২০৩।

১১. আবদুল মতিন ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত তৎকালীন 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর লন্ডন সংবাদদাতা ছিলেন। জুলাই মাসের (১৯৭১) শেষ দিকে তিনি ছুটি কাটানোর জন্য জার্মানিতে গিয়েছিলেন। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে ফেরার পথে প্যারীতে অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসে হামিদুল হক চৌধুরীর জামাতা মঞ্জুর চৌধুরীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন। লন্ডন থেকে সংবাদ পাঠানো বন্ধ করে দেয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ চিঠি লিখে মঞ্জুর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মি. মতিনকে অনুরোধ করেছিলেন। মঞ্জুর চৌধুরী বলেন, পশ্চিম ইউরোপে সফররত হামিদুল হক চৌধুরী লন্ডনে পৌঁছেই মি. মতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
[সূত্রঃ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১০২-১০৩, ২০৩-২০৪।]

১২. ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলীর জনসভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার কথা গোপনে তাসাদ্দুক আহমদকে জানানো হয়। সহকর্মীদের সঙ্গে জরুরি আলোচনার পর তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বলেন, জনসভায় বক্তাদের চেষ্টা করা হলে হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলীর নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। অতএব, নিরাপত্তার খাতিরে জনসভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ত্যাগ করার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরামর্শ দেয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এই পরামর্শ গৃহীত হয়।
[সূত্রঃ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১০৩-২০৪।]

১৩. আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১০৮-১০৯, ১১৩।
১৪. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯-১০২; 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ', ২৯ আগস্ট, ১৯৭১।
১৫. Please pay an amount of 2640 pounds sterling equivalent to Rs. 30216.00 to Mr. Abdul Qauyyum, Press Counsellor. The cheque should be in his personal name and not by designation. The amount may be divited to Head 25-GA-Ministry of Information and National Affairs, Demand No.92-Information Services abroad-Other expenditure of Information Offices-A.4-Other Charges.
Sanction No. 1s 8(5)-71/EP.11 dated 13 July, 1971.
Sd / Baktiar Ali, Head of Chancery.
[সূত্রঃ 'The Sunday Times', London, 10 October, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-১২১-১২২, ২০৫।]

৩.২০ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রচেষ্টা ঃ

কভেন্ট্রি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্টিয়ারিং কমিটি বিলাতের বাঙালিদের সংগঠিত সংগ্রাম কমিটি সমূহকে সমন্বয় সাধন করে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"১৯৭১ সালের ৩০ জুলাই স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে কিছু বাঙালি নেতার এক আনুষ্ঠানিক সভায় কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে একটি কনভেনশন

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটিসমূহের ৪টি বৃহৎ জোন থেকে ৪ জন এবং স্টিয়ারিং কমিটি থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে ৬ জনের একটি কনভেনশন কমিটি গঠনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১]

৩০ জুলাই আনুষ্ঠানিক সভার আলোচনার প্রেক্ষাপটে ৬ আগস্ট তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির এক সভা উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হন এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই মর্মে অনুমোদন লাভের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির শেখ আবদুল মান্নান, শামসুর রহমান ও কবির চৌধুরী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফলপ্রসূ আলোচনার প্রেক্ষাপটে স্টিয়ারিং কমিটি ১২ আগস্ট পুনরায় মিলিত হয়ে পূর্ব প্রস্তাব মোতাবেক শেখ আবদুল মান্নান ও আজিজুল হক ভূঁইয়াকে স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে কনভেনশন কমিটিতে মনোনয়ন দান করা হয়। এই সভায় স্টিয়ারিং কমিটির শেখ আবদুল মান্নান, শামসুর রহমান ও আজিজুল হক ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।[২]

বিলাতের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাকে চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ (ক) সাউথ ইংল্যান্ড, (খ) মিডল্যান্ড; (গ) ল্যাংকাশায়ার এবং (ঘ) ইয়র্কশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। ৩০ জুলাইয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক চারটি অঞ্চল থেকে গাউস খান (লন্ডন), আবদুল মতিন (ম্যাঞ্চেস্টার), আরব আলী (স্ট্রাটফোর্ড আপন এ্যাভন) এবং এ. এম. তরফদারকে কনভেনশন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এই অন্তর্ভূক্তি উল্লেখিত অঞ্চলগুলোতে গড়ে ওঠা নেতৃত্ব থেকে কোনো নীতিমালার ভিত্তিতে মনোনীত করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রামের কর্মকান্ডে যাঁরা অগ্রগামী পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে কনভেনশন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভূক্তি নিয়ে অবশ্য পরবর্তীকালে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এ পর্যন্ত উল্লেখিত ছয়জন ছাড়াও কেন্দ্রীয় পরিষদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য কনভেনশন কমিটির ৩০ আগস্টে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভায় নূরুল ইসলাম ও জগলুল পাশা (বার্মিংহাম) কে উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কনভেনশন কমিটি গঠনের পর তার প্রথম সভা ১৬ আগস্টে আহবান করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তা ২০ আগস্ট তারিখে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পূর্ব লন্ডনের ১১নং গোরিং স্ট্রীটের স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে ২০ আগস্ট কনভেনশন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়া। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন গাউস খান, শেখ আবদুল মান্নান, আবদুল মতিন, আরব আলী ও এ. এম. তরফদার। কনভেনশন কমিটির সভা আহবান ও সমন্বয় সাধনের জন্য আবদুল মতিন কমিটির একজন আহবায়ক নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়াকে কনভেনশন কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কনভেনশন কমিটির উপরোক্ত প্রথম সভায় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের কার্যক্রম দু'টি শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে পরিচালনার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি কমিটি 'কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কাউন্সিল'' এবং অপরটি 'সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি' নামে অভিহিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত কমিটিসমূহে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে থেকে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। অঞ্চল ভিত্তিক কি পরিমাণ বাঙালি বসবাস করেন তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। তাই আনুমানিক জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল' নিম্ন বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী মোট ২১৬ জন কাউন্সিলর সমন্বয়ে গঠনের প্রস্তাব করা হয়। বাঙালি জনসংখ্যা বসতির আনুপাতিক হারে সাউথ ইংল্যান্ড-৯০, মিডল্যান্ড-৭৫, ল্যাংকেশায়ার-২৭, স্কটল্যান্ড-৩, কার্ডিফ-২ এবং ইস্ট এ্যাংলিয়া-২ জন হারে কাউন্সিলর নির্ধারণ করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের সুষ্ঠ পরিচালনা ও কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জনসংখ্যার অনুরূপ আনুপাতিক হারে সাউথ ইংল্যান্ড থেকে ১০ জন, মিডল্যান্ড থেকে ৯ জন, ল্যাংকাশায়ার থেকে ৫ জন এবং ইয়র্কশায়ার অঞ্চল থেকে ৩ জন সদস্য গ্রহণ করে মোট ২৭ জনের একটি কার্যকরী কমিটি (সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি) গঠনের সুপারিশ উক্ত প্রথম সভার গ্রহণ করা হয়।[৩]

কনভেনশন কমিটির ২৪ আগস্ট, ৩০ আগস্ট, ৩ সেপ্টেম্বর, ২১ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর তারিখের পরবর্তী সভাসমূহে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পরিষদের গঠনতন্ত্র নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। গাউস খান, আজিজুল হক ভূঁইয়া, আবদুল মতিন ও এ. এম. তরফদার কর্তৃক ২৪ আগস্টের সভায় প্রস্তাবিত খসড়া গঠনতন্ত্র পরবর্তী সভাসমূহের আলোচনার পর মূল প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ২৭ জনের পরিবর্তে ১১ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠনের ব্যাপারে একমত হয়। উক্ত কার্যকরী কমিটির সদস্য অঞ্চলভিত্তিক আনুপাতিক হারে গ্রহণের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক সরাসরি নির্বাচনের বিধান প্রস্তাব করা হয়। কনভেনশন কমিটির মূল প্রস্তাবে ছাত্র, মহিলা ও ডাক্তার সমিতির পক্ষ থেকে কোন কাউন্সিলর রাখা হয়নি। পরবর্তীতে তা সংশোধন করে উপরোক্ত পেশাজীবী প্রতিটি সংগঠন থেকে ৪ জন করে মোট ১২ জন কাউন্সিলর সংযোজন করা হয়। এছাড়া ল্যাংকাশায়ারের জন্য ২ জন এবং ইয়র্কশায়ারের জন্য ৩ জন কাউন্সিলর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২১৬ জনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর সংখ্যা মোট ২৩৩-এ নির্ধারণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় পরিষদের কাউন্সিল ও কার্যকরী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের বিষয় ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়ার পর কনভেনশন কমিটি উক্ত পরিষদের খসড়া গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুমোদন করে। ১ অক্টোবরের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিলাতের বিভিন্ন শহরের সংগ্রাম পরিষদসমূহকে তাদের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য কনভেনশন কমিটি পত্র প্রেরণ করে। পত্রে এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, আঞ্চলিক কমিটিসমূহ তাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা স্থানীয় কমিটির মধ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বিতরণ করবেন। আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যা অনুযায়ী স্থানীয় কমিটি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে উক্ত আসন্ন সম্মেলনে পাঠাবেন। আরো জানানো হয় যে, স্থানীয় কমিটি সভা আহবান করে উক্ত প্রতিনিধি/কাউন্সিল নির্বাচন করবেন এবং ২০ অক্টোবরের মধ্যে আঞ্চলিক কমিটির কাছে তা জমা দিবেন। ১ অক্টোবরের কনভেনশন কমিটির সভায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আনুমানিক তারিখ ৭ নভেম্বর, ৭১ নির্ধারণ করা হয়।[৪]

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্লেখিত পত্রটি আঞ্চলিক ও স্থানীয় কমিটিসমূহের হস্তগত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত জটিলতা। প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হয় 'লন্ডন সংগ্রাম কমিটি'-এর অবস্থান নিয়ে। লন্ডন শহরেও পাশের এলাকার সকল স্থানীয় কমিটির সমন্বয়ে 'লন্ডন এ্যাকশন কমিটি' গঠন করা হয়েছে বলে উক্ত কমিটির নেতৃবৃন্দ যে দাবি করেন তা অনেকে মেনে নিতে রাজি হননি। লন্ডনে অবস্থিত 'বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি' এর সাধারণ সম্পাদক আবদুল সামাদ খান ১৫ সেপ্টেম্বর এক পত্রে স্টিয়ারিং কমিটিকে এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানান যে, তাদের কমিটি লন্ডন এ্যাকশন কমিটির আঞ্চলিক কমিটি হিসেবে স্বীকার করে না। আবদুল সামাদ খান আরো জানান যে, লন্ডন ভিত্তিক সমমনা বেশ কিছু কমিটি একত্রে 'ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন যাঁদের সাথে লন্ডন এ্যাকশন কমিটির কোন সম্পর্ক নেই। লন্ডন ভিত্তিক বেইজওয়াটার এ্যাকশন কমিটি তাদের ২ অক্টোবরের সভায় সিদ্ধান্ত করে যে, বেইজওয়াটার কমিটি আঞ্চলিক কমিটিকে স্বীকার করে না। অন্য এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, আসন্ন সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয় কমিটি তা সরাসরি কেন্দ্রীয় কনভেনশন কমিটিতে প্রেরণ করবেন। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বেইজওয়াটার শাখার সভাপতি সামসুল মোরশেদ এক পত্রে কনভেনশন কমিটিকে জানিয়ে দেন।[৫]

প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আঞ্চলিক কমিটির হস্তক্ষেপের নিয়মটি প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় কনভেনশন অনুষ্ঠানের বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে লন্ডনে গড়ে ওঠা অগণিত সংগ্রাম পরিষদসমূহ লন্ডন এ্যাকশন কমিটিকে আঞ্চলিক কমিটি হিসেবে মেনে না নেয়ার ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে এস. এম. আইয়ুবের সভাপতিত্বে লন্ডনের কনওয়ে হলে ১১ অক্টোবর' ৭১ তারিখে বিভিন্ন সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এস. এম. আইয়ুবের স্বাক্ষরিত এক প্রচারপত্রে দাবি করা হয় যে উক্ত কনওয়ে হলের সভায় নিম্নলিখিত ১২টি স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি অংশগ্রহণ করেছিল। যথাঃ এনফিল্ড, ওয়েস্ট মিনিস্টার, বেইজওয়াটার, কলচেস্টার, আক্সব্রিজ, বালহাম, হেনডন, নর্থওয়েস্ট লন্ডন, ইজলিংটন, ইস্টলন্ডন রিলিফ, সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্র সংগ্রাম কমিটিসমূহ। উক্ত সভার প্রস্তাবে একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কনভেনশন কমিটির প্রস্তাবিত পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করা হয়। উক্ত সভায় ৭টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ (ক) কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রতিনিধির প্রেরণ পদ্ধতির বিরোধিতা, (খ) প্রত্যেক স্থানীয় কমিটি থেকে কমপক্ষে ২ জন প্রতিনিধির সম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা, (গ) খসড়া গঠনতন্ত্র স্থানীয় কমিটির কাছে অগ্রীম প্রেরণ, (ঘ) দুই স্তরে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন পদ্ধতি, (ঙ) কেন্দ্রীয় কনভেনশন কমিটি সম্প্রসারণ এবং (চ) ১০ জন সদস্যের একটি সম্মেলন ক্যাম্পেইন কমিটি গঠন।[৬]

এস. এম. আইয়ুবের নেতৃত্বে কনওয়ে হলেও সভা ও তার গৃহীত পদক্ষেপের ফলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে দক্ষিণ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটির বিষয়েও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং উক্ত অঞ্চলের বেশ কিছু কমিটি উক্ত আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। একইভাবে এনফিল্ড এ্যাকশন কমিটির পক্ষে শহিদুর রহমান খান ২২ আগস্ট' ৭১ তারিখ এবং বোরহান উদ্দিন- লুটন এ্যাকশন কমিটির পক্ষে ১৭ অক্টোবর' ৭১ তারিখে পত্র মারফত কনভেনশন কমিটিকে তাদের ভিন্নমত জানিয়ে দেন। কনভেনশন কমিটির গৃহীত পদক্ষেপ সমর্থন করে বেশ কিছু কমিটি সভার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে প্রেরণ করেন। বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, মিডল্যান্ড, লন্ডন আঞ্চলিক কমিটি সহ বহু কমিটি তাদের প্রতিনিধির লিষ্ট জমা করেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রবাসে আন্দোলন আরো জোরদার করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আহবান সম্বলিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর এক আবেদনপত্র প্রচার করা হয়।[৭]

কনভেশন কমিটি একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে সকল ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলে। লন্ডনের নর্থ ওয়েষ্ট-৫, কেন্টিশ টাউনস্থ লেডী মার্গোরেট চার্চ হলে ৭ নভেম্বর উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের কর্মকর্তা ও কার্যকরী কমিটি নির্বাচন পরিচালনার জন্য ব্যারিস্টার আমীন, ব্যারিস্টার ফেরদৌস, ডাক্তার হারুণ, ডাক্তার সিরাজদৌলা ও গণেশ চন্দ্র দে-কে সদস্য করে একটি নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ গঠনের সকল প্রকার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক মুখপাত্র বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শ মোতাবেক ৭ নভেম্বর-এ অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্থগিত করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধি মনোনয়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের জন্য কনভেনশন কমিটি প্রচেষ্টা চালান। ইতোমধ্যে মাস গড়িয়ে ডিসেম্বর এসে গেলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মোড় ত্বরান্বিত গতিতে ইতিবাচক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং বিলাতের আন্দোলনে সমন্বয় করার যে তাগিদ তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। ২৪ এপ্রিল সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় তা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি।[৮]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ঢাকায় সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৯৭।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৮।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৮-১৯৯।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা-২০০।
৬. ঐ।
৭. সাক্ষাৎকারে ঐ, নূরুল ইসলাম এবং জাকারিয়া খান চৌধুরী।
৮. ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০১।

৩.২১ বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ ঃ যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের কৃতিত্ব ঃ

প্রতিরোধের সূচনা ও বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়সহ এ সম্পর্কে গবেষণাপত্রের বিভিন্ন জায়গায় আরও আলোচনা রয়েছে। তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলাদা অধ্যায় হিসেবে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

(i) বঙ্গবন্ধু ঃ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ঃ

১৯৭১ সালে বিজয় দিবসের ৪ দিন পরে (২০ ডিসেম্বর) পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিদানের আভাস দেন। সেদিন তাঁর (জেনারেল ইয়াহিয়া) পদত্যাগ সংবাদ ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু মুক্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিল।[১]

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারকালে বঙ্গবন্ধু 'দি সানডে টাইমস্'-এর সংবাদদাতা এ্যান্থনী ম্যাস্কারেন্হাসকে বলেন, প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁকে ফাঁসী দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কারা-রক্ষকদের সহানুভূতির ফলে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[২]

৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দিন ইয়াহিয়া খান তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বঙ্গবন্ধুর বিচারকারী ট্রাইবুনাল সদস্যদের ডেকে নিয়ে তাঁর ফাঁসীর রায় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রায় স্থগিত রাখা হয়। ঢাকায় পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী বলে বুঝতে পেরে তিনি ফাঁসীর রায় কার্যকর করার নির্দেশ দেন। তিনি তখন উদ্বেগে অস্থির ছিলেন। ঝোঁকের মাথায় তিনি ঘোষণা করেনঃ "এই লোকটিকে যেদিন আমি বন্দী করার হুকুম দিয়েছিলাম, সেই দিনই তাঁকে হত্যা করা উচিত ছিল। এখন তাঁকে ফাঁসী দাও।"

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রাওয়ালপিন্ডি থেকে একটি সামরিকদল মিয়াঁওয়ালীতে পাঠানো হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বঙ্গবন্ধুর "সেল"- এর পাশের "সেল"-এ একটি অগভীর কবর খোঁড়ে। তাঁকে বলা হয়, বিমান-আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে এটি খোঁড়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এর আসল উদ্দেশ্য জানতেন এবং তিনি চরম পরিণতির জন্য তৈরী ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানেকে শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে বুঝতে পেরে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে জেলখানার জনৈক অফিসার তাঁকে গোপনে জেলখানার ভেতরে নিজের বাড়িতে নিয়ে দু'দিন লুকিয়ে রাখেন। এর পর সেই অফিসার তাঁকে একটি আবাসিক কলোনীর নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে চার-পাঁচ কিংবা ছ'দিন রাখা হয়েছিল।[৩]

জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার পর লন্ডন হয়ে ২০ ডিসেম্বর সকালবেলা জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে যান। ২১ ডিসেম্বর তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিদেশী কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শেখ মুজিবকে শীঘ্রই কারামুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হবে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য নিয়োজিত সৈন্যদল ফাঁসীর আদেশ পুণরায় বৈধ করার জন্য মি. ভূট্টোকে অনুরোধ জানায়। তিনি তা' প্রত্যাখ্যান করেন।[৫]

২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ অফিসার মহল থেকে জানা যায়, মি. ভূট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ২২ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে আসা হয়েছে।[৬]

২৭ ডিসেম্বর রাত্রিবেলা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে মি. ভূট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। শেখ মুজিবকে তিনি "পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা" হিসেবে উল্লেখ করেন।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রেরিত উল্লিখিত সংবাদে 'দি গার্ডিয়ান'-এর সংবাদদাতা মার্টিন উলাকোট বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্বন্ধে কোনো রকম প্রতিশ্রুতি না দিয়েই কিংবা মামুলি আশ্বাস দিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেখ মুজিব ঢাকার পথে রওয়ানা হবেন বলে কোনো কোনো কূটনীতিবিদ মনে করেন।[৭]

নয়া দিল্লী থেকে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয় ২৪ ডিসেম্বর মি. ভূট্টোর ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (এই তথ্য অনুযায়ী মনে হয় ২৭ ডিসেম্বর তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়-দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়)।[৮]

১ জানুয়ারী (১৯৭২) মার্কিন সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হয়, আগামী দু'এক দিনের মধ্যে বাংলাদেশের বন্দী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার কথা প্রেসিডেন্ট ভূট্টো বিবেচনা করছেন। ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত এই সংবাদটি লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক 'টাইম' প্রদত্ত সংবাদে মি. ভূট্টোর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, তাঁর (শেখ মুজিবের) হৃদয় এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের আগুণ জ্বলজ্বল করছে- এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁকে দু'এক দিনের মধ্যে নিঃশর্ত মুক্তিদানের কথা ভাবছেন।

মি. ভূট্টো বলেন ঃ "আমি তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করছি না। তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে আমি আলোচনা চালাচ্ছি না, বরং পাকিস্তানের দু'অংশে নির্বাচিত নেতাদের মধ্যেই এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

"অত্যন্ত ঢিলেঢালা একটা ব্যবস্থা সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব, কিন্তু পাকিস্তানের নামটি অন্ততঃপক্ষে থাকা উচিত। এটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমাদের হাজার বছরের সম্পদ এবং আমরা তা' বিসর্জন দিতে পারি না।[৯]

ব্রিটিশ লেখক রবার্ট পেইন তাঁর একটি গ্রন্থে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে কি-না, সে সম্বন্ধে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু ও মি. ভূট্টোর কথোপকথন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

মি. ভূট্টো বঙ্গবন্ধুকে বলেন ঃ "প্রথম জিনিস সম্পর্কে আমাদের প্রথমেই আলাপ করা উচিত। আমাদের দু'টি পৃথক জাতি হওয়া চলবে না, শেখ সাহেব। যেমন করেই হোক, আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখতেই হবে; বশ্য ঠিক আগের মতো নয়, তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বলে চেনা যায়, এমন একটি দেশ হিসেবে। আর যাই হোক, আমাদের ধর্ম এক, উদ্দেশ্যও এক। দেখুন, শেখ সাহেব, সব কিছুর পরেও আমরা এখনও এক জাতি-সেই সত্যের মুখোমুখি আমরা হয়েছি। আমাকে বিশ্বাস করুণ, আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারি না। একথা আমাদের উভয়ের ভাবা উচিত। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে বসে একথা আমাদের আলোচনা করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমরা একটা নিরপেক্ষ দেশে আলোচনার জন্য মিলিত হতে পারি।"

"এখন আমরা যেমন মিলিত হয়েছি" ব্যঙ্গোক্তির আভাস দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন। "ঠিক তাই, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কোনো রকম বাধাবিপত্তি ছাড়া আমরা এখানে কাজটা সেরে ফেলতে পারি। আপনি ও আমি, আমরা দু'জনে, নীতি সম্পর্কিত একটি বিবৃতি তৈরি করতে পারি। আমরা ব্যাপারটার চূড়ান্ত হবে বলে আমি মনে করি। আপনাকে আমি এটা দেখতে চাই।"

'না'।"

"কেন নয়?"

"কারণ, আমি এখনও পর্যন্ত আপনার বন্দী।......আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে কীভাবে, আমার সামনে আপনি যে কাগজের টুকরো রেখেছেন, তাতে আমি দস্তখত করতে পারি? আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি আমাকে জোর করে রাজী করানোর চেষ্টা করছেন। আপনি আমাকে গুলি করতে পারেন, কিন্তু ঢাকায় গিয়ে আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো কাগজে দস্তখত দেবো না।...."

ভূট্টোর শেষ অনুরোধ ঃ "একটি অখন্ড এবং অবিভাজ্য পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন, নাকি করবেন না?"

শেখ মুজিব নীরব থাকেন। ('The Tortured and the Damned', .P.146) সাবেক ভারতীয় কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জী তাঁর 'এ লং জার্নি টুগেদার ইন্ডিয়া পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ' গ্রন্থে বলেন, কারামুক্তির পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মি. ভূট্টো তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংবর্দ্ধনা জানান। তাঁর উক্তির প্রতিবাদ করে শেখ

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নয়, বরং সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। মি. ভূট্টো তাঁর চালাকিপূর্ণ মন্তব্য পরিহার করে পরিস্কার ভাষায় বলেন, পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে এবং তিনি (শেখ মুজিব) ঢাকায় গিয়ে নতুন জাতির নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।.....বিদায় দেওয়ার আগে মি. ভূট্টো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শেখ মুজিবের কাছ থেকে জানতে চান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর (Confederation) মাধ্যমে একত্রিত হওয়ার ধারণার প্রতি তিনি বিরূপ কি-না। শেখ মুজিব বুদ্ধিমানের মতো তাঁর মনোভাব প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উত্তর দানে বিরত থাকেন।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে বিমানযোগে ঢাকায় যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর সহযাত্রী মি. ব্যানার্জীর কাছে উল্লেখিত কথোপকথন বর্ণনা করে উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়েন। ঔৎসুক্যবশতঃ মি. ব্যানার্জী জানতে চাইলেন, মি. ভূট্টোর প্রস্তাব সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্য কিছু সময় পাওয়ার পর তাঁর উত্তর কী হতে পারতো বলে তিনি ভাবছেন? বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে বললেন: ''আমার জীবনকালে নয়'' (Over my dead body).[১০]

টীকা ও তথ্যসুত্র ঃ

১. 'দি ফাইনান্সিয়াল টাইমস', লন্ডন, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-২৪।

২. 'দি সানডে টাইমস', লন্ডন, ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী -এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত।

৩. 'দি সানডে টাইমস', লন্ডন, ৯ জানুয়ারী, ১৯৭২-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত।

৪. 'দি ফাইনান্সিয়াল টাইমস', লন্ডন, ২২ ডিসেম্বার, ১৯৭১-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।

৫. ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ টি-ভি সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৮ই জানুয়ারী নিউইয়র্ক টেলিভিশনের ''ডেভিড ফ্রস্ট ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকারটি প্রদর্শিত হয়। এই সাক্ষাৎকার বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসী দেওয়ার ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

ফ্রস্ট: এমন কি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভূট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেন, তখনো নাকি সে ভূট্টোর কাছে আপনার ফাঁসীর কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, ঠিক। ভূট্টো আমাকে সে কাহিনীটা বলেছিল। ভূট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিল: ''মি. ভূট্টো, আমার জীবনের সব চাইতে বড় ভুল হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসী না দেওয়া।''

ফ্রস্ট: ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, ভূট্টো একথা আমায় বলে তার পরে বলেছিল: 'ইয়াহিয়ার দাবি ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসী দেবে।'' কিন্তু ভূট্টো তাঁর এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি।

ফ্রস্ট: ভূট্টো কি জবাব দিয়েছিল? তাঁর জবাবের কথা কি ভূট্টো আপনাকে কিছু বলেছিল?

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, বলেছিল।

ফ্রস্ট: কি বলেছিল ভূট্টো?

শেখ মুজিব: ''ভূট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল: 'না'' আমি তা' হতে দিতে পারি না। তা' হলে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিকবাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয়বাহিনীর হাতে বন্দী রয়েছে। তা' ছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে আছে। মি. ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তা' হলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরৎ আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সঙ্কটজনক।'' ভূট্টো আমাকে একথা বলেছিল। ভূট্টোর নিকট আমি অবশ্যই এজন্য কৃতজ্ঞ।''

[সূত্রঃ ডেভিড ফ্রস্টকে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার, আব্দুল মতিন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবঃ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়,' পৃষ্ঠা, ২২৪-২২৫।]

৬. 'দি গার্ডিয়ান', লন্ডন, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী -এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-২৫।

৭. 'দি গার্ডিয়ান', লন্ডন, ২৮ ডিসেম্বার, ১৯৭১-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত।

৮. 'দি টাইমস,' লন্ডন, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬।

৯. * "I plan to release him (Sheikh Mujib) unconditionally in a couple of days, with hope and faith that fire of Pakistan still burning in his heart. He will be free to go. I

Dhaka University Institutional Repository

am not extracting any promise from him. I am not talking to him under duress, but between elected leaders of the two parts of Pakistan. From one end the spetrum to the other, an extremely loose arrangement could be worked out, but at least the name of Pakistan must remain. It's our legacy of 1,000 years and we can't spurn it."

[সূত্রঃ The Time, as quoted in 'The Sunday Telegraph', 2 January, 1972.

Note: 'The Time' released this item to the Press on 1 January, 1972 and published it in its issue of 10 January, 1972. -এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-২৭, ২৯ ।]

১০. On Mujib's release, Bhutto greeted him with the declaration that he was now the PM of East Pakistan, to which Muj8ib objected, explaning that as the majority leader, he could only be the PM of Pakistan, not East Pakistan. Frivolity over, Bhutto clarified that East Pakistan was now Bangladesh and he could go back to Dhaka and stake his claim as the leader of the new nation. To match the occasion, Bhutto had asked his office to procure for Mujib a couple of Indian-style buttoned-up suits, so that he would be appropriately attired when inspecting the guard of honour at Delhi Airport. Mujib's dark blue suit did not go unnoticed or without comment when he arrived in Delhi. As a parting shot, Bhutto asked Mujib with great circumspection whether he would ever be averse to the idea of Bangladesh and Pakistan coming together again to form a confederation. Mujib wisely kept his thoughts on the matter to himself and refrained from offering a response.

[সূত্রঃ Sashanka S. Banerjee, 'A Long Journey Together: India, Pakistan and Bangladesh'. P.244. published in the U.S.A., 2008, ISBN: 9781-4196-9763-0; 'The Tortured and the Damned', .P.146-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭- ২৯ ।]

(ii) লন্ডনে বঙ্গবন্ধু ঃ জানুয়ারী, ১৯৭২ ঃ

পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী (শনিবার) লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে এসে পৌছান। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে পুলিশ অফিসার পিটার ল্যাংলী টেলিফোন করে প্রবাসী বাঙালিদের এ বিষয়ে অবহিত কার পর তাঁরা প্রথমে এ খবর শুনে হতবাক হয়ে যান এবং দলে দলে মে-ফেয়ার এলাকার ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে সেখানে ছুঁটে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু শীঘ্রই লন্ডন ত্যাগ করবেন।

মুহূর্তের মধ্যে সেখানে হাজির হন শেখ আবদুল মান্নান সহ স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ড. হাকিম, স্টিয়ারিং কমিটি নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কাজী মুজিবুর রহমান ও বেজওয়াটার কমিটির আলী নেওয়াজ, সিরাজুল ইসলাম (প্রফেসর ডঃ), নূরুল ইসলাম, জাকারিয়া খান চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমদ, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (প্রফেসর ডঃ), এম. মোফাখখারুল ইসলাম (প্রফেসর ডঃ), বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের পরিচালক এনামুল হক (ডঃ), বেঙ্গল স্টুডেন্টস কাউন্সিলের আহবায়ক-১ এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু), আহবায়ক-২ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ছাত্র নেতা ও বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ ও এ্যাকশন বাংলাদেশের সদস্য এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বিচারপতি), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী রাজিউল হাসান (রঞ্জু), যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট গাউস খান, লন্ডন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মিনহাজউদ্দিন এবং 'বাংলাদেশ নিউজলেটার-এর প্রতিষ্ঠাতা তাসাদ্দুক আহমদ, স্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারি শামসুল আলম চৌধুরীসহ ফেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার গোলাম মাওলা। শিল্পপতি জহিরুল ইসলামের পক্ষ থেকে তাঁর এক ভাইও দেখা করতে আসেন। বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য শীতের মধ্যে সারাদিন হাজার হাজার প্রবাসী বাঙালি জনতা হোটেলের বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল। সেখানে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁদের এক আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জন্য ও বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম মুখর ছিলেন তাঁক কাছে পেয়ে পূর্ণিমার চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো মনে হলো তৎকালে সেখানে উপস্থিত সাক্ষাৎকারদাতাদের। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কুলাকুলি করার সময় অনেকের চোখে পানি এসেছিল।[১]

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে স্মৃতিকথায় শেখ আবদুল মান্নান লিখেছেন, 'হোটেলের বাইরে রাস্তার দৃশ্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। গত দশ-এগারো মাস যাবৎ স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার ফলে পরিশ্রান্ত বাঙালীরা দলে দলে এসে হোটেল ঘিরে ফেলেছে। মুহুর্মুহুঃ "জয় বাংলা" শ্লোগান দিয়ে তারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। হোটেলের বাইরে যেদিকে তাকানো যায়, সে-দিকেই অগণিত লোক। দেখেই বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর শরীর অত্যন্ত দুর্বল। তা'সত্ত্বেও তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর গায়ে শক্তি নেই; তিনি থর থর করে কাঁপছেন। তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, আপনি তো পড়ে যাবেন। তিনি কারো কথা শুনলেন না। জানালা থেকে ফিরে এসে কয়েক মিনিট বসে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে তিনি হাত তুলে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে হোটেলের উপরের তলার জানালায় দাঁড়িয়ে দর্শনপ্রার্থী জনতার উদ্দেশ্যে কথা বললেন। দর্শনার্থীরা হয় তো তাঁর কথা শুনতে পায়নি। এইভাবে তিনি জনতার সঙ্গে ভাব বিনিময় করলেন।'[২]

'দুপুরের দিকে বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। দেশ-বিদেশের রেডিয়ো, টিভি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ক্ল্যারিজেস্ হোটেলের লাউঞ্জে সাংবাদিকরা ছাড়াও বহু নেতৃস্থানীয় বাঙালি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

'প্রশ্নোত্তরের আগেই একটি একটি লিখিত বিবৃতি সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাবলীলভাবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বার বার "আমার জনগণ " (My people) এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ" (Our epic liberation war) শব্দগুলি ব্যবহার করেন। মিয়াঁওয়ালী জেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এবং তাঁর "সেল"-এর পাশে কবর খোঁড়ার কথা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন; যার বিস্তারিত বর্ণনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সবাই অবাক-বিস্ময়ে তাঁর কথা শোনেন। প্রসঙ্গক্রমেই তিনি বললেন, এক মুহূর্তের জন্যও আমি বাংলাদেশের কথা ভুলিনি। আমি আমার নিজের জন্য প্রাণ- ধারণ করছিলাম না। আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার সুযোগ পাবো না, কিন্তু আমার জনগণ মুক্তি অর্জন করবে, এ সম্বন্ধে কখনও আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।"

'বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাঁরা তাঁকে অবহিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম, গাউস খান, মিনহাজউদ্দিন, তাসাদ্দুক আহমদ, জাকারিয়া খান চৌধুরী ও গোলাম মাওলা। তা'ছাড়া তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন, শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে একান্তে আলোচনা করেন। ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে ছোটখাট গোপন আলোচনার সময় তিনি সবাইকে রুমের বাইরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিংবা অন্য রুমে গিয়ে কথা বলেছেন।'

'সাংবাদিক সম্মেলনের পর বহুলোকের ভীড়ের মধ্যে থেকে বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ্য করে একজন বললেন: "ভাই, যুদ্ধ-বিগ্রহের শেষে আমাদের উপমহাদেশেই বসবাস করতে হবে। কাজেই পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সহযোগিতার ভাব রেখে আমাদের চলতে হবে, চলা উচিত।"

বঙ্গবন্ধু বললেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে কোন আপস হতে পারেনা। আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে দরকষাকষির কথাই উঠে না। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতাই অর্জ করেছি। পাকিস্তান আমাদের কাছে অন্য যে কোন একটি দেশের মতো ২৫শে মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান একটি জাতি হিসাবে মৃত্যু বরণ করেছে এবং আমার জনগণ বীরের মত যুদ্ধ করেছে। তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে। আমি কখনও তাদের অসম্মান করবো না; এমনকি আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি এই প্রতিশ্রুতি পালন করবো।"

'ক্ল্যারিজেস্ হোটেল থেকে গাড়ি যখন রওনা হচ্ছিল, তখন হোটেলের বাইরের ভিড়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পূর্ব পরিচিত একজন পাকিস্তানী ছিলেন। তিনি এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে "ব্রীফ" করার জন্য নয়, আবেদন পেশ করার উদ্দেশ্যে। তিনি গাড়ির দরজা টেনে ধরে বললেন,"Mujub, don't forget, I and you belong to Pakistan." (মুজিব, তুমি ও আমি পাকিস্তানী, একথা ভুলে যাবে না)", তখন আমাদের পক্ষে একটি ছেলে তাকে টেনে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলো।'

'এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর বঙ্গবন্ধু যে ভি. আই. পি. রুমে বসে ছিলেন, সেখানে আমি)শেখ আবদুল মান্নান)ও বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি আধ ঘন্টা সময় পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন আমি কোন প্রশ্নই তাঁকে করতে পারিনি। কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলতে পারি নি। ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে লক্ষ্য করেছি বহুলোক বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা আন্দোলন কালে তাঁরা কি করেছেন, তার বিবরণ দিচ্ছেন। আমি কি করেছি, সে সম্পর্কে একটি কথাও আমার মুখ থেকে বের হলো না। শুধু একটু বলেছি: "মুজিব ভাই, বাঙালি কিন্তু আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং এখানে যাঁরা সাড়া দিয়েছে, তাঁরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।"

'এয়ারপোর্টে অবস্থান কালে আজিজুল হক ভুঁইয়া, কাজী মুজিবর রহমান এবং নেওয়াজ সাহেব আমাকে বললেন, "বঙ্গবন্ধুকে একটা কথা বলতে হবে-তিনিতো জানেন, অনেক রক্ত ক্ষয়ের পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন দেশে এমন

Dhaka University Institutional Repository

একটা সরকার গঠন করা যায় কিনা সেখানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সরকার গঠিত হবে।" আমি তাঁদের কথাটা এভাবে বলি নি। মিনিট খানেক সময় নিয়ে আমি সংক্ষেপে তাঁকে বললাম, শাহ আজিজুর রহমান সহ সব 'কোলাবরেটর', আল-বদর ও আল শামস্-এর যে সব কর্মী ঘরে ঘরে ঢুকে বাঙালিদের নিধন করেছে, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মীরপুরের বদ্ধভূমিতে নৃসংশভাবে হত্যা করেছে, তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে এমন একটা সরকার গঠন করা যায় কি না, যেখানে আওয়ামী লীগদের সংখ্যা হবে ৯৯ ভাগ এবং বাকী ১ ভাগ হবে অন্যান্য যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এই সরকার গঠিত হবে আপনার নেতৃত্বে।"

বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন, "৭ই ডিসেম্বার ও ১০ ই জানুয়ারী নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জীবিত আছে, তাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাঁরা সরকার গঠন করবে। কিন্তু তোমরা যদি চাও অন্যরাও সরকারে যোগ দেবে, তাহলে সেই সুযোগ আমি দেবো। ইলেকশান করা হোক, তোমরা দেশে আস, দেশের জন্য কাজ করো। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, সরকার ওঁরাই গঠন করবে। আমি টুংগীপাড়ার যেয়ে বাগিয়ার নদীতে হাতা মাথায় দিয়ে মাছ ধরবো। তোমরা একটা স্বাধীন দেশে এখন বাস করছো। এরপর তোমাদের আর কিছু আমার দেওয়ার নেই। আমি জীবনে দীর্ঘ ১১টি বছর জেল খেটে, আমার পুত্র-কন্যাকে অবহেলা করে, নিজের ঘর-সংসার বাদ দিয়ে, দেশের কাজ করেছি। এখন তোমরা কিছুটা কর। তোমরা অনেক সুযোগ পাবে এবং আমি তোমাদের সেই সুযোগ দেবো, অঙ্গীকার করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে যাঁরা গণনির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁরা-ই সরকার পরিচালনা করবে।"

'হিথরো বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় দেওয়ার সময় আমাদের চোখে পানি আসেনি । আমরা তখন মনে মনে ভাবছিলাম-যে জাতি তাঁর জন্য, তাঁর ডাকে, তাঁর কথায় অবলীলাক্রমে জীবন দিল, ইজ্জত দিল, মান-সম্মান দিল, সব অত্যাচার সহ্য করলো, তাঁর কাছে তিনি ফিরে যাচ্ছেন, কোলের সন্তান কোলে ফিরে যাচ্ছেন আর হাজার হাজার মানুষ যাঁরা ইয়াতিম হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, তাঁরা তাঁকে ফিরে পাবে। এটাই আমাদের সান্তনা।'[৩]

এ প্রসঙ্গে একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রাণদন্ড রহিত হওয়ার নেপথ্য কথা এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পটভূমি সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। অতি সম্প্রতি লন্ডন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে কর্মরত শশাঙ্ক এস্. ব্যানার্জীর লিখিত (1) 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banerjee, Anthem Press, published in U.K. and U.S.A., 2006; (2) ('A Long Journey Together: India, Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banrjee, published in the U.S.A., 2008, ISBN: 9781-4196-9763-0.গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন তাঁর 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি বিশেষ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীসহ বাঙালি নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় নাগরিক বিশেষ করে শশাঙ্ক এস্. ব্যানার্জীর সহায়তায় ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণেই বঙ্গবন্ধুর প্রাণদন্ড রহিত হয়।[৪]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পেক্ষাপট সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃটিশ সরকার ও যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় নাগরিক এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এতো সহজে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যস্থ্য প্রবাসী বাঙালিদের সুদীর্ঘ নয় মাসের শান্তিপূর্ণ সংগাম এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তান-বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল এ. কে. নিয়াজী ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ-বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী অপশাসনের অবসান সূচনা করে। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

পাকিস্তান-বাহিনীর আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে উল্লিখিত তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী। নতুন জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের জনগণের মধ্যে ন্যায্য আসন গ্রহণ করে বাংলাদেশকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সোনার বাংলার স্বপ্ন সফল হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতের শুভেচ্ছা থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

তিনি আরো বলেন, এই বিজয় শুধু বাংলাদেশের বিজয় নয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যে-সব জাতি শ্রদ্ধাশীল, তারা এই বিজয়কে মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পথনির্দেশক বলে গণ্য করবে।[৫]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী সকালবেলা লন্ডনে পৌঁছান। সে দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ডহীথ্-এর (পরবর্তী কালে স্যার এডওয়ার্ড) সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে যান। ঘরোয়া আলাপ-আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন ও

Dhaka University Institutional Repository

সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মি. হীথ্ বঙ্গবন্ধুকে বলেন, স্বীকৃতি দানের আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্য-পরিচালনা সম্পর্কিত আচরণবিধি (প্রটোকল) অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারকে দেখতে হবে নতুন সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী কিনা।

পরদিন 'দি সনডে টাইমস্'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে ব্রিটিশ সরকারী মহল মনে করে। একটি প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের আগে ব্রিটিশ স্বীকৃতি আশা করা যায় না।[৬]

অপর রবিবাসরীয় পত্রিকা 'দি অবজারভার'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা প্রদত্ত প্রতিবেদনেও একই ধরণের মন্তব্য করা হয়। বলা বাহুল্য, উভয় সংবাদদাতা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের গোপন "ব্রিফিং" অনুযায়ী উল্লিখিত প্রতিবেদন রচনা করেন। ১৩ জানুয়ারী (১৯৭২) 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' এবং 'দি গার্ডিয়ান' বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। কারামুক্তির পর দেশে ফেরার আগে লন্ডনে এসে বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বলে প্রথমোক্ত প্রত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়ঃ "শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ প্রধান এবং সর্বোত্তম ব্যাপর। এর ফলে বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শেখ মুজিবই জানেন, কী করে বাঙালির আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হবে।......"

"শেখ মুজিবকে সাফল্য অর্জনের সুযোগ দিতেই হবে। মি. হীথ্ তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশি জানেন। বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য পেতেই হবে। রাষ্ট্র হিসেবে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বৈদেশিক সাহায্যের মতো অবশ্য প্রয়োজন। ব্রিটেন শীঘ্রই স্বীকৃতি দান করবে। পররাষ্ট্র কার্যপরিচালনা সম্পর্কিত পুরানো আচরণবিধি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মাটিতে পা রাখা মাত্রই এই নতুন রাষ্ট্র একটি বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই হবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের উপযুক্ত সময়।"[৭]

১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পরপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগ্লাস হিউম (পরবর্তীকালে লর্ড ডগ্লাস হিউম) বলেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য কখন প্রত্যাহার করা হবে। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, তিনি (বঙ্গবন্ধু) যখনই চাইবেন, তখনই ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।[৮]

৮ জানুয়ারী (১৯৭২) লন্ডন থেকে ব্রিটিশ এয়ার-ফোর্সের কমেট্ বিমানযোগে ঢাকা যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লীতে ভারতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করেন। প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা কালে বঙ্গবন্ধু ৩১ মার্চের মধ্যে বাংলদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানান। মিসেস গান্ধী তাঁর অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু আমন্ত্রণে মিসেস গান্ধী সরকারী সফর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আসেন। তখন তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ৩১ মার্চের মধ্যে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালে কেউ কেউ দাবি করেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য মিসেস গান্ধীকে রাজি করিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বার স্বাধীন করেন। বঙ্গবন্ধু মতো দৃঢ়সঙ্কল্প নেতা ছাড়া আর কারো পক্ষেই তা' সম্ভব হতো না বলে মনে করেন।

বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বার স্বাধীন করার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান-বাহিনী আত্মসমর্পন করার পরেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে একটি ভারতীয় কলোনীর (উপনিবেশ) মর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ তখনও স্বাধীনতা অর্জন করেনি।

সংবাদ বিশেজ্ঞরা মনে করেন, স্বাধীনতা অর্জন করার পরেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দীর্ঘকাল বাংলাদেশে অবস্থান করলে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী মহল বাংলাদেশকে ভারতীয় কলোনী আখ্যা দিয়ে অপ-প্রচার চালাতে পারে। বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে নিশ্চয় সচেতন ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মি. হীথের সঙ্গে আলোচনাকালে বুঝতে পারেন, ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার আগে ব্রিটেন থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। তিনি আরো জানতেন, ব্রিটেনের স্বীকৃতির উপর বাংলাদেশ সম্পর্কে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।

ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী প্রত্যাহার করার ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রমাণ্য তথ্য ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক এস্. ব্যানার্জী তাঁর একটি গ্রন্থে (India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh) বলেন, মিসেস গান্ধীর অনুরোধ অনুযায়ী মি. হীথ্ বঙ্গবন্ধুকে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর একটি কমেট্ বিমানের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পলিসি প্লানিং কমিটির চেয়ারম্যান দুর্গা প্রসাদ ধর, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান আর.এ.ডবলিউ. (Research & Analasis Wing) প্রধান রাম নাথ কাও (Ram Nath Kao) এবং তাঁর ডেপুটি শঙ্করণ নায়ারের (Ahankaran Nair) সঙ্গে পরামর্শ করে মি. ব্যানার্জীকে বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর অনুমতি গ্রহণ করা হয়। মি. ব্যানার্জী ১০/১২ বছর যাবৎ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন।

বিমানযোগে রওয়ানা হওয়ার কিছুকাল পর বঙ্গবন্ধু মি. ব্যানার্জীকে কানে কানে ফিস্‌ফস্‌ করে বলেন, দিল্লী পৌঁছানো মাত্রই তিনি যেন মিসেস গান্ধীকে একটি বার্তা পৌঁছে দেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর (বঙ্গবন্ধু) সঙ্গে আলোচনার আগেই বার্তাটি পৌঁছে দিতে হবে।

ইতোপূর্বে মিসেস গান্ধী বাংলাদেশ থেকে ৩০ জুন-এর (১৯৭২) মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ৩১ মার্চের মধ্যে (অর্থাৎ মিসেস গান্ধীর ঘোষিত তারিখ থেকে তিন মাস আগে) সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তা' হলেই ব্রিটেন কর্তৃক বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের পথ বাধামুক্ত হবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার কথা মনে রেখে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার ঘোষিত তারিখে পুনর্বিবেচনার জন্য বঙ্গবন্ধুর বার্তা মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার আগেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মি. ব্যানার্জীকে তিনি অনুরোধ করেন। সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের ঘোষিত তারিখ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার পর সরকারী ইস্তেহারে প্রকাশ করা হবে বলে বঙ্গবন্ধু আশা প্রকাশ করেন।

মি. ব্যানার্জী বঙ্গবন্ধু অনুরোধ সম্পর্কে ডি. পি. ধরকে অবহিত করেন। মি. ধর অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর বার্তা মিসেস গান্ধীকে পৌঁছে দিয়ে সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মিসেস গান্ধী রাম নাথ কাও এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী টিক্কী কৌলের (Tikki Kaul) সঙ্গে পরামর্শ করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর তাঁর (বঙ্গবন্ধু) অনুরোধ অনুযায়ী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের তারিখ পূর্ব-ঘোষিত ৩০ জুনের পরিবর্তে ৩১ মার্চ হবে বলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত খুশি হলেন। এর পর ব্রিটেন কর্তৃক বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদান অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি নিশ্চিত হন।

ঢাকা থেকে লন্ডনে ফিরে আসার আগে বঙ্গবন্ধু মি. ব্যানার্জীকে বিদায়জ্ঞাপক মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। তখন তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের জন্য মি. ব্যানার্জীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দিল্লীতে আলাপ-আলোচনাকালে তিনি মিসেস গান্ধীর কাছে থেকে যা'কিছু পাবেন বলে আশা করেছিলেন, সবই পেয়েছেন।[৯]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য আন্দোলনে সরাসরি ভূমিকা পালনকারী সাক্ষাৎকারদাতা বৃন্দ [পরিশিষ্ট-(i)-এ সংযুক্ত।]
২. শেখ আব্দুল মন্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-১২০।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১২১-১২৮।
৪. মি. শশাঙ্ক এস্. ব্যানার্জীর পরিচয় যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয়দের ভূমিকা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গ্রন্থদ্বয় 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banerjee, Anthem Press, published in U.K. and U.S.A., 2006; (2) ('A Long Journey Together: India, Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banrjee, published in the U.S.A., 2008, ISBN: 9781-4196-9763-0.- এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন তাঁর 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পৃষ্ঠা- ৩০-৩৭।
৫. 'দি টাইমস্', লন্ডন, লন্ডন, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৪।
৬. 'দি সানডে টাইমস্', লন্ডন, জানুয়ারী, ১৯৭২-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫।]
৭. 'দি গার্ডিয়ান', লন্ডন, লন্ডন, জানুয়ারী, ১৯৭২-এর সূত্র উল্লেখ আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫।]
৮. ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগ্‌লাস-হিউমের এক বিবৃতিতে উল্লিখিত পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। ১৮ জানুয়ারী (১৯৭২) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন:

"--- the new Government in Dhaka appears to be firmly established. The Indian army is still in the East, but Sheikh Mujib has made it clear that this is by his will and that the soldiers will be withdrawn when he deems it necessary.

"I am keeping the question of recognition under close consideration and am in touch with a number of Commonwealth and other governments. I hope to be able to make another statement on this question in the near future...

" Sheikh Mujib also expressed his wish to remain on good terms with Pakistan, but made it clear that there could be no question of a formal link."

[সূত্রঃ Hansard. Vol.829, January 17-28.1971-72, Parliamentary Debate in the House of Commons.Col.216)-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫, ৫৩।]

৯. 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh, pp. 139-140.'-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

বিদেশীদের ভূমিকা ঃ যুক্তরাজ্যের ভূমিকাসহ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশীদের ভূমিকা ঃ

৪.১ পটভূমিঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক জটিল রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং মুক্তিযুদ্ধে বৃটিশ ও ভারতসহ পরাশক্তির অবস্থানঃ

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ রূপ নিয়েছিল জনযুদ্ধে। সকল প্রকার বাঙালি "যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে" সু-প্রশিক্ষত পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবাসে "মুজিবনগর সরকার" নামে পরিচিত বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই বাংলাদেশর স্বাধীনতা লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধী দুই ফ্রন্টেই লড়ে যাচ্ছেন। দেশের ভিতরে "বাংলাদেশ বিরোধী" লবির সঙ্গে তাঁকে বুঝতে হচ্ছে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁকে তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট রাখতে হচ্ছে। যদিও দেশের ভিতরে ততোটা বিরোধীতার সম্মুখীন তিনি হননি, ভারতের জনসাধারণ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে যেন তাদেরই মুক্তিযুদ্ধ বলে ধরে নিয়ে সব রকম সহযোগিতা অক্ষুন্ন রেখেছে গোটা নয় মাস ধরে।[১] ভারতের রাজনীতিতে পিকিংপন্থীদের বিরোধিতাকে বাদ দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে হোম ফ্রন্টে ইন্দ্রিরা গান্ধী বিরোধী দলের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছেন। এই লক্ষ্যে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের পক্ষে রায় দিয়েছে বিরোধী দল। বরং পার্লামেন্টে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কেন আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে পারছে না সে জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন; কেন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সাহায্য করছেন সে প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে কখনও হতে হয়নি।[২] বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি তখন ভারতের জাতীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌছানোই গণতান্ত্রিক রীতি, গণতান্ত্রিক ভারতে তাই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব লাভের আন্দোলনকে খুব বড় কোনও বাঁধার সম্মূখীন হতে হয়নি। আমলাতান্ত্রিক বাঁধা অবশ্য একবারেই যে ছিল না, তা বলা যাবে না। কিন্তু রাজনৈতিক সহযোগিতার জোয়ারে তা উড়ে গিয়েছিল। হোমফ্রন্টে এই একচ্ছত্র সমর্থন ইন্দ্রিরা গান্ধীর জন্য আন্ত-র্জাতিক সমর্থন অর্জনেও সহায়ক হয়েছিল।[৩]

১৯৭১ সালে ভারতের প্রতি ব্রিটেনের শুধু নমনীয় মনোভাব নয় প্রচ্ছন্ন সমর্থনের জন্য ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং একই সঙ্গে ব্রিটেনের জনমত সৃষ্টিকারী পত্রপত্রিকার ভূমিকাকে (এ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) খাটো করে দেখার উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধকালে বলতে গেলে ব্রিটেনের সবগুলো পত্রপত্রিকাই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব লাভের সংগ্রামকে অকুন্ঠ সমর্থন দিয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতের ভূমিকাকেও প্রসংশা করেছে। ফলে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় থাকা সত্বেও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটেনের সহযোতিা লাভ সম্ভব হয়েছে। এপ্রিলের ৪ তারিখে ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের জন্য তৈরীকৃত 'পূর্ব পাকিস্তান রিপোর্ট'[৪] -এ বলা হয়, "সপ্তাহান্তের কাগজগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই লেখা হয়েছে, ঢাকার রাস্তা গণকবরে আবৃত।' স্যাটারডে টাইমস্ বলেছে শুধুমাত্র কুমিল্লাতেই ২৬০০ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। স্যাটারডে গার্ডিয়ান বলছে, ওয়েস্টমিনস্টারে এম.পি.দের মধ্যে এই মতবাদ শক্তিশালী হচ্ছে যে, এই ভয়াবহতা আরও বাড়ার আগেই ব্রিটেনের কিছু একটা করা উচিত। একই পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তেব্যে বলা হয়েছে, "মিসেস গান্ধীকে শেখ মুজিবের একমাত্র সমর্থক হবার সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না"। অর্থাৎ এসব কাজগুলো বহু আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন লাভ করবেই। এটা ঠেকানো সম্ভব নয়। সুতারাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য একক কৃতিত্ব ভারতকে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে বাংলাদেশের উপর ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য। যেটা বাণিজ্যিক মানসিকতা সম্পন্ন ইংরেজদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। স্বাধীন বাংলাদেশ যে ব্রিটেনের জন্য একটি উর্বর বিনিয়োগ ক্ষেত্র হবে, সেকথা প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম, ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস এবং বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো বিভিন্ন রিপোর্টে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] অন্য সব কিছুকে যদি বাদও দিই তাহলে ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে হলেও তৎকালীন ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অপ্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজ দলের এমপিরা পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছেন, কিন্তু বিরোধী দলের এম.পি.রা সম্মিলিত ভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে রাস্তায় নেমেছেন, পার্লামেন্টে সোচ্চার হয়েছেন। সুতারং প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ এদিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন যে, বিরোধী দল তাঁর পক্ষে ছিল। অবশ্য বহু বছর পর এই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে, কনজার্ভেটিভ দলের প্রধানমন্ত্রী হয়েও এডওয়ার্ড হীথ ঠিক ততোটা 'কনজার্ভেটিভ' হতে পারেননি, যতোটা মিসেস থ্যাচার ছিলেন। একথা ভাবলেও এখন গা শিউরে ওঠে যে, ১৯৭১ না হয়ে আশি অথবা নব্বইয়ের দশকে যদি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতো তাহলে ব্রিটেনের ভূমিকা কি হতো? ১৯৭১ সালে এডওয়ার্ড হীথ ও স্যার ডগলাস-হিউম পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন; পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বিশাল অঙ্কের নতুন অর্ডার এলেও তা সময়ক্ষেপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল; জাতিসংঘে ভেটো দানে বিরত থেকে সপ্তম নৌবহরের গতিপথ বাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছিল।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম কয়েক মাস ব্রিটিশ সরকার একদিকে 'পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে' পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে অভিহিত করেছে, অপরদিকে পার্লামেন্টে একথাও বলেছে যে, "নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সিভিল শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হবে বর্তমান সমস্যার সমাধানের উৎকৃষ্ট উপায়"। কিন্তু একথাও ব্রিটেনের ভালো করেই জানা ছিল যে, এই পথেও পূর্ব পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আপামর জনসাধারণের দাবীকে কখনই পাকিস্তানের সামরিক সরকার দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ২৮শে জুন তারিখে পাঠানো ইসলামাবাদে নিযুক্ত হাই কমিশনারের রিপোর্ট[৭] -এ বলা হয়, "শেখ মুজিব প্রথমে বলেছিলেন যে, ছয়-দফা নিয়ে আলোচনা সম্ভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অনড় ভূমিকা পরিস্থিতিকে বিরূপ করে তোলে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ নাকচ করে দেন এবং আগে থেকেই তিনি কৌশলের মাধ্যমে এবং তা' সম্ভব না হলে বলপ্রয়োগ করে দেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। ১৫ই মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলাকালে তিনি এবং তাঁর অনুচররা এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই গোপন প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তাঁরা জিন্না'র সৃষ্ট পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।" এরপরে পূর্ব পাকিস্তানে নির্যাতিত জনগণকে সহায়তা দানের জন্য ভারতের প্রতি প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ও ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি স্যার ডগলাস-হিউম খুব একটা রাখঢাক না করেই সমর্থন দিতে শুরু করেছিলেন; একই সঙ্গে ব্রিটেনের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনতো ছিলোই।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে যখন ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে গোপন বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝোলানোর ইঙ্গিত দিয়েছে তখন শেখ মুজিবের জন্য ব্রিটেনের উদ্বেগ অপ্রকাশিত না থেকে প্রকাশ্য রূপ ধারণ করেছে। ওয়াশিংটনে ও উপমহাদেশে ব্রিটিশ দূতাবাসগুলোর কাছে পাঠানো এক জরুরী টেলিগ্রাম[৮]-এ স্যার ডগলাস-হিউম লেখেন, "আমাকে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হচ্ছে যা আমাদের খুব 'বিচলিত' করেছে, তাহলো 'এক্সিকিউসন অব শেখ মুজিব' বা গোপন বিচারের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া। আমি মানি যে, বিষয়টি একান্তই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পাকিস্তানের ব্যাক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এর প্রক্রিয়া হবে ভয়াবহ।" তিনি এই টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমেরিকা ও জাতিসংঘের কাছে বিশেষ ভাবে আবেদন জানান পাকিস্তান সামরিক সরকারকে বোঝানোর জন্য যাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে হত্যা না করেন। ব্রিটেনের এই মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখিয়েই হয়তো খোদ্ প্রেসিডেন্ট নিক্সনও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে অনুরোধ করেন শেখ মুজিমকে মৃত্যুদন্ড না দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে পাঠানো বিভিন্ন চিঠি[৯]'তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধী উদ্বেগও উল্লেখ করার মতো। একটি চিঠি[৯]'তে ইন্দ্রিরা গান্ধী লিখেন, "আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়া শেখ মুজিবকে হত্যা করার প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হবে।" এই চিঠির পরেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মি. হীথ এবং ফরেন এ্যাড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি স্যার ডগলাস-হিউম পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের কাছে আবেদন[১০] জানান তাঁরা যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে শেখ মুজিবকে হত্যা করার মতো 'হঠকারী' সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকে। তাঁরা ব্রিটেন থেকে পাকিস্তানের বন্ধু বলে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও পাকিস্তানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসলামাবাদে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের কাছে পাঠানো এক টেলিগ্রাম[১১]-এ স্যার ডগলাস-হিউম একথাও উল্লেখ করেন যে,".. শেখ মুজিবকে প্রাণদন্ড দান সম্পর্কে পাকিস্তানের মনোভাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাকে সম্ভবতঃ বোঝানো যেতে পারে যে, বাঙলি জাতিয়তাবাদ ও সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপস-রফার মাধ্যমে কিছুটা হলেও এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হলে শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।" ব্রিটেন একে শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল বলেই শেখ মুজিবকে গোপন বিচারের মাধ্যমে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়নি। একথা পরে শেখ মুজিব নিজেও প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকালে উল্লেখ করেন।[১২]

গোটা ১৯৭১ সাল ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আদান-প্রদানকৃত চিঠিগুলি[১৩] পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দ্বি-খন্ডিত করা ভারতের মূল উদ্দেশ্য নয়; ভারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পূর্ব বাংলার' অধিকার-বঞ্চিত মানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব লাভের সংগ্রামে সমর্থন দেয়া। ভবিষ্যতে এই সমর্থন দেওয়ার ফলে সৃষ্ট দেশটি থেকে কি ফলাফল আসবে সেটা প্রধান বিবেচ্য নয়; প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো সেই মুহূর্তে এই নির্যাতিত জনগণের পাশে গিয়ে দাড়ানো। ব্রিটেন নিঃসন্দেহে ভারতের এই মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজও করেছে। ভারতকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আরও একটি ভয় যে কাজ করেনি তা নয়। যার কথা উল্লেখ পাই আমরা অক্টোবরে ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে পাঠানো একটি মেভোরেন্ডাম[১৪]-এ। এতে বলা হয়,"আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত ও পাকিস্তানের উভয়ের ওপরই আমাদের ক্ষমতা সীমিত। উভয় পক্ষের কাছেই আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু ভারতের তুলনামূলক গুরুত্ব এবং ক্ষমতা সম্পের্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অখন্ড পাকিস্তান আমাদের কাম্য হলেও শেষ পর্যন্ত তা' বোধ হয় আর থাকছে না।"

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটেন কেন সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল? উদ্ধারকৃত ব্রিটিশ দলিলপত্রাদি ঘাঁটার পর মোট পাঁচটি বিষয়কে আমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাধান্য দেওয়ার কথা মনে এসেছে। এই পাঁচটি বিষয় হলঃ

ক) পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অসমতা।

খ) পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে শেখ মুজিব ঘোষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় আপামর বাঙালির সাড়া দেওয়া।

গ) পাকিস্তানের সামরিক শাসনব্যবস্থা।

ঘ) পাকিস্তানের তুলনায় ভারতকে বেশী বন্ধু হিসাবে কাছে পাওয়া।

ঙ) বাংলাদেশ স্বাধীন হলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের নতুন আর একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসে ডগলাস-হিউমকে লেখা ইসলামাবাদে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার মি. পামফ্রে'র একটি চিঠি[১২]তেই উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মি. পামফ্রে লিখেন, "পাকিস্তানের প্রথাগত ভুল বোঝাবুঝি, ভুল ব্যাখ্যা এবং শত্রুতার ভয়াবহতাই আমার কাছে বর্তমান সমস্যার মূল কারণ বলে মনে হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ সাধারণতঃ নম্র, ভদ্র ও মোটামুটিভাবে বুঝদার এবং তারা একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুসুলভও, বিশেষ করে বাঙালিরা। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও নীতি নির্ধারকদের এমন অসংযম, উগ্রতা ও অযোগ্যতা আমি অন্য কোথাও দেখিনি এমনকি জাম্বিয়ায়ও নয়। ..... ১৯৪৮ সালে জিন্না'র মৃত্যু অথবা ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পরই পাকিস্তান মূলতঃ পথভ্রষ্ট হয়েছে। যদিও এই দুই ব্যক্তি পাকিস্তানের দুই অংশকে একত্রে গ্রোথিত করে একটি গণতান্ত্রিক পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে পারতেন কিনা, তাতেও সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু সৃষ্ট পরিস্থিতি বলছে পশ্চিমের প্রশাসন পূর্বাঞ্চলের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে; গণতন্ত্র শেকড় গ্রোথিত করতে পারেনি এবং সেনাবাহিনী দিয়ে পাঞ্জাবীদের প্রভাব খাটানোর বিষয়টি বাঙালির জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।.... পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে কোনও সন্তোষজনক (বাঙালির জন্য) রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান বন্ধ করতে পারবে না; ওদিকে ভারত যতোক্ষণ না এই সাহায্য বন্ধ করছে ততোক্ষণ পূর্ব পাকিস্তানের কোনও সন্তোষজনক (পাকিস্তান সরকারের কাছে) রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। ভারত যে আচারণ করেছে তাতে যে তাঁর অধিকার রয়েছে পৃথিবী তা অস্বীকার করতে পারবে না; তাইতো তারা ভারতের ধৈর্যশীলতার জন্য সাধুবাদ জানাতেও দ্বিধা করছে না। পাকিস্তান মনে করছেন যে, পৃথিবী ভুল করছে; তাঁরা মনে করেন ভারত তাদের দেশকে ভাঙতে চায়; এই দুশ্চিন্তা থেকেই তারা উম্মাদ শিশুর মতো আচারণ করছেন।"

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও যে ব্রিটিশ সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করেছেন তারও মূল কারণ উপরে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের ওপরই নির্ভরশীল। ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে ঢাকায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ঘটার পর বিচারপতি চৌধুরী যখন জেনেভা থেকে ব্রিটেনে আসেন তখন ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসের আন্ডার সেক্রেটারি ও দক্ষিন এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ড বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণ সম্পর্কে যতোটুকু জানেন তা বিচারপতি চৌধুরীকে জানান। এরপর থেকে ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সম্পর্কটা কখনওই ছিন্ন হয়নি বরং ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বিচারপতি চৌধুরীর নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে ব্রিটেনে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য সব রকম সহযোগিতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। ফরেন এন্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি স্যার আলেক ডগলাস-হিউম ব্যক্তিগতভাবে বিচারপতি চৌধুরীকে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন। অফিসে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে '(তথাকথিত) বাংলাদেশ' কে সমর্থন দেওয়া অভিযোগ উঠতে পারে বলে বাড়িতে স্যার ডগলাস-হিউমের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসাবে বিচারপতি চৌধুরী দেখা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তবে বিচারপতি চৌধুরীও ব্রিটিশ সরকারকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরই ক্ষমতায় আরোহণের ন্যায্য অধিকার রয়েছে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার তাঁকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, যে বঞ্চনা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বহুদিন থেকে ভোগ করেই আসছে, এখন তাঁরা অস্ত্র ধরছে অধিকার আদায়ের জন্য; এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শেখ মুজিবকে যদি সমর্থন নাও দেওয়া হয় তাহলেও পূর্ব পাকিস্তান আজ হোক কাল হোক স্বাধীনতা অর্জন করবেই, তবে সেক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের দখল চলে যাবে 'কমিনিউনিষ্টদের' হাতে। ব্রিটেন তখন কমিনিউষ্ট শব্দটিকেই যমের মত ভয় পায়। সুতারং কমিনিউনিষ্টদের ঠেকাতে হলে শেখ মুজিবকে প্রয়োজন। এ মনোভাব থেকেও হয়তো ব্রিটেন শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এতোটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষেই সহায়তা দিয়ে গেছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পাকিস্তানের চরম বিরোধিতার মুখেও বিচারপতি চৌধুরীকে লন্ডনে 'স্বাধীন বাংলাদেশের দূতাবাস' খোলার পরোক্ষ অনুমতি দিয়েছে। দূতাবাস উদ্বোধনের দিন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করেছে, কারণ পাকিস্তান দূতাবাসের সহযোগিতায় ব্রিটেনে অবস্থারত পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা বাঁধা প্রয়োগে ব্যর্থ হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় লন্ডনে এই দূতাবাস প্রায় নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যায়। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে ব্রিটেনে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান করে কোনও '(তথাকথিত) বিদ্রোহী' গোষ্ঠী এতটা সরকারী নিরাপত্তা ভোগ করে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে বলে জানা যায় না, যেমনটি ১৯৭১ সালে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে বাঙালিরা পেরেছিলেন। তবে আগেও যেকথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও সে কথা উল্লেখ করতে হবে যে, এক্ষেত্রে ব্রিটেনের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন স্বাধীনতাকামী বাঙালির পক্ষে ছিল। অবশ্য সর্বকালেই দেখা গেছে যে, যে কোন দেশের নীপিড়িত ও নির্যাতিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ব্রিটেন ও আমেরিকার জনগণ সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু সরকারকেই দেখা গেছে ভূমিকা বদলে শোষকের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াতে। জনগণ কিন্তু কখনওই ভূমিকা বদলান নি; তারা সব সময়ই শোষিতের পক্ষে থেকেছেন।

১৯৭১ সালে বাঙালির পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতার কথা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, গ্রন্থটি ত্রুটিপূর্ণ নয়, অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেছে তাতে। তারপরও বিচারপতি চৌধুরীর গ্রন্থে ব্রিটেনের যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এটা লক্ষ্যনীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নেই প্রথম ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটে। এর আগে বা পরে অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিমত পোষণ করতে দেখা যায় না। একমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নেই যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে, ব্রিটেন ভারত তথা বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ সরাসরিই প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তাঁর অবস্থান ব্যাখা করেছেন। একাত্তরের নভেম্বর মাসে এক টেলিফোনে আলাপকালে[৬] দুই নেতার কথোপকথনের অংশ এরকম,"…. প্রেসিডেন্ট নিক্সনঃ সবকিছুই জেনে ও বিবেচনা করে আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভারত পাকিস্থানকে ভাঙতে চাইছে এবং সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়, সকলেই তা মনে করেন। তাঁরা অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের জনসংযোগও চমৎকার। বাকিরা চরম বোকা। প্রথমেই তারা অত্যন্ত বোকার মত কিছু কাজ করেছে। আমার মনে হয় না পরিস্থিতির এই পর্যয়ে ভারতীয়রা আগ্রহী হবে। আপনি নিজেও জানেন যে, তারা জাতিসংঘে যাওয়ার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছে। সত্য হচ্ছে তারা জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ মেনে না নেয়া সহ অন্য অনেক কিছুই করেছে যাতে তারা পরিস্থিতির সমাধান চায় বলে মনে হয় না।

"প্রধানমন্ত্রী ঃ আমি মনে করি যে, পাকিস্থান ইচ্ছা করলেই ভালো অবস্থান পেতে পারতো যদি আমরা প্রেসিডেন্ট মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে ও অতীত ভুলে যেতে রাজি করাতে পারতাম। লোকজনকে কারাগারে পাঠিয়ে পরে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদেরকে প্রেসিডেন্ট বানানোসহ অন্য অনেক কিছু করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ আমাদের রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখের উপর এরকম 'আত্ম-সমালোচনা'র দ্বিতীয় কোন উদাহরণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকান প্রস্তাবে ভেটোদানে বিরত থাকার নামে 'মৌন-ভেটো' প্রয়োগ করেও এডওয়ার্ড হীথ মার্কিন-বিরোধিতার নজির স্থাপন করেন। এমনকি একাত্তর সালেই ব্রিটেন অনুভব করে যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ছেড়ে আসার প্রাক্কালে উপমহাদেশে 'কাশ্মির' ও 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে দু'টি ক্যান্সার বা ক্ষত তাঁরাই সৃষ্টি করে এসেছিল। এখন এই দু'টি ক্ষত সারানোর দায়িত্বও তাদেরই। যে কারণে আমরা দেখতে পাই ২৯ নভেম্বর ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের জন্য তৈরি মেমোরেন্ডাম[৭]-এ ব্রিটেনকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ঃ

ক) ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও ক্রমাবর্ধমান গেরিলা তৎপরতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

খ) অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পকিস্তান পাকিস্তানের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে (যদিও অতীতে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের বড় সম্পদ)।

গ) পূর্ব বাংলার বিনীময়ে কাশ্মীর লাভের 'সামরিক বাণিজ্য'ই একমাত্র সমাধান।

সাতচল্লিশে যে ভুল ব্রিটেন করেছিল একাত্তরে সেই ভুল শোধরাতে চেয়েছিল কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার কারণে সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কাশ্মীরকে নিজে হাতে রেখেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারত সফলতা অর্জন করেছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পরাজিত পাকিস্তানি-বাহিনী ভারত ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর ভাষণ-এ একে "সামরিক যুদ্ধ বিরতি" বলে উপেক্ষা করেন এবং 'ফাইনাল ভিক্টরি' বা চুড়ান্ত বিজয় অর্জনের ভার জুলফিকার আলী ভূট্টোর ওপর প্রত্যার্পন করেন। আমরা দেখতে পাই যে, পাকিস্তানের সামরিক শক্তি পরাজিত হলেও রাজনৈতিক ফ্রন্ট পরাজয়কে স্বীকার করতে চায় না সহজে। ভূট্টো তাই তাবৎ বিশ্বের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ বলে দাবি করে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য তৎপরতা চালায়। স্বীকৃতি দেওয়া হলে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করবেও বলে হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেন ভূট্টোর হুমকিকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যায়। কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলির কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গোপনে তৎপরতাও চালাতে দেখা যায় ব্রিটেনকে। এমনকি শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ গোপনে বার্তা

Dhaka University Institutional Repository

পাঠান যাতে তিনি প্রকাশ্য একথা উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন বা যে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপনে স্বাধীন বাংলাদেশ আর আগ্রহী নয়। অবশ্য একথা শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর লন্ডনে এসে এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে সাক্ষাৎকালেই নিশ্চিতভাবে বলে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে শেখ মুজিব এডওয়ার্ড হীথকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভূট্টো-কথিত কোনও প্রকার কনফেডারেশনে যেতে তিনি আগ্রহী নন, দু'টি স্বাধীন দেশের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে তাই-ই বলবত থাকবে।[১৮]

পাকিস্তানী সেনাবাহীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করার মাধ্যমে যে স্বাধীন বাংলদেশ অর্জিত তার স্বীকৃতি আদায়ের যুদ্ধও কম ভয়াবহ ছিল না। যে যুদ্ধ বঙ্গবন্ধু একা করেছেন। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, যুদ্ধ করে যখন স্বাধীনতা অর্জিত হয়েই ছিল তখন স্বীকৃতিও আসতো কোনও না কোনও সময়। এই যুক্তি অসার বলে মনে হয়, কেননা একটি স্বাধীন দেশ এবং যাকে অনেকেই পৃথিবীর ওপর বোঝা বলে অভিহিত করে ছিল (আমরিকাতো একে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে প্রকাশ্য মন্তব্যই করেছিল) তার জন্য স্বীকৃতি আদায় করা অতো সহজ ভাববার কোন কারণ নেই। বঙ্গবন্ধু এই কঠিন কাজটিই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা করেছিলেন। যদিও পাকিস্তান পদে পদে এতে বাঁধা দিয়েছে। প্রথমেই তারা ধুয়া তুলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। একটি স্বাধীন দেশ কেমন করে অপর একটি দেশের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকে? বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে পাঠানো চিঠিতে ভূট্টো বার বার এই প্রশ্ন তুলেছেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে এসে এডওয়ার্ড হীথকে বলেছেন তিনি অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেবেন। ভারতে নেমে প্রথমেই তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে ওেয়ার অনুরোধ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালনও করেছেন। যদি তার মনে কোন দূরভিসন্ধি থাকতো তাহলে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য অতো সহজে সরে যেতো কি? ইন্দ্রিরা গান্ধী যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণের দোহাই দিয়ে সেনাবাহিনী আরও দীর্ঘদিন রাখতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে কেউ ঠেকানোর যুক্তি কী ছিল ? না কি বিশ্ববাসী তাঁর যুক্তিকে অবহেলা করতে পারতো? ঐতিহাসিকের নিকট এ আমার প্রশ্ন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, উল্টো সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রীয় এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পঁচিশ লাখ ডলার জমা দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্দ্রিরা গান্ধী তথা ভারতের এই অবদানের কথা আজকের বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা ও ভারত-বিরোধিতার জোয়ারে ভেসে যেতে বসেছে। এই জোয়ার ঠেকানোর কোনও উদ্যোগ তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, যা দুঃখজনক। আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তার ঢালাও স্বীকৃতি দেওয়া হয়, ব্রিটেনের ক্ষেত্রে জোটে প্রশংসা, কিন্তু এই দু'টি দেশকে যে দেশটি বাঙালির পাশে এনে দাঁড় করিয়েছিল সেই ভারত তথা ইন্দ্রিরা গান্ধীর ভাগ্যে জোটে নিন্দা।[১৯]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের পরাজয় হয়েছিল। জাতিসংঘ সুস্পষ্টভাবেই আমেরিকার পক্ষাবলম্বন করেছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদে পাশ না হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল ভারত মহাসাগরে শুধুমাত্র পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য, অন্যথায় বাঙালি নিধনের জন্য। আমরা দেখতে পাই ১৪ ডিসেম্বর ভারত থেকে এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তার রিপোর্ট[২০]-এ বলা হয়, "এই যুদ্ধে জাতিসংঘেরও বড় ধরনের পরাজয় ঘটেছে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে বিষয়টি নিস্পত্তি না হওয়ায় এখন থেকে যে অঞ্চলে দুই পরাশক্তির আগ্রহ রয়েছে, সেখানে কোন সমস্যা দেখা দিলেই তারা জাতিসংঘকে বাদ দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে।" যেহেতু দুঃখজনকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক পরাশক্তির পতন ঘটেছে সেহেতু একক পরাশক্তি হিসাবে আমেরিকা জাতিসংঘ কেন কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু একে ঠেকানোর যে কৌশল মুসলিম বিশ্বে অবলম্বনের চেষ্টা চলছে সেটা ভুল। ধর্মের উগ্রতা দিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ঠেকানো যায় না, একাত্তরে বাঙালি তা' প্রমাণ করেছে। বাঙালি সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের শক্তিকেই সশস্ত্র পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করেছিল। বরং ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানী ও পাকিস্তানপন্থীরাই বাঙালি-নিধন-যজ্ঞে নেমেছিল, কিন্তু তাদের সেই অস্ত্র কাজে আসেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাই বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে যখন ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে বঙ্গবন্ধুকে চিঠি পাঠায় তখন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উত্তরে লিখেন[২১], "... এখন আমার সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার সরকার জোট-নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলবে। আমার সরকার সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবাদ প্রতিহত করার নীতিতে অটল থাকবে। আমার সরকার জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবে এবং সার্বভৌমত্ব , সাম্য, অভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান, একে অন্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সীমান্তগত স্বকীয়তার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল সরকারের সঙ্গে আমার সরকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রস্তুত থাকবে।"

যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুদীর্ঘ নয়মাস ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে যতই সময় গড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ততই আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। সময় এখানে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচিত করেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরেও বিশেষ করে, ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে ব্রিটেন কর্তৃক বাংলাদেশ স্বীকৃতি প্রদান পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধই ছিল আর্ন্তজাতিক আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু। তাই মাস ওয়ারী আন্তর্জাতিক জটিল এ রাজনীতির ব্যাখা উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এ লক্ষ্যে নিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ সম্পর্কিত আলোচনা 'যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি সংগ্রামী পটভূমি' অংশে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে বিধায় পুণরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যে এ অংশে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন আর্ন্তজাতিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করা হলো।

শুধু ৪ মার্চ তারিখে ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসের অনুরোধে তৈরিকৃত পাকিস্তান সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। সম্ভবতঃ পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই এটি তৈরি। এটি তৈরি করেন জে এ থমসন নামে কেউ। এর দ্বারা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য ঃ

ক) ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে। বিশেষ করে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঞ্জাবীদের কর্তৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং এই ক্ষিপ্ততায় জোয়ারোপ করে পূর্বের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ। শেখ মুজিব এই তিক্ততাকে পূর্ব পাকিস্তানে আরও বিস্তৃত করতে সক্ষম হন এবং এ কারণেই গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে তার দল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দু'টি বাদে সব আসনে জয়লাভ করে যা তাকে গোটা পাকিস্তানেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেয়। একই সময়ে পশ্চিমে ভূট্টোর পিপল্‌স পার্টি অনাকাঙ্খিত ভাবে বিজয় অর্জন করে। দুই দলের মধ্যে চরম বিরোধ থাকলেও তাদের মধ্যে একটি মাত্র সাদৃশ্য রয়েছে। তা'হলে দুই দলেই প্রাইভেটাইজেশনের বিপক্ষে। কিন্তু পাকিস্তানের দুই খন্ডের মধ্যে সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ব্যাপারে দুই দলের অবস্থান দুই মেরুতে। মুজিব দৃঢ়ভাবে তার "ছয়দফা'র (যার মূল কথা হচ্ছে দুই অংশের পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে একটি দুর্বল কেন্দ্র) ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন; ওদিকে ভূট্টো একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতি। ভারতের প্রতি মনোভাবও দুই দলের দূরত্ব অনেক; মুজিব ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কাশ্মীরে ব্যাপারে ভূট্টোর তুলনায় অনেক কম সোচ্চার। ভূট্টো মনে করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না করে ভারতের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব নয়।

খ) পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক ভাবে উঁচু স্তরের 'লিভিং স্ট্যান্ডার্ড' অংশত ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণে কিন্তু মূলত পক্ষপাতিত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে। পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট বলা যাক অথবা বৈদেশিক সাহায্য বেশির ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় এবং দেশীয় মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রা উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বের তুলনায় পশ্চিমই সব দিক দিয়ে লাভবান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টে কাউকে কোন প্রকার উৎসাহ তো দেয়ইনি বরং কোন ধরনের পাবলিক ইনভেস্টমেন্টও হয়নি। এখনও পর্যন্ত অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের দুই- তৃতীয়াংশেরও কম, অথচ ২০ বছর আগে এই পার্থক্য ছিল মাত্র ১০%।

গ) নব নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ১২০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা। মুজিব একথা স্পস্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি ছয় দফার ব্যাপারে কোনও প্রকার আপস করবেন না। কিন্তু ভূট্টো বলেছেন যে, তিনি তাহলে ৩ মার্চের অধিবেশন বয়কট করবেন। দুই পক্ষের অনমনীয় তার সুযোগে প্রেসিডেন্ট ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই মার্শাল ল প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। পশ্চিমের চার প্রভিন্সে সিভিল প্রশাসনের মাথা হয়ে কাজ করার জন্য মার্শল ল প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে বরখাস্ত করে মার্শল ল প্রশাসনকে সিভিল প্রশাসনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ঘ) দুই অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশমত জাতির অখন্ডতা ও একতা সমুন্নত রাখার মতো (প্রভিন্সকে 'ম্যাক্সিমাম অটোনমি' দিয়ে ফেডারেল সরকারের হাতে আইনী, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখার কথা যাতে বলা হয়েছে) একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ মনে হচ্ছে। যদি কোন পক্ষই এতে রাজি না হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট একটা নুতন নির্বাচন দিতে পারেন; কিন্তু তাতে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। হয়তো তিনি বর্তমান সামরিক সরকারকেই আরও দীর্ঘায়িত করতে পারেন। কিন্তু তাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

যার ফলে সেখানে আরও বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর থেকে কর্তৃত্ব হারাবে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সর্বত্র খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

ঙ) যে কোনও পরিস্থিতিতেই হোক না কেন পাকিস্তানের কোনও অংশই সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া সরে দাঁড়াবে না বলে স্পষ্ট মনে হচ্ছে। এরকম ভয়ঙ্কর তিক্ত পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্থানের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নটি অবান্তর নয়, দিন দিন তা বরং আরও খোলামেলা হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পতন হবে। যে কারণে দেশীয় মুদ্রার ঘাটতি দেখা দেবে। অবিলম্বে হয়তো পূর্ব পাকিস্তান একটু কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং স্বল্প সময়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ফরেন এক্সচেঞ্জ সুস্থতার মুখ দেখবে। তবে শেষ পর্যন্ত পূর্বের তুলনায় পশ্চিমের ভবিষ্যৎ ভালো, বিশেষ করে পাটের ওপর পূর্বের নির্ভশীলতা ও জনসংখ্যার বোঝা এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক ভাবে 'স্থবির' করে তুলবে। তবে আমার এই বিশ্লেষণই শেষ নয়, হয়তো রাজনৈতিকভাবে উন্নতির মাধ্যমে এই অবস্থা এড়ানো সম্ভব হবে।[২২]

এপ্রিল মাসের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের স্পেশাল এনভয় মিয়া আরশাদ হোচাইন ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ-এর সাক্ষাৎকার। এর মূল বিষয় হলো পূর্ব পাকিস্থানে 'রক্তপাত' সম্পর্কে মিথ্যাচার। এবং শেখ মুজবের চরিত্র সম্পর্কে স্যার সিরিল পিকার্ডের নিকট কুৎসা রটনা করা। মিয়া আরশাদ হোচাইনকে দিয়ে ইয়াহিয়া এই কাজটিও করিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা ইয়াহিয়া ছাড়াও তাঁর সকল সাঙ্গপাঙ্গও বার বার করে বলছেন, মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার দাবি করেই সমস্ত ভন্ডুল করে দেন। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা স্থায়ী সমাধানে যেয়ে পাকিস্তানের জন্ম তাকে মুজিব পূণরায় ভাঙ্গাতে চেয়ে মহা পাতকের কাজ করছেন, অতএব তাঁকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি পেতে হবে। যে শাস্তির ব্যাপারটি চরম ভাবে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে উদ্বিগ্ন করেছে, তিনি তাই সমস্ত প্রটোকল ভেঙ্গে বার বার শেখ মুজিবসহ সকল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে ইয়াহিয়ার রোষানল থেকে মুক্ত করতে ব্রতী হয়েছেন।[২৩]

মে মাসে পরিস্থিতি কিছুটা ঝিমানো মনে হয়। বিশেষ করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কতিপয় দলছুট আওয়ামী লীগদের নিয়ে একটি 'সিভিলিয়ান সরকার গঠনের জন্য গোপণে তৎপরতা শুরু করে এবং তা আমেরিকা ও ব্রিটেনকে জানাতে ভোলে না অবশ্য। এই মে মাসেই আমরা দেখতে পাই যে, ইন্দ্রিরা গান্ধীর নব-গঠিত সরকার 'শরণার্থী' সমস্যাকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করেছে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটা আসলে একটা ইস্যু মাত্র। এ পথ ধরেই বুদ্ধিমতী ইন্দিরা গান্ধী এগিয়ে যেতে চাইছেন। তিনি আমেরিকা, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এমনকি কানাডার কাছেও এই সমস্যা সমাধানে 'উপদেশ' চেয়েছেন। এই 'উপদেশ' প্রার্থনার অপর নাম তাদেরকে সমস্যায় টেনে আনা হিসাবে যদি ধরি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, ইন্দিরা গান্ধীর কথায় সবই মোটামুটি সাড়া দিয়েছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি জাতিসংঘের মাধ্যমে ১ মিলিয়ন পাউন্ড সাহায্য বরাদ্ধও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ইন্দিরা গান্ধীকে ব্রিটেন সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সে সময় তিনি বিশ্বের সমস্যা বিশেষ করে পূর্ব 'পাকিস্তান' সম্পর্কে আলোচনা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্যার ডগলাস-হিউমের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত মিয়া আরসদ হোচাইনের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, স্যার ডগলাস-হিউম প্রকারান্তরে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের খবর আর বিশ্বের অজানা কিছু নয়। পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী সাংবাদিকরা ঢুকতে না পারলেও সেখান থেকে 'পাখির ঠোঁটে' খবর পেয়ে গোটা দুনিয়ায় বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। কোনও শান্তিকামী মানুষ যে রক্তপাত সহ্য করে না স্যার ডগলাস-হিউম সে কথাটিই পাকিস্তানী দূতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উত্তরে পাকিস্তানী প্রতিনিধির সত্য-মিথ্যের ভেজাল দিয়ে ভারতকে দোষীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছে। কিন্তু স্যার ডগলাস-হিউম তাঁর অপরিসীম প্রজ্ঞা দিয়ে বার বার পাশ কাটিয়ে যান।[২৪]

জুন মাসে এসে দেখা যায় ইয়াহিয়া বার বার প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড-হীথের স্মরণাপন্ন হচ্ছেন। ক্রমাগত মিথ্যা দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড-হীথকে ভোলাতে চাইলেও ইয়াহিয়া তাতে বার বারই ব্যার্থ হচ্ছেন। বিদেশী সাহায্য বন্ধের জন্য ভারতের আহব্বান যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণ্যযোগ্য ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে "সাহায্য ছাড়া পাকিস্তানী জাতি বেঁচে থাকতে পারে" বলে প্রকাশ্যে হুঙ্কার দিলেও প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড-হীথের কাছে কাঁদো কাঁদো হয়ে সাহায্য বন্ধ না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এই জুন মাসেই আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমস্ত ক্ষমতাকে একত্রিত করে এসে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে-পেচিয়ে হলেও প্রকাশ্যেই (পার্লামেন্টের বক্তৃতায়) প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবী করছেন। সন্দেহ নেই ইন্দিরা গান্ধীর সেই সাহসী পদক্ষেপ রক্তাপরুত পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে স্বাধীনতার অংকুরোদ্গম ঘটিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তা সূর্য দীপ্তি লাভ করে চলছিল।[২৫]

জুলাই মাসে এসে পাকিস্তানের উপূর্যুপুরি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের মনেও প্রশ্ন ওঠে, তারা ভারত না কি পাকিস্তানকে সমর্থন দেবে? আমরা দেখতে পাই যে, ব্রিটিশ অফিসিয়াল অর্থাৎ ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড-হীথকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারী

Dhaka University Institutional Repository

দু'জনেই ভারত তথা পূর্ব পাকিস্তানে নির্যাতিত জনগণের জন্য শুধু উদ্বেগ প্রকাশ নয়, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর যথেষ্ট চাপও বজায় রেখেছেন। তারা বরাবরই ভারতের ধৈর্য ও উদারতার প্রসংসা করেছেন। বিশেষ করে মিসেস ইন্দিরার ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড হীথ কোনও প্রকার আপোস করতে চাননি। যদিও তিনি ইয়াহিয়াকেও হাতে রেখেছেন বরাবর।

আমরা দেখতে পাই যে, এই মাসেই পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলার ব্যাপারে ব্রিটেন চিন্তা-ভাবনা করছে। তবে বিষয়টি উত্থাপনের আগে স্থায়ী সদস্যদের সংগে আলোচনার কথাও বলা হয়েছে এই রিপোর্টে। ব্রিটেন ভয় পাচ্ছে, চীন যদি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হয়ে পড়ে তাহলে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা সমাধান অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে, ব্রিটেনের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। সব নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে আমেরিকা চীনকে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' যাতে সৃষ্টি না হয় তারই জন্য নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য করে ন্যায় এবং চীন বরাবর সেই কঠিন দেওয়ালের ভূমিকাই পালন করেগেছে।[২৬]

গোটা আগস্ট মাস ধরেই দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন শেখ মুজিবের গোপন বিচার ও তাঁকে হত্যার বিষয়ে চরম উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা যে পরিস্থিতির সমাধান নয় তা ইয়াহিয়াকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি এই বোঝানোর কাজে আমেরিকাকেও টেনে আনছে ব্রিটেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন, যাতে শেখ মুজিবকে গোপন বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা না হয়। জাতিসংঘও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শেখ মুজিব প্রসঙ্গ ইয়াহিয়ার কাছে তুলছে। যেহেতু পাকিস্তান অন্যায় করছে সেহেতু সে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করছে প্রতিটি ব্যাপারে। তাঁর (ইয়াহিয়ার) বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোনও কথাকেই তিনি ভারতের পক্ষাবলম্বন বলে ধরে নিয়ে সবার প্রতিই বিদ্বেষ ছড়ানো অব্যাহত রাখেন। যেহেতু ব্রিটেন প্রথম থেকেই পাকিস্তানের আচরণকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দেয়নি সেহেতু শেখ মুজিব বিষয়ে ব্রিটেনের কোনও প্রস্তাব যে পাকিস্তান গ্রহণ করবে না, তা বুঝতে পেরেই ব্রিটিশ হাই কমিশনার (এ সময় মি.পামফ্রে স্যার সিরিল পিকার্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন) করেন এ্যান্ড কমলওয়েলথ সেক্রেটারি স্যার ডগলাস-হিউমকে বিকল্প কোনও উপায় খুঁজতে অনুরোধ করেন। স্যার ডগলাস-হিউম শেখ মুজিবের নিরাপত্তা নিশ্চত করিতে এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে, তিনি সমস্ত কুটনৈতিক শিষ্টাচার লংঘন করে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত অনুরোধ করেছেন ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য। বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা হিসাবে শেখ মুজিবকে মেনে না নিলে ব্রিটেন তার নিরাপত্তায় এতটা উদ্বিগ্ন হতো কি?[২৭]

সেপ্টেম্বরের খুব বেশী নথিপত্র পাওয়া যায়নি। যা হয়েছে তাতে পাকিস্তানের পারস্থিতি বিশ্লেষণ করে মি. পামফ্রের একটি চিঠি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বর্তমান অবস্থা বিচার করে ভবিষ্যতের একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করেছেন। মি. পামফ্রে পাকিস্তানের ভাঙনকে অনিবার্য বলে বর্ণনা করেছেন। এর আগে তিনি ইয়াহিয়াকে রাক্ষসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে তিনি ইয়াহিয়ার মিথ্যাচার সম্পর্কে স্যার ডগলাস-হিউমকে অবহিত করেছেন। তিনি বাঙালির উদারতা ও বন্ধুত্বসুলভ চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে অসমতা তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার জন্য তিনি নীতি-নির্ধারকদের দায়ী করেছেন এবং পাকিস্তান ভাঙনের বীজ যে তার সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত ছিল, তাও সুস্পষ্ট করেই বলেছেন।[২৮]

অক্টোবর মাসেই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ব্রিটেন আসলে অখন্ড পাকিস্তানের ব্যাপার আর আস্থা রাখতে পারছে না। তারা পাকিস্তানের উভয় অংশকে হাতে রাখতে আগ্রহী, যে কারণে ভারতকে তাদের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে ভারত সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা সামান্যই বিশ্বাস করেছেন। তিনি ফিরতি চিঠিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে একথাও স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, ভারত সম্পর্ক খারাপ করতে তিনি মোটেও আগ্রহী নন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একান্ত আলাপকালে উপমহাদেশের পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার জন্য তিনি ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাতে সফলও হয়েছেন। মিসেস গান্ধী সুকৌশলে ও বিশেষভাবে বেছে নেওয়া কুটনৈতিক ভাষায় এডওয়ার্ড হীথের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি নিজের উদ্বেগের কথা না বলে রাশিয়ার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গোটা ১৯৭১ সাল ব্যাপীই মিসেস ইন্দিরা এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রিটিশ দলিলপত্রে এ বিষয়গুলি বার বারই উল্লেখ রয়েছে।

এ মাসেই জাতিসংঘ প্রধান উ-থান্ট তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে চিঠি লিখেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কালবিলম্ব না করেই তার উত্তর দিয়েছেন এবং সত্বর উভয় পক্ষকেই সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। মোটকথা অক্টোবর মাসেই ইয়াহিয়া জেনে গিয়েছিলেন যে, ভারত যদি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না।[২৯]

নভেম্বর মাস ভারত-পাকিস্তান সমস্যাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল বিশেষ করে আমেরিকা ও ব্রিটেনের হিসাব-নিকাশ আরও তিব্রতা লাভ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু আমেরিকান হিসাব-নিকাশকে অত্যন্ত অশুভ মনে হয় যখন

Dhaka University Institutional Repository

দেখি অত্যন্ত অশুভ ভাবেই প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করছেন। কোনও রাগঢাক ছাড়াই প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতকে শুধু উস্কানীদাতাই নয়, পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ অবশ্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তাঁর দ্বি-মতের কথা জানিয়েছেন। তবে ব্রিটিশ ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে রাজনীতির নতুন খেলা খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। উপমহাদেশ ছেড়ে আসার প্রাক্কালে কাশ্মির বিষয়ে ব্রিটেন যে বিরোধের জন্ম দিয়েছিল তা পূর্ব পাকিস্তানের বিনিময়ে শেষ করতে আগ্রহী দেখা যায় ব্রিটিশ ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসকে। তবে ব্রিটেন ও আমেরিকা পুরাপুরি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, পাকিস্তান কোনও মতেই আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ফলে পরিস্থিতিকে সে দিকে এগিয়ে যেতে দিতে তারা বাঁধা না দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু আমরা জানি যে, ব্রিটেন পরিস্থিতিকে সেদিকে এগিয়ে যেতে দিলেও আমেরিকা দেয়নি। তারা শেষ দিন পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে গিয়েছে। এমনকি সপ্তম নৌবহর পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে ভারত মহাসাগরের উদ্দেশ্যে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন এমন ভাব দেখিয়েছেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পুর্ণ একমত যে, পরিস্থিতি পাকিস্তান ভাঙনের দিকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে। কি সেই নিগূঢ় কারণ, যার জন্য আমেরিকা মুখে একরকম আর কাজে অন্যরকম আচারণ করেছে, তা ডিসেম্বরে গিয়ে পুরাপুরি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এমন কি ব্রিটেন যে বিষয়টি আগের থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল অর্থাৎ আমেরিকা যে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের সঙ্গে থাকবে না, তাও নভেম্বরে কমনওয়েলথ অফিস এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কারণে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রিটেন আমেরিকাকে ছাড়াই এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপনে ততোটা গা করেনি, যতোটা গরজ দেখিয়েছে আমেরিকা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মিসেস গান্ধী বিষয়টিকে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে সুচারুরূপে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই এডওয়ার্ড হীথ স্বীকার করেছেন।[৩০]

১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির স্বাধীনতার বছর আর গোটা বিশ্বের জন্য এই বছরটি হচ্ছে কূটনৈতিক যুদ্ধের ডামাডোলের বছর। আমেরিকা ও চীন তার মিত্রদের নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে যাতে করেবাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে না পারে। আর ব্রিটেন ও তার মিত্ররা বাঙালি জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব লাভের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছে। তার প্রমাণ আমরা পাই, গোটা বছর ব্যাপী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান, উভয়েই ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বলতে গেলে প্রতি সপ্তাহেই তাদের স্ব-স্ব অবস্থান ব্যাখা করে চিঠি লিখেছেন। লক্ষ্য করা যায়, এডওয়ার্ড হীথ ইয়াহিয়ার চিঠিগুলোর হেলাফেলায় জবাব দিয়েছে, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর চিঠিগুলোকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর ধীর-স্থিরভাবে উত্তর দিয়েছেন। এমনকি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বার বার টেলিফোনালাফ হয়েছে, কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভঙ্গ করে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। যদিও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য এডওয়ার্ড হীথের তুলনায় ইন্দিরা গান্ধীরই উদ্যোগ ও উদ্বেগ দুইই খুব বেশী ছিল বলে এরকমটি সম্ভব হয়েছিল। নাহলে ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ওকালতি করতে বিশ্বময় ছুটে বেড়াতেন না। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বাঙালির সবচেয়ে বেশী যার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা, সে দেশটির নাম তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই নথিপত্র থেকে মনে হয় বাঙালির স্বাধীনতার যুদ্ধ বহুকাল ধরে চলতে থাকতো যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পরাশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা আমরা না পেতাম। বলা বাহুল্য, এটাও জুটেছিল ইন্দিরা গান্ধীরই উদ্যোগের ফলে।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু করা সম্পার্কিত কারণ ব্যাখা করে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশ থেকে এডওয়ার্ড হীথের কাছে চিঠি এসেছে। যে কারো পক্ষেই অতি সহজে দু'দেশের রাষ্ট্রনায়কের চিঠির ভেতরকার পার্থক্য আবিস্কার করা সম্ভব। অন্য দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "বাংলাদেশ"-কে কেন্দ্রে রেখে পাক-ভারত যুদ্ধ নিয়ে শুরু হয়েছে অন্য নাটক। এই নাটকের কুশীলবরা এক একজন শ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠতর অভিনেতা সবাই স্ব স্ব ভূমিকায় লড়ে যাচ্ছেন মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো। তখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কারো হাতেই পারমানবিক অস্ত্র ছিল না। যে কারণে এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য পৃথিবীর তথাকথিত অভিভাবকগণ কোনও প্রকার আগ্রহ দেখান নি। বরং এই যুদ্ধের ফসল হিসাবে বাংলাদেশ যাতে স্বাধীনতা অর্জন করিতে না পারে সেজন্য গোটা বিশ্বের ভারি ভারি মাথারা তাঁদের কূটচাল অব্যাহত রেখেছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে বার বার 'ভেটো' দেওয়া হয়েছে এবং বার বার সোভিয়েত ইউনিয়নের একক প্রচেষ্টায় তা বানচাল করা হয়। ব্রিটেন এক্ষেত্রে মৌন থেকে এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারা ফ্রান্সকেও মৌন থাকার জন্য রাজি করিয়েছে।

১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসটি শুধুমাত্র উপমহাদেশ নয় গোটা বিশ্বের জন্যই একটি উত্তেজনাকর মাস। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রথম একটি "(তথাকথিত) বিচ্ছিন্নতাবাদী" (আমেরিকার মতে) আন্দোলন নিয়ে গোটা বিশ্ব এভাবে ঘেমে-নেয়ে একাকার হচ্ছে। জাতিসংঘে তার তর্কের ঝড় তুলছে। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অনড় ভূমিকা এবং ভারতের দৃঢ়তার কারণে বাঙালি জাতির "বিচ্ছিন্নতাবাদী" আন্দোলন সফল হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশ্বের ইতিহাসে যা সত্যিকার অর্থেই একটি বিরল ঘটনা। কেননা এর আগে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নিয়ে এতোটা আলোচনা এবং জাতিসংঘে "মাথাঘামানো"র ঘটনা ঘটেনি। কিউবান "মিসাইল ক্রাইসিসে"র পর পূর্ব বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

আবার বিশ্বের ভিত্ নাড়িয়ে দিয়েছিল। যে কারণে আমেরিকা বিভিন্ন "ছল"- এর আশ্রয় নিয়েছে, পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনের কারণ হিসাবে উদ্ভট দলিল দেখিয়েছে; খোদ্ ব্রিটেন বলেছে এ ধরনের দলিলের কথা তাদের সম্পূর্ণ অজানা।

তবে এ কথা সত্য যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষনিকভাবে ভারত-পাকিস্তানের খবরাখবর রেখেছেন। তিনি নিজে আগ্রহী হয়ে দিল্লি এবং ইসলামাবাদের কাছে পরিস্থিতির বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছেন। যে সব ব্যাখ্যায় ভারত-পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত উঠে এসেছে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ রিপোর্টটি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সংঙ্গে আজকের পরিস্থিতি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যাবে, পরিস্থিতির খুব একটা বেশী হেরফের হয়নি।

কিন্তু এই গোটা রিপোর্ট বিশ্লেষণ সবচেয়ে যে বিষয়টি আশ্চর্য করেছে তাহলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা। এরকম দৃঢ়তা অর্জনের জন্য যে ধরনের ধৈর্য ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা' তাঁর ছিল। এমনকি কিসিঞ্জার-নিক্সন, এডওয়ার্ড হীথ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর এই নয় মাসের ভূমিকার প্রসংশা করেছেন অকুন্ঠভাবে। আর একটি বিষয় এখানে ফুটে উঠেছে তা'হলো তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক বক্তব্য এবং পদক্ষেপ একেবারে নির্ভূল। ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি থেকে শুরু করে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা সবাই যেন একেবারে হিসেব মিলিয়ে, আগে থেকে ছক কেটে তৈরী করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১৫ ডিসেম্বর এডওয়ার্ড হীথকে ইন্দিরা গান্ধীর পাঠনো চিঠিটি, কতোটা নিজের অবস্থান দৃঢ় হলে কেউ এরকম কঠোর হতে পারেন।[৩১]

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ কার্যত বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন যে ১৯৭২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি তা বোঝা যায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে বিশ্বময় রাজনীতির খেলা খতিয়ে দেখলে। প্রত্যেকেই বাংলাদেশ স্বীকৃতিদানের বিনিময়ে তাদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে চাইছেন। ওদিকে স্বাধীনতার এক মাস পেরিয়ে গেলেও পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারছে না। ভূট্টো ভেবেছিলেন শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পরে ভেসে যাওয়া পাকিস্তানকে জোড়া দেওয়ার স্বার্থে তাঁকে রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু জেলখানায় বসে, মুক্তি লাভ করে, লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে আলোচনাকালে, দেশে ফিরে গিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় শেখ মুজিবের এককথা- পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়; অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে পাকিস্তানের সঙ্গেও তাই, এর চেয়ে একচুলও বেশী নয়, একচুল কমও নয়। পরবর্তীকালে যাঁরা বলেন, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনায় শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে একটা কনফেডারেশন গঠনের পক্ষে কথা বলেছিলেন, তাঁদের দেওয়া তথ্য যে সঠিক নয় ভূট্টো নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, শেখ মুজিব তাকে এমন কোন কথা কোন কালেও দেননি; তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র।

১৯৭১ সালে প্রবাসী 'মুজিবনগর সরকার' দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করে নিয়ে গিয়েছিলেন শেখ মুজিবের নামে। পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে শেখ মুজিবই তাঁর একক ক্যারিসমাটিক নেতৃত্বগুণে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতিও আদায় করেছিলেন। একথা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বার বারই উল্লেখ করেছেন যে, শেখ মুজিবের সত্যই কোনও বিকল্প নেই, যাঁর কথায় একটি জাতি সর্বান্তকভাবে উদ্বেলিত হয়।[৩২]

শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশকে ব্রিটেন স্বীকৃতি দেয়। একটি স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে অন্যরাও স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্রিটেনের প্রচেষ্টায় কমনওয়েলথ সদস্য পদও বাংলাদেশ লাভ করেছে ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ সালে। যদিও এর পিছনে পাকিস্তানের অব্যাহত বাঁধা ছিল, ছিল আমেরিকান অপচেষ্টাও। শত্রুর মুখ কালো করে ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদই বাংলাদেশ প্রায় সবগুলো দেশের স্বীকৃতি লাভ করে, একমাত্র সৌদি আরব ও চীন ছাড়া। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর এই দু'টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[৩৩]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. মাসুদা ভাট্টি, 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃটিশ দলিলপত্র', পৃষ্ঠা-১৯-২০ এবং সাক্ষাৎকারে হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ও ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
২. ঐ, পৃষ্ঠা-২১ এবং ঐ।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৯-২০৩ এবং ঐ।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৬ এবং ঐ।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৯-২০৩; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড', পৃষ্ঠা-(১-২২২) ও (৫১৭-৬৯৩); ত্রয়োদশ খন্ডঃ পৃষ্ঠা-(১-১৯৭); পঞ্চদশ খন্ডঃ (৩১৭-৫৪৯) এবং ঐ।
৬. মাসুদা ভাট্টি, 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃটিশ দলিলপত্র', পৃষ্ঠা-২২-২৩ এবং ঐ।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৩-১২৫ এবং ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৯-২০৩ এবং ঐ।
৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৯ এবং ঐ।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৭-১৪৫ এবং ঐ।
১১ ঐ, পৃষ্ঠা-১৪১-১৪৪ এবং ঐ।
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-২২৫-২২৮ এবং ঐ।
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৯-২০৩ এবং ঐ।
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১৫৪-১৫৭ এবং ঐ।
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৬-১৫১ এবং ঐ।
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৮১-১৮৬ এবং ঐ।
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৬-১৮৯ এবং ঐ।
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৩০ এবং ঐ।
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩ এবং ঐ।
২০. ঐ, পৃষ্ঠা-২১৪-২১৮ এবং ঐ।
২১. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৫-২৪৬ এবং ঐ।
২২. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৬, ৪৭-৪৯ এবং ঐ।
২৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৭০-৯৯ এবং ঐ।
২৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৯-১১০ এবং ঐ।
২৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১১০-১২৭ এবং ঐ।
২৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৭-১৩৫ এবং ঐ।
২৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৬-১৪৫ এবং ঐ।
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৫-১৫৩ এবং ঐ।
২৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১৫৩-১৬৬ এবং ঐ।
৩০. ঐ, পৃষ্ঠা-১৬৬-১৮৯ এবং ঐ।
৩১. ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৯-২২৩ এবং ঐ।
৩২. ঐ, পৃষ্ঠা-২২৪-২৪৩ এবং ঐ।
৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৪-২৪৬ এবং ঐ।

৪.২ বৃটিশ পার্লামেন্টের ভূমিকা ঃ

বিলাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে সকল সংগঠন ও ব্যক্তি সক্রিয় ছিলেন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করার সাথে সাথে বিশেষ করে বৃটিশ সরকার ও পার্লামেন্ট এর সমর্থন আদায় করা। তাই মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে অনশন ধর্মঘট, পার্লামেন্টের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং পার্লামেন্টের উদ্দেশ্যে মিছিল পরিচালনা ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া বিলাতে বসবাসকারী প্রবাসীরা যার যার এলাকার সংসদ-সদস্যকে বাংলাদেশকে সমর্থন দানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধর্ণা ও চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বেশ কয়েকজন সম্মানিত এম. পি. বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মধ্যে পিটার শোর, জন স্টোন হাউজ, ডগলাস ম্যান, মাইকেল স্টুয়ার্ট, ডেনিস হিলী, মাইকেল বার্নস, জন পারদো, মিসেস জুডিথ হার্ট, স্যার এফ. বেনেট; জেফিমি থর্প, বিগস ডেভিডসন এবং ফ্রাংক জ্যাড প্রমুখ সম্মানীত এম. পি.বৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃটিশ সরকার ও পার্লামেন্ট সুদীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তা' এ স্বল্প পরিসরের গবেষণাপত্রে আলোচনা করা এক কথায় অসম্ভব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণার জন্য ফিল্ড লেভেলের কাজের অংশ হিসেবে লন্ডনে যেতে না পারায় বিলাতের গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনায় সাক্ষাৎকার সংযোজিত পরিশিষ্ট (i), প্রকাশিত দলিলপত্রাদি সংযোজিত পরিশিষ্ট (ii) ও (জ) একনজরে সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি সংযুক্তে উল্লেখিত বই-পুস্তকের উপর নির্ভর করে এ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে (অধ্যায় শেষে টীকা ও তথ্যসূত্র সংযুক্ত)।

২৯ মার্চ, ১৯৭১: ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পার্লামেন্টে বক্তব্য ঃ

২৫ শে মার্চের কালো রাত্রি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে অবহিত করার জন্য ২৯ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী (সেক্রেটারী) স্যার আলেক ডগলাস হিউম বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি পাকিস্তানে জীবননাশ ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুঃখ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে ২৫শে মার্চের ঘটনা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। এই ঘটনায় ব্রিটিশ কোন নাগরিকের ক্ষয়ক্ষতি হয় নি বলে হাউজকে অবহিত করে ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রসঙ্গে ২৫ মার্চের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেন। যেহেতু, ঢাকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সেহেতু ঘটনার বিস্তারিত এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় বলেও তিনি হাউজকে অবহিত করেন।

স্যার আলেক ডগলাস হিউমের বক্তব্যের পর প্রশ্নাকারে ডেনিস হিলি, জেরিমি থ্রপ, স্যার এফ, বেনেট, পিটার শোর, উইলকিনসন, আলেকজান্ডার ডব্লিউ লায়ন, এবং ফ্রাংক জ্যাড প্রমুখ সম্মানিত এম.পি.বৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ অধিকাংশই নাইরেজিয়ার 'বায়ফ্রা' সমস্যার কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার যেন হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য সাবধান করে দেন। কিন্তু পিটার শোর দিনের অধিবেশনেই 'পূর্ববঙ্গ' 'শেখ মুজিবুর রহমান' নাম সমূহ উল্লেখ করে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লিখিত ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যায়িত করে পাকিস্তান সরকারকে পূর্ববঙ্গে হত্যাকান্ড বন্ধ করা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহকর্মীরা যাতে নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে উদ্যোগে গ্রহণের অনুরোধ জানান। পিটার শোর আরো বলেন-"Further, will the right hon. Gentleman do everything in his power to impress upon the Pakistan Government that the people of Bengal have the right to decide their own future, and if need be to decide on a separate future for themselves" বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা পূর্ব লন্ডন থেকে নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় এম. পি. পিটার শোর ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের প্রবাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের আন্তরিক সমর্থক বলে পরিচিত লাভ করেছিলেন এবং হাউজ অব কমন্সে প্রথম সুযোগেই তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তা প্রমাণ করলেন।[২]

"পাকিস্তান" পরিস্থিতি সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি (৫ এপ্রিল, ৭১) ঃ

৫ এপ্রিল, '৭১ তারিখে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম 'পাকিস্তান' পরিস্থিতি সম্পর্কে হাউজ অব কমন্সে আরো একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমার পূর্বে প্রদত্ত বিবৃতির পর 'পূর্ব পাকিস্তানে' বর্তমানেও সংকট চলছে। এখনও সম্পূর্ণ খবর না পেলেও বলা যায় যে, হতাহতের সংখ্যা উদ্বেগজনক। তিনি এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির অবসান কামনা করে এই মর্মে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বাণীর কথা উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতিতে মন্তব্য করেনঃ

"Her majesty's Government have no intention of interfering in Pakistan's internel affairs and I wish again to emphasise that this is our position. It is the people of Pakistan themselves who must decide their own destinies and intervention from outside will only complicate a very difficult and destressing situation."

তিনি আরো বলেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের পর 'পূর্ব পাকিস্তানীদের' যেভাবে ব্রিটিশ সরকার ও জনগণ সাহায্য করেছে সেভাবে 'পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের দুঃখ লাঘবের জন্য ভূমিকা পালনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ও জনগণ প্রস্তুত আছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির পর ডেনিস্ হিলী, ব্রাইন, পিটার শোর, জন ষ্টীভাঙ্গ, জেরিমি থর্প, ডগলাসম্যান প্রমুখ এম. পি.গণ বক্তব্য রাখেন। মিঃ হিলি (শ্রমিক দলীয় এম.পি.) বলেন যে, এই হাউজের সকলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তিনি অনতিবিলম্বে 'পূর্ব পাকিস্তানে' সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের অবসান এবং সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করেন। পিটার শোর বলেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে হলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি অপরিহার্য। মিঃ ডগলাসম্যান 'পাকিস্তানের' যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে হাউজে উত্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব তৈরি করেছেন তাতে এ পর্যন্ত হাউজের উভয়পক্ষের ১০০ জন সদস্য স্বাক্ষর করেছেন বলে হাউজকে অবহিত করেন। তিনি তার বক্তব্যে এক পর্যায়ে প্রশ্ন রাখেন "Is Right Hon. Gentleman aware of the widespread feeling that Pakistan, after the events of the last few weeks, can never be one country." তিনি 'পাকিস্তানে' এই অন্তর্ঘাতি যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারকে তার সকল প্রকার প্রভাব ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী উপসংহারে বলেন যে, উপরোক্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।[৩]

'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য (২০ এপ্রিল, '৭১) ঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলীয় মাননীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসনের 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বলেন, যথাসময়ে 'পূর্ববঙ্গের' পরিস্থিতি সম্পর্কে হাউজকে অবহিত করা হবে। বিরোধী দলীয় নেতা মি. উইলসন 'পূর্ব বাংলায়' গণহত্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি পরিদর্শন দল প্রেরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। একই প্রসঙ্গে লিবারেল পার্টির সদস্য ডেভিড স্টীলের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পূর্ব বাংলায়' একটি রাজনৈতিক সমাধান ও সংঘর্ষের অবসানের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনের জন্য ব্রিটিশ সরকার স্বচেষ্ট ও

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় আছে। শ্রমিক দলের সদস্য ও বাংলাদেশের কট্টর সমর্থক এম. পি. পিটার শোর 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তানের সামরিক সরকারে গৃহীত দমননীতি পরিহারের জন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের নীতি নির্ধারণের জন্য পার্লামেন্টে জরুরী ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য দাবি জানান। শ্রমিক দলীয় অপর এক সদস্য উইলিয়াম হ্যামিলটন প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে 'পূর্ব বাংলায়' পাকিস্তান সামরিক সরকার পরিচালিত গণহত্যার প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।[৪]

পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত বিতর্ক (২৬ এপ্রিল, '৭১) ঃ

২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ হাউজ অব কমন্স-এ পাকিস্তানে ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় এম. পি. মিঃ প্রেন্টিস এক প্রশ্ন উথাপন করেন। প্রশ্নের জবাবে বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী রিচার্ড উড বলেন, আগামী জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য 'এইড মিটিং' এর পূর্বে অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থার সাথে আলোচনা করে এবং 'পাকিস্তানের' রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে 'পূর্ব পাকিস্তানে' যে সকল প্রকল্পে কাজ চলছে সে সকল প্রজেক্টে যাতে সাহায্য অব্যাহত থাকে তাও লক্ষ্য রাখা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। পাকিস্তানে ব্রিটিশ সাহায্য সংক্রান্ত বিতর্কে প্রেনটিস ছাড়াও উইলকিনসন, পিটার শোর, মিঃ বার্নস প্রমুখ সম্মানিত এম. পি.বৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মিঃ বার্নস এর এক প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম হাউজকে জানান যে, পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ পরিস্থিতি তিনি পর্যালোচনা করেছেন। ১৯৬৭ ইং সনের পর ছোটখাট মেরামত এর চুক্তি ব্যতিরেকে বৃটেনের সাথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি হয়নি বলেও তিনি হাউজকে অবহিত করেন।[৫]

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও আলোচনা (৪ মে, '৭১) ঃ

৪ মে, ১৯৭১ সনে হাউজ অব কমনস্ এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এডওয়ার্ড হীথ 'পাকিস্তান' এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম বারের মতো বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির একটি রাজনৈতিক সমাধানের কথা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিজেই ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই মর্মে বাস্তব পদক্ষেপ নেবেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত আরশাদ হোসেনের সাথে গত সপ্তাহের তাঁর বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা তিনি পার্লামেন্টকে অবহিত করে মিঃ হীথ বলেন যে, পাকিস্তানে সাহায্য প্রদানের পূর্বঘোষিত নীতি এখনও অনুসরণ করা হবে। শরণার্থী সমস্যার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাউজকে জানান যে, আমাদের সর্বশেষ খবর মোতাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং প্রতিদিন প্রায় ২০,০০০ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করছে। শরণার্থীদের ক্যাম্পে সাহায্য প্রেরণের বিষয়ে সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখছেন বলেও তিনি হাউজকে অবহিত করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান' এর এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে ব্রিটিশ জনগণ ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ".... At the same time, there is a deep feeling in this country and the house about the problems which exist. This was shown in the different situation which arose when part of East Pakistan was hit by the hurricane and there was an upsurge of voluntary effort which amazed the world, as I known from my own contacts. There is similarly today a very deep feeling about the situation. I think it is quite natural that many in this country and the House would want to help.

হাউজে প্রশ্ন উথাপন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মাইকেল বার্নস, পিটার শোর, হিউজ ফ্রেজার, জন ম্যানডেলসন, বিগ্স ডেভিডসন এবং মি. ডালিয়েল প্রমুখ সম্মানিত এম. পি.বৃন্দ।[৬]

পাকিস্তানে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর (৬ ও ৭ মে, ৭১) ঃ

৬ মে শ্রমিক দলীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জন স্টোন হাউজ কর্তৃক উথাপিত এক প্রশ্নের জবাবে বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ উড পার্লামেন্টকে জানান যে, 'পাকিস্তানের' জন্য বরাদ্দ সাহায্য 'পূর্ব পাকিস্তানে' কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তা আলাদাভাবে প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে তিনি ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭০-৭১ অর্থ বছরে 'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পশ্চিম পাকিস্তানের' জন্য বরাদ্দের বছরওয়ারী একটি আলাদা হিসাব হাউজকে অবহিত করেন। ৭ মে স্টোন হাউজের সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত অপর এক প্রশ্নের জবাবে মিঃ উড হাউজে জানান যে, 'পাকিস্তান' সরকারকে যেহেতু কেন্দ্রীয়ভাবে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে সেহেতু 'পূর্ব পাকিস্তানে' ব্রিটিশ সাহায্যের মাথাপিছু ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। মিঃ উইলকনসিন 'পূর্ব পাকিস্তানে' ত্রাণ কার্যক্রমে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মিঃ উড বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার দাতা দেশ সমূহের সাম্প্রতিক সভায় 'পূর্ব পাকিস্তানে' ত্রাণ প্রেরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং এ বিষয় সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।[৭]

পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রীর বিবৃতি (১১ মে, ৭১) ঃ

পরবর্তী শুক্রবারে 'পাকিস্তান' বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনার সুবিধার্থে মাননীয় পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম ১১ মে হাউজ অব্ কমনসে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি তাঁর বিবৃতির প্রথমে বলেন, "In

Dhaka University Institutional Repository

previous statements to the House I have expressed Her Majesty's Government's concern about the situation in East Pakistan and our wish to assist in alleviating the suffering and stress." মন্ত্রী হাউজকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, বৃটেন যে কোন আন্তর্জাতিক ত্রাণ উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্মত প্রস্তাব জাতিসংঘের মহাসচিব উ-থান্টের কাছে প্রেরণের কথা হাউজকে অবহিত করে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ প্রেরণের আশু ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সাহায্যের জন্য বৃটিশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের কথাও তিনি হাউজকে অবহিত করেন। মন্ত্রী আরো বলেন যে, ইতোমধ্যে ভারত শরণার্থীদের জন্য সাহায্য কামনা করে জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছে। শরণার্থীদের সাহায্য প্রদানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মাননীয় মন্ত্রী মিঃ হিউমের বিবৃতি দানের পর মাননীয় এম. পি. ডেনিস হিলী, মিঃ উডহাউজ, জেরিমি থর্প, স্যার এফ. বেনেট এবং পিটার শোর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।[৮]

'পূর্ব পাকিস্তান' পরিস্থিতিতে প্রস্তাব উত্থাপন ও সাধারণ আলোচনা (১৪ মে, ১৯৭১) ঃ

১৪ মে, ১৯৭১ তারিখে বৃটিশ পার্লামেন্টে 'পূর্ব পাকিস্তান' এর পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন এবং সাধারণ আলোচনার জন্য পূর্ব থেকেই দিন ধার্য করা হয়েছিল। নির্ধারিত এই দিনে সকাল ১১-০৫ মিনিটে লন্ডনের কেনসিংটন নর্থ থেকে নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় এম. পি. ব্রুস ডগলাস ম্যান 'পূর্ব পাকিস্তানে' সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, "That the House, deeply concerned by the killing and destruction which has taken place in East Pakistan, and the possible threat of food shortages later this year calls upon Her majestys Government to use their influence to secure on end to the strife, the admission of United Nations or other international relief organisations and the achievement of political settlement which will respect the democratic rights of the people of Pakistan."

তিনি ইতোপূর্বে ৩০০ এম. পি.-এর স্বাক্ষর যুক্ত প্রস্তাবটি জমা দিয়েছিলেন (প্রস্তাব নং-৫০৯)। বর্তমান প্রস্তাবটি তার চেয়ে সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় উত্থাপনের কথা হাউজকে অবহিত করে বলেন যে, একটি প্রস্তাবে ৩০০ জন সম্মানীত এম. পি.-এর সমর্থন পার্লামেন্টে এক নজিরবিহীন ঘটনা।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে জন স্টোন হাউজ ও তাঁর বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী শিবির এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিছু এলাকা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ব্রুস ডগলাস ম্যান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পরিচালিত জঘন্যতম হত্যাকান্ডে এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে (পাকিস্তানের সরকারী হিসাবে ১৫০০০) এবং প্রাণভয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ লোক ভারতে পালিয়ে এসেছে। তিনি শরণার্থী শিবিরগুলোর করুণ অবস্থা এবং খাদ্য সংকটের কথা হাউজকে অবহিত করে বলেন যে, অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতা শুরু না হলে সেখানে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করবে। পাকিস্তান সেনাবহিনীর নির্মমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বক্তৃতায় এক পর্যায়ে বলেন- "Time and again we were told the same story: troops of the West Pakistan military Authorities had entered the village, which had not been defended, had shot the men in the fields and killed the women and children and then, having killed a great number of people from the village, had burnt it down and left." ডগলাস ম্যান তাঁর ২২ মিনিটের বক্তব্যে পাকিস্তানের জন্ম ইতিহাস, পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট অবিশ্বাস এবং গত নির্বাচনের আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে অনতিবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক দায়িত্ব যাতে গ্রহণ করতে পারে তার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা সম্পর্কে হাউজকে অবহিত করে তিনি এই সমস্যার একটি যুক্তিপূর্ণ এবং বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। ২৫ মার্চের জঘন্যতম ঘটনার পর যে পাকিস্তান আর তার পূর্ব অবস্থায় নেই তার ইঙ্গিত দিয়ে মিঃ ম্যান বলেন, "It was abundantly clear that the hatred of the punjabis, which has been generated in the last six weeks among the people of East Pakistan, who are overwhelmingly Bengali, is now so deep that it is quite impossible that Pakistan can ever again be one country." ডগলাস ম্যানের উপরোক্ত মন্তব্য প্রনিধাণযোগ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র ৬ সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান যে টিকবে না তা স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উচ্চারিত হলো। মিঃ ম্যান যখন পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন

Dhaka University Institutional Repository

তখন পার্লামেন্টের বাইরে হাজার হাজার বাঙালী নারী-পুরুষ বাংলাদেশকে সমর্থনের দাবিতে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী পালন করছিলেন।

ব্রুস ডগলাসম্যানের প্রস্তাব উত্থাপন ও বক্তব্য প্রদান শেষে সকাল ১১-২৭ মিঃ এ ব্রিটিশ বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী রিচার্ড উড উপরোক্ত প্রস্তাব পেশ ও বক্তব্য প্রদানের জন্য মিঃ ম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুঃখ ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করা এবং সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের ব্যাপারে হাউজের উভয় অংশই সাধারণভাবে একমত হবেন বলে তিনি আশাবাদী। তিনি আরো বলেন, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্যদেশের পার্লামেন্টে আলোচনা করা রীতিবিরুদ্ধ হলেও পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা প্রবাহ এতই নাজুক ও মানবতা বিরোধী যে, 'পূর্ব পাকিস্তান' পরিস্থিতি নিয়ে এই হাউজে আমরা আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। তিনি উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় ব্রিটিশ সরকারের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা দানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মিঃ উড 'পাকিস্তানের' বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনটি মূল সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যা কিছু সম্ভব তা করতে প্রস্তুত রয়েছে। যে তিনভাবে বর্তমান সমস্যাকে তিনি বিভক্ত করেছেন তাহলোঃ (১) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুর্দশা লাঘব ও সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ; (২) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যে সকল শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সমস্যার সমাধান এবং (৩) পাকিস্তানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত।

ব্রিটিশ বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রী তাঁর ২০ মিনিটব্যাপী বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, "Therefore, I would prefer to solve this delimna in what I consider to be a more positive way. We are ready. I repeat, to resume aid for development, but we can clearly do so only if conditions are restored in which that aid could be effectively deployed. Therefore it remains the view of Her Majesty's Government that a political solution in East Pakistan is necessary and that it must be matter for Pakistan Government and people to achieve." বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

মাননীয় বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রীর বক্তব্যের পর পর্যায়ক্রমে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ফুলহাম থেকে নির্বাচিত মাইকেল ষ্টিউয়ার্ট, ষ্ট্যাফোর্ড এবং ষ্টোন থেকে নির্বাচিত হিউজ ফ্রেজার; ষ্টেপনি থেকে নির্বাচিত পিটার শোর; টরকি থেকে নির্বাচিত স্যার ফ্রেডরিক বেনেট; লিডস পূর্ব থেকে নির্বাচিত ডেনিস হীলি; ক্রয়ডন দক্ষিণ থেকে নির্বাচিত স্যার রিচার্ড থমসন; কর্নওয়াল নর্থ থেকে নির্বাচিত জন পারদো; চিগওয়েল থেকে নির্বাচিত জন বিগস ডেভিসন; ওয়েভনেসবারী থেকে নির্বাচিত জন ষ্টোনহাউজ; বার্মিংহোম এর্সটন থেকে নির্বাচিত জুলিয়াস সিলভারম্যান; এ্যাসেক্স সাউথ ইষ্ট থেকে নির্বাচিত বার্নারড্ ব্রেইন; ব্রেন্টফোর্ড এবং চিসউইক থেকে নির্বাচিত জ্যামস কিনফেডার; শেফিল্ড হাল্লাম থেকে নির্বাচিত জন এইচ. অসবরন; পোরটসমাউথ ওয়েষ্ট থেকে নির্বাচিত ফ্রাংক জ্যাড, বার্মিংহোম থেকে নির্বাচিত ডব্লিউ বেনিয়ন; লানার্ক থেকে নির্বাচিত মিসেস জুডিথ হার্ট প্রমুখ সম্মানীত এম. পি.বৃন্দ। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা ৫৫ মিনিটব্যাপী পূর্ণ আলোচনার পর ব্রুস ডগলাস ম্যান কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই বিরল ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দলমত নির্বিশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সকল সদস্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী ছাড়া উপরোক্ত প্রস্তাবের উপর ১৮ জন মাননীয় এম. পি বক্তব্য রাখেন।[৯]

পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য (১৭ মে, ১৯৭১) ঃ

১৭ মে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট অধিবেশনে পূর্ববঙ্গে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ সংক্রান্ত পিটার শোর এর এক প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম হাউজে বক্তব্য রাখেন। বর্তমানে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে স্থান দেয়া হয়েছে বলে হাউজে অবহিতকরে তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাপারে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। তিনি 'পাকিস্তানের' অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে বলেও হাউজকে অবহিত করেন। এই পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ডেনিস হীলি, গ্রেভিল্ জেনার, ভার্জ কার্নিংহোম, স্যার এফ, বেনেট, ফ্রান্ক জাড এবং মিসেস জুডিথ হার্ট প্রমুখ সম্মানিত এম. পি.বৃন্দ।[১০]

ত্রাণ সাহায্য সংক্রান্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি (৮ জুন, ৭১) ঃ

'পাকিস্তান' এর সর্বশেষ পরিস্থিতি, ত্রাণ কার্যক্রম এবং বৃটেনের ত্রাণ সাহায্য প্রেরণ সম্পর্কে ৮ জুন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম হাউজে বিবৃতি প্রদান করেন। স্পীকারের অনুমতি নিয়ে বিবৃতির শুরুতে হাউজকে অবহিত করেন যে, "Since the House debated the situation in Pakistan, there has been a serious deterioration of flow of refugee from East Pakistan to India. The number is now estimated as upwards of 4 million." তিনি বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা করে তিনি সিয়াটো সভায় যোগদানের জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে জাতিসংঘকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সাহায্য প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য যৌথভাবে অনুরোধ করেছিলাম। জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী 'পূর্ব পাকিস্তানের' শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য যে আবেদন করেছিল তাতে প্রথমেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ১০ লাখ পাউন্ড এবং আরো ৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ডের খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি হাউজকে অবহিত করেন। জাতিসংঘ তাদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় যাতে অর্থকষ্টের সম্মুখীন না হন তার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া, ইতোমধ্যে 'পূর্ব পাকিস্তানের' শরণার্থীদের সাহায্যে ব্রিটিশ বেসরকারী ত্রাণ সংস্থাগুলো যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাতে ব্রিটিশ সরকার যে সকল সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্য প্রদান করেছে তার বিবরণ তিনি বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির পর হাউজ অব কমনসের বিরোধী দলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বক্তব্য রাখেন। মিঃ উইলসন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জঘন্যতম ট্র্যাজেডি আখ্যায়িত করে বলেন, "Is the Right Hon. Gentleman aware that the whole House and, I believe, all our constituents throughout the country regard this in terms of sheer scale as the worst human tragedy that the world has known since the war, apart from war itself?"

মিঃ উলসন ছাড়াও মিসেস জুডিথ হার্ট, বয়েড কার্পেন্টার, মাইকেল ষ্টুয়ার্ট, ডেভিড ষ্টীল, স্যার এইচ. লেগে বোর্কী, ডগলাস ম্যান, স্যার এফ. বেনেট, আলফ্রেড মরিস, স্যার আর. টমসন, পিটার শোর, মিঃ লংডেন, কেটার জোনস, টম কিং, জন ম্যানডেলসন, মিঃ ব্রেইন, জন ষ্টোন হাউজ এবং বার্নস প্রমুখ সম্মানীত এম. পি.বৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হিউম সম্মানিত এম. পি.দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।"[১১]

'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে জন ষ্টোনহাউজ কর্তৃক ১২০ জন এম. পি.সমর্থিত প্রস্তাব উত্থাপন (১৫ জুন, '৭১) ঃ

শ্রমিক দলীয় এম. পি ও সাবেক মন্ত্রী জন ষ্টোনহাউজ ১২০ জন এম. পি.-এর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ১৫ জুনের পার্লামেন্ট অধিবেশনে উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে ৬ জন প্রিভি কাউন্সিলর, শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান ইয়ান মিকার্ডো এবং শ্রমিক দলের কার্যকরী পরিষদের সদস্যরাও স্বাক্ষর করেন। প্রস্তাব উত্থাপনের সময় জন ষ্টোনহাউজ বলেন, 'জেনোসাইড কনভেনশন' এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে 'পূর্ববঙ্গে' সংঘটিত গণহত্যার জন্য প্রস্তাবটির গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো-"This House believes that the widespread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan Army in East Bengal, country to the U.N.Convention on Genocide signed by Pakistan itself, confirms that the Military Government of Pakistan has forfeited all rights to rule in East Bengal, following its wanton refusal to accept the democratic will of the people expressed in the election of December, 1970.

Therefore believes that the U.N.Security council must be called urgently to consider the situation both as a threat to the international peace and as a contravention of the Genocide Convention; and further believes taht until order is restored under U.N.supervision, the provisional Government of Bangladesh should be recognised as the vehicle for the expression of self-determination of the people of East Bengal."[১২]

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ২৩ জুনে প্রদত্ত বিবৃতি ঃ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ২১ জুন সফররত ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ শরণ সিং-এর বৈঠকের পর ২৩ জুন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম পুনরায় হাউজে বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বিবৃতিতে উপরোক্ত বৈঠকের কথা উল্লেখ করে 'পূর্ব পাকিস্তানের' পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাবের কথা হাউজকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, শরণার্থীদের ত্রাণ সাহায্য হিসাবে ভারতকে আরো ৫ মিলিয়ন (৫০ লাখ পাউন্ড) প্রদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার অঙ্গীকার করেছে। গত ২১ জুন পাকিস্তান এইড কনসোরসিয়ামের অনানুষ্ঠানিক সভায় বিশ্ব ব্যাংক ও আই. এম. এফ সহ দাতাসংস্থা ও দেশসমূহ পাকিস্তানকে যে আর নতুন কোন সাহায্য অঙ্গীকার করেনি তা হাউজকে অবহিত করে মন্ত্রী বলেন যে, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হলে বৃটেন কর্তৃক পাকিস্তানকে নতুন কোন সাহায্য প্রদান করা হবে না। তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান' পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের গুরুত্ব দিয়ে বিবৃতির এক পর্যায়ে বলেন, "There must be a political settlement. There must be a civilian Government installed."[১৩]

শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির দাবি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন (২ আগস্ট, '৭১) ঃ

২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টির প্রভাবশালী এম. পি.দের উদ্যোগে উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে পিটার শোর, জন স্টোন হাউজ, আর্নেষ্ট মারপলস্, মাইকেল ষ্টুয়ার্ট এবং এডওয়ার্ড ডু'ক্যান এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রস্তাবে বলা হয়, 'পূর্ববঙ্গে' সংঘটিত গণহত্যা ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন 'পূর্ববঙ্গের' ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত এবং পাকিস্তান পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তি। এবং এই লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রস্তাবে দাবি করা হয়। আরো উল্লেখ করা হয়, ২ আগষ্টে উত্থাপিত প্রস্তাব বিগত ১৫ জুনের উত্থাপিত প্রস্তাবের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হবে।[১৪]

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতির ক্রমঅবনতি সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি (২৩ সেপ্টেম্বর '৭১) ঃ

ডেনিস হীলি এম. পি.-এর বেসরকারী এক নোটিশের জবাবে ২৩ সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম 'পূর্ব বাংলার' পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত নীতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি হাউজকে অবহিত করেন যে, ২৩ জুনে তার প্রদত্ত বিবৃতির পর পূর্ব পাকিস্তানে কিছু নতুন ঘটনা ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসাবে বেসামরিক গভর্ণর নিয়োগ করেছেন এবং একটি নির্বাচিত সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শীঘ্রই নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে শরণার্থীদের প্রবেশ অব্যাহত রয়েছে বলে মিঃ হিউম হাউজকে অবহিত করেন। বর্তমানে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়ার তথ্য প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্রিটিশ সরকার এ পর্যন্ত ভারতকে ৮ মিলিয়ন (৮০ লাখ) পাউন্ডের অর্থ ও সামগ্রী সাহায্য প্রদান করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে মি. হিউম বলেনঃ "Our aim is to play our full part with the international community in bringing an end to suffering and the return of normal conditions to this troubled part of the subcontinent, including making it possible for the return of the refugees to their homes."

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতির পর মিঃ হিলী, মিঃ ব্রেইন, জন ষ্টোনহাউজ, মিঃ পায়লো, বিগ্স্ ডেভিসন, মিঃ পেগেট, মিঃ মলী এবং মিসেস জুডিথ হার্ট প্রমুখ সম্মানীত এম. পি.বৃন্দ মন্ত্রীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।[১৫]

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ৪ নভেম্বরে প্রদত্ত বিবৃতি ঃ

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রী সম্প্রতি বৃটেনে সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর বৈঠকের বিষয় এবং পূর্ব বাংলার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ৪ নভেম্বর হাউজে বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি 'পূর্ব বঙ্গের' জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রধান দু'টি নীতির প্রতি হাউজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রথম নীতি হলো ত্রাণ সাহায্য প্রদান। এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ভারতকে মোট ১৫ মিলিয়ন (১৫০ লাখ) পাউন্ড এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ২ মিলিয়ন (২০ লাখ) পাউন্ড সাহায্য প্রদান করেছে বলে তিনি হাউজকে জানান। ব্রিটিশ সরকারের দ্বিতীয় নীতি উপমহাদেশে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষকে যথাসম্ভব যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস সম্পর্কে তিনি হাউজকে অবহিত করেন। উপমহাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পরিমাণ জটিল আকার ধারণ করেছে তার শান্তিপূর্ণ সমাধানকল্পে ভারত-পাকিস্তান আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিঃ হিউম গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৬]

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ৬ ডিসেম্বরে প্রদত্ত বিবৃতি ঃ

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এবং হাউজের সকল সদস্যের উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয়ে ৬ ডিসেম্বর আলেক ডগলাস হিউম হাউসে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ৩ ডিসেম্বরে প্রথম আক্রমণ ও প্রতি আক্রমনের রিপোর্ট প্রাপ্তির পরপরই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন। তিনি হাউজে বলেন "In spite of our efforts and those of other powers. India and Pakistan have been to the calamity of war. Our immediate concern must now be to try to stop the fighting and to contribute to a sane and civilised solution that takes account of the wished of the peoples affected."[১৭]

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ১৩ ডিসেম্বরে প্রদত্ত বিবৃতি ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ ও যুদ্ধের অবসানের প্রাক্কালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৩ ডিসেম্বর তারিখে বিবৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশে মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উপমহাদেশের পরিস্থিতি এবং তাদের ভাষায় 'পূর্ব পাকিস্তান' সমস্যার বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সকল বক্তৃতা বিবৃতি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩ ডিসেম্বরের বিবৃতি ছিল তার সর্বশেষ ঘটনা। বিবৃতিতে মিঃ হিউম উপমহাদেশে যুদ্ধের বিস্তৃতি ও পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করে বলেন, "The hostilities between India and Pakistan countries. Indian forces have

Dhaka University Institutional Repository

advanced deep into East Pakistan, have captured the town of Jessore and have now border between India and West Pakistan particularly in the chhamb area where Pakistani forces have penetrated into Indian Territory." যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তথ্যাদি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, পরিস্থিতি যতই বিয়োগান্ত হোক না কেন উপমহাদেশে যুদ্ধ বিরতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।[১৮]

উল্লেখিত আলোচনার পেক্ষাপটে এক কথায় বলা যায় বৃটিশ পার্লামেন্ট মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শুধু নিয়ম রক্ষার খাতিরে (যেহেতু তাঁরা পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে ইতোমধ্যে পরিচিত) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি, কিন্তু উক্ত সময়ে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের অব্যাহত প্রচেষ্টা, ধর্ণা-লবিং-এর ফলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও বিরোধী দল সমূহেয় এম. পি.বৃন্দ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ আন্দোলন উপলক্ষ্যে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন নূরুল ইসলামের ভাষায় যা এক প্রকারের স্বীকৃতিরই নামান্তর। এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে, যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের প্রাণপণ লড়াই ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং পরবর্তী সময়ে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার স্থপতি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক সাফল্যের ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১) পর মাত্র ৫৮ দিন বা ১৩৯২ ঘন্টা পরে (৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) বৃটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পূর্ব থেকে সহানুভূতি না থাকলে এটা সম্ভব ছিল কি? বৃটেনের এই অবদানের কথা বাঙালি ও বাংলাদেশ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।[১৯]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম।
২। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', তথ্য মন্ত্রণালয়, পুণর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১-৩।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-৪-৬।
৪। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৫।
৫। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা-১৪।
৬। ঐ, পৃষ্ঠা-৯-১১।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা-১৩।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা-৮৩-৯২।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা-১৮-৭৯।
১০। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৫৪-১৫৫।
১১। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০০।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা-১২৮-১২৯।
১৩। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৬১-১৬২;।
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা-১৬২।
১৫। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৯।
১৬। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৬৩।
১৭। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৫-১০৮।
১৮। ঐ, পৃষ্ঠা-৯-১১।
১৯। সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

৪.৩ বৃটিশ এম. পি.দের ভূমিকা ঃ

পাকিস্তানের নির্বাচিত পার্লামেন্ট বাতিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার এবং ২৫ মার্চ রাত থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জঘন্যতম গণহত্যা পরিচালনার পর থেকে ব্রিটিশ এম. পি. ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের ঘৃন্য কর্মকান্ডের প্রতিবাদ এবং বাঙালিদের প্রতি সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে সমর্থন এবং ব্রিটিশ হাউজ অফ কমনস্ে (ব্রিটিশ পার্লামেন্টে) পার্লামেন্ট সদস্যদের ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের করেছে অনুপ্রাণিত এবং বিলাতে আন্দোলনরত বাঙালিদের করেছে উৎসাহিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দল-শ্রমিক দল (Labour Party)-এর নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এবং পার্টির চেয়ারম্যান ইয়ান মিকার্ডোসহ প্রায় সকল এম. পি. বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ সমর্থন করেন। লিবারেল পার্টির সকল এম. পি. বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। কিছুসংখ্যক সরকার দলীয়-রক্ষণশীল দল (Conservative Party)-এর এম. পি.বৃন্দও পাকিস্তান সামরিক সরকারের বর্বরতার সমালোচনা এবং বাঙালিদের

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন। এছাড়া বিশিষ্ট ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও বিশেষ করে সাংবাদিকদের বাংলাদেশকে সমর্থন করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ, প্রচার কাজে অংগ্রহণ এবং মূল্যবান লিখনীর মাধ্যমে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন।[১]

পিটার শোর ঃ

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় থেকে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে অতিপ্রিয় একটি নাম পূর্ব লন্ডনের ষ্টেপনি থেকে নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় এম. পি. পিটার শোর। তিনি পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টের বাইরে বাঙালিদের প্রতিনিধির মতো বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে প্রবাসীদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ২৮ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১০ নং ডাইনিং স্ট্রীটের সামনে যে অনশন ধর্মঘট চলছিল সে স্থানে পিটার শোর অন্য একজন এম. পি. ব্রুস ডগলাস-ম্যানসহ উপস্থিত হয়ে অনশনকারী ছাত্রদের প্রতি সমবেদেনা প্রকাশ করেন। ধর্মঘটস্থলে এসে তিনি 'পূর্ববঙ্গে' সংঘটিত গণহত্যার নিন্দা করেন এবং বাঙালিদের ন্যায্য দাবির পক্ষে অবস্থান গ্রহণের কথা বলে বাঙালিদের সমর্থক একজন এম. পি. হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ৪ এপ্রিল 'হ্যামস্টেড টাইন হলে' পূর্ববঙ্গে গণহত্যার প্রতিবাদে গণসমাবেশে বক্তব্য রাখার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বৃটেনের বাঙালিদের আন্দোলনে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত হন। এরপর থেকে লন্ডনে এমন কোন জনসমাবেশ হয় নাই যেখানে পিটার শোর-এর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল না। যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন বাংলাদেশ আন্দোলনের আহবানে তিনি সব সময় সাড়া দিয়েছেন একজন বাঙালি কর্মীর মতো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পিটার শোর এবং ব্রুস ডগলাস-ম্যান এর নেতৃত্বে শ্রমিক দল ও লিবারেল পার্টির চাপে ৫ এপ্রিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক ডগলাস-হিউম 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দিতে বাধ্যহন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পর যে সকল এম. পি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে পিটার শোর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারপর ২৯ মার্চ, ২০ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল, ৪ মে, ১১ মে, ১৪ মে, ৮ জুন, ৪ নভেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিতর্ক ও আলোচনায় পিটার শোর সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। মি. শোর আগষ্ট মাসের শেষের দিকে দিল্লী ও পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান। সফর শেষে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করে ২ সেপ্টেম্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গিয়েছে-এই বাস্তবতাকে সকলের মেনে নেয়া উচিৎ। মি. শোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের কাছে পাকিস্তানকে উন্নয়ন ঋণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি ৭ অক্টোবর ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে কয়েকজন এম. পি. বাংলাদেশের সুহৃদ সমর্থক ও বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্যে পিটার শোর অন্যতম।[২]

ব্রুস ডগলাস-ম্যান ঃ

বাংলাদেশের আর একজন অকৃত্রিম বন্ধু যিনি পিটার শোরসহ ১০ নং ডাইনিং স্ট্রীটে অনশনরত (২৮ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ) ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশের আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ৫ এপ্রিল রাতে ব্রুস ডগলাস-ম্যানসহ কয়েকজন শ্রমিক দলীয় এম. পি. এবং লিবারেল পার্টির এম. পি. 'পূর্ববঙ্গে' 'গৃহযুদ্ধ' বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি জরুরী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ব্রুস ডগলাস-ম্যান এর উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল লন্ডনে 'জাষ্টিস ফর ইস্ট বেঙ্গল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯ এপ্রিল 'পূর্ববঙ্গের' পরিস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করেন। ২৩ এপ্রিল তিনি কলকাতায় একটি সংবাদ সম্মেলনে বৃটেনের পার্লামেন্ট সদস্যদের বাংলাদেশ ইস্যুকে সমর্থন করার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, তিনি পূর্ববঙ্গের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং শরণার্থীদের দুরবস্থার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবেন। ১৪ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করার জন্য লন্ডনে কাজ করবেন বলে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন। সফর শেষে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করে ব্রুস ডগলাস-ম্যান ১ মে 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারে 'পূর্ববাংলায়' পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরতা এবং তাদের নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে আসা ভারত সীমান্তের শরণার্থীদের দুর্দশার বিবরণ দিয়ে বিশ্ব বিবেকের কাছে তার প্রতিকারের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানান। ১৪ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'পূর্ববঙ্গে' যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহবান' শীর্ষক প্রস্তাবের যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সেই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রুস ডগলাস-ম্যান। তিনি প্রস্তাব উত্থাপনকালে বলেন, তিনি 'পূর্ববঙ্গের' পরিস্থিতি নিজ চক্ষে দেখে এসেছেন এবং এই মর্মে তার বিশ্বাস জন্মেছে যে 'পূর্ববঙ্গে' এখনই যদি যুদ্ধ বিরতি না হয় তাহলে সেখানে একটি বিরাট মানবিক বিপর্যয় ঘটবে এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এর সৃষ্টি হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে যতবার বিতর্ক বা আলোচনা হয়েছে তার প্রতিটিতে ব্রুস ডগলাস-ম্যান অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন। শুধু পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে নয় বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ট্রাফেলগার স্কোয়ার, হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্ণার, কনওয়ে হল এবং পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন সমাবেশে তিনি বাংলাদেশের সমর্থনে বক্তব্য রেখে প্রবাসী বাঙালিদের প্রশংসা অর্জন করেন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

জন স্টোনহাউস ঃ

মুক্তিযুদ্ধকালে বৃটেনের প্রবাসীদের মধ্যে যে আর একজন এম. পি. বাঙালিদের আপনজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি হলেন শ্রমিকদলীয় এম. পি. এবং সাবেকমন্ত্রী জন স্টোনহাউস। ১৪ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতির উপর আলোচনার প্রস্তাবকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। 'পূর্ববঙ্গ' বা বাংলাদেশ সংক্রান্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সকল বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে জন স্টোনহাউস প্রত্যেকটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং 'পূর্ববঙ্গের' পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ১০ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'পাকিস্তান পরিস্থিতি'-এর বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। জন স্টোনহাউস ১৫ জুন শ্রমিকদলীয় ১২০ জন এম. পি.-এর স্বাক্ষরসহ 'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং সামরিক নেতৃবৃন্দকে দায়ী করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এর পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের জন্য কয়েকবার কলকাতা সফর করেন। তাঁর নিজ চোখে দেখা শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি সংবাদ মাধ্যমে এবং পার্লামেন্টে অবহিত করেন। জন স্টোনহাউস স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গঠিত 'বাংলাদেশ ফান্ড' এর তিন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরীর অনুমতিক্রমে স্টিয়ারিং কমিটি বাংলাদেশের ডাকটিকেট ছাপানোর যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তার সকল ব্যবস্থা করে দেন এবং ২৬ জুলাই পার্লামেন্ট ভবনে তাঁরই উদ্যোগে 'ডাকটিকেট'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জন স্টোনহাউস পার্লামেন্টের বাইরে বাঙালিদের বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রেখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন। তিনি ৭ অক্টোবর ব্রাইটনে শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য বক্তব্য রাখেন। তিনি স্টিয়ারিং কমিটিসহ বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের সাথে নিঃস্বার্থভবে কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জন স্টোনহাউস লন্ডনে 'ব্রিটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি এই ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যবসায় আর্থিক অনিয়মের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন। সেই সময়ে বাঙালিদের মধ্যে একটা অপপ্রচার ছিল যে, জন স্টোনহাউস 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর অর্থ আত্মসাৎ করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন বাঙালির প্রচেষ্টায় বৃটেনের সলিসিটর জেনারেল 'বাংলাদেশ ফান্ডের' বিষয় একটি পুলিশী তদন্ত করেন। তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে 'বাংলাদেশ ফান্ড' থেকে মি. স্টোনহাউস বা অন্য কেউ কোন অর্থ আত্মসাৎ করে নি।[৪]

হ্যারল্ড উইলসন ঃ

বিরোধী দলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সব সময়ই বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ২০ এপ্রিল তিনি 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে আহবান জানান। ৯ জুন বাংলাদেশে অপর্যাপ্ত সাহায্য প্রেরণের বিষয়ে মিসেস জুডিথ হার্ট প্রশ্ন উত্থাপন করলে বিরোধী দলীয় নেতা মি. উইলসন 'পূর্ব বঙ্গের' শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি করে বক্তব্য রাখেন। মি. উইলসনের প্রস্তাবে এবং প্রচেষ্টায় 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে সরজমিনে পরিদর্শনের জন্য সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত গমন করেন এবং 'পূর্ববঙ্গ' সীমান্তে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এই সফরের পর সরকার দলীয় এম. পি.গণও বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ও নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন।[৫]

ইয়ান মিকার্ডো ঃ

শ্রমিক দলীয় অপর প্রভাবশালী নেতা ও দলের চেয়ারম্যান ইয়ান মিকার্ডো এম. পি. পার্লামেন্ট এবং দলীয় ফোরামে 'পূর্ববঙ্গের' জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাঁর অবদান রাখেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিভিন্ন সময়ে 'পূর্ববঙ্গের' পরিস্থিতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও বিতর্কে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। ৭ অক্টোবরে ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে পার্টির সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের শোকাবহ পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাব সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।[৬]

মাইকেল বার্নস ঃ

শ্রমিকদলীয় এম.পি. মাইকেল বার্নস বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ৪ এপ্রিল লন্ডনের 'হ্যাম্পস্টেড টাউন হলে' অনুষ্ঠিত লর্ড ব্রকওয়ে-এর সভাপতিত্বে 'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যার প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মি. বার্নস বাংলাদেশ আন্দোলনের একজন সক্রিয় সমর্থক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি পার্লামেন্টে 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিতর্কে বাংলাদেশকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। মি. বার্নস পাকিস্তান ক্রিকেট টীমের যুক্তরাজ্য সফর বাতিল করার জন্য ১৯ এপ্রিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রেখে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস জুডিথ হার্ট ঃ

শ্রমিক দলীয় অপর এম. পি. মিসেস জুডিথ হার্ট বাংলাদেশের একজন নিবেদিত প্রাণ সমর্থক ছিলেন। তিনি ৯ জুন বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য প্রদত্ত সাহায্য অপ্রতুল বলে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ১০ জুনসহ বিভিন্ন সময়ে তিনি পার্লামেন্টে 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলেন। তিনি ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক দলের সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য বক্তব্য রাখেন।[৮]

রেজ প্রেন্টিস ঃ

শ্রমিক দলীয় এম. পি. রেজ প্রেন্টিস সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পরিস্থিতি সরজমিনে দেখার জন্য ভারত ও 'পূর্ববঙ্গ' সফর করেন। তিনি দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সফরের অভিজ্ঞতা, 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরতা এবং সীমান্ত এলাকার শরণার্থীদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া সৃষ্ট সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।[৯]

আর্থার বটমলি ঃ

সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের অন্য এক শ্রমিকদলীয় সদস্য আর্থার বটমলি ভারত ও 'পূর্ববঙ্গ' সফরের অভিজ্ঞতা ১ জুলাই দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্য ও সাংবাদিকদের কাছে ব্যক্ত করেন। তিনি ১ আগস্ট 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত লন্ডনে ট্রাফেলগার স্কোয়ারের বিশাল জনসভায় তাঁর সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।[১০]

টোবি জ্যাসেল ও জেম্‌স রামসৃফিল্ড ঃ

সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদের সদস্য হিসেবে রক্ষণশীল দল (Conservative party)-এর এম. পি. টোবি জ্যাসেল ও জেম্‌স রামসফিল্ড ২১ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত ভারত ও 'পূর্ববঙ্গ' সফর করেন। বৃটিশ পার্লামেন্টে কনজার্ভেটিভ পার্টির সরকারদলীয় সদস্যরা 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তানী বর্বরতা ও গণহত্যাকে নিন্দা জানালেও পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী হিসেবে সতর্ক মন্তব্য করতেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের এই দুই সদস্য সীমান্তে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন এবং 'পূর্ববঙ্গে' প্রকৃত অবস্থা দেখে পাকিস্তানী বর্বরতায় বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্য টোবি জ্যাসেল কলকাতায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী নৃশংসতার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[১১]

বৃটিশ পার্লামেন্টে তৃতীয় দল লিবারেল পার্টির সম্মানীত এম. পি. বৃন্দ ঃ

বৃটিশ পার্লামেন্টে তৃতীয় দল লিবারেল পার্টির সম্মানীত এম. পি. বৃন্দ পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বাংলাদেশের আন্দোলনের সমর্থন করেছেন। পার্লামেন্টে 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন লিবারেল পার্টির নেতা জেরেমি থর্প, জন পার্ডো ও ডেভিড স্টীল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১৮ সেপ্টেম্বর স্কারবারায় অনুষ্ঠিত লিবারেল পার্টির সম্মেলনে পার্টি নেতা হিসেবে জেরেমি থর্প বক্তব্য প্রদানের সময় বৃটেন কর্তৃক বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থন জানানোর জন্য আহবান জানান।[১২]

টেড্‌ লেডবিটার ঃ

পাকিস্তান হাইকমিশন জুন মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য সম্বলিত অপপ্রচার শুরু করে। তারা এই অপপ্রচার মূলক প্রচারপত্র, বুকলেট ও লিফলেট ব্রিটিশ এম. পি., বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পত্রিকা অফিসে বিতরণ করে। শ্রমিক দলীয় এম. পি. টেড্‌ লেডবিটার বাংলাদেশ সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ সম্বলিত প্রচারপত্র বিতরনের জন্য পাকিস্তানের হাই কমিশনার সালমান আলীকে দায়ী করে এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন। ১২ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে তিনি বললেন, বৃটেনের পত্র-পত্রিকায় এবং টেলিভিশনে বাংলাদেশ পরিস্থিতির যে চিত্র পাই তাতে পরিস্কার প্রতীয়মান হয়, পাকিস্তানের প্রচার মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি পাকিস্তান হাই কমিশনকে এই অপ্রচার বন্ধ করার আহবান জানান।[১৩]

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অন্যান্য এম. পি.বৃন্দ ঃ

উপরোল্লেখিত মাননীয় সংসদ সদস্যদের ছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সকল শত শত মাননীয় এম. পি. (সংযোজিত পরিশিষ্ট (ii)-এ ৩০ জুন, ১৯৭১ সালের 'দি টাইমস' পত্রিকায় রিপোর্ট সহ) বাংলাদেশের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন, 'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যা বন্ধের দাবিতে প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডেনীস হীলি, ফ্রাংক জ্যাড, নাইজেল ফিসার, মাইকেল স্টুয়ার্ট, স্যার এফ. বেনেট, জুলিয়াস সিলভারম্যান, এরিক হেফার, উইলিয়াম হ্যামিলটন, ফ্রাংক এ্যালান, হিউজ ফ্রেজার, ফ্রেড এভান্স, এনড্রুল্ড, বিজ ফ্রিসন, হিউ জেংকিন্‌স, জন সিলকিন, রবার্ট প্যারী, স্যার জেরাল্ড নেবারো, রিচার্ড উড, ডেভিড লেইন, জর্জ টমস, বিগ্‌স ডেভিসন, রিচার্ড থমসন, বার্নারড ব্রেইন, জ্যাম্‌স কিলফেডার, জর্জ কানিংহাম, আলফ্রেড মরিস এবং টম কিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪]

ব্রিটিশ এম. পি.দের বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন থাকায় বিলাতের মিডিয়া, জনগণ ও সরকার বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম।
২। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', তথ্য মন্ত্রণালয়, পুণর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫৩।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-১১৬-১১৭।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-১৯০-১২০।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা-১৬১।
৬। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৮৫।
৭। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', পৃষ্ঠা-১২৬।
৮। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৮৬।
৯। ঐ।
১০। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', পৃষ্ঠা-৩৪, ১৪৮।
১১। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪।
১২। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৮৬।
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৬-১৮৭।
১৪। ঐ; পৃষ্ঠা-১৮৭।
১৫। সাক্ষাৎকারে নূরুল ইসলাম।

৪.৪ বৃটিশ গণমাধ্যম ঃ রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিলাতের পত্র-পত্রিকার অবদান ছিল অপরিসীম। বিলাতের প্রচার মাধ্যমকে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার জন্য প্রবাসী বাঙালিদের অব্যাহত প্রচেষ্টা বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বিলাতের সাংবাদিকদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিলাতে প্রবাসীদের সমাবেশ, শোভাযাত্রা, নিউজ, বুলেটিন ও পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিলাতের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা ও অগ্রগতি অবহিত রাখার কার্যক্রমও বিলাতের সংবাদপত্রগুলোর উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ এম. পি'দের বাংলাদেশ ও সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিলাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ইস্যু বৃটিশ সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও গুরুত্ব প্রদানে সাহায্য করেছে। যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বি,বি,সি এর বাংলা বিভাগের সিরাজুর রহমান, রাজিউল হাসান (রঞ্জু), শ্যামল লোধ (প্রয়াত), কমল বোস, জনমত পত্রিকার সম্পাদক এ. টি. এম ওয়ালী আশরাফ (বাংলাদেশ সংসদের সাবেক এম. পি.) এবং স্টিয়ারিং কমিটির আবদুর রউফ ও মহিউদ্দিন চৌধুরীসহ একটি বিশেষ গ্রুপ লন্ডনের সাংবাদিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ ব্যাপারে বৃটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিংগ, পিটার হেজেলহার্স্ট, বৃটিশ পত্রিকায় কর্মরত পাকিস্তানী সাংবাদিক এনথনি মাসকারেনহাস, কলিম সিদ্দিকী এবং ভারতীয় সাংবাদিক ধরম পালসহ লন্ডনে কর্মরত বেশ কিছু সাংবাদিক সহযোগিতা করেন।[১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃটিশ গণমাধ্যমের মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন বিশেষ করে বিবিসি বাংলা বিভাগ ও বৃটিশ পত্র-পত্রিকা সুদীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তা' এ স্বল্প পরিসরের গবেষণাপত্রে আলোচনা করা এক কথায় অসম্ভব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণার জন্য ফিল্ড লেভেলের কাজের অংশ হিসেবে লন্ডনে যেতে না পারায় বিলাতের গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনায় সাক্ষাৎকার সংযোজিত পরিশিষ্ট (i), প্রকাশিত দলিলপত্রাদি সংযোজিত পরিশিষ্ট (ii) ও (জ) একনজরে সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি সংযুক্ততে উল্লেখিত বই-পুস্তকের উপর নির্ভর করে এ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে (অধ্যায় শেষে টীকা ও তথ্যসূত্র সংযুক্ত)।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই বৃটিশ পত্র-পত্রিকা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবহেলা ও একপেশে নীতির ফলে বাঙালিদের ক্ষোভ এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আভাস দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৯৭০ এর নভেম্বরের প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে পাকিস্তান সরকারের রিলিফ কার্যক্রমে ব্যর্থতা ও অবহেলার বিষয়ে বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত প্রলয়ংকারী জলোচ্ছাসের পর উপকূলীয় অঞ্চলে পাকিস্তান সরকারের সাহায্য পৌঁছার পূর্বে বৃটিশ সাহায্য জাহাজ পৌঁছেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই মহাবিপদের দিনে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকারের চরম অবহেলা বাঙালিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এমনি সময়ে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার কলামিস্ট পাকিস্তানী সাংবাদিক কলিম সিদ্দীকী ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বরের সংখ্যায় "Independence fever in East Pakistan" শিরোণামে একটি বাস্তবমুখী কলাম প্রকাশ করেন। উক্ত কলামে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বক্তব্যের উল্লেখ করে বাঙালিদের "স্বাধীনতার" প্রতি ঝুঁকে পড়ার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়। পাকিস্তানী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কলিম সিদ্দিকী বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সাহসের সাথে প্রকাশ করে সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

পাকিস্তান সরকারের সকল অবহেলা ও নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের তাজা অভিজ্ঞতার আলোকে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাঙালিদের রায় মূলত কলিম সিদ্দিকীর "স্বাধীনতার" আভাস বা ইংগিত হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ ইং সনের ৭ ডিসেম্বরের 'দি গার্ডিয়ান পত্রিকা'য় "Ivory tower power" শিরোণামে এক সাব এডিটরিয়েল কলামে পিটার প্রেসটন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কঠিন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করেন। পিটার প্রেসটন উক্ত উপসম্পাদকীয়ের এক স্থানে উল্লেখ করেন যে, "... the cry of Bengal sounds like a united cry of hunger and deprivation." কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য এই যে, যা পিটার প্রেসটনের কাছে পরিস্কার ছিল তা পাকিস্তানের শাসকদের বোধগম্য হয় নি। এই "United cry"কে বিচ্ছিন্নতাবাদী পাকিস্তানের শত্রুদের গন্ডগোল আখ্যায়িত করে পাকিস্তানের শাসকরা দিবানিদ্রাতে বিভোর ছিলেন।

মার্চ, ১৯৭১ ঃ

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী ড্রামা বাংলাদেশের সকলের স্মৃতিতে রয়েছে। বিলাতের পত্র-পত্রিকা ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের ঘটনাবলী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে। পাকিস্তানের সামরিক নেতাদের একটু ভুলে যে বিরাট বিপর্যয় হতে পারে তা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের কোন উপলব্ধি বা শুভবুদ্ধি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। ২৫ মার্চের কালো রাত্রি যথারীতি সংঘটিত হওয়ার পর সময়ের ব্যবধান ও ২৬ মার্চ ঢাকার সাথে বিশ্বের সকল যোগাযোগ বন্ধ থাকায় ২৭ মার্চ বিলাতের সকল পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনা শিরোণাম লাভ করে। বিলাতের রক্ষণশীল পত্রিকা হিসাবে পরিচিত 'দি টাইমস' পত্রিকার শিরোণাম এবং তৎসঙ্গে একই দিনে প্রকাশিত "War clouds over Pakistan" নামের সম্পাদকীয় বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে অবদান রেখেছে। একই দিনে লন্ডনের আর একটি রক্ষণশীল পত্রিকা 'দি টেলিগ্রাফ' এর প্রতিবেদক কেনেথ ক্লার্ক "Jinnah's dream of unity dissolves in blood" শিরোণামে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করেন। গণতান্ত্রিক ও উদারপন্থী পত্রিকা "দি গার্ডিয়ান" ২৭ মার্চে "The tragedy in Pakistan" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ২৭ ও ২৮ মার্চের বিলাতের সংবাদপত্রসমূহে বাংলাদেশে স্বাধীনতার ঘোষণার খবর প্রাধান্য লাভ করে। ২৫ মার্চের কালো রাত্রে বাংলাদেশে যে গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা ঘটেছে তা তখনো বিশ্বের মানুষের কাছে পরিস্কার হয়নি। ২৭ ও ২৮ মার্চের খবরা-খবর ভারতের দিল্লী থেকে পাঠানো খবরের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়। ঢাকায় ২৫ মার্চ রাত্র থেকে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় এবং সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আবদ্ধ করে রাখায় ঢাকা থেকে কোন সাংবাদিক কোন খবর পরিবেশন করতে পারেনি। 'পূর্ব পাকিস্তানে' গৃহযুদ্ধ, তুমুল যুদ্ধ চলছে, পাকিস্তানী ট্যাংক বিদ্রোহীদের দমনে ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি খবরা-খবর ইতোমধ্যে প্রকাশিত হলেও প্রকৃত অবস্থা তখনো অন্ধকারে ছিল। ২৮ মার্চে 'সানডে টাইমস'-এ ডেভিড হোলডেন "The second flood in East Pakistan" শিরোণামে এক বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলাদেশে ভয়াবহ অবস্থার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পাকিস্তানের পুনঃ একাত্রীকরণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে সংঘটিত জঘন্যতম হত্যাকান্ডের তথ্য প্রকাশ শুরু হয় ২৯ মার্চ থেকে। ২৯ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান পত্রিকা'য় পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সাংবাদিক মার্টিন এ্যাডনি তিনটি পৃথক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিবেদনগুলোর শিরোণাম ছিলঃ (১) "Curfew eased as army mops up rebellion" (২) "Rocket attack on the campus" এবং (৩) "Troops used shot first tactics" উপরোক্ত তিনটি প্রতিবেদনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজনমত স্তম্ভিত হয়ে যায়। মার্টিন এ্যাডনি অন্যান্য সাংবাদিকদের সাথে তৎকালীন হোটেল ইন্টাকন্টিনেন্টালে আবদ্ধ থেকে ২৪ ঘন্টা পর ঢাকা থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হন। পাকিস্তান সামরিক জান্তা ২৫ মার্চের কালো রাত্রির ২৪ ঘন্টা পর সকল বিদেশী সাংবাদিকদের দেশ থেকে বের করে দেয়। হোটেল ইন্টাকন্টিন্টোলে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে তিনি যতটুকু উপলব্ধি করেছেন এবং খবরা-খবর নিতে পেরেছিলেন তার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল উপরোক্ত তিনটি প্রতিবেদন। মার্টিন এ্যাডনি প্রতিবেদনের এক স্থানে লিখেছেন যে, "Dacca was still burning when I and other foreign journalists left in nearly 24 hours after the Army began its military assault on an almost unarmed population."

Dhaka University Institutional Repository

২৮ মার্চ লন্ডন থেকে প্রকাশিত রবিবারের পত্রিকা 'দি অবজারভার'-এ 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, পূর্ববঙ্গে সামরিক বল প্রয়োগ করে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বরং এই বল প্রয়োগ দেশটিকে গৃহ যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান মারাত্মক ভুল করেছে বলেও সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়।

২৯ মার্চ 'দি টাইমস্' পত্রিকায় কলকাতা থেকে তাদের প্রতিনিধি পিটার হেজেলহার্স্ট প্রেরিত এক সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো সামরিক বাহিনীকে ও পাকিস্তান সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে বলে মন্তব্য করেন।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত বৈকালিক দৈনিক 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা এসোসিয়েটেড প্রেসের ফটো সাংবাদিক মাইকেল লরেন্স এর বরাতে "The Pakistan Death Horror" শিরোণামে এক পূর্ণ পাতা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মাইকেল লরেন্স ও অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে ঢাকায় আবদ্ধ থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হন এবং কিছু টুকিটাকি নোট ও গোপনে তোলা কিছু ছবি নিয়ে যেতে সমর্থ হন। ২৯ মার্চ তারিখ থেকে বাংলাদেশে সংঘটিত প্রকৃত তথ্য বিশ্ববাসী জানতে শুরু করে। বাংলাদেশের ঘটনাবলী বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে বৃটিশ অপর এক সাংবাদিক সাইমন ড্রিংগ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিও অন্যান্য সাংবাদিকদের সাথে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আবদ্ধ ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর সালিক যখন ২৬ মার্চ (শুক্রবার) বিকাল ৫.৩০ ঘটিকায় বিদেশী প্রায় ৩০ জন সাংবাদিকে জোর করে হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যান তখন সায়মন ড্রিংগ হোটেলে আত্মগোপন করে থাকেন। ২৫ মার্চের কালো রাত্রির ২৪ ঘন্টা পরে যে প্রথম বারের মতো সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয় তখন ড্রিংগ গোপনে ঢাকার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং পরবর্তী সুযোগে ঢাকা থেকে ব্যাংককে চলে যান। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ব্যাংকক থেকে লন্ডনে প্রেরণ করেন এবং তা 'দি ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় "Tanks crush revolt in Pakistan" শিরোণামে প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পুলিশ লাইন ও পুরানো ঢাকার হিন্দু প্রধান এলাকাসহ ঢাকায় সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ উক্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ করেন।

সায়মন ড্রিংগের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার হওয়ার খবর চূড়ান্তভাবে জানা যায়। ইতোপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিভিন্ন ভিন্নধর্মী খবর পরিবেশন করা হয়েছিল। সায়মন ড্রিংগের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা আক্রমণের জন্য ১ ব্যাটেলিয়ন আর্মড, ১ ব্যাটেলিয়ন আর্টিলারী এবং ১ ব্যাটেলিয়ন ইন্ফ্যান্ট্রি (সর্বমোট ৩ ব্যাটেলিয়ন) সৈন্য ব্যবহার করেছে।

'দি টাইমস্' পত্রিকা ৩০ মার্চ এসোসিয়েটেড প্রেসের ফটো সাংবাদিক মাইকেল লরেন্সের বরাত দিয়ে "At Dhaka University the burning bodies of students still lay in dormitory beds..... A mass grave had been hastily covered..." শিরোণামে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রথম পাতায় হেড লাইন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাঁর প্রতিবেদনের তিনি উল্লেখ করেন যে, "Touring the still burning areas of fighting on Saturday and Sunday, it was obvious that the city had been taken without warning."

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বিশ্বজনমতের যে এক অংশ স্বাধীনতা ঘোষণাকে বাঙালিদের বাড়াবাড়ি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মনে করেছিলেন সে অংশও ২৯ এবং ৩০ মার্চে প্রকাশিত খবরা-খবরে স্বাধীনতা ঘোষণার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে লন্ডন থেকে প্রকাশিত এ কয়েকদিনের পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ অবদান রেখেছে।

ঢাকা থেকে প্রত্যাগত বৃটিশ সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের প্রকৃত চিত্র আংশিকভাবে হলেও বৃটিশ জনমনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৮ ও ২৯ মার্চ এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে লন্ডন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক পত্রিকার সম্পাদকীয়সমূহে উক্ত প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে। উপরোক্ত সম্পাদকীয়সমূহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত নির্দেশ করে মন্তব্য করা হয়। সুদূর লন্ডন থেকে সাংবাদিকরা যে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সমর্থ হয়েছিলেন বা পাকিস্তান সংকটে যে বাস্তব সমাধান চিন্তা করতে পেরেছিলেন তা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হয়নি।

২৮ মার্চ, ১৯৭১ ইং তারিখে 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় "The victim" শিরোণামে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, "What ever happens, the old Pakistan is dead. The rulers are trying to deny that fact by arms, but the attempt cannot be other than tragic folly." 'দি সানডে টেলিগ্রাফ'-এ উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে বায়াফ্রার গৃহযুদ্ধ এবং ভিয়েতনামে আমেরিকার বর্বরতাকে উল্লেখ করে পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধকে আরো ভয়াবহ ও ব্যতিক্রমধর্মী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৯ মার্চ 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "The watching Neighbours" শিরোণামে এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আর একটি বিশেষ দিক বিশ্ব জনমতের কাছে তুলে ধরা হয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতকে পদদলিত করে একটি জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কিভাবে গ্রহণ করতে পারে তার আভাস উক্ত সম্পাদকীয়তে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে ভারত এবং চীন কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তা সম্পাদকীয়তে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া ২৯ মার্চে রক্ষণশীল পত্রিকা 'দি টাইমস'-এ যে মন্তব্য করেছিল তা পরবর্তীতে অক্ষরে বাস্তবে রূপ লাভ করেছিল। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তিকরণ ভারতের বহু নেতা মেনে নিতে পারেননি এবং শক্তিশালী পাকিস্তানও অনেকের কাম্য ছিল না। এমতাবস্থায়, পাকিস্তানের এক অংশ অস্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অপর অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রতিক্রিয়ায় ভারত নিশ্চুপ থাকবেন এটা আশা করা (পাকিস্তানের পক্ষে) যে অবাস্তব তা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার চতুর্থ দিনেই 'দি টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আভাস দেয়া হয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, পাকিস্তান তখন সকল যুক্তি ও বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ নয় মাস বাংলাদেশে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যায়।

'দি টাইমস'-এর সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে চীনের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের রূপ লাভ করে তখন চীন বিপ্লবীদের সমর্থন দান করলে বাংলাদেশের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গও ভারতের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বলেও উক্ত সম্পাদকীয়তে সন্দেহ পোষণ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও যে ভারতের সমূহ বিপদ রয়েছে তা উল্লেখ করে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের নেতারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী রূপ লাভের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন।

২৯ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি থেকে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক পিটার প্রেস্টন প্রেরীত এক প্রতিবেদনে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে একজন নির্বোধ আখ্যায়িত করে পূর্ববঙ্গে ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তাঁকে দায়ী করেন।

৩১ মার্চ লন্ডনে থেকে প্রকাশিত উদারপন্থি 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যের এক স্থানে উল্লেখ করা হয় ".... Henceforth, the country must be regarded as a particularly brutal and insensitive military dectatorship, its elected political leadership in prison, its majority party obliterated by decree.... . The fate of Dacca is an arrogant crime against humanity and human aspirations; no one should stand mealy-mouth by."

এপ্রিল, ১৯৭১ ঃ

বৃটেনের মধ্যমপন্থী পত্রিকা 'দি গার্ডিয়ান' ৩ এপ্রিল, ১৯৭১ ইং তারিখে বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর "A time to speak out" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গার্ডিয়ানের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নেই বরং তা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। উক্ত সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয় যে, পাকিস্তানের ৭০,০০০ সৈন্যের পক্ষে শহরে আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী, ছাত্র ও যুবকদের হত্যা করা সম্ভব হলেও ৭৫ মিলিয়ন (সাড়ে সাত কোটি) জনগণকে পদানত করা সম্ভব হবে না। যে 'জাতীয় ঐক্যের' জন্য "পূর্ব পাকিস্তানে" জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে সে জাতীয় ঐক্যের যে চিরতরে মৃত্যু ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়।

৩ এপ্রিলে প্রকাশিত 'দি গার্ডিয়ান'-এর উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা প্রবাসী বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত বাস্তব মনে হলেও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তা উপলব্ধি করতে পারেনি। নির্যাতন, সন্ত্রাস ও হত্যা পাকিস্তানের দুই অংশকে একত্রিত করতে পারেনি। উক্ত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের নৃশংসতা ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা এবং বাঙালিদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে বিশ্বজনমত বিশেষ করে পাকিস্তানের বিবেকসম্পন্ন জনগণকে এখনই সোচ্চার হওয়ার আহবান জানানো হয়। বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে পাকিস্তানের অপপ্রচার সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিলাতের পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে প্রভাবিত করেছে।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বিলাতের সকল পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত রক্তপাতের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। রবিবারের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো সপ্তাহের সংগৃহীত সকল খবরের সমন্বয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর বড় বড় প্রবন্ধ রচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে। ৪ এপ্রিল 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ডেভিড লোশাকের "Pakistan's path to blood shed" এবং কলিন স্মীথের "Bengals's bamboo stick Army" শিরোণামে দুটো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন দুটো যথাক্রমে কলকাতা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যশোর শহর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পাঠানো হয়। ডেভিড লোশাক মার্চ মাসের শেষের দিকে ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব আলোচনা চলাকালে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং ঘটনাপ্রবাহ কি ভাবে একটি যুদ্ধের দিকে মোড় নিচ্ছিল তা অবলোকন করছিলেন। প্রহসনমূলক আলোচনার নাটক, বাঙালিদের অসহযোগ আন্দোলন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ও নিরস্ত্র বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে 'পাকিস্তানে' একটি বড় ধরনের রক্তপাতের সূচনা হয়েছে বলে ডেভিড লোশক মন্তব্য করেন। তার প্রবন্ধ উল্লেখ করেন যে, ২৫ মার্চ রাতের আক্রমণ বাঙালিদের কাছে প্রত্যাশিত মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত আক্রমণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাকিস্তান পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ১১ দিন যাবৎ শীর্ষ আলোচনা ও প্রতিদিনই অগ্রগতির খবর পরিবেশন করায় অধিকাংশ বাঙালি এ ধরণের আক্রমণের কথা চিন্তা করতে পারেনি।

'দি সানডে টেলিগ্রাফ'-এ অপর এক প্রতিবেদনে কলিন স্মীথ অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় নিরস্ত্র বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অসম সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের মূল্যায়ন করেন। তিনি ২৫ মার্চের পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানে স্থানে যে সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছে তা গেরিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অবিশ্বাস্য হলেও বাঙালিরা যে প্রথমে বাঁশের লাঠি নিয়ে প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে প্রতিবেদনের এক অংশে বলা হয় যে, "Few of the civilian volunteers of the Bengal National Liberation Army-have anything more than single-barrelled shotguns. Most have sharpened bamboo sticks." কলিন স্মীথ সে সময়ে (৩রা এপ্রিল, ১৯৭১) যশোরের পরিস্থিতি ও বাঙালিদের প্রতিরোধ সংগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেন। কলিন স্মীথের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে বাঙালিরা কেরানীকূল বাক্সওয়ালা-তাদের পক্ষে যুদ্ধ করা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রতিবেদনে সে সময় কালে (১৯৭০-৭১) লন্ডনে মাথা কামনো (skin-head) কিছু উচ্ছৃংখল যুবক পূর্ব লন্ডনে বাঙালিদের উপর যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল তার উল্লেখ রয়েছে। এ সকল যুবকরা এনক পাওয়েলের (এম. পি.) বর্ণবাদী আদর্শের অনুসারী হিসাবে বিদেশীদের উপর আক্রমণ চালাতো। লন্ডনে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরা সবচেয়ে নিরীহ প্রকৃতির মানুষ হিসাবে পরিচিত থাকায় তাদেরকে উক্ত বর্ণবাদী আক্রমণের টার্গেট করা হতো। কলিন স্মীথ উদাহরণ হিসেবে এ ধরণের নিরীহ বাঙালিরাও যে বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধরেছে এবং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্কীন হেডদের কথা উল্লেখ করেছেন।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত রবিবারের অপর একটি পত্রিকা 'দি সানডে টাইমস' ৪ এপ্রিল, "The slaughter in East Pakistan" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে সর্বশেষ মন্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, "At some point the dialogue between the Government and the leaders of East Pakistan must be resumed. The sooner the better, jndging by the horrors of the past few days." গত কিছুদিনের হত্যাযজ্ঞ দেখে 'দি সানডে টাইমস্' যে সংলাপের প্রত্যাশা করেছিলেন তা বাস্তবে রূপলাভ করেনি। বরং অপরিসীম রক্তের বিনিময়ে বাঙালিরা তাঁদের ইপ্সিত লক্ষ্য স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলেন।

৬ এপ্রিল 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় 'পূর্ব বঙ্গে' হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের পার্লামেন্টে প্রদত্ত বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। শ্রমিক দলীয় এম. পি. ব্রুস ডগলাস-ম্যান, ফ্রাংক জ্যাড, নাইজেল ফিচার এবং লিবারেল পার্টির এম. পি. জন পারডো 'পূর্ববঙ্গে' গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপের জন্য এক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এই প্রস্তাব ১৬০ জনের বেশি এম. পি. সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই স্যার আলেক ডগলাস-হিউম পার্লামেন্টকে জানান যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'পূর্ব বঙ্গে' সংঘঠিত হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করায় শ্রমিকদলীয় এম. পি. ডেনীস হীলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সমালোচনা করে বৃটিশ সরকারকে পাকিস্তান সরকারের উপর শান্তি স্থাপনের জন্য চাপ প্রয়োগের অনুরোধ করেন। স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের বক্তব্যে 'পূর্ববঙ্গে'র গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন না করায় সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন "Sir Alec Douglas-Home had the opportunity to declare Britain's support for democracy in East Pakistan. He wawted it. ... The President Yahya Khan did not want Shaikh Mujib to assume the powers that his people had voted him. So the President reached for his gun. What is happening in East Pakistan is unjustified military oppression. Until Sir Alec can bring himself to say so he should stop making statement."

এপ্রিল মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহব্যাপী বিলাতে পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শী উক্তি দিয়ে বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের খবর পরিবেশন অব্যাহত থাকে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ৭ এপ্রিল তারিখে মার্টিন উলাকেট "Refugees flee of murder in East Pakistan" শিরোণামে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বিদেশী যে

Dhaka University Institutional Repository

সকল ব্যক্তি আটকা পড়েছিল তাঁদেরকে উদ্ধার করে 'Clan McNair' নামক কার্গো জাহাজ কলকাতা পোর্টে নিয়ে যায়। বিবরণীতে বলা হয় যে, "All agreed that Chittagong was now firmly under army control although, as one said, with much of its puplation gone and with no services, it is now a dead city."

লন্ডন থেকে ৭ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত 'দি টাইমস' পত্রিকায় পিটার হেজেলহার্স্ট অপর এক প্রতিবেদনে কলিকাতায় আগত শরণার্থীদের বরাত দিয়ে "British refugees from Chittagong flee of murder by both sides" নামে অনুরূপ বিবরণ প্রকাশ করেন। বিলাতের বাঙালিরা এ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেছিল তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর প্রকাশের মাধ্যমে আস্তে আস্তে প্রমাণিত হয় এবং বাঙালিদের ইস্যুর সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি হয়।

১১ এপ্রিল তারিখে 'দি সানডে টাইমস্'-এ নিকোলাস টমালিন বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত শহর দিনাজপুর থেকে প্রেরিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশেষ করে দিনাজপুরের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে মিঃ টমালিন উল্লেখ করেন যে, "By the time these words are in print the town of Dinajpur in Free Bangladesh will almost certainly be overwhelmed by West Pakistani trops and Sgt-Major Abdur Rab, its Chief Defender, will probably be dead." উক্ত প্রতিবেদনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের রেডিও এর মাধ্যমে প্রদত্ত সামরিক নির্দেশ উল্লেখ করে বলা হয় যে, বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার পূর্ব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ উক্ত নির্দেশ থেকে পাওয়া যায়। মিঃ টমালিন প্রতিবেদনের এক অংশে তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, "We have seen the massacres with our own eyes and that radio message appears to prove the deliberate intention."

মিঃ টমালিন উক্ত প্রতিবেদনে পাকিস্তান কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যা রটনার বিরুদ্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেন। ছয় ডিভিশন ভারতীয় সৈন্যের সীমান্তে অবস্থানের পাকিস্তানী অপপ্রচারকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি উল্লেখ করেন যে, "As for Pakistani reports that six Indian divisitions are threatening the border, these are nonsense."

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস হামলা ও তার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সীমান্ত শরণার্থীদের ভিড় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন এপ্রিল মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে বিলাতের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২ এপ্রিল তারিখে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "Border area under Pakistani pressuere" শিরোণামে এবং প্রতিবেদনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটার বিবরণ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ছবি ছাপানো হয়। ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়ার পথে করাচী বিমান বন্দরে পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রকাশ করা হয়। ইতোপূর্বে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের বিষয়ে প্রবাসীদের মধ্যে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল তা এই ছবি প্রকাশের পর পরিষ্কার হয় যায়।

'দি টাইমস' পত্রিকায় ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ডেনিস নিল্ড (Dennis Neeld)-এর বরাত দিয়ে যথাক্রমে "Thousands still fleeing frightened Dacca" এবং "Dacca city of fear" শিরোণামে দুটো প্রতিবেদনে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের ঢাকার অবস্থা এবং দেশত্যাগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৩ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মিঃ নিল্ড কূটনৈতিক এক সূত্র উল্লেখপূর্বক শুধুমাত্র ঢাকা শহরে দুই সপ্তাহে ৬০০০ জনের মৃত্যুর হিসাব প্রদান করেন। ঢাকা শহরের তখনকার পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয় "The crack of rifle shots still punctuates the night as troops round up Awami League officials, intellectuals and other prominant Bengalis. This is gestapo rule, one western diplomate commented. The army has committed mass murder."

১৭ এপ্রিল 'দি টাইমস' পত্রিকায় "East Bengal rebel HQ, falls after jet raid" শিরোনামে প্রথম পাতায় গুরুত্ব সহকারে একটি প্রতিবেদন ও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে তার স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি রাজনৈতিক ফর্মূলা উদ্ভাবনের জন্য আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অন্যথায় এই সমস্যা বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি হবে বলে আশংকা করা হয়।

মেহেরপুরের (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত) কাছাকাছি কোন এক স্থান থেকে ১৮ এপ্রিলে মার্টিন ওলাকোট (Martin Woollacott) প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে "Bangladesh troops flee into India" শিরোণামে ১৯ এপ্রিল 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে সীমান্ত শহর চূড়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর কিভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়েছিল তার বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এ অঞ্চলে প্রতিরোধকারী মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানীদের

Dhaka University Institutional Repository

অভিযান ছিল সর্বাত্মক। সীমান্ত থেকে ৩০০ গজ দূরে অবস্থিত মেহেরপুরের একটি গ্রামে বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎপরতা এতদ্ অঞ্চলে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৭ এপ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার পরের দিন বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা মেহেরপুর থেকে পিছু হটে সীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে বিশ্বজনমতের দৃষ্টি শরণার্থী শিবিরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়।

'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা ১৪ এপ্রিল "Rhetoric and Reality" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তিন সপ্তাহ ব্যাপী রক্তপাতের মাধ্যমে পাকিস্তান পরিস্থিতি কোন অবস্থায় উপনীত হয়েছে তার মূল্যায়ন করা হয় এই সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয় এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বায়ফ্রা-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনা করা সমীচীণ নয় বলে মন্তব্য করা হয়।

১৬ এপ্রিল লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'নিউ ষ্ট্যাটসম্যান' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় "The blood of Bangladesh" প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়ের শুরুতে মন্তব্য করা হয় যে, "If blood is the price of a people's right to Independence. Bangladesh has over paid." পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সমালোচনা করে উল্লেখ করা হয় যে, "... Pakistan was a state created from above for reasons of Political expendiency. So the lesson in simple, if a hard one that such structures cannot survive. How much human misery must be endured before that fact is accepted. উপরোক্ত সম্পাদকীয় ছাড়াও ১৬ এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করে সিলেটের অভ্যন্তর থেকে ডেভিড লোশাক (David Loshak) কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ "Slaughter goes on as East Pakistan fights for life" শিরোণামে 'দি সানডে টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত হয়। 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় একই দিনে সায়মন ড্রিংগ প্রেরিত অপর এক সংবাদ 'Sheikh's supporters failed to prepare for armed resistance' শিরোণামে প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রথম যে বৃটিশ সাংবাদিক কলিন স্মীথ কলকাতা থেকে ঢাকায় গিয়ে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে প্রত্যাবর্তন করে কলকাত থেকে সংবাদ প্রেরণ করেন তা 'দি অবজারভার' পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল প্রকাশিত হয়। এই সংবাদে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে স্থান লাভ করে। ১৮ এপ্রিল 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত "Pakistan: A time to speak out" শিরোণামে সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশে সংঘটিত মর্মান্তিক ও জঘন্য ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বৃটিশ সরকারকে এখনই সোচ্চার হওয়ার সময় হয়েছে বলে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়, ২০ এপ্রিল প্রকাশিত এক সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের বিচারের জন্য ইসলামাবাদে একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের খবর পরিবেশন করা হয়। সংবাদে শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায়িত করে তাকে ভারতের সাথে পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ অভিযুক্ত করা হয়। ২৪ এপ্রিল 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের নক্সাল পন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে "সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র" বলে আখ্যায়িত করে মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করছে বলে এক খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞের বিবরণ সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' পত্রিকায় ২৬ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত বিবরণের সাথে করাচী বিমান বন্দরে বন্দী অবস্থায় গৃহীত শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছাপানো হয়।

মে, ১৯৭১ ঃ

বিলাত সফরে আগত পাকিস্তানী ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটিসহ প্রবাসী বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটিসমূহের বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণের প্রেক্ষাপটে ১ মে তারিখে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১ মে 'দি টাইমস্' পত্রিকায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর বরাত দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা প্রকাশ করে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদে আরো জানানো যায় যে, মিঃ ভুট্টো উক্ত সম্ভাব্য যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষে থাকবে বলে এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন।

বৃটেনের বামপন্থী পত্রিকা 'মর্নিং সান' ৪ এপ্রিলে প্রকাশিত খবরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনের কথা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের কাছে বাংলাদেশকে সমর্থনের আবেদন জানিয়েছেন বলে উক্ত খবরে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের ছয়টি প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন সমবায়ে গঠিত বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নও বাংলাদেশকে সমর্থনের জন্য বিশ্ববাসীকে আহবান জানিয়েছেন বলেও উক্ত সংবাদে জানা যায়। এর ফলে বৃটেনে প্রবাসী প্রগতিশীল কর্মীদের মধ্যে ইতোপূর্বে প্রকাশিত খবরে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বার্মিংহামের কাছে এজবাস্টন ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের খবর "মর্নিং সান" পত্রিকায় ৬ মে ফলাওভাবে প্রকাশিত হয়। ৬ মে তারিখে "দি গার্ডিয়ান" পত্রিকায় পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স সান্ধ্য দৈনিক "The Evening standard" পত্রিকায় ৬ মে "Time to act" শিরোণামের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, "This is not a civil war: It is virtually a war between two nations, clumsily united since 1947 and now quite clearly imcompatible."

৭ মে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "The world's latest refugees" শিরোণামে এক প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শরণার্থী সমস্যার কথা বিশ্ববিবেকের কাছে তুলে ধরা হয়। 'দি অবজারভার' পত্রিকা ৯ মে শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে এক নিবন্ধে এ পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করেছে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ভারত যে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে তার আলোচনা করা হয়। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে শরণার্থীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষে দাঁড়াবে বলে নিবন্ধে আশংকা প্রকাশ করা হয় এবং এ ব্যাপারে আঞ্চলিক শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়।

১৩ মে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা "The silent conscience" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। নিবন্ধে এক অংশে বলা হয় যে, "... How many died. Millions, says the Bangla propagandists. Perhaps 15000 say Yahha's spokesmen. But crucially even fifteen thousand corpses is an absurd price to pay for keeping the two distant giants of Pakistan in miserable liaison." নিবন্ধে এক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয় যে, "How should a Government which belives in freedom act in these circumstances? It should not hide behind the diplomatic niceties of "internal matter". It should have an open view." এ পর্যায়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের এবং সরকারের কি কি করণীয় রয়েছে তাও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশে সংক্রান্ত পার্লামেন্ট ডিবেটকে সামনে রেখে ১৩ মে 'দি টাইমস্' পত্রিকায় বৃটেনের ২০৬ জন বুদ্ধিজীবী, পার্লামেন্ট সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত পৃষ্ঠা ব্যাপি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলাদেশ থেকে দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য বৃটিশ সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

১৫ মে "দি টাইমস্" পত্রিকায় বনগা থেকে পিটার হেজেলহার্সটস (Peter Hazelhurst) কর্তৃক প্রেরিত একটি সংবাদ "Unbelivable misery" শিরোণামে প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর ভারতে প্রবেশের খবর প্রাধান্য পায়। খবরে বলা হয় যে, ইতোমধ্যে প্রায় ২০ লাখ শরণার্থী বনগা এলাকায় রয়েছে। শরণার্থীদের মাথা গুজবার মত কোন স্থান নেই বলে উল্লেখ করে তাদের সীমাহীন দুর্ভোগের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

জুন, ১৯৭১ ঃ

বাংলাদেশ ইস্যুর আন্তর্জাতিক প্রচারের ক্ষেত্রে জুন মাস বিশেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। বিলাতের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট শরণার্থী সমস্যা সংবাদের শিরোণাম সৃষ্টি করে। প্রায় সকল সংবাদপত্রের ব্যানার হেডলাইন ও সম্পাদকীয়তে স্থান পায় বাংলাদেশ ইস্যু।

'দি টাইমস্' পত্রিকা ১ জুন "Bengal's suffering millions" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ থেকে ভারতে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সীমাহীন দুর্ভোগের কথা আলোচনা করা হয়। সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, "The evidence of refugees does not confirm the claim made by the army authorities in East Pakistan that order has been restored and that life is returning to normal."

৪ জুন 'দি টাইমস্' পত্রিকার প্রথম পাতার ব্যানার হেডলাইন ৬ কলামে "Drug supplies runing out as 5,000 refugees die of cholera." সংবাদটি পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর থেকে প্রেরণ করেন পিটার হেজেলহার্সট। এই প্রবন্ধে শরণার্থীদের বাসস্থানের অপ্রতুলতা, খাদ্যের অভাব ও রোগ ব্যাধির ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। রক্ষণশীল পত্রিকা 'দি টেলিগ্রাফ' ৫ জুন কলিকাতা থেকে ইয়ান ওয়ার্ড কর্তৃক প্রেরিত একই ধরণের খবর "Cholera –out of control" শিরোনামে প্রকাশ করে।

৮ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বাংলাদেশ ইস্যু ও শরণার্থী সমস্যা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। "The better way to help" শিরোণামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের রক্ষা করতে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো যে ব্যর্থ হয়েছে তার সমালোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকীয়তে প্রথমেই মন্তব্য করা হয় যে, "The world community should be ashamed at how slow it is to learn." 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় একই দিনে সাইমন উইনচেস্টার কর্তৃক প্রেরিত "Ferry to freedom or death" এবং "Aid demands beyond UN" শিরোণামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ তার আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। শ্রমিক দলীয় সংসদ সদস্য জন ষ্টোনহাউজ ৮ জুন 'দি টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা বন্ধের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য আহবান জানান।

'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা ৯ জুন "Relief bottleneck threatens aid"; "Guerrillas raids add to border chaos"এবং "Armed police move to stop refuge clash" শিরোণামে তিনটি সংবাদ নিবন্ধ এবং "Refugees fear of Pakistan army" শিরোণামে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। উপ-সম্পাদকীয়তে গত ৮ জুন পার্লামেন্টে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম-এর সত্য ভাষণের জন্য প্রশংসা করা হয়। স্যার আলেক পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "They were afraid of untolerable suppressive action by the Pakistan army, and only a political settlement would get them back to their homes." 'দি টাইমস' পত্রিকায় ১২ জুন এক সংবাদ নিবন্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জঘন্যতম গণহত্যা এবং হিন্দুদেরকে নির্বিচারে হত্যার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ ছাপানো হয়।

১২ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বৃটিশ এম. টি. টেড্ লেড্‌বিটার পাকিস্তান হাইকমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও অর্থহীন সংবাদ সম্বলিত প্রচারপত্র প্রকাশ করায় বিরক্ত হয়ে তার প্রতিবাদ করে পাকিস্তান হাই কমিশনার সালমান আলীকে যে পত্র দেন তা সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়। টেড্ লেড্‌বিটার তাঁর পত্রে লিখেন যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার 'পূর্ববঙ্গে' যেভাবে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বলাৎকারের মতো জঘন্য অপরাধ করছে তা শতাব্দির ঘৃণিত কাজ হিসাবে গণ্য হবে। বাংলাদেশের ঘটনাবলী যে কিভাবে বৃটিশ এম. পি.সহ সুধী সমাজকে বিচলিত করেছিল তা মি. লেড্‌বিটারের পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৩ জুন 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় এনথনী মাসকারেনহাস এর সাড়া জাগানো দীর্ঘ প্রবন্ধ 'Genocide' শিরোণামে প্রকাশিত হয়। মাসকারেনহাস এই প্রবন্ধ লিখে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তা প্রশংসনীয়। তিনি ভারত বিভাগের পূর্বে গোয়ার অধিবাসী একজন খৃষ্টান। ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং পাকিস্তানী পাসপোর্টধারী নাগরিক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস'-এর প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলাদেশে গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর এপ্রিল মাসে তিনি বাংলাদেশ সফর করেন এবং পরিস্থিতি সরজমিন প্রত্যক্ষ করেন। পাকিস্তানে ফিরে এসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি তার রিপোর্ট পাকিস্তানের সামরিক সরকারের ইচ্ছা মাফিক প্রকাশ করবেন না, যদি রিপোর্ট ছাপাতেই হয় তাহলে প্রকৃত এবং পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। প্রকৃত রিপোর্ট পাকিস্তানে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না বলে তিনি সম্পূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে লন্ডনে উপস্থিত হন। তিনি জানতেন যে, এই রিপোর্ট প্রকাশের পর তাকে আর পাকিস্তানে ফিরে যেতে দেয়া হবে না। তাই 'দি সানডে টাইমস'-এর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে তিনি পুনরায় পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তার বাড়ীসহ সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করে লন্ডনে পালিয়ে আসেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে লন্ডনে ফিরে আসার পর এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ''Genocide" রিপোর্ট প্রকাশের সূচনাতে 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকার প্রথম পাতায় মন্তব্য করা হয় যে, "West Pakistanis Army has been systematically massacaring thousands of civilians in East Pakistan since end of march. This is the horrifying reality behind the news blackout imposed by President Yahya Khan's Government since end of March. This is the reason why more than five million refugees have streamed out of East Pakistan into India, risking cholera and famine." ম্যাসকারেনহাসের দীর্ঘ এই রিপোর্ট বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

১৪ জুন 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "Death of a Citizen"; "Dwindling flow of refugees suggests West Bengal border has been sealed off" শিরোণামে দু'টি সংবাদ নিবন্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা এবং শরণার্থী সমস্যা আলোচনা করা হয় এবং বিশ্ব বিবেকের কাছে তুলে ধরা হয়। একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৬ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় সায়মন উইনচেস্টার প্রেরিত "Soothing words scan Bengali refugees" শিরোণামে যে খবর প্রকাশিত হয় তাতে প্রবাসী বাংলাদেশী জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শরণার্থী সংক্রান্ত জাতিসংঘের হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন খান বনগাঁও এলাকার শিবির পরিদর্শনের পর মন্তব্য করেন যে, "... he regarded the situation in East Pakistan as optimistic

Dhaka University Institutional Repository

and that he did not see why the refugees should not be able to return home in time." সংবাদ নিবন্ধে প্রিন্স সদরুদ্দিনের এই ধরণের মনোবৃত্তির সমালোচনা করা হয়। একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "Pakistan –guilty of genocide" শিরোণামে অপর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রিন্স সদরুদ্দিনের উপরোক্ত মন্তব্যে বিশ্বজনমতও স্তম্ভিত হয় এবং সমালোচনা মুখর হয়। ১৭ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বাংলাদেশের শরণার্থী ও জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে একটি সম্পাদকীয় "The UN could be bolder" শিরোণামে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, "Prince Sadruddins words have added the burder of despair to the refugees trials of flight, disease and hunger." শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘকে আরো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্পাদকীয়তে মত প্রকাশ করা হয়। একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার মার্টিন ওলাকোট প্রেরিত খবরে পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কঠিন মনোভাবের কথা প্রকাশিত হয়।

২২ জুন লন্ডন থেকে প্রকাশিত সকল পত্রিকা প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১১ জাতি সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান এইড কনসোরসিয়ামের সভায় পাকিস্তানকে নতুন সাহায্য বন্ধের সিদ্ধান্তের খবর ফলাওভাবে প্রচার করা হয়। গার্ডিয়ান পত্রিকায় ২২ জুনে প্রকাশিত উক্ত খবরের সাথে লন্ডন এবং বার্মিংহাম থেকে প্রেরিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'সহ বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সভা স্থলের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে লবিং এবং বিক্ষোভ হয় তাও প্রচার করা হয়। ২২ জুন লন্ডনের পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের জন্য অপর একটি ইতিবাচক আনন্দের খবর প্রকাশিত হয়। ২১ জুনে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার পর এক যুক্ত বিবৃতিতে এই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বৃটিশ সরকারের পরোক্ষ সমর্থন মনোভাব প্রকাশিত হয়। যুক্তবিবৃতিতে বলা হয় যে, পাকিস্তানে সৃষ্ট সমস্যার এমন সমাধান হতে হবে যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। দীর্ঘদিনের লবিং, ধর্ণা, মিছিল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের পর রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের এই পরিবর্তিত মনোভাব বিলাতে আন্দোলনরত প্রবাসী বঙালিদের মনে অনুপ্রেরণা ও আশাবাদ সৃষ্টি করে।

২৩জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় শরণার্থী সংক্রান্ত জাতিসংঘের হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান জাতিসংঘের মহাসচিব মিঃ উথানটের কাছে যে রিপোর্ট দেন তা প্রকাশ লাভ করে। এই রিপোর্টে এক পেশে বলে সমালোচিত হয়। ২৪ জুন পত্রিকায় প্যাট্রিক কিটলী এবং ক্রিস্টিন ইয়েভ যৌথভাবে "Big sqeeze is on Yahha khan" শিরোণামে একটি সংবাদ নিবন্ধে 'পাকিস্তান সমস্যার' একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বৃটেন পাকিস্তানকে কোন সাহায্য দেবেন না বলে যে ঘোষণা বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকল্য পার্লামেন্টে দিয়েছেন তা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে আমেরিকা যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল তা উপেক্ষা করে ২টি জাহাজ ভর্তি অস্ত্র নিউইয়র্ক পোর্ট থেকে ছেড়ে এসেছে বলে এক খবর ২৫জুন 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৯ জুন 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মার্টিন ওলাকোট পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ইস্যুকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এই পরিকল্পনা বিদ্যমা পরিস্থিতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যে হবে না তা উল্লেখ করে 'দি গার্ডিয়ান' একই দিনে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ৩০ জুন 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ প্রেরিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উপর ইয়াহিয়া খানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নতুন পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দু আক্রমণের খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ সমর্থক 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ৩০ জুন 'দি টাইমস্' পত্রিকায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি সম্বলিত এক পূর্ণ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৫ জুন বাংলাদেশের সমর্থক সংসদ সদস্যগণ যে প্রস্তাব উথাপন করেছিলেন, প্রায় ২০০ জনের বেশি এম.পি.-এর নাম সহ তার পূর্ণ বিবরণ উক্ত বিজ্ঞাপনে ছাপানো হয়।

জুলাই, ১৯৭১ ঃ

১ জুলাই 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বৃটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক দলীয় সদস্য আর্থার বটমলীর নেতৃত্বে প্রেরিত বৃটিশ পার্লামেন্টধারী প্রতিনিধি দলের ভারতে শরণার্থী শিবির এবং বাংলাদেশের কিছু এলাকা পরিদর্শনের খবর প্রকাশ হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্য টোবী জ্যাসেল প্রদত্ত বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্বিচারে হত্যা, ধ্বংস ও নৃশংসতার বিবরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। একই দিনে 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' অপর এক সংবাদ প্রতিবেদনে কানাডা কর্তৃক পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ লাইসেন্স বাতিলের খবর প্রকাশিত হয়। এর ফলে পাকিস্তানী জাহাজ 'পদ্মা' মন্ট্রিয়েলের বন্দর থেকে খালি ফিরে গিয়েছে খবরে উল্লেখ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২ জুলাই 'দি টাইমস্' পত্রিকায় বৃটিশ পার্লামেন্টধারী প্রতিনিধি দলের সদস্য রেজিনাল্ড প্রেন্টিস্, এম.পি.এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে সৃষ্ট সমস্যা নিরসন শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রতিনিধি দলের নেতা আর্থার বটমলী এম.পি.'র বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা ৩ জুলাই তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের প্রধান জেনারেল ফরমান আলী খানের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। ৫ জুলাই 'দি টাইমস্' পত্রিকা 'গান্ধী পীস ফাউন্ডেশন'-এর সভাপতি ভারতের সর্বশ্রদ্ধেয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণের এক বিবৃতি প্রকাশ করে। ৬ জুলাই 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ঢাকা থেকে মিস ক্লেয়ার হোলিংয়ার্থের প্রেরিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

৭ জুলাই 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় "Pakistan's only way out" শিরোণামে মন্তব্যে বলা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে 'পূর্ববঙ্গে'র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এতদঅঞ্চলে শান্তি পুনঃস্থাপন করা যায়। সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয় যে, 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং এর কোন ভবিষ্যত নেই। একই দিনে 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ফ্রান্স কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য সামরিক অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত সকল চুক্তি বাতিলের খবর প্রচারিত হয়। উপরোক্ত সম্পাদকীয় এবং সংবাদ প্রতিবেদন প্রবাসীদের মধ্যে বিপুল প্রেরণ ও উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তান যে আন্তর্জাতিক সমর্থন হারাচ্ছে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা ৮ জুলাই "188m needed for refugees" শিরোণামে এক সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশ করে। সংবাদে ভারতের অভ্যন্তরে শরণার্থীদের সংখ্যা ৬০ লক্ষের উর্ধ্বে হবে বলে উল্লেখ করে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের মুখপাত্র স্ট্যানলি রাইট বলেন যে, এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রায় ১৬৬ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং এর সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়।

৯ জুলাই 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বেনাপোল সীমান্ত এলাকা থেকে মিসেস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থের প্রেরিত এক সংবাদ প্রতিবেদন "War spirit grows on trigger happy Pakistan border" শিরোণামে প্রকাশিত হয়।

১১ জুলাই বৃটেনের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় "A regime of thugs and bigots" শিরোণামে মুরে সায়েল (Murry Sayle) একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

'দি টাইমস্' পত্রিকা ১৪ জুলাই বাংলাদেশের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ১৩ জুলাই 'দি নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকা বিশ্বব্যাংকের এই গোপন রিপোর্টটি প্রকাশ করে, যা ১৪ জুলাই লন্ডন থেকে পুনঃ প্রকাশ করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি হেন্ড্রিক ভেনডার হেইজেন (Hendrick Vander Heijden) বাংলাদেশে পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া চালনা ও মংলা পোর্ট এবং তৎসংলগ্ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন (৩ জুন থেকে ৬ জুন '৭১) করে ব্যাংকে যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেন তা প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তান কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা ও ধ্বংসের বিবরণ দেয়া হয়। এমনিভাবে অন্যান্য এলাকার ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ উপরোক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংক ও দাতা দেশ সমূহ যে পাকিস্তানকে সাহায্য দান স্থগিত করেছিল তার জন্য উপরোক্ত রিপোর্টটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

১৪ জুলাই 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "The terror that perpetuates terror" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'পূর্ববঙ্গে'র আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যে সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখা যাবে না তা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়।

'ফাইনান্সিয়াল টাইমস্' পত্রিকায় ১৯ জুলাই বৃটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েল এর গৃহীত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত আমেরিয়ার বার এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২০ জুলাই 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় অর্ধপৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি "খোলা চিঠি" প্রকাশ করে। "খোলা চিঠি"তে যে সকল দাবি উত্থাপন করা হয় তার মধ্যে (ক) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান; (খ) পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করা; (গ) গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি এবং (ঘ) জেনোসাইড কনভেনশন লংঘন ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন করার ব্যাপারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন দাবিসমূহ উল্লেখযোগ্য।

২৩ জুলাই 'দি টাইমস্' পত্রিকায় তাদের সংবাদদাতা প্রেরিত এক সংবাদে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ২০,০০০ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হওয়ার দাবি করা হয়। ২৫ জুলাই 'সানডে টাইমস্' পত্রিকায় পিটার গীল প্রেরিত "Still no end to Bengal Plight" শিরোণামে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশার কথা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়। ২৫ জুলাই 'দি অবজারভার' পত্রিকায় অপর এক খবরে চীনের নীতি সমর্থক মাওপন্থী ভারতের নক্সালপন্থীদের এক গ্রুপ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ধনিক শ্রেণীর আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে পাকিস্তানকে

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থনের কথা প্রকাশিত হয়। নক্সালপন্থী এই গ্রুপের নেতা অসীম চ্যাটার্জীর সাথে নক্সালপন্থী পার্টির চেয়ারম্যান চারু মজুমদারের এ বিষয়ে মতভেদের কথাও সংবাদ সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়।

২৮ জুলাই 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "The plight of Bengal" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা এতই প্রকট হয়েছে যার ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অনিচ্ছুক ও ভীত শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হবেন নতুবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন। সমস্যা সমাধানের কয়েকটি পদক্ষেপের সুপারিশ করে সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, "It may be that nothing, no diplomatic intervention, can reverse this humaliting and disastrous side. But a few dramatic gestures would help. First the release of Sheikh Mujibur Rahman and his installation in Dhaka. Secondly, concerted action by the Security Council. Thirdly, clear warning to Yahya that he will remain, economically and moraly, beyond the pall until his Punjabi troops fly home to the Punjab."

৩০ জুলাই "দি গার্ডিয়ান" পত্রিকায় এ্যাকশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে আয়োজিত ১ আগস্টের ট্রাফেলগার স্কোয়ারের জনসমাবেশ যোগদানের আবেদন জানিয়ে "পূর্ব বঙ্গে গণহত্যা" শিরোণামে অর্ধপৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সিনেটর ইউজিন ম্যাক্‌কার্থী এর বাংলাদেশকে সমর্থন দানের খবর প্রচারিত হয়। ৩১ জুলাই 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে এক সংবাদ সমীক্ষায় বলা হয় যে, যে সকল দেশ পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান স্থগিত করেছে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধিমূলক আচরণ করছে বলে ইয়াহিয়া খান অভিযোগ করেছেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি প্রদান করেন। একই দিনে 'দি ইকনমিস্ট" পত্রিকায় "Time is running out" শিরোণামে একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ পায়।

আগস্ট, ১৯৭১ ঃ

বিলাতে বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'দি সানডে টাইমস্' ১ আগস্ট মুরে সাইল (Murry Syel)-এর একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করে। 'পূর্ববঙ্গ' পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তান যে পরিমাণ অবাস্তব ও মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে তাতে পাকিস্তান ভিয়েতনামের মতো এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে প্রবন্ধে আশংকা করা হয়। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকিস্তানী সেনাদের হতাহতের সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ইঙ্গিত হিসাবে পাকিস্তানী আহত সৈন্যদের বিমানযোগে ঢাকা থেকে করাচী প্রেরণের বিবরণ উক্ত নিবন্ধে প্রকাশিত হয়। একই দিনে 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ইয়াহিয়া খানের ঢাকা গমনের ঘোষণা ও ঢাকায় সংঘটিত যুদ্ধের কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়।

২ আগষ্ট 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত ইকনমিক কাউন্সিলর বাঙালি কর্মকর্তা এ. এম. এ. মুহিতের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের খবর প্রকাশিত হয়। একই দিনে 'দি টাইমস্' সহ বিলাতের প্রায় সকল পত্রপত্রিকায় ১ আগস্টে ট্রাফেলগার স্কোয়ারে 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত জনসভার খবর প্রকাশিত হয়। ট্রাফেলগার স্কোয়ারের জনসভায় ঘোষণার মাধ্যমে লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব বাঙালি কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহমদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের খবরটি উক্ত পত্রিকায় প্রাধান্য পায়। ৩ আগস্ট 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পাকিস্তানে বন্দী ও বিচারাধীন বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব পেশ করার খবর প্রকাশিত হয়। গত ১৫ জুন বৃটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রস্তাব পেশ করা হয়।

৫ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ একটি প্রস্তাব গ্রহণের খবর প্রকাশ করে সংবাদে বলা হয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং শরণার্থীদের ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে আমেরিকার সাহায্য দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত হয়। ৬ আগস্ট 'দি টাইমস্' এবং 'দি গার্ডিয়ান' পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। উক্ত শ্বেতপত্রে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বিবরণ দিয়ে সকল ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগকে এবং ভারতকে দায়ী করা হয়। ৭ আগস্ট 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ প্রেরিত সংবাদ প্রতিবেদনে উপরোক্ত 'শ্বেতপত্র' অতিরঞ্জিত বলে মন্তব্য করা হয়। ৭ আগস্ট 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পিটার হেজেলহার্স্ট এক সংবাদ সমীক্ষায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করেন।

৮ আগস্ট 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একটি সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়।

'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা ৯ আগস্টে এক সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্প্রতি ওয়াশিংটন ও নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানী দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত ১৫ জন কূটনৈতিক কর্মকর্তার একযোগে পদত্যাগের ঘটনাকে ইয়াহিয়া খানের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০ আগস্ট লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রায় সকল পত্রিকায় পাকিস্তানে গঠিত একটি সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। এই প্রেক্ষিতে ১০ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় যে, এই প্রহসনমূলক বিচার অনুষ্ঠানের ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের যে একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল তারও অপমৃত্যু হলো। এই বিচার অনুষ্ঠানকে ইয়াহিয়া খানের একটি অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করে সম্পাদকীয়তে এর ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে আশংকা করা হয়।

'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ১২ আগস্টে মিস. ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ পরিবেশিত খবরে ঢাকার কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের বিবরণ দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়। একই দিনে 'দি টাইমস্' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য সকল সংশ্লিষ্ট মহলকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। সম্পাদকীয়তে এই প্রহসনমূলক গোপন বিচারের তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বলে অভিহিত করা হয়।

১৩ আগস্ট 'দি টাইমস্' পত্রিকায় শ্রমিকদলী এম.পি.টমাস উইলিয়ামস্ এর একটি পত্র গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। পত্রে টমাস উইলিয়ামস্ বলেন, সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচারের সময় তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আনীত অভিযোগগুলো যোগ করার খবরে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাছাড়া এই গোপন বিচারে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্য পাকিস্তানী আইনজীবী ছাড়া অন্য কাউকে সুযোগ না দেয়ার সিদ্ধান্তে এটা পরিষ্কার যে শেখ মুজিব ন্যায় বিচার পাবেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, টমাস উইলিয়ামস্ ১৯৬৯ সনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। একই দিন (১৩ আগস্ট) 'দি ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার জাতিসংঘ সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে বলা হয়, শেখ মুজিবের সামরিক আদালতে গোপন বিচার এবং নিরাপত্তার বিষয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট পর্দার অন্তরালে পাকিস্তান সামরিক শাসকদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং সক্রিয় আছেন।

১৫ আগস্ট 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় যে, গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত আওয়ামীলীগ নেতার প্রতি ইয়াহিয়া খানের এ হেন আচরণে তিক্ততা আরো বৃদ্ধি হবে এবং করুণ পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। ১৫ আগস্ট 'দি অবজারভার' পত্রিকায় একই বিষয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় যে, বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানী নির্যাতন নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্পাদকীয়তে ইয়াহিয়া খানকে হুঁশিয়ার করে বলা হয় যে, তার এই ভুল পদক্ষেপের ফলে এক সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় নেমে আসবে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

১৫ আগস্ট লন্ডনের রবিবারের পত্রিকা 'সানডে টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক খবরে জানা যায় যে, জনৈক ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ সামরিক আদালত লায়ালপুর শহরে একটি সার্কিট হাউজে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শুরু করেছে।

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আরো ৬৮টি সংগ্রাম পরিষদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে ১৬ আগস্ট 'দি টাইমস্' পত্রিকায় একটি অর্ধপৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। বিজ্ঞাপনে জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করা হয়। বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশে পরিচালিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা এবং সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। ২১ আগস্ট 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থনের জন্য পাকিস্তানের আইনজীবী এ. কে. ব্রোহী রাজী হয়েছেন বলে খবর পরিবেশিত হয়। 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ক্যানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবলী ২২ আগস্ট প্রকাশ লাভ করে। উল্লেখিত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই উপমহাদেশে সৃষ্ট সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। ২৮ আগস্ট 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' সহ অন্যান্য পত্রিকায় লন্ডনের বেইজ ওয়াটার এলাকায় ২৪ নং পেমব্রিজ গার্ডেনে বাংলাদেশ মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের খবর পরিবেশন করা হয়।

৩০ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "Washington and Bangladesh" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ এনে এমতাবস্থায় ওয়াশিংটনের করণীয় সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়। গত ডিসেম্বরে যে অঞ্চলে শান্তি পূর্ণ নির্বাচন হয়েছে সেখানে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ, হত্যা, ধর্ষণ ও দুর্ভিক্ষের মতো এক ভয়াবহ অবস্থা চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউমকে ওয়াশিংটন সফর করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা এবং বৃটেনের মনোভাবের কথা অবহিত করার জন্য সম্পাদকীয়তে পরামর্শ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ঃ

১ সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ প্রেরিত সংবাদ নিবন্ধে 'পূর্ববঙ্গে'র গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খানকে বাদ দিয়ে গভর্নর পদে ডাঃ এ. এম. মালিককে এবং সামরিক প্রশাসক পদে লেঃ জেঃ নিয়াজীকে নিয়োগের খবর পরিবেশন করে মন্তব্য করা হয় যে, টিক্কা খানের অপসারণে আপাতত 'পূর্ববঙ্গে'র জনগণ খুশি হবেন। নিবন্ধে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ডাঃ মালিক বাঙালি হলেও তিনি পাকিস্তানী সামরিক কমান্ডার দালাল হিসেবে চিহ্নিত হবেন। 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' একই দিনে অপর এক খবরে পাকিস্তান মিশনসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনৈতিকদেরকে পদত্যাগ করতে বৃটেন উৎসাহ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। খবরে আরো উল্লেখ করা হয় যে, লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের বিষয় পাকিস্তানের প্রতিবাদের যে ব্যাখ্যা বৃটেন প্রদান করেছে তা পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩ সেপ্টেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় বৃটিশ শ্রমিক দলীয় প্রভাবশালী এম. পি. ও সাবেক মন্ত্রী পিটার শোর-এর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পাকিস্তান দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালিরা যাতে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিতে না পারে তার পদক্ষেপ হিসাবে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত অফিসারদের পাসপোর্ট জমা দেয়ার নির্দেশের খবর প্রকাশিত হয়। এর ফলে পাকিস্তানের দুর্বলতা আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ লাভ করে।

১০ সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় জুলফিকার আলীকে পাকিস্তানেরত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের দাবির সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। মার্চ মাসে ইয়াহিয়া-মুজিব আলাচনা ব্যর্থহওয়ার জন্য ভুট্টোকে দায়ী করে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেখানে ভূট্টোর দল পেয়েছে ৮৫ টি আসন আর শেখ মুজিবের দল পেয়েছে ১৬২ টি সেখানে ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয় যে, পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিয়ে ইয়াহিয়া খানের উচিত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে একটা আপোষ ফরমুলায় উপনীত হওয়া। একই দিনে 'নিউ স্ট্যাটস্‌ম্যান' পত্রিকায় "Bangladesh must be freed" শিরোণামে একটি সংবাদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য পাঁচ দল সমন্বয়ে "কনসালটেটিভ কমিটি" গঠনের খবর পরিবেশিত হয়। বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে কমিটির আহবায়ক করে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ ভাসানী পন্থী), মনি সিং (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), অধ্যাপক মুজাফফর আহম্মদ (মুজাফফর পন্থী ন্যাপ), খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ (বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের দুইজন সহ আট সদস্য বিশিষ্ট কনসালটেটিভ কমিটি গঠিত হয়। এই খবরে প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা ও সমর্থনের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

১৪ সেপ্টেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত 'কমনওয়েলথ্ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন'-এর সম্মেলনের উত্থাপিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়। সম্মেলনের প্রথম দিনে (১৩ সেপ্টেম্বর) বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী আর্থার বটমূলী 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তান সামরিক সরকারের বল প্রয়োগ ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার জন্য নিন্দা জানিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবি করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ফিলিপাইনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বাঙালি কূটনীতিবিদ খুররম খান পন্নী এবং নাইজেরিয়ায় পাকিস্তান হাই কমিশনের চ্যান্সেরীর কর্মকর্তা মহিউদ্দিন জায়গীরদারের পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের খবর প্রকাশিত হয়। খবরে মন্তব্য করা হয় যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন কূটনীতিবিদ বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পরিচালিত গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেছে। একই দিনে 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, মস্কো-দিল্লী মৈত্রী চুক্তির সম্ভাব্য ফলাফলের কথা চিন্তা করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার উদ্বিগ্নবলে মনে হচ্ছে। এই সংকট আরো ঘনীভূত হলে পাকিস্তান চীনের সাহায্য পাবে কিনা প্রবন্ধে সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর 'ইভিনিং স্টান্ডার্ড' পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ইরানের শাহ 'পূর্ববঙ্গে'র পরিস্থিতির ব্যাপারে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ঝুঁকি না নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি শেখ মুজিবকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দানের আহবান জানিয়ে 'পূর্ববঙ্গের' সমস্যা সমাধানে পাকিস্তান ও ভারতের সাথে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব করেন। সংবাদে আরো বলা হয়, ইরানের শাহ এর যমজ বোন প্রিন্সেস আশরাফ পাহলভি ইরানের শাহ এর পক্ষে উপরোক্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তিনি ইতোমধ্যে পিকিং ও মস্কো সফর শেষে ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হবেন এবং 'পূর্ববঙ্গে'র সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কথা বলবেন বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ফরাসী বামপন্থী রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, মুক্তিযোদ্ধা, জেনারেল দ্যা গলের মন্ত্রী সভার সদস্য ৬৯ বছর বয়স্ক আন্দ্রে মালরো এর এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশিত হয়। 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংল্যান্ডের স্কারবারাতে অনুষ্ঠিত লিবারেল পার্টির সম্মেলনে পার্টির নেতা পার্লামেন্ট সদস্য জন পারডো কর্তৃক বাংলাদেশ সংগ্রামকে সমর্থন করে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় "অপারেশ ওমেগা" কর্তৃক পীস টিমের বাংলাদেশে প্রবেশকালে গ্রেফতারকৃত সদস্যদের মুক্তির খবর পরিবেশন করা হয়।

২০ সেপ্টেম্বর 'মর্নিং স্টার' পত্রিকায় ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে লন্ডনের ওভাল ক্রিকেট ময়দানে আয়োজিত পপ উৎসবের খবর প্রচারিত হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস্ হিউমের হাউস অব কমনসে ভাষণের বরাত দিয়ে একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পাকিস্তানেও বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিদাবি করার খবর পরিবেশিত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিলর অধিবেশনে উপরোক্ত দাবি উত্থাপন করা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় মস্কো সংবাদদাতা ডেভিড বোনাভিয়া প্রেরিত ইন্দিরা-কোসিগিন বৈঠকের বিবরণ প্রকাশ করা হয়। ক্রেমলিন প্রসাদের সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় বক্তৃতায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বলেন, পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের পরিচালিত নৃশংস কর্মকাণ্ড কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। তিনি পূর্ববঙ্গের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমুন্নত রেখে অবিলম্বে পূর্ববঙ্গের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পূর্বের দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের বক্তৃতার উল্লেখ করে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যে, "... It would enter fresh negotiations in a very different mood from that of last march. At the same time Shaikh Mujib must be associated in freedom with such negotiations. Of course an acknowledgement of these necessities would reopen the question of future relations of East and West Pakistan. That can not be evated...."

অক্টোবর, ১৯৭১ ঃ

'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা ১ অক্টোবরের সংখ্যায় ডেভিড লোশাক প্রেরিত এক সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের পরিচালিত চোরাগুপ্তা আক্রমণের বিবরণ দিয়ে বলা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধারা আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সের তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করছে। ২ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পাকিস্তানে সৃষ্ট সমস্যার অবসান না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলো প্যারিসে 'এইড পাকিস্তান কনসোরসিয়াম'-এর সভায় পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা অপরিবর্তিত রাখার কথা প্রকাশিত হয়। ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংকের সভার বরাত দিয়ে উপরোক্ত খবর পরিবেশিত হয়। এর ফলে বিশ্ববাসীর কাছে পাকিস্তানের অবস্থা আরো নাজুক হয়।

৪ অক্টোবর 'মর্নিং স্টার' পত্রিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের বিষয় গুরুত্বসহকারে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মস্কো থেকে প্রকাশিত যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি উল্লেখ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের গভীর উপলব্ধির কথা প্রতিফলিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার যুক্ত বিবৃতিকে অভিনন্দন জানান বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

৬ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান' বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত শরণার্থীদের করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। ৮ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ত্রাণকার্য পরিচালনাকালে 'অপারেশন ওমেগা' এর আরো দু'জন কর্মীকে গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়। ৮ অক্টোবরে "ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকায় অপর খবরে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আগমনের হার পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হয়।

১০ অক্টোবর 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকা পাকিস্তান হাই কমিশনের একটি গোপন দলিলের ফ্যাক্সিমিলি প্রকাশ করে। জনৈক বাঙালি আবদুল হাই 'পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্ট' এর নামে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পাকিস্তান হাই কমিশন যে তাকে অর্থ দিচ্ছে তা উক্ত গোপন দলিল থেকে প্রমাণিত হয়। ১৫ অক্টোবর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর পাকিস্তানপন্থী হিসাবে পরিচিত আবদুল মোনেম খানকে হত্যার খবর প্রকাশ করে। সংবাদদাতা ডেভিড লোশাক প্রেরিত খবরে জানা যায়, দু'জন গেরিলা মোনেম খানের বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে অতর্কিতে গুলি করে হত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এবং 'অক্সফাম' এর উদ্যোগে ১৯ অক্টোবর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের শরণার্থীদের করুণ অবস্থার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনে দুর্গতদের সাহায্য ছাড়াও 'পূর্ববঙ্গ'র রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সকল মহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়। বিজ্ঞাপনে একটি কুপন ছাপানো হয় এবং বাংলাদেশকে সমর্থনের নিদর্শন হিসাবে এই কুপন পূরণ করে নিজ নিজ এলাকার সংসদ সদস্যদের কাছে প্রেরণের জন্য পাঠকদের অনুরোধ জানানো হয়।

২১ অক্টোবর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর চারদিন ব্যাপী ভারত সফরের পর প্রেসিডেন্ট টিটো ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের সমস্যা সমাধানে আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করা হয়। ২৫ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ভারতে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরের পূর্বে বেতার ভাষণের বরাত দিয়ে এক সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ পরিস্থিতি ও শরণার্থী সমস্যা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যার ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়।

২৫ অক্টোবর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পিটার হেজেলহার্স্ট প্রেরিত সংবাদ নিবন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর তিন সপ্তাহ ব্যাপী বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী এবং আমেরিকা সফরের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

২৬ অক্টোবর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মার্টিন ওল্লকোট এর ঢাকা থেকে প্রেরিত একটি বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ "Waiting for the war to start" শিরোণামে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি যুদ্ধ অবিসম্ভাবী উল্লেখ করে নিবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করা হয় যে, "There is less optimism about the aboidance of war in the longer term with many believing that ultimately only conventional military fight can bring a permanent solution."

২৮ অক্টোবর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন-এর ভারত সফর শেষে দু'দেশের প্রতিনিধিদের প্রদত্ত যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ৯ নং ধারায় ভারত বা সোভিয়েট ইউনিয়ন তৃতীয় দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে উভয় দেশ পরস্পরকে সামরিক সাহায্য দানের যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত আছে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র উপমহাদেশে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে যার পরিণতি একটি অবিসম্ভাবী যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

২৯ অক্টোবর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় পাক-ভারত উপমহাদেশে উত্তেজনাময় পরিবেশ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর যুক্তি সমর্থন করে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে মিসেস গান্ধীর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে 'পূর্ববঙ্গ' থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে শরণার্থীদের তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেই কেবলমাত্র উপমহাদেশে সৃষ্ট উত্তেজনা নিরসন সম্ভব। ৯০ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়ে ভারত যে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে রয়েছে তাও নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়। ইয়াহিয়া খান মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে 'পূর্ববঙ্গে' যে অকার্যকর পুতুল বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার কঠিন সমালোচনা করা হয়।

৩০ অক্টোবর 'দি ইকোনোমিস্ট' এবং 'দি টাইমস্' পত্রিকা ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডন সফরের উপর খবর ও বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করে। "দি ইকোনোমিস্ট" পত্রিকায় বিশ্লেষণে মন্তব্য করা হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিন সপ্তাহ ব্যাপী পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সফর করে সরকার প্রধানদেরকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী সমস্যা এবং 'পূর্ববঙ্গে'র সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে শেখ মুজিবকে মুক্তিসহ 'পূর্ববঙ্গ' থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের জন্য পাকিস্তানকে চাপ সৃষ্টি লক্ষ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। 'দি টাইমস্' পত্রিকায় এক খবরে 'রয়াল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স' এর সদস্যদের উদ্দেশ্য মিসেস গান্ধীর বক্তব্যে 'পূর্ববঙ্গের' সমস্যার সমাধান একমাত্র 'পূর্ববঙ্গে'র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করতে পারেন বলে মন্তব্য করেন। আর তা করতে হলে শেখ মুজিবের মুক্তি অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৩১ অক্টোবর 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত আক্রমণ এবং প্রতিরোধের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'দি অবজারভার' পত্রিকায় একই দিনে সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের আলোচনার সংবাদ প্রকাশিত হয়। মিসেস গান্ধী উপরোক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং উপমহাদেশের সংকটে ভারতের নীতির প্রতি বৃটেনের সমর্থন কামনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর, ১৯৭১ ঃ

১ নভেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর সম্মানে ইন্ডিয়া লীগ আয়োজিত সভায় তাঁর বক্তৃতার বরাত দিয়ে বলা হয় যে, ৯০ লক্ষ শরণার্থী রক্ষণাবেক্ষণ ও সীমান্ত পরিস্থিতি এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মিসেস গান্ধী এই অবস্থাকে আগ্নেয়গিরির সাথে তুলনা করে বলেন যে, তার বিস্ফোরণ যে কোন সময় ঘটতে পারে। 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় একই দিনে ডেভিড লোশাক প্রেরিত এক সংবাদ সমীক্ষায় একের পর এক পাকিস্তান সরকারের হঠকারি সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান যে একটি চরম সংকটে নিপতিত হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

৩ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ঢাকা থেকে মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ কর্তৃক প্রেরিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ও আক্রমণের ফলে পাকিস্তানী ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ৪ নভেম্বর একই পত্রিকায় ঢাকা থেকে প্রেরিত খবরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪টি ইউনিটের মধ্যে ৩টি ইউনিট বিধ্বস্থ হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ইউনিফরম পরিধান করে ছদ্মবেশে এই দুর্দান্ত আক্রমণ পরিচালনা করে। এই খবরে প্রবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'দি টাইমস্' পত্রিকায় ৮ নভেম্বর তারিখে উপমহাদেশে উত্তেজনা এবং মিসেস গান্ধী ও মিঃ ভুট্টোর আন্তর্জাতিক সফরের মূল্যায়ন করে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

৯ নভেম্বর ' দি গার্ডিয়ান' উপমহাদেশে সৃষ্ট ঘটনা প্রবাহ ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

৯ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী আগ্রাসনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, ইয়াহিয়া খান আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। তাই ইয়াহিয়া খানের উচিৎ শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তার সাথে একটি রাজনৈতিক সমাধানের নতুন প্রচেষ্টা চালানো। 'পূর্ববঙ্গে' প্রতিনিয়ত যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে তাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য পাকিস্তান হয়তো কাশ্মীর সমস্যাকে সামনে এনে সেই ফ্রন্টে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু তার সম্ভাবনা ও ক্ষীন হয়ে গেছে মি. ভুট্টোর ব্যর্থ চীন সফরের পর। রক্ষণশীল পত্রিকা নামে পরিচিত 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' তাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে ভবিষ্যতবাণী করেছিল তার যথার্থতা প্রমাণিত হলো ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। ভারত ও পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ ঘোষণা করলে পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীর বা পাঞ্জাব ফ্রন্টে যুদ্ধ সম্প্রসার করা সম্ভব হয় নাই।

১১ নভেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পূর্বাভাস হিসাবে নোয়াখালী জেলার বেলুনিয়া এলাকায় সীমান্ত যুদ্ধে ১০২ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে বলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দাবির খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয় যে, উভয় সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তান সৈন্য সমাবেশ জোরদার করছে এবং যে কোন সময় পূর্ণ যুদ্ধ ঘোষণা হতে পারে। ১২ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতা ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রেরিত খবরে ঢাকার জি. পি. ও.-এর কাছে মুক্তিযোদ্ধারা একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হতাহত ও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে বলে প্রকাশিত হয়।

১৩ নভেম্বর 'দি ডেইল টেলিগ্রাফ' তাদের প্রতিনিধি মিস্ ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রেরিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ইয়াহিয়া খান ''পূর্ব পাকিস্তান''কে টিকিয়ে রাখতে সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে ''পূর্ব পাকিস্তানে'' ১২ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

১৪ নভেম্বর 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ঢাকা থেকে প্রেরিত এক সংবাদ বিবরণীতে জানা যায়, 'পূর্ববঙ্গে' সফররত জাতিসংঘের এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল মার্ক হেনরী তার সফর সংক্ষিপ্ত করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সেক্রেটারী জেনারেল উ. থান্টকে জানানোর জন্য নিউইয়র্ক ফিরে গিয়েছেন। একই দিন (১৪ নভেম্বর) 'দি অবজারভার' পত্রিকায় ঢাকা থেকে প্রেরিত খবরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

১৫ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর বিশেষ সংবাদদাতা মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব থাকলেও তাদের মনোবল শক্ত এবং তাদের মধ্যে মাতৃভূমি স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয়, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই খবরে প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযোদ্ধারা স্থল ও জলপথে চতুর্মুখী আক্রমণের জন্য শক্তি অর্জন করে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

১৫ নভেম্বর 'দি টাইমস্'-এর সংবাদদাতা পিটার হেজেলহার্স্ট ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের সম্ভাবনার বিষয় একটি বিশ্লেষণ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৬ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় শিকারপুর সীমান্তে খণ্ডযুদ্ধে ১৩৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য হত্যার ভারতীয় খবর প্রকাশিত হয়। ১৮ নভেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দর্শনা শহর

Dhaka University Institutional Repository

দখরের সংবাদ প্রকাশিত হয়। একই দিনে 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের নেতা পাকিস্তান কারাগারে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এড়ান সম্ভব বলে মন্তব্য করা হয়।

২২ নভেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় যশোরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক ভয়াবহ যুদ্ধে ৯০ জন ভারতীয় সৈন্য হত্যা এবং সাতটি ট্যাংক ধ্বংস করার পাকিস্তান রেডিও-এর দাবির বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ, ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে মুখামুখি সংঘর্ষে প্রতিপক্ষ ঘায়েল করার পরস্পর বিরোধী দাবি কয়েকদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

২৪ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' সহ বিলাতে বিভিন্ন পত্রিকায় ইয়াহিয়া কর্তৃক পাকিস্তানের জরুরী অবস্থা ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। ২৪ নভেম্বর তারিখে বিলাতের প্রায় প্রত্যেকটি পত্র পত্রিকায় পা-ভারত যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও শেখ মুজিবের মুক্তিদান ব্যতিরেকে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হবে না। 'দি টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের দু'অংশকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয় এবং বলা হয় যে, ভারত আর ধৈর্য ধরবে বলে মনে হয় না।

২৭ নভেম্বর 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস্' পত্রিকায় বাংলাদেশ নামক একটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র শীঘ্র জন্ম নিবে বলে মন্তব্য করা হয়।

২৯ নভেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় জাতিসংঘের শান্তি পরিষদে বেলজিয়াম কর্তৃক উত্থাপিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য উল্লেখ করে বলা হয় যে, উপমহাদেশের জটিল সমস্যা শান্তি পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হবে না। এ মাসের শেষ সপ্তাহের পত্রিকায় ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ এবং সাফল্যের পরস্পরবিরোধী দাবি সম্পর্কিত খন্ডরা খবর প্রচারিত হয়।

২৯ নভেম্বর 'দি ডেইল টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় এসোসিয়েটেড প্রেসের বরাত দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক কর্তৃপক্ষ 'পূর্ববঙ্গে' মুক্তিযোদ্ধারা যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করছে তার তথ্য প্রকাশের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনে 'পূর্ববঙ্গে'র গেরিল তৎপরতা ভিয়েতনামের গণযুদ্ধের সাথে তুলনা করাও ভুল হবে বলে প্রতিবেদক মন্তব্য করেন।

৩০ নভেম্বর 'ফাইনানসিয়াল টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পত্র দিয়েছেন। মূল সমস্যা সমাধানের কোন প্রস্তাব উল্লেখিত চিঠিতে না থাকায় ভারতের মুখপাত্র প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পত্র সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

৩০ নভেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় সংবাদদাতা ডেভিড হাউসগো কর্তৃক রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর একটি জাতীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে আলোচনার জন্য 'পূর্ববঙ্গে'র মুসলিম লীগ নেতা নূরুল আমীনকে আহবান জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এ সংক্রান্ত বিষয়ে পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথেও কথা বলেছেন বলে প্রতিবেদনে জানা যায়। 'পূর্ববঙ্গে'র যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারকে আরো কঠোর এবং পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছেন নূরুল আমীন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'পূর্ববঙ্গে' অনুষ্ঠিত প্রহসনের উপ-নির্বাচনে তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ২৭ ডিসেম্বর আহুত সংসদ অধিবেশনের মুখ দেখেন নি এবং নূরুল আমীন কয়েকদিনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য যে পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছিলেন তাঁর আর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি। নূরুল আমীনের কবর পাকিস্তানের মাটিতে স্থান পেয়েছে।

ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঃ

১ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩০ নভেম্বরের রাজ্য পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নাই বলে তিনি সরকারের মনোভাবের কথা উল্লেখ করেন। মিসেস গান্ধী আরো বলেন, পাকিস্তান যদি শান্তির পক্ষে হয় তা হলে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। ঐ রাতেই এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে 'পূর্ববঙ্গে' প্রবেশ করে পাকিস্তান সেনা বাহিনীকে মোকাবেলা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

১ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ম্যালকম ডীন কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কর্মতৎপরতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, প্রতিনিধি দল প্রায় ২০০ টি দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাস্তবতা এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২ ডিসেম্বর জাতিসংঘ থেকে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা ম্যালকম ডীন প্রেরিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী বলেন, মার্চ মাসে যখন ইয়াহিয়া খান 'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যা পরিচালনা করছিল তখন জাতিসংঘ ঐ জঘন্য অপরাধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপা বলে কোন আমলে আনেনি। আর এখন যখন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভ করছে তখন জাতিসংঘের পক্ষে পূর্বের মতো নিষ্ক্রিয় থাকাই উচিত। তিনি বিবৃতিতে আরো বলেন, বাংলাদেশ অতি শীঘ্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং অনেক দেশের স্বীকৃতি লাভ করবে। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই চূড়ান্ত বিজয়ের সময়ে জাতিসংঘের কোন পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানের জন্য জাতিসংঘে অবস্থান করছিলেন।

৩ ডিসেম্বর 'দি টাইমস' পত্রিকায় "India's tacties in East Pakistan" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে বলা হয় যে, ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ভার বহন করতে ভারত যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম ক্ষতির ঝুকি নিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করে শরণার্থীদের তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারলে উপমহাদেশে শান্তি ফিরে আসবে। একই দিনে 'দি টাইমস্' পত্রিকায় কলকাতা থেকে সাইমন ড্রিংগ পরিবেশিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং না থাকায় পাকিস্তানী নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছেনা এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক সীমান্ত এলাকায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের খবরও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

৪ ডিসেম্বর বিলাতের সকল পত্রিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ প্রদান করেন তার বিবরণ প্রকাশিত হয়। মিসেস গান্ধী বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। ৪ ডিসেম্বর 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' দাবি সম্বলিত একটি খবর প্রকাশিত হয়। মিঃ ভুট্টো এক জনসভায় ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা ত্যাগ করে তাঁর কাছে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি করেন।

৫ ডিসেম্বর 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় এনথনি মাসকারেনহাস "Why they went to war" শিরোনামে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলোর দীর্ঘ দিনের নীরবতা এবং ভারতে শরণার্থী প্রবেশের ফলে সৃষ্ট কি পরিমাণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ প্রয়োজন হলো তার বিশ্লেষণ করে ভারতে পক্ষে এছাড়া যে কোন বিকল্প ছিল না তা প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়। একই দিনে 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় "Stop the slaughter" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে রক্তপাত বন্ধ করার উপর গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, এখনও যদি পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তাঁর দাবি মেনে পূর্ববঙ্গে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করা হয় তাহলে রক্তপাত বন্ধ হতে পারে।

৬ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় ভারতের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ' হিসাবে আক্ষায়িত করে যুদ্ধ বিরতির জন্য একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপন করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে ১১টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পোলান্ড প্রস্তাবের বিপক্ষে এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ভোট দানে বিরত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব পরিশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভিটো' প্রয়োগের ফলে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ৬ ডিসেম্বরে 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ব্যাপকতা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে। যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মার্কিন সেক্রেটারী অফ স্টেট উইলিয়াম রজার্স বিদেশ সফর বাতিল করেন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. হেনরি কিসিংগারের নেতৃত্বে একটি এ্যাকশন গ্রুপ সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি মনিটরিং করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

৭ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' 'দি গার্ডিয়ান' এবং 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' সহ সকল পত্র পত্রিকায় ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের খবর ব্যানার শিরোণামে প্রকাশিত হয়। ৭ ডিসেম্বর বিলাতের সকল পত্র-পত্রিকায় এই দিনটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিহ্নিত করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

৭ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "The deadlock at the UN" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তীব্র সমালোচনা করা হয়। একই দিন 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে বলা হয় যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অচিরেই রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভারতকে অনুসরণ করবে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং পূর্ণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের যুদ্ধের খবর বিলাতের সকল পত্রিকায় প্রাধান্য পায়। ৮ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা লরেন্স ষ্টার্ন প্রেরিত খবর "India makes sweeping gains on the road to Dacca"

Dhaka University Institutional Repository

শিরোণামে যুদ্ধে ভারতের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত বাহিনীর সাফল্যের বিবরণ প্রকাশ করে। একই দিনে সায়মন ড্রিংগ কর্তৃক কলিকাতা থেকে প্রেরিত খবর "Pakistanis in fight to save escape route" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ৯ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকা "Pakistanis falling back on port of Khulna after abandoning Jessore without major battle" শিরোণামে যশোর থেকে হেনরি ষ্টেনহোপ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ পরিবেশন করে।

৯ ডিসেম্বর 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস'-এ প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেষ রক্ষায় পদক্ষেপ হিসাবে 'পূর্ববঙ্গ' মুসলিম লীগের নেতা নূরুল আমীনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ করে একটি 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করেছেন। নিয়োগ লাভের পর জাতিসংঘে পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্য মি, ভূট্টো নিউইয়র্ক গমন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই মন্ত্রী সভা এক সপ্তাহও পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থন হয় নি।

৯ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব এবং ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত ৭ ডিসেম্বর রাতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ও পরস্পরের সৈন্য প্রত্যাহারের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ১০৪ টি দেশ, বিপক্ষে ১১ টি দেশ এবং বৃটেন ও ফ্রান্সসহ ১০ টি দেশ ভোট দান থেকে বিরত থাকে। প্রস্তাবে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় উল্লেখ থাকায় পাকিস্তানের জন্য কিছুটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। ভারত এই প্রস্তাব আমলে না নিয়ে দিল্লীতে সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পাকিস্তান যদি পূর্ববঙ্গে' আত্মসমর্থন করে তাহলে অন্যান্য সেক্টরে যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে ভারত বিবেচনা করতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

১০ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "Rout of Pakistanis in East reported as ring tightens around Dacca" শিরোণামে একটি সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। খবরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রযাত্রা এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পরাজয় ও প্রত্যাহারের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। 'দি টাইমস্' পত্রিকায় একই দিনে "The chess Board of strategy" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই নিবন্ধে পাকিস্তানের রণনীতিতে এবং বাস্তব ভৌগলিক অবস্থানে তাদের পক্ষে যে কোনো সাফল্য অর্জন সম্ভব নয় তা মন্তব্য করা হয়।

১২ ডিসেম্বর 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ প্রেরিত খবর "Yahya Khan vetoes plan to surrender" শিরোণামে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ. এম. মালেকের আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, 'পূর্ব পাকিস্তান' এর বেসামরিক গভর্নর ডাঃ এ. এম. মালেক পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি মেজর জেনারেল ফরমান আলীর মাধ্যমে জাতিসংঘের ঢাকাস্থ প্রতিনিধির কাছে শর্ত সাপেক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যা করেন। প্রস্তাবে যে শর্তসমূহ উল্লেখ করা হয় তা হলো (১) ভারতের সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ; (২) বাংলাদেশের গেরিলাদের সাথে কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনা হবে না; (৩) সকল পাকিস্তানী বেসামরিক নাগরিককে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা প্রদান; (৪) পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ফেরত প্রেরণ এবং (৫) নির্বাচিত আওয়ামীলীগের সদস্যদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। উল্লেখিত খবর প্রকাশের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে সকল সংশ্লিষ্ট মহলের স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়। ১২ ডিসেম্বর 'দি সানডে টাইমস্' পত্রিকায় "Pakistan gamble that failed. The war of the 700 million." শিরোণামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে বাংলাদেশ সমস্যা শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং চতুর্থ ও চূড়ান্ত পর্যায় কিভাবে কম রক্তপাতের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং তাদের প্রত্যাবর্তন সহজ করা যায় তা নিয়ে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। একই দিনে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি অবজারভার' গেভীন ইয়ং প্রেরিত "Dacca Dairy" শিরোণামে গত পাঁচ দিনের ঘটনাবলীর একটি বিবরণ প্রকাশ করে। বিবরণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অব্যাহত পরাজয় ও প্রত্যাহার এবং মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১৩ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকা Guerrillas said to be fighting demoralised troops inside Dacca" শিরোণামে: 'দি গার্ডিয়ান" পত্রিকায় "Dacca counts the hours to destruction" শিরোণামে; 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা "Independent Bangladesh Government takes over in Jessore" শিরোণামে এবং লন্ডনের বৈকালিক 'দি ইভিনিং ষ্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা "Bitter fighting rages in Dacca" শিরোণামে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিটি প্রতিবেদনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর করুণ অবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'যৌথ বাহিনীর' আক্রমণের সাফল্যের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "Is there a way to peace?" শিরোনামে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে এখন বাস্তব বিবেচনা করে উপমহাদেশে কিভাবে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার বিশ্লেষণ করে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়-

Dhaka University Institutional Repository

"Even more urgent is the need to bring peace in East Bengal among people who this year already have twice been divided in vendettas. Bengali Muslims killed Biharies and Punjabis; then the tables were turned and Bengalis suffered at the hands of the non Bengalis. As power passes once again how many more bodies will be hacked to pieces in the impersonal hatreds governed by nothing but a religious or regional or supposedly ethnic otherness? Sheikh Mujib alone might have the authority to arrest the blood shed."

১৪ ডিসেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ঢাকা থেকে তাদের সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে জানা যায়, ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন ঢাকার তিন দিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত তখন 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর সামরিক প্রশাসক জেনারেল নিয়াজী ভারত কর্তৃক আত্মসমর্পণের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে ঢাকার পতন রোধে পাকিস্তানের প্রতিটি সৈন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত বলে বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় সময় মন্তব্য করেন। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্র রাওয়ালপিণ্ডি থেকে জাতিসংঘের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রদানের কথাও অস্বীকার করে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তৃতীয় বার ও সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভিটো' প্রয়োগ করে এবং ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের যে কোন প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভিটো' প্রয়োগ করবে।

১৫ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় "Dacca leaders resign and seek asylum as Indians launch final assault on city" শিরোণামে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বেসামরিক সরকার প্রধান গভর্ণর ডাঃ এ. এম. মালেক ও তার মন্ত্রসভার পদত্যাগ এবং রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে জুলিয়ান কার প্রেরিত এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, গভর্নর ডাঃ মালেকের পদত্যাগের পর ঢাকার পরিবর্তী সকল দায়-দায়িত্ব সামরিক কমান্ডার মেজর জেনারেল এ. কে. নিয়াজির উপর ন্যস্ত হয়েছে। জেনারেল নিয়াজি অবশ্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বলেও খবরে উল্লেখ করা হয়। 'দি টাইমস্' ছাড়াও বিলাতে সকল পত্র পত্রিকা একই ধরণের খবর পরিবেশন করে। একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা "The End in Dacca" শিরোণামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে জেনারেল নিয়াজির একগুঁয়েমির ফলে সম্ভাব্য চরম অবস্থার জন্য কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং বাস্তবকে মেনে নিয়ে আত্ম-সমর্পণের পরামর্শ দেয়া হয়।

১৬ ডিসেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় "Pakistan ready to accept truce without terms" শিরোণামে যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ করার সম্ভাবনার খবর পরিবেশিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "The first doves emerge" শিরোণামে বাংলাদেশের জন্মের বাস্তবতা মেনে নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাগিদ দেয়া হয়। 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় একই দিনে "Bangladesh Now" শিরোণামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অভিনন্দন জানিয়ে সকল মহলকে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার আহবান জানান হয়।

১৭ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্'; 'দি গার্ডিয়ান' এবং 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' সহ সকল পত্র পত্রিকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের ছবি সহ খবর পরিবেশন করে। এর মাধ্যমে নয় মাস দীর্ঘ বাংলাদেশ সমস্যার অবসান এবং একটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের নবযাত্রাকে স্বাগত জানিয়ে প্রায় সকল পত্র পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় "Pakistans way forward" শিরোণামে এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, "West Pakistan now needs stable Government and common sense: not generals feathering their army nests by keeping the land for ever in the grip of martial law." সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের পুর্নগঠন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয় যে, "Bangladesh, a separate entity, has a morass of challenges all its own ... It is a long road to travel, especially with Mujib still in prison and blood shed barely staunched. But the road exists and it is worth travelling" ১৭ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় অপর এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ যুদ্ধের অবসান হওয়ায় সকলে স্বস্তি অনুভব করবে। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে যত দ্রুত তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এবং যত দ্রুত ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করা হবে বাংলাদেশের জন্য তথা উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ততোই মঙ্গল হবে বলে সম্পাদকীয় নিবন্ধে আশা প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন ঃ

"বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিলাতের পত্র-পত্রিকা সমূহ বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও সাহসী ভূমিকা পালন করে বিলাতে প্রবাসীদের এবং বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের যে পরিমাণ সাহস, প্রেরণা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে তা বাংলাদেশে জনগণ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। যে সকল সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন লিখেছেন তাদের কাছেও জাতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।"[২]

টীকা ঃ

১। সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম।

২। সাক্ষাৎকারে ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭।

২। তাজুল মোহাম্মদ, 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ', সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১, ঢাকা।

৩। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫ সহ গ্রন্থপুঞ্জিতে উল্লেখিত বই সমূহ।

৪। শেখ আব্দুল মন্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮।

৬। মাসুদা ভাট্টি, 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃটিশ দলিলপত্র', জ্যোৎস্না পাবলিসার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩।

৭। নূরুল ইসলাম, 'প্রবাসীর কথা', প্রবাসী পাবলিকেশন্‌স, সিলেট, বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

৮। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, ১৯৯৭।

৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্দশ খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুণমুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩১৭-৫৪৯।

৪.৫ বৃটিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, বেসরকারী সংস্থা, সামাজিক ও মানবতাবাদী সংগঠনের ভূমিকা ঃ

মুক্তিযুদ্ধকালে বিলাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিক, বেসরকারী সংস্থা, সামাজিক ও মানবতাবাদী সংগঠনের কর্ণধরবৃন্দ ভূমিকা ও সমর্থন বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্রিটিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে লর্ড ব্রুকওয়ে, ডোনাল্ড চেস্‌ওয়ার্থ, লর্ড গিফোর্ড, লেডী গিফোর্ড, জন এ্যানালস, 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর পল কনেট, ম্যারিয়াটা প্রকোপে, মিসেস আইলীন কনেট, ইয়ং লিবারেলের চেয়ারম্যান পিটার হেইন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন (ULU)-এর সভাপতি ফিলিপ ক্লার্ক, অক্সফামের ডাইরেক্টর লেজলী কার্কলী, 'কমিটি ফর ক্রিশ্চিয়ান এ্যাকশন'-এর চেয়ারম্যান ক্যানন কলিন্স এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখিত সাংবাদিকবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে ৪ এপ্রিল উত্তর লন্ডনের হ্যামস্টেড হলে 'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যার প্রতিবাদে ব্রিটিশ নাগরিক ও প্রবাসী বাঙালিদের যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক দলের প্রভাবশালী নেতা জন এ্যানাল্‌স। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে 'পূর্ববঙ্গে' পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলা ও গণহত্যার নিন্দা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন লর্ড ব্রুকওয়ে। জন এ্যানাল্‌স ও লর্ড ব্রুকওয়ে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে শুরু থেকে সম্পৃক্ত হন এবং বিভিন্ন সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রেখে বাঙালিদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।[২]

'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য প্রবাসী বাঙালিদের একজন আপনজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'পূর্ববঙ্গ' থেকে ভারতে আগত শরণার্থীদের সাহায্য প্রেরণ এবং তাদের দুর্দশা নিজের চোখে দেখার জন্য কয়েকবার কলকাতা সফর করেন। কলকাতা সফরে গিয়ে তিনি মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাথে বহু জনসভায় বক্তব্য রেখে তিনি প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মি. চেসওয়ার্থ স্টিয়ারিং কমিটির কর্মকান্ডে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতবেক যে 'বাংলাদেশ ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় তার ট্রাস্টিবোর্ডের তিনি একজন সদস্য ছিলেন। তিনি 'বাংলাদেশ দূতাবাস' স্থাপনের জন্য ২৪ নং পেমব্রীজ গার্ডেনের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের (যার তিনি ওয়ার্ডেন ছিলেন) গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামমাত্র ভাড়ায় কামরার ব্যবস্থা করে দিয়ে লন্ডনে দূতাবাস প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ যুবনেতাদের মধ্যে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর পল কনেট, মিস ম্যারিয়াটা প্রকোপে ও মিসেস আইলীন কনেটসহ বহু নিবেদিত প্রাণ যুব নেতৃবৃন্দ। মুক্তিযুদ্ধ চলা সময়ে বিলাতের বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ছাড়াও পল কনেটের নেতৃত্বে 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে বিলাতে ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখেন। তাদের গৃহিত কর্মসূচীর মধ্যে ১ আগস্ট ট্রাফেলগার স্কোয়ারে বিশাল গণসমাবেশ, মার্কিন দূতাবাসের সামনের রাস্তায় 'হত্যা অভিনয়', পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও বিবৃতি প্রকাশ, 'ওপারেশন ওমেগা'-এর উদ্যোগে 'পীস টীম'-এর বাংলাদেশে সাহায্য-সামগ্রী প্রেরণ এবং মিসেস আইলীন কনেট সহ তাঁদের স্বেচ্ছাসেবকাদেরকে পূর্ববঙ্গ সীমান্তে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার ও কারাবরণ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিশ্ব জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে পল কনেট 'এ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রচারপত্র, লিফলেট ও পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করেছেন।[৪]

লর্ড গিফোর্ড এবং লেডী গিফোর্ড মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনে বাঙালিদের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হন। ৪ এপ্রিল উত্তর লন্ডনের 'হ্যাম্পস্টেড টাউন হলে' 'পূর্ববঙ্গে' গণহত্যার প্রতিবাদে এক গণসমাবেশে লর্ড গিফোর্ড বাংলাদেশকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখে বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। লেডী গিফোর্ডও উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। এরপর বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় লর্ড গিফোর্ড ও লেডী গিফোর্ড বাংলাদেশকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখে, বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করে বিলাতে বাংলাদেশ আন্দোলনকে শক্তিশালী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।[৫]

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃন্দ (১০ মে, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য ব্রিটেনের শ্রমিক ও বিভিন্ন প্রগতিশীল শক্তির প্রতি আহবান জানান।

ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলের যুব প্রতিষ্ঠান 'ইয়াং লিবারেলস্' (১২ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত এক পত্রে তাঁরা বলেন, ইয়াহিয়া খান হাজার হাজার নিরপরাধ বাঙালিকে হত্যা করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করেন। ১৩ অক্টোবর 'দি মর্নিং স্টার'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৬]

'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত (১৬ ডিসেম্বর) এক পত্রে বাংলাদেশ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক লর্ড ব্রকওয়ে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব নেই; এই সত্য ইয়াহিয়া খানকে মেনে নিতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বাংলাদেশের নেতা মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া তাঁর পক্ষে অবশ্যকর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।[৭]

এছাড়া, বৃটিশ নাগরিক প্রতিষ্ঠিত কমিটিসমূহ ঃ জাস্টিস ফর ইস্ট পাকিস্তান, এইড টু বাংলাদেশ, কার্ডিফ ওয়েলস, কমিটি ফর দ্যা ক্রিশ্চিয়ান এ্যাকশন, ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ; যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাঃ অক্সফাম, থার্ড ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট, সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, দ্যা সোসালিস্ট লীগ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস, সেভ দ্যা চিলড্রেন, মুভমেন্ট ফর কলোনিয়াল ফ্রিডম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[৮]

যুক্তরাজ্যস্থ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী ঃ

বিলাতের সংবাদপত্রগুলো বরাবরই 'পূর্ববঙ্গের' জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষ সমর্থন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে অনুপ্রাণিত করেছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ইতিবাচক ভূমিকার জন্য বিলাতের এবং সারা বিশ্বের জনমত বাংলাদেশের পক্ষে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই সকল পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ' থেকে বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে বিশাল অবদান রেখেছেন। বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে বৃটেনের পত্র-পত্রিকা এবং তাদের সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা এ গবেষণাপত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও যে কয়েকজন স্বনামধন্য সাংবাদিকদেন নাম উল্লেখ না করলে কৃপণতা করা হবে। তাঁরা হলেন 'দি সানডে টাইমস'-এর এ্যান্থনী মাসকারেনহাস, ডেভিড হোল্ডেন, কলিন স্মীথ, নিকোলাস টমালিন, মুরে সায়েল; 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সায়মন ড্রিংগ (পরবর্তিতে দি টাইমস), ডেভিড লোশাক, মিস ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, কেনেথ ক্লার্ক; 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার পিটার প্রেসটন (সম্পাদক), মার্টিন এ্যাডনি, মার্টিন ওলাকোট, সায়মন উইনচেস্টার, লরেন্স স্টার্ন; 'দি টাইমস' পত্রিকার পিটার হেজেলহার্স্ট; 'এসোসিয়েটেড প্রেস'-এর ডেনিস নিল্ড ও ফটো সাংবাদিক মাইকেল লরেন্স; 'দি অবজারভার' পত্রিকার কলিন স্মীথ এবং বি, বি, সি বাংলা বিভাগের সিরাজুর রহমান, শ্যামল লোধ ও কমলবোস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', তথ্য মন্ত্রণালয়, পুণমুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৬।
২। ঐ, পৃষ্ঠা-১১০।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-১১১, ১২৬।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-১১৬, ১২৬, ১৪৪-১৪৬, ১৯৬।
৫। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান', পৃষ্ঠা-১৮৮।
৬। আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-৫৬, ১৩৩।
৭। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', তথ্য মন্ত্রণালয়, পুণমুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১১০।
৮। সাক্ষাৎকার সংযোজিত পরিশিষ্ট (i), প্রকাশিত দলিলপত্রাদি সংযোজিত পরিশিষ্ট (ii) ও (ছ) একনজরে সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি সংযুক্ততে উল্লেখিত বই-পুস্তক।
৯। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ত্রয়োদশ খন্ড', তথ্য মন্ত্রণালয়, পুণমুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৫৪।

৪.৬ যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় নাগরিকদের ভূমিকা ঃ

১৯৭১ সালের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসে নানা ধরণের মত প্রচলিত রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ রুপ নিয়েছিল জনযুদ্ধে। সকল প্রকার বাঙালি "যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে" সু-প্রশিক্ষত পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসে 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধী দুই ফ্রন্টেই লড়ে যাচ্ছেন। দেশের ভিতরে 'বাংলাদেশ বিরোধী' লবির সঙ্গে তাঁকে বুঝতে হচ্ছে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁকে তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট রাখতে হচ্ছে। যদিও দেশের ভিতরে ততোটা বিরোধীতার সম্মুখীন তিনি হননি, ভারতের জনসাধারণ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে যেন তাদেরই মুক্তিযুদ্ধ বলে ধরে নিয়ে সব রকম সহযোগিতা অক্ষুন্ন রেখেছে গোটা নয় মাস ধরে। ভারতের রাজনীতিতে পিকিংপন্থীদের বিরোধিতাকে বাদ দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে হোম ফ্রন্টে ইন্দ্রিরা গান্ধী বিরোধী দলের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছেন। এই লক্ষ্যে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের পক্ষে রায় দিয়েছে বিরোধী দল। বরং পার্লামেন্টে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কেন আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে পারছে না সে জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন; কেন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সাহায্য করছেন সে প্রশ্নের মুখোমুখি তাঁকে কখনও হতে হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি তখন ভারতের জাতীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌছানোই গণতান্ত্রিক রীতি, গণতান্ত্রিক ভারতে তাই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব লাভের আন্দোলনকে খুব বড় কোনও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি। আমলাতান্ত্রিক বাঁধা অবশ্য একবারেই যে ছিল না, তা বলা যাবে না। কিন্তু রাজনৈতিক সহযোগিতার জোয়ারে তা উড়ে গিয়েছিল। হোমফ্রন্টে এই একচ্ছত্র সমর্থন ইন্দ্রিরা গান্ধীর জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জনেও সহায়ক হয়েছিল।

এখানে একথা উল্লেখ করতেই হবে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন করার পেছনে তৎকালীন ভারত সরকারের কোনও দূরভিসন্ধি থাকলে তা ভারতীয় জনগণের সামনে গোপন করা কোনও মতেই সম্ভব হতো না। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারকে নিঃসন্দেহে বড় রকম বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হতো। ১৯৭১ সালে ভারতীয় জনগণের মনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে উদার ও গণসমর্থনের স্রোত ছিল তা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি ভবিষ্যতে আর কখনও তেমনটি ঘটবে বলে আশা করা যায় না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক। কিন্তু এ স্বল্প পরিসরের গবেষণা পত্রে সেটা আলোচনা করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা বিষয় সংশ্লিষ্টও নয় । তথাপি এখানে কিছু বিষয় বিশেষ করে ১৯৭১ সালে লন্ডনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের পুণঃউল্লেখ প্রয়োজন ছিল। ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাজ্য প্রবাসী ভারতীয় নন, যেন বিশ্ব নাগরিকে পরিণত হয়েছিলেন বাংলাদেশের সমর্থনে। তাঁর এ ভূমিকা অত্র গবেষণা পত্রের কয়েকটি অধ্যায় যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা ঃ পটভূমি ঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক জটিল রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং বৃটিশ, ভারতসহ পরাশক্তির অবস্থান, ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের পর বিচারপতি চৌধুরী, প্রসঙ্গ 'দি বার্থ অব বাংলাদেশ', এফাস্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রাণদন্ড রহিত হওয়ার নেপথ্য কথা এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পেক্ষাপট প্রভৃতি শিরোণাম ছাড়াও বিভিন্ন অধ্যায়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয়সহ অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় প্রবাসীদের ভূমিকা যেমন উঠে আসবে তেমনি ভারতের সার্বিক ভূমিকার একটি অংশ এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের কিছু বিশেষ দিক যেমন তাঁর জীবন ও কর্মের সততা, নির্লোভ মানসিকতা, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ়তা ও অবিচল আস্থা, ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর অতুলনীয় হৃদ্যতা, গভীর মমত্ববোধ, ব্যক্তিগত বোঝাপড়া, তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) নেতৃত্বের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও দ্বিধাহীন আকর্ষণ; কোন কালে না দেখেও বিচারপতি চৌধুরীর সাথে যেন বহু কালের পরিচিত স্বজনের মতো সুমিষ্ট ব্যবহার দ্বারা নিঃসন্দেহে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে আন্দোলনের স্পৃহা বাড়িয়ে দিয়েছেন শতগুণ, যে সমস্ত গুণের কারণে তিনি দ্বি-মেরু কেন্দ্রিক বিশ্বকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রায় এক করে ফেলেছিলেন, ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্বময়। আবার বৃটেন মুখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও ভেতরে ভেতরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে কাবু করে ফেলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক জালথেকে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে; অন্তত তৎকালীন পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্রকে অন্তত একটি বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইত্যাদি বিষয় সমুহ ছাড়াও আরো অনেক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বিধায় অত্র পত্রের পরিসর ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য এ বিষয়ে শুধু চুম্বক অংশ এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

এ প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী-চুক্তি সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। অতি সম্প্রতি লন্ডন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশানে কর্মরত শশাঙ্ক এস্. ব্যানার্জী'র লিখিত (1) 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banerjee, Anthem Press, published in U.K. and U.S.A., 2006; (2) ('A Long Journey Together: India, Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banrjee, published in the U.S.A., 2008, ISBN: 9781-4196-9763-0.গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করে তাঁর 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ' গ্রন্থে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই আলোকে এ প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের পর বিচারপতি চৌধুরী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয় ব্যক্তিবর্গের এবং ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩০ মার্চ 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ২৯ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে ভারতীয় পার্লামেন্টের সংহতি ঘোষণার জন্য বিরোধী দলগুলোর দাবি মেনে নেন।

১ এপ্রিল 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা প্রদত্ত এক সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে বিমানযোগে করাচিতে নিয়ে আসা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। তিনি কোথায় ও কিভাবে রয়েছেন সে সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার নীরব থাকার নীতি গ্রহণ করেছে।

একই তারিখে 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহীত এক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সফল হবে বলে আশা করা হয়। মিসেস গান্ধী নিজে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেনঃ

"পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি ভারতীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং তারা সর্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত।"

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির নেত্রী মিসেস অরুণা আসফ আলী মস্কো থেকে ফেরার পথে লন্ডনে আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। 'মুজিবনগর' সরকারের পক্ষে ভারতে ও বিদেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি কয়েকটি ব্রিটিশ ও বাঙালি গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

লন্ডনের রেড লায়ন স্কোয়ারে অবস্থিত কনওয়ে হলে 'লিঙ্ক ফোরাম' গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিসেস আসফ আলী বলেন, ভারতের জনগণ বাংলাদেশের সংগ্রামকে জাতীয় বিপ্লব বলে মনে করে। কারণ, বাংলাদেশের জনগণ একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। দল ও মত নির্বিশেষে ভারতের জনগণ বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে। মস্কো ও বার্লিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ভারত সরকারের নেই। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে নির্যাতন, নরহত্যা ও ধর্ষণ অব্যাহত রয়েছে, এ কথা বিশ্ববাসী জানে না; কিন্তু ভারতবাসীরা তার খবর রাখে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেন নি। তাই তিনি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে পড়েছেন বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। যেখানেই তিনি যাবেন, সেখানেই বাংলাদেশের মর্মবাণী তিনি পৌঁছে দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড ব্রকওয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জন স্টোনহাউস (এম. পি), ব্রুস ডগলাসম্যান (এম. পি), সুরাইয়া খানম (স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি), ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, বি এইচ তালুকদার, পল কনেট (এ্যাকশন বাংলাদেশ) এবং ফরিদ জাফরী (সম্পাদক, বাংলাদেশ নিউজলেটার) বক্তৃতা করেন।

মি. ডগলাসম্যান বলেন, পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সাহায্যদান বন্ধ করার জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে রাজি করাতে হবে।

মি. স্টোনহাউস বলেন, জাতিসংঘের সনদে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত। এই সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি ন্যায়সঙ্গত।

লর্ড ব্রকওয়ে বাংলাদেশের ঘটনাবলি তুলনাহীন বলে উল্লেখ করেন। ইহুদিদের হত্যা করার ফলে তাঁর মনে হিটলারের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল, ঠিক সেই পরিমাণ ঘৃণা তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অনুভব করেন। ব্রিটিশ সরকারসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের সরকার যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তবে পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তানি শাসনকে নিন্দা না করে তাদের কোনো উপায় নেই। শেখ মুজিব এখন কোথায়, তিনি জানতে চান। তাঁর সম্পর্কে কোনো খবর নেই কেন? তাঁর খবর জানার অধিকার সবার রয়েছে।

মে মাসের শেষ দিকে আফগানিস্তানে অবস্থানরত প্রবীণ জননেতা খান আবদুল গাফফার খান বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির খবর তিনি বেতারযোগে পেয়েছেন। এর ফলে বাঙালিদের ওপর ভীতির রাজত্ব কায়েম হয়েছে। তাদের দুর্দশার জন্য তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করেন।

প্রকৃত পরিস্থিতির সংবাদ ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও সীমান্ত প্রদেশের কাইয়ুম খানের মিথ্যা প্রচারণার সমালোচনা করে গাফফার খান বলেন, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়; ক্ষমতা দখল করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। পাঞ্জাবের ধনিক শ্রেণী এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা দখল করেছে। হতভাগ্য বাংলার আর কোনো অপরাধ নেই; তারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, এটাই তাদের অপরাধ। বাঙালিদের সঙ্গে আজ যে খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই একই খেলা পসতুনদের সঙ্গে পাকিস্তান গঠনের সময় অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানি ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাফফার খান বলেন: 'পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সব সময়ে ধর্মের নামে আমাদের প্রতারিত করেছে। তারা পাকিস্তান ও ধর্মের নামে কথা বলার অধিকার দাবি করে। বাংলায় যা ঘটেছে তা কি ইসলামের জন্য ঘটেছে? আমরা একটানা সামরিক শাসনের আওতায় রয়েছি, একথা দয়া করে আপনারা মনে রাখবেন।'

গাফফার খান আরো বলেন, জালালাবাদে নিয়োজিত পাকিস্তানি কন্সাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাঙালিরা পাকিস্তান ধ্বংস করেছে বলে উল্লেখ করেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বোমা দিয়ে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা যাবে না। পাকিস্তান সরকার বাস্তবিকই যদি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে চায়, তা হলে তিনি শেখ মুজিব ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য মধ্যস্থতা করতে রাজি হবেন। পাকিস্তান সরকার যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় তাহলে তিনি বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

কিছুকাল পর পাকিস্তানি কন্সাল গাফফার খানের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করে বলেন, তিনি এ সম্পর্কে তাঁর একটি বিবৃতি প্রচার করবেন বলে পাকিস্তান সরকার আশা করে। গাফফার খান বলেন, বিবৃতি দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; তবে তিনি বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন।

ভারতীয় সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে কায়রো, রোম, হেলসিংকি, পারী ও মস্কো সফরের পর ২ জুন লন্ডনে পৌঁছান।

পল কনেট ও মারিয়েটা প্রকোপের উদ্যোগে এ্যাকশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এক সভায় মি. নারায়ণ বলেন: 'বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হবে এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া খান কিংবা বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যক্তির সঙ্গে বাক্য বিনিময় কিংবা করমর্দন করতে রাজি নন। ... আমি শান্তিবাদী; কিন্তু ইয়াহিয়া খানের নিষ্ঠুর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের নিন্দা করতে আমি রাজি নই। যুদ্ধের জন্য ভারতের তৈরি হওয়া উচিত।'

এই সভায় তিনজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য-জন স্টোনহাউস, পিটার শোর ও মাইকেল বার্নস্ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁদের বক্তৃতার পর বিচারপতি চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং মি. নারায়ণের বিদেশ সফরের সাফল্য কামনা করেন।

৪ জুন জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্মানার্থে লন্ডন এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে লন্ডন কমিটির পক্ষ থেকে গাউস খান এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা করেন। বিচারপতি চৌধুরী মি. নারায়ণের জীবন-দর্শনের ওপর আলোকপাত করেন।'[২]

Dhaka University Institutional Repository

২১ জুন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় এক ঘন্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন। পররাষ্ট্র দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই ঘরোয়া বৈঠকের পর প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করবেন। এই বিবৃতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধানের শর্ত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা হয়। বাঙালিদের স্বাধীনতা দাবির এই পরোক্ষ স্বীকৃতি প্রবাসী বাঙালিদের উৎসাহিত করে।'[৩]

পররাষ্ট্র দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. শরণ সিং বলেন, ভারতের জন্য বৈদেশিক সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি লন্ডনে আসেন নি। পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যদান স্থগিত রাখার অনুরোধ জানানো তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যা বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার পর মি. শরণ সিং লন্ডনে আসেন। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গেও এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারপতি চৌধুরী শরণ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপা পন্থ উপস্থিত ছিলেন। মি. শরণ সিং বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, বিভিন্ন দেশ সফরকালে যদি বিপদের সম্মুখীন হন, তা হলে তিনি (বিচারপতি চৌধুরী) ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যেন দ্বিধাবোধ না করেন। কথা প্রসঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমতি চেয়েছেন। অনুমতি না পাওয়ার জন্য অস্ত্র পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। মি. শরণ সিং বলেন, বিদেশ থেকে অস্ত্র না পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাচ্ছে। তবে লন্ডন থেকে অস্ত্র পাঠাবার অনুমতি দেয়ার আগে কয়েকটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য অনুমতিদানে বিলম্ব হচ্ছে।

বিচারপতি চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, শেখ মান্নান ও আজিজুল হক ভূঁইয়া ভারতীয় দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। 'মুজিবনগর' সরকারের কোনো জরুরি বার্তা ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে পাঠানো হলে মি. ব্যানার্জি তা শেখ মান্নান অথবা মি. ভূঁইয়ার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'[৪]

ভারতীয় আইন-বিশেষজ্ঞ ও পরবর্তীকালে আইনমন্ত্রী অশোক সেন ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত জনসভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা করেন। তিনি বিচারপতি চৌধুরীর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের আইন দপ্তরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন।

২৭ শে জুন বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মি. সেন প্রধান বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য ১লা আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায়ও তিনি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বাঙালিদের সংগ্রাম ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন।'[৫]

যুক্তরাজ্যস্থ ভারতীয়দের মধ্যে ড. তারাপদ বসু বাঙালিদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন। বিদেশ সফররত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও তিনি আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। তা' সত্ত্বেও কেউ কেউ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। আমাদের কাছে খবর এলো, ড. বসু একজন ভারতীয় গুপ্তচর। আমরা বললাম তা হলে ধরে নিতে হবে ভারতীয় হাইকমিশানের সবাই তাদের গুপ্তচর। কিন্তু ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী দেশ। অতএব, তাদের গুপ্তচরদের সম্বন্ধে অযথা সঙ্কিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আপাতত দৃষ্টিতে মনে হবে, ড. বসু একটি ভুল করেছিলেন। কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মোশাররফ হোসেন মুত্তাজির। ১৯৬৩ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। অর্থনীতি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর ড. বসু বলেন,"এই তো, আপনাদের মতো লোকই আমরা চাই।" মুত্তাজির সাহেব ধরে নিলেন, ড. বসু পাকিস্তান ভাঙার জন্য তাঁর মতো 'মীর জাফর'-দের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

৮ আগস্ট (১৯৭১) ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি ২০ বছর মেয়াদি যে 'শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা'র চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে দিল্লির কূটনৈতিক মহল মনে করেন।

৯ আগস্ট 'দি গার্ডিয়ান' -এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশ সমস্যার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের বেয়াড়া নীতি এবং চীনের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা ছাড়া মিসেস গান্ধীর পক্ষে আর কোন উপায় ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

ভারত-সোভিয়েত চুক্তিকে পাকিস্তান 'আক্রমণাত্মক চুক্তি' বলে অভিহিত করে। ১১ আগস্ট 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এই চুক্তিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে তুলনা করেন।

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের প্রাক্তন দেশরক্ষামন্ত্রী এবং যুক্তরাজ্যে তাদের প্রাক্তন হাই কমিশনার মি. কৃষ্ণমেনন ৪/৫ দিনের জন্য লন্ডনে আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় মনোভাব দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাখ্যা করাই তাঁর সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর বয়স তখন প্রায় ৭৫ বছর। তিনি তখন ভারতীয় লোকসভার স্বতন্ত্র সদস্য।

বিচারপতি চৌধুরী স্যাভয় হোটেলে গিয়ে মি. কৃষ্ণমেননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রবাসী ভারতীয় সাংবাদিক ড. তারাপদ বসু তাঁকে দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লন্ডন অবস্থানের প্রথম দিন পুরো বিকেল বেলা তিনি বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ও বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন সম্পর্কে আলোচনা করে কাটান।

১৩ আগস্ট মি. কৃষ্ণমেনন কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সভার শেষে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালি বাস্তুত্যাগীদের অবস্থা সম্পর্কে গৃহীত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, নিজের চোখে যা দেখেছেন তা আরও করুণ ও হৃদয়-বিদারক।

১৪ আগস্ট তিনি ভারতীয় ছাত্রাবাস মহাত্মা গান্ধী হল এবং রেড লায়ন স্কোয়ারে অবস্থিত কনওয়ে হলে অনুষ্ঠিত দুটি পৃথক সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বিচারপতি চৌধুরী উভয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। কনওয়ে হলের সভায় তিনি 'মুজিবনগর' সরকারের পক্ষ থেকে মি. কৃষ্ণমেননকে ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট গাউস খান মি. কৃষ্ণমেননের সম্মানার্থে একটি ঘরোয়া ভোজসভার আয়োজন করেন। বিচারপতি চৌধুরী, স্টিয়ারিং কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি ধৈর্য সহকারে সবার বক্তব্য শোনেন এবং যথাসম্ভব সাহায্যের আশ্বাস দেন। লন্ডনের কর্মসূচি পালনের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে রওনা হয়ে যান।[৭]

আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের প্রভাবশালী এম. পি. রাণী মঞ্জুলা দেবী লন্ডনে আসেন। লন্ডনের ইন্ডিয়া ক্লাবে তাঁর সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিরা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ২৬শে আগস্ট শেখ আবদুল মান্নান, আজিজুল হক ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেন এবং আরো দু'জন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

মঞ্জুলা দেবী পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তারা কী ভাবে এক কাপড়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, কী ভাবে তারা অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় রয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বলেন, শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক আপীল নিয়ে তিনি বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, মেঘালয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীদের অবস্থা অত্যন্ত মর্মান্তিক। স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতায় যারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের সমস্যা সহজেই বিদেশী টেলিভিশন-সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেঘালয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীরা সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে। প্রবাসী বাঙালিরা হাসতে হাসতে বলেন, মেঘের আড়ালে পড়লে তো আর কিছুই দেখা যায় না। আমাদের শরণার্থীরা মেঘের আড়ালে পড়েছে। অনেক হাসা-হাসির পর তিনি বলেন, "না, অন্ধকারে ওরা থাকবে না। তাদের জন্য আমি জীবন পণ করেছি। আমি কাজ করবো। তাই আমি আন্তর্জাতিক সফরে বেরিয়েছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আমার কাজ করে যাবো।" রানী মঞ্জুলা দেবীর অবদান বাঙালি কোনো দিনও ভুলতে পারবে না।[৮]

ভারত উপমহাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ২৪ অক্টোবর নয়াদিল্লি ত্যাগ করেন। তিনি সপ্তাহ বিদেশে অবস্থানকালে তিনি ব্রাসেলস্, ভিয়েনা, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, পারী ও বন (তৎকালীন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী) সফর করবেন।

২৫ অক্টোবর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে রয়াল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিসেস গান্ধী বলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযানকে গৃহযুদ্ধ বলা যায় না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ভোটদানের ফলে নিরপরাধ জনগণকে তারা নির্বিচারে হত্যা করছে। বিপুল সংখ্যক বাস্তুত্যাগীকে তারা ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে। ভারত এ যাবৎ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানে ভারতে নিরাপত্তার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

২৬ অক্টোবর 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউটন' পত্রিকায় প্রকাশিত উপরোক্ত সংবাদে আরও বলা হয়, মিসেস গান্ধী বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপমহাদেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২৬ অক্টোবর মিসেস গান্ধী বেলজিয়াম থেকে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পৌঁছান। ২৮ অক্টোবর 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, ২৭ অক্টোবর মিসেস গান্ধী অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ব্রুনো ক্রাইস্কির সঙ্গে উপমহাদেশের পরিস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে দেড় ঘন্টাকাল আলাপ করেন। এরপর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আসন্ন সঙ্কট এড়াতে হলে পূর্ব বঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

মিসেস গান্ধীর সঙ্গে ভিয়েনা সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে মি. ক্রাইস্কি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। ৬ নভেম্বর 'ইন্ডিয়া উইকলি'-তে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

২৯ অক্টোবর (শুক্রবার) মিসেস গান্ধী ভিয়েনা থেকে লন্ডনে পৌঁছান। ব্রিটেনে ছ'দিনব্যাপী সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স-এর সদস্যদের এক সভায় তিনি বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী-চুক্তি সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

২৯ অক্টোবর 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মিসেস গান্ধীর সফরের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, ৯০ লক্ষ বাস্তুত্যাগীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হওয়ার ফলে ভারত এক অসহনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বহন করছে।

মিসেস গান্ধী মনে করেন, বাস্তুত্যাগীদের জন্য সাহায্য বরাদ্দ করে কেবল সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাঁর অভিমত সমর্থন করে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে বাস্তুত্যাগীদের পূর্ব বঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপসংহারে বলা হয়, উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মিসেস গান্ধীর যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য।

মিসেস গান্ধী লন্ডনে পৌঁছানোর কয়েক ঘন্টা পর বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ও 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ক্ল্যারিজেস হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে এই সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়; যা ইতোপূর্বে গবেষণাপত্রে সূত্র সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১ অক্টোবর 'দি অবজারভার' পত্রিকার কমনওয়েলথ সংবাদদাতা প্রদত্ত এক সংবাদে বলা হয়, আজ (রোববার) প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর অসমাপ্ত আলোচনা পুনরায় শুরু হয়।

মিসেস গান্ধী ব্রিটেনকে উপমহাদেশের ব্যাপারে জড়াতে চান না। তিনি আশা করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি এবং এ সম্পর্কে ভারতের নীতির প্রতি ব্রিটেন সমর্থন জানাবে।

বর্তমান সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে কারারুদ্ধ বাংলাদেশ নেতা শেখ মুজিব কিংবা তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে পাকিস্তানকে রাজি করানোর জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে মিসেস গান্ধী তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে আশ্বস্ত হতে চান।

১ নভেম্বর (সোমবার) লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে মিসেস গান্ধীর আনুষ্ঠানিক আলোচনা গতকাল (রোববার) দুপুরবেলা সমাপ্ত হয়।

সোমবার লন্ডনের 'ফরেন প্রেস এ্যাসোসিয়েশন' আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় বক্তৃতাদানকালে মিসেস গান্ধী বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে তৈরি না থাকলে দেশের জনগণ তাঁর সরকারকে ক্ষমা করবে না। তিনি আরও বলেন, ভারত পাকিস্তানকে কখনও আক্রমণ করে নি এবং বর্তমানেও সেই ইচ্ছা নেই।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, স্বীকৃতিদানের ফলে কি লাভ হবে? তিনি বলেন, স্বীকৃতিদানের উপযুক্ত মুহূর্ত সম্পর্কিত প্রশ্ন তাঁর সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ভারতীয় মুখপাত্ররা বলেন, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে দিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস গান্ধী পাশ্চাত্যের দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনুযোগের সুরে বলেন, পাকিস্তানের কার্যকলাপ উপেক্ষা করে ভারত ও পাকিস্তানকে সমপর্যায়ের রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা বিরক্তিকর। ২ নভেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তান সমপর্যায়ভুক্ত নয় এবং তা মেনে নিতে তিনি রাজি নন।

একই তারিখে 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, সভাগৃহের দরজায় জনৈক প্ল্যাকার্ডধারী বিক্ষোভকারী মিসেস গান্ধীর কাছে বাস্তুত্যাগীদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের বাধা সৃষ্টির কারণ জানতে চায়। তিনি বলেন, এ প্রশ্নটি এ বছরের সবচেয়ে বড় রসিকতা বলে গণ্য হওয়া উচিত। বাস্তুত্যাগীদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ভারত অত্যন্ত সচেষ্ট রয়েছে। তা সত্ত্বেও দৈনিক প্রায় ৩০ হাজার বাস্তুত্যাগী ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করছে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করবে বলে ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক বিবৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে মিসেস গান্ধী বলেন, অন্যান্য প্ররোচনামূলক বিবৃতির সঙ্গে এর মিল রয়েছে। পাকিস্ত

Dhaka University Institutional Repository

নকে আক্রমণ করার ইচ্ছা ভারতের নেই। ইতঃপূর্বে পাকিস্তান দু'বার আক্রমণ করেছে বলে ভারতকে 'সম্পূর্ণভাবে তৈরি' থাকতে হবে।

১ নভেম্বর স্থানীয় কলোসিয়াম থিয়েটারে ইন্ডিয়া লীগ আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিসেস গান্ধী উপমহাদেশের সমগ্র পরিস্থিতির ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, তিনি একটি আগ্নেয়গিরির চূড়ায় অবস্থান করছেন বলে মনে করেন। কখন বিস্ফোরণ ঘটবে তা তিনি জানেন না।

উল্লিখিত তারিখে 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস্'-এর সংবাদদাতা কেভিন র‍্যাফার্টি এক সংবাদ-বিশ্লেষণে বলেন, শরণার্থীদের জন্যসাহায্যের আবেদন জানাবার উদ্দেশ্যে মিসেস গান্ধী ব্রিটেন ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ সফর করছেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু অগ্নিগর্ভ ভাষায় প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য থেকে মনে হয়, শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের প্রশ্ন জরুরি নয়। পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানই তাঁর কাম্য।

পত্রিকাটির সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, মিসেস গান্ধীর যুক্তি বোধগম্য এবং যুক্তিসঙ্গত। তিনি মনে করেন, আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে। পত্রিকাটি মনে করেন, মিসেস গান্ধীর যুক্তি মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

১ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম ক্লারিজেস হোটেলে গিয়ে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ৪০ মিনিট যাবৎ বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৪ নভেম্বর মিসেস গান্ধী লন্ডন থেকে ওয়াশিংটন পৌঁছান। সেখান থেকে ৭ নভেম্বর তিনি প্যারীতে যান। প্যারীতে দু'দিন কাটিয়ে ৯ নভেম্বর তিনি পশ্চিম জার্মানি পৌঁছান।

৯ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান বহির্বিশ্বে ক্রমেই অধিকতর সমর্থনহীন হয়ে পড়বেন। এর ফলে মরিয়া হয়ে তিনি কাশ্মীর কিংবা পাঞ্জাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে, ভুট্টোর চীন সফরের উদ্দেশ্য সফল হয় নি বলে মনে হয়।

উল্লিখিত তারিখে 'দি গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, ঘটনাস্রোত ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল (৮ নভেম্বর) আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু বলে প্রচারিত চীন থেকে ভুট্টো 'আন্তরিক বন্ধুত্ব' ও 'সমর্থনের দৃঢ় সঙ্কল্প' সম্পর্কিত মৌখিক আশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছেন। এর ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অপার স্বস্তি বোধ করবেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরও বলা হয়, পাকিস্তানের জেনারেলগণ নিজেদের দুর্বুদ্ধির ফলে সৃষ্ট নিপীড়নমূলক পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করতে পারেন, কিংবা আলোচনার মাধ্যমে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন। এরপর তাঁদের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়; প্রতারণামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়।

১০ নভেম্বর ঢাকা থেকে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা বিগত দু' সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের ৭টি এলাকা দখল করে 'মুজিবনগর' সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ১১ নভেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' এ প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, ঢাকার নিকটবর্তী মধুর জঙ্গল এবং সুন্দরবন এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রয়েছে।

১১ নভেম্বর বন থেকে 'দি গার্ডিয়ান'-এর সংবাদদাতা নরম্যান ক্রসল্যান্ড প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, ভারত-পাকিস্তান সমস্যা সম্পর্কে মিসেস গান্ধীর অনমনীয় মনোভাব থেকে বোঝা যায়, উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সীমান্ত এলাকায় এবং ওপারের ঘটনার ওপর যুদ্ধ শুরু হবে কিনা তা নির্ভর করছে। পূর্ব বঙ্গে অধিবাসীরাই পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু পূর্ব বঙ্গে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে জনসাধারণ পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার পক্ষপাতী কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দেশে ফিরে যেতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হবে।

ইয়াহিয়া খানের এক পত্রের জবাবে পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ড উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি মধ্যস্থতা করতে রাজি নন বলে জার্মানির সরকারি মুখপাত্র প্রকাশ করেন।

মিসেস গান্ধী মধ্যস্থতার প্রস্তাব সম্পর্কে উৎসাহী নন। বিশ্ব-জনমত ইয়াহিয়া খানকে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে বাধ্য করবে বলে তিনি আশা করেন।

পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে ভারত পাল্টা আক্রমণ করবে এবং দখলিকৃত এলাকা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কেউ ভারতকে বাধ্য করতে পারবে না বলে সম্প্রতি ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম যে মন্তব্য করেন, সে সম্পর্কে মিসেস গান্ধী একমত বলে উল্লেখ করেন।

তিন দিনব্যাপী পশ্চিম জার্মানি সফরের পর মিসেস গান্ধী ১১ নভেম্বর বন্ থেকে দিল্লি রওনা হন। বন্ অবস্থানকালে তিনি ফেডারেল চ্যান্সলর উইলি ব্রান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১ ডিসেম্বর লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজন বলে ভারত সরকার মনে করে। ৩০ নভেম্বর রাজ্য পরিষদে বক্তৃতাদানকালে মিসেস গান্ধী ভারত সরকারের উপরোক্ত মনোভাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন।

'দি টাইমস্' ও 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত উক্ত সংবাদে আরও বলা হয়, উচ্চ পরিষদে অনুষ্ঠিত এক বিতর্কে অংশগ্রহণ করে মিসেস গান্ধী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে তিনি মনে করেন। প্রতিবেশী দেশে গণহত্যা ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। নিরস্ত্র জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান যদি ভারতের প্রতি শান্তির হস্ত প্রসারিত করতে চায়, তাহলে সদিচ্ছার প্রমাণ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।

১ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত অন্য একটি সংবাদে বলা হয়, ৩০ নভেম্বর রাত্রিবেলা এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব বঙ্গে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে।

২ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শেখ জামালের একটি আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়। চিত্র-পরিচিতি উপলক্ষে বলা হয়, শেখ জামাল বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। তাঁর ইউনিট পূর্ব বঙ্গ সীমান্ত পার হয়ে দশ মাইল ভেতরে গিয়ে যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে।

৩ ডিসেম্বর 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ভারতকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ভারতের পাঞ্জাব এলাকায় একটি স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে চরমপন্থী শিখদের সমর্থনদান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

২ ডিসেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চরমপন্থী শিখদের নেতা ড. জগজিত সিং চৌহান উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানের অন্তর্গত নানকানা সাহেব থেকে একটি বেতার কেন্দ্র এবং লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডি থেকে নতুন একটি যাত্রীবাহী বিমান প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ইয়াহিয়া খান অনুমতি দেবেন। এর ফলে পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধে মিসেস গান্ধী অনুসৃত নীতিব্যাহত হবে বলে ড. চৌহান মনে করেন।

৩ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির অব্যবহিত পর এক বেতার ভাষণে মিসেস গান্ধী বলেন, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করছে এবং দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর জাতির উদ্দেশে এই বেতার ভাষণ প্রচার করা হয়।

৪ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' ও 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী মিসেস গান্ধী আরও বলেন, পাকিস্তানী 'স্যাবর জেট' বিমান উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মিরের আটটি বিমান ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানী বিমান আগরতলার বিমান ঘাঁটিও আক্রমণ করে।

৫ ডিসেম্বর 'দি সানডে টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, ভারত-পাকিস্তান বিরোধে চীন পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করবে বলে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ঘোষণা করেছেন।

ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারকালে চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলে উভয় দেশই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণমূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে চীন দৃঢ়ভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। শেষ পর্যন্ত ভারত তার ফলাফল ভোগ করবে। এরপর উপমহাদেশে অশান্তি বিরাজ করবে।

৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৭ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' ও 'মর্নিং স্টার'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় পার্লামেন্টে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ঘটনাবলির স্বাভাবিক পরিণতির সম্ভাবনা থাকলে এই পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে তিনি ইতস্তত করতেন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের মোড় পরিবর্তিত হয়েছে। জীবন-মরণ সংগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশের জনগণ এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে নিয়োজিত ভারতীয় জনগণ বর্তমানে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পরের সহযোগীতে পরিণত হয়েছে বলে মিসেস গান্ধী বলেন।

মিসেস গান্ধী বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি পত্রের কপি পার্লামেন্ট সদস্যদের অবগতির জন্য পেশ করেন। ২৪ এপ্রিল (১৯৭১) লিখিত পত্রে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানানো হয়। ৪ ডিসেম্বর লিখিত সর্বশেষ পত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদ দস্তখত করেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে বলে ঘোষণা করেছে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে মিসেস গান্ধী বলেন, পাকিস্তান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী।

১৭ ডিসেম্বর 'দি টাইমস্'-এ প্রকাশিত উল্লিখিত সংবাদে আরও বলা হয়, নতুন জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের জনগণের মধ্যে ন্যায্য আসন গ্রহণ করে বাংলাদেশকে উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন বলে মিসেস গান্ধী আশা প্রকাশ করেন। 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন সফল করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতের শুভেচ্ছা থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। মিসেস গান্ধী আরও বলেন, এ বিজয় শুধুমাত্র বাংলাদেশের বিজয় নয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যেসব জাতি শ্রদ্ধাশীল তারা এই বিজয়কে মানব স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পথ-নির্দেশক বলে গণ্য করবে।'[১০]

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১.'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banerjee, Anthem Press, published in U.K. and U.S.A., 2006; (2) ('A Long Journey Together: India, Pakistan and Bangladesh', Sashanka S. Banrjee, published in the U.S.A., 2008, ISBN: 9781-4196-9763-0.গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করে তাঁর 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ' গ্রন্থে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পৃষ্ঠা-৭৯-৮৭।

২. 'Bangladesh Newsletter', London, 21JUne, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ঃ যুক্তরাজ্য', পৃষ্ঠা-৫৯-৬০, ৬১, ৬৪।

৩.'Sir Alec Douglas-Home and Mr. Swaran Singh agreed that a political solution must be ... found which was acceptable to the people of East Pakistan.' 'This is the first time the British Government has made a specific mention of the wishes of the people of East Pakistan as a condition for political settlement.' [সূত্রঃ 'The Guardian', London, 22 June, 1971.–এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-৭৭, ২০১।]

৪. 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৫১।

৫. শেখ আব্দুল মান্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬।

৬. শেখ আব্দুল মান্নান, ঐ, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫; পৃষ্ঠা-৭৬, ১২৭ এবং সাক্ষাৎকারে জাকারিয়া খান চৌধুরী।

৭ আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০২, ১০৭।

৮. শেখ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬।

৯. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৬, ১৩৭, ১৩৮-১৩৯, ১৪০, ১৪০-১৪১, ১৪৫-১৪৮।

১০. We hope and trust that the father of this new nation, Sheikh Mujibur Rahman, will take his rightful place among his own people and lead Bangladesh to peace, progress and prosperity. The time has come when they can together look forward to a meaningful future in their Sonar Bangla (Golden Bengal). They have our good wishes.' 'The triumph is not their's alone. All nations who value the human spirit will recognise it as a significant milestone in man's quest for liberty.' [সূত্রঃ Mrs. Indira Gandhi's speech in the Indian Parliament on 16 December, 1971 as quoted in 'The Times', 17 December, 1971.-এর সূত্র উল্লেখ করে, আবদুল মতিন, ঐ, পৃষ্ঠা-১৫১, ২০৮।]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা ঃ

৫.১ ভূমিকা ঃ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত বিলাত আন্দোলনে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠিত করতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তৎকালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনে যোগদানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত আইনজীবী পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাকালেই সময় ক্ষেপণ না করে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিকামনায় আপোষহীন হয়ে ওঠেন; শুরু হয় সুদীর্ঘ নয় মাসের কর্ম প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ; একদিকে ব্যক্তিগতভাবে বৃটিশ সরকার, পার্লামেন্ট, বিরোধীদল, বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিদেশী কূটনীতিক ও যুক্তরাজ্যস্থ বেসরকারী সংস্থাসহ বৃটিশ গণমাধ্যমসমূহে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। এবং অন্যদিকে অপরিসীম ত্যাগ ও ক্যারিসম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা তৎকালীন যুক্তরাজ্যে নানা দলমতে বিভক্ত বাঙালি জাতিকে প্রত্যয় ও ঐক্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বহির্বিশ্বে একমাত্র দুত হিসেবে মনোনীত হন। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডন কেন্দ্রিক সমগ্র ইউরোপ তথা বহির্বিশ্ব জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল; তার প্রাণ পুরুষ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম, শিক্ষালাভ এবং বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে। অন্যদিকে বিশেষ দূত হিসেবে যাঁর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বহির্বিশ্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলদেশের প্রথম পতাকা উত্তীন হয়েছে, গঠিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, প্রচার পেয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস, সংটাপন্ন জীবনের হুমকিতেও যিনি অকুতোভয়, পর্বত প্রমাণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ, কর্মে অবিচল, হৃদয়ে মানবতাবাদী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বহির্বিশ্বে আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক প্রাণ-পুরুষ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে আলোচিত অধ্যায়ে। একই সাথে তাঁর চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো উদঘাটনপূর্বক যুক্তিসংগত সমালোচনা সহ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতা অধ্যায়ে তাঁর সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে তাঁর চরিত্রের কিছু দিক উল্লেখ পূর্বক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.২ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

(i) জন্ম ও শিক্ষা লাভ ঃ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ৩১ জানুয়ারী ১৯২১ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার নাগবাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল হামিদ চৌধুরী তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার ছিলেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় টাঙ্গাইল শহরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিন্দুবাসিনী হাইস্কুলে কিছুদিন লেখা পড়া করার পর ১৯৩৬ সালে ময়মনসিংহ স্কুল জীবনের লেখা পড়া শেষ করেন। এর পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বি. এ. পাস করার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই তিনি একদিকে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে 'রূপায়ণ' নামে একটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি লন্ডনের লিংকন্‌স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। তিনি বিলেতে তৎকালীন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ব্রিটেন শাখার সভাপতি ছিলেন।

(ii) কর্ম জীবন ঃ

দেশে ফিরে আবু সাঈদ চৌধুরী গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ শোহরাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি আইন ব্যবসায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬০-৬১ সালে তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেল। ১৯৬১ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি।[১] ১৯৬৯ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিচারক সম্মেলন ও আইনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতারূপে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দিতে জেনেভার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। মাহবুব উল আজাদ চৌধুরী (সম্পাদনা) ঃ 'স্মৃতি সত্তায়- আবু সাঈদ চৌধুরী' ঃ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতীয় স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, ১৬ জুলাই ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬৯ এবং সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী ।

২। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২ এবং সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী ।

৫.৩ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট ঃ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী (তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচর্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য জেনেভায় আসেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পান। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে জেনেভার একটি পত্রিকা থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন ছাত্র নিহত হওয়ার সংবাদ পান। এর প্রতিবাদে তিনি ১৫ই মার্চ তারিখে প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবকে লিখিত এক পত্রে জানান, "আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালনার পর আমার ভাইস্-চ্যান্সেলর থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।"[১]

তাঁর এই বক্তব্যে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তাবাদী চেতনা ও দেশপ্রেমবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার পর থেকে বিচারপতি চৌধুরীর মন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি মারাত্মকভাবে বিষিয়ে উঠে।

২৬ মার্চ সকালবেলা বি বি সি-র মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের সব যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার খবর শুনে বিচারপতি চৌধুরী অনুমান করলেন, বাংলাদেশে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন। সে দিনের অধিবেশনে গিয়ে তিনি বি বি সি-র খবরের কথা উল্লেখ করে কমিশনের চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। বিচারপতির পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁর জন্য লন্ডনে অপেক্ষা করছিলেন।[২]

লন্ডন বিমানবন্দরে বিচারপতি চৌধুরীর বড় ছেলে আবুল হাসান চৌধুরী (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক স্টেট মিনিস্টার) এবং পাকিস্তান হাই কমিশনে নিয়োজিত বাঙালি অফিসার হাবীবুর রহমান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দক্ষিণ লন্ডনের ব্যালহাম এলাকায় গসবার্টন রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে তিনি উঠলেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতা ও কর্মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরীফ, মিনহাজউদ্দিন এবং বি. এইচ. তালুকদার। মাওপন্থী দলের কোনো নেতা কিংবা কর্মী বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেননি।[৩]

ঢাকার সংগে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সংগে টেলিফোনে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে না পারলেও রাতেই আবার টেলিফোনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেন। এরপর বিচারপতি চৌধুরী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব মি. ব্যারিংটনকে টেলিফোন করে এ ব্যাপারে কথা বলেন। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মি. এলিগার সংগে দেখা করে বি. বি.সি.'র সূত্র উল্লেখ করে তাঁকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সর্ম্পকে অবহিত করেন। পর দিন ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের বিবরণী এবং ঢাকায় পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আক্রমণের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কেনেথ ক্লার্কের পাঠানো করাচি থেকে একটি রিপোর্টে বলা হয়, 'জিন্নাহর একতার স্বপ্ন রক্তে ধুয়ে-মুছে গেছে।' সেদিনকার 'লন্ডন টাইমস'-এ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন প্রতিবেদন ছাপে এবং ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী ঘোষণার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে।[৪] ঐ দিনই বিচারপতি চৌধুরী বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান। সেখানে সাদারল্যান্ডের কাছে ঢাকা থেকে পাঠানো বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহসহ ঢাকার গণহত্যার কথা শুনে বিচারপতি চৌধুরী ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, উত্তেজনা ও অপমানে বিহবল হয়ে পড়েন এবং সাদারল্যান্ডকে জানান ঃ

"এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাব-আর পাকিস্তানী সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাব। তারা আমার ছেলেদের হত্যা করেছে। এর প্রতিবিধান চাই।"[৫]

২৫ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাত্রে হানাদার বাহিনী কর্তৃক সাধারণ মানুষ হত্যাকে তিনি তাঁর জাতীয় সম্মানে মারাত্মক আঘাত স্বরূপ মনে করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেন। বিচারপতি চৌধুরী ঘোষণা করেন ঃ

"বিশ্ববাসীকে এই গণহত্যার কথা জানাব, চাইব প্রতিকার। বাংলাদেশকে স্বাধীন হতেই হবে।"[৬]

একাত্তরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ইউরোপে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) বিশেষ দূত বা কূটনৈতিক মিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২৭ আগস্ট ১৯৭১ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনের ২৪ নং কেমব্রিজ গার্ডেনে স্বাধীন বাংলাদেশের মিশন উদ্বোধন করেন। সেদিন লন্ডনের বিখ্যাত ট্রাফালগার স্কোয়ারের এক

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি উক্ত বাংলাদেশ মিশন খোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। উক্ত সভায় বিচারপতি চৌধুরী ছাড়াও বক্তৃতা করেছিলেন লর্ড ব্রকওয়ে, লেডি গ্রিফোর্ড, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য রেজ প্রেন্টিস, জন স্টৌন হাউস, টম উইলিয়ামস্, বব এডওয়ার্ড প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।[৭]

লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিচারপতি চৌধুরীর সমর্থনের সংবাদ পাবার পর অত্যন্ত উৎসাহিত হন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ চান এবং তাঁকে আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য যে, উনিশ শ' উনসত্তর সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। তাই লন্ডনে অধ্যয়নরত বাঙালি শিক্ষার্থী এবং লন্ডনে বাঙালিদের নিয়ে বিচারপতি চৌধুরী সহজেই প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ২৭ মার্চ লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বাঙালি ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিচারপতি চৌধুরী প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সার্থক করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ৩০ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১ আবু সাঈদ চৌধুরী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং সেন্ট ক্যাথারিন কলেজের অধ্যক্ষ লর্ড এলেনবুলেকের সংগে দেখা করে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের হত্যার কথা তাঁদের অবহিত করেন। তিনি তাঁকে রক্তক্ষয় বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে ইয়াহিয়া খানের নিকট টেলিগ্রাম করার জন্য অনুরোধ জানান। অধ্যক্ষ লর্ড এলেন বুলেকের পরামর্শে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলোর কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিংগারের সঙ্গে দেখা করে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর আবেদন জানান।

কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিংগারের সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর লর্ড জেমসকে প্রথমে টেলিফোন করে তাঁকে দেশের অবস্থার ব্যাখ্যা দেন এবং পরে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি কমনওয়েলথ-এর সেক্রেটারি জেনারেল আর্নল্ড স্মীথের সঙ্গে দেখা করেন। বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণ, ২৫ মার্চের রাত্রিতে ঢাকায় নিরীহ বাঙালিদের হত্যা, সামরিক সরকারের নির্যাতন প্রভৃতির উল্লেখসহ বাংলাদেশ কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তার পুরো ইতিহাস তুলে ধরেন এবং ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান।

বিচারপতি চৌধুরী আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশনের সাধারণ সম্পাদককে বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ ও বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য পাকিস্তানের সরকার প্রধানকে চাপ প্রয়োগের জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশনের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশে হত্যাকান্ড বন্ধ ও বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন।

একদিকে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের হত্যাকান্ড বন্ধ ও বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য লন্ডনের বিভিন্ন পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, তেমনি অন্যদিকে লন্ডনে বসবাসরত বাঙালি ছাত্রনেতা খন্দকার মোশারফ হোসেন (ডক্টর), এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (বর্তমানে বিচারপতি), রাজিউল হাসান (রঞ্জু), শেখ আবদুল মান্নান ও অন্যান্যদের সাথে কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাপ্তাহিক 'জনমত' সম্পাদক ওয়ালী আশরাফ তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁকে তাঁর কাগজের মারফত এবং ব্যক্তিগতভাবে ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে আহবান জানান।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। সাইনন ড্রিন্ডয়ের বিস্তৃত বিবরণের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরো সময়টা লর্ড হিউম পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেন এবং একথা জানিয়ে দেন যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিচারপতি চৌধুরীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানান যে, বঙ্গবন্ধু সুস্থ আছেন এবং তাঁর প্রাণহানির আশংকা এ পর্যন্ত ঘটেনি। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য ব্রিটেনে তাঁদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে ডগলাস হিউম তাঁকে উৎসাহিত করেন।[৮]

১০ই এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরী বি বি সি-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক হত্যার কথা বর্ণনা করেন। এই হত্যাকান্ডের কথা তিনি বিশ্ববাসীকে জানাবেন এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে 'মুজিবনগর'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই অত্যন্ত খুশী হন। তাজউদ্দিন আহমদ বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে নির্দেশ দেন। ১২ এপ্রিল তিনি বিচারপতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমিরুল ইসলাম (রহমত আলী ছদ্ম নামে) বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, বাংলাদেশের যে-সব নেতৃবৃন্দ ভারতে এসেছেন তারা শীঘ্রই প্রবাসী সরকার গঠন করবেন এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি বিচারপতি

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরীকে বিশেষ প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করতে চান। তাঁর সম্মতি নেওয়ার জন্য আমিরুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, "আপনাদের সঙ্গে কোনোরূপ যোগাযোগ না হলেও আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কাজ করার সম্মতি জানাচ্ছি।" আমিরুল ইসলাম বলেন, মন্ত্রিসভা শীঘ্রই শপথ গ্রহণ করবে এবং তার পরই বিচারপতি চৌধুরীর নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ১৭ এপ্রিল 'মুজিবনগর'-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরীর নিয়োগপত্রে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরদান করেন। এই নিয়োগপত্র সঙ্গে নিয়ে লন্ডন-প্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ী রকিবউদ্দিন ২৩ এপ্রিল কলকাতা থেকে লন্ডন পৌঁছান।

বিচারপতি চৌধুরী 'কাউন্সিল ফর দি পিপল্‌স্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউ. কে.' গঠনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন। গাউস খানের অনুরোধক্রমে শেখ আবদুল মান্নান (আমি) বিচারপতি চৌধুরীকে টেলিফোনে করে তাঁকে এই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলের সাফল্য কামনা করে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, তিনি বিশেষ কোনো দল বা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবেন না।

১৬ এপ্রিল হলওয়ে এলাকায় ব্যারিস্টার রুহুল আমিনের বাড়িতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে কাউন্সিল ফর দি পিপল'স্-রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন্ দি ইউ. কে.-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেখ আবদুল মান্নান (আমি নিজে), শাখাওয়াত হোসেন, জাকারিয়া খান চৌধুরী, আমীর আলী, শামসুল মুর্শেদ, শামসুল হুদা হারুণ, ডাঃ আবদুল হাকিম এবং আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে গাউস খানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বিচারপতি চৌধুরী জানতে চান, আমাদের আন্দোলন কত দূর এগিয়েছে, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল কি-না, আমাদের কি 'প্রোগ্রাম' আমরা কেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত, আমরা কেন এক হতে পারি না, আরও নানা রকম প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের জবাব ধীর-স্থিরভাবে সেখানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ (আমরা) প্রদান করেন।[৯] এ প্রসঙ্গে শেখ আবদুল মান্নান তাঁর 'স্মৃতি কথা'[১০]য় লিখেছেন,

'আলোচনাকালে যে-কথাগুলো আমি বিশেষভাবে বলেছি, তা' হচ্ছে, এই আন্দোলনে আমরা এ যাবৎ যে ভূমিকা পালন করেছি, তা' পুরোপুরি সফল না হলেও একে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যদি সবাই এগিয়ে আসেন এবং বিচারপতি চৌধুরীও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। গাউস খান বলেন, আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। বিচারপতি চৌধুরী প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণে রাজী হলে তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন। বিচারপতি চৌধুরীর পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া কেন সম্ভব নয়, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত কার্যবলীর সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের আবেদন জানান। রাত্রি দু'টো পর্যন্ত আলোচনার পরও কমিটির কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। পরদিন আবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে একমত না হলে তিনি আর ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করবেন না। তা সত্ত্বেও সেদিন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

'এখানে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে। আমার মনে প্রশ্ন ছিল- একটি বিত্তবান পরিবারের মানুষ, যিনি শৈশব থেকেই সমৃদ্ধির মধ্যে একটা বিশেষ পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, একটা বিশেষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁর পিতাও সেই রাজনীতি করেছেন, হঠাৎ করে তাঁকে আমরা কী-ভাবে আমাদের মুক্তি-আন্দোলনে যোগদান করবেন বলে আশা করতে পারি! তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতটুকু কাজ করতে পারবেন, সে সম্বন্ধেও আমার মনে প্রশ্ন ছিল। এই পরিবেশ থেকে এসে তিনি কোনো গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারবেন বলে আমি ভাবতেও পারিনি। আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের কাছে যে সব কাগজপত্র পাঠিয়েছি, তার মধ্যে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের মাতৃভূমি থেকে আমরা চিরদিনের জন্য দারিদ্র্য, শোষণ ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটাবো। জরাজীর্ণ সমাজের পরিবর্তে সুন্দর, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক-সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো। সে সমাজে ধনীর স্বার্থ রক্ষা ও গরিবদের শোষণের পরিবর্তে জাতীয় মর্যদাবোধ সম্পর্কে আত্মসচেতন একটি জাতি ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্র হবে গণমুক্তির হাতিয়ার। ৬-দফার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম তৈরি করেছি এবং পৃথিবীর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বিচারপতি চৌধুরী কি তার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবেন! এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। তাঁর নিরাপদ পরিবেশ থেকে এসে তিনি বিদেশের রাস্তাঘাটে অসহায় অবস্থায়, এতো স্বার্থত্যাগ করে এগোতে পারবেন বলে আমি তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি তাঁর মানসিকতা বুঝতে পেরেছি।

'অনেকে দাবি করেছেন তারাই বিচারপতি চৌধুরীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে নামিয়েছিলেন। এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে আমি মনে করি। কারণ, তিনি নিজের মনে অঙ্ক কষেছেন। দেশের পরিস্থিতি তখন কোথায়, সে সম্বন্ধে মনে মনে বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্ত পৌঁছান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার সংবাদ তাঁর মনে একটা বিরাট রেখাপাত এবং গভীর বেদনার সৃষ্টি করে। ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করার খবর তিনি শুধু সংবাদ-মাধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই পাননি, ব্যক্তিগত সূত্রেও বিস্তারিত বিবরণ পেয়েছেন। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত করেন, স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই, কোনো দেওয়া- নেওয়ার প্রশ্ন নেই, কোনো আপস নেই, পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। কখন উনি আমাদের সঙ্গে আসবেন, কিভাবে আসসবেন, সে সম্বন্ধে তখনও তাঁর মনে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, এটি সত্যি। কিন্তু তিনি নিজেই মনে মনে স্থির-সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরবেন না।

'বিচারপতি চৌধুরী পরে আমাকে বলেন, এক বিয়ের বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। একটি 'সোফা'-য় তিনি বসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এসে তাঁর পাশে বসেন এবং তাঁর (বিচারপতি– কাঁধে হাত রেখে বললেন, ''চৌধুরী সাহেব, বড় একটা কাজ করতে হবে আপনাকে। এক বৃহত্তর কাজের জন্য আপনি প্রস্তুত হন। অনেক, অনেক কাজ আপনার জন্য আছে।'' বিচারপতি চৌধুরী আমাকে বলেন, ''তখন তো আমি বুঝতে পারিনি; আর নিয়তি এমনই হলো, আমি যখন বাইরে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যাই, বাইরে আছি, বিদেশে আছি, তখন এই বিরাট প্রলয়কান্ড, এই অমানুষিক অত্যাচার, এই নরহত্যা, এই ছাত্রহত্যা। এটা তো বঙ্গবন্ধু আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'চৌধুরী সাহেব আপনাকে অনেক, অনেক কাজ করতে হবে।' এটা কি করে এমনভাবে সম্ভব হলো, তাঁর এই অনুরোধ পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হলো আমার মনের বেদনা এবং দেশাত্মবোধের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছিলেন, এখন আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হলো- আমি বিদেশে থাকবো এবং আমার উপর একটা দায়িত্ব আসবে। সে উত্তর আমি খুঁজে পাই না।''

'আমাদের সঙ্গে কাজ করার আগে একটা প্রশ্ন হয় তো বিচারপতি চৌধুরীকে উতলা করেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পিতার স্মৃতি এবং বাড়িঘরসহ বিরাট সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সম্পত্তি এবং সম্মান- দু'টোই হারাবার আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করে তিনি স্থির করেন, তাঁর আর কোনো পথ নেই; সর্বস্ব যদি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, জীবনও যদি চলে যায়, তবুও আর কোনো রাস্তা তাঁর সামনে খোলা নেই।

'বঙ্গবন্ধু (তখনও সম্মানসূচক বঙ্গবন্ধু নামটি বহুল প্রচলিত নয়) আমরা কখনো নেতা বলেছি, কখনো শেখ মুজিব বলেছি; কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী কোনো দিন ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় কিংবা প্রকাশ্য সভায় 'বঙ্গবন্ধ' ছাড়া কথা বলেননি। সেন্ট্রাল সদস্যদের কেউ যখনই বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করতে চেয়েছেন কিংবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানতে ইতস্তত করেছেন, তখনই তিনি আমার সামনেই বলেছেন, ''আপনারা কি এটা অস্বীকার করতে চান- জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যিনি একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি আওয়ামী লীগের প্রধান; একথাটা আপনারা ভুলে যাবেন না।''

'স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরীর প্রকৃত মনোভাব কি আমরা জানতে পেরেছি? এ সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল। আমি বলবো, তাঁর মনোভাব আমরা জেনেছি; তাঁর কাছ থেকেই জানার সুযোগ আমার হয়েছে। 'মুজিবনগর' সরকারের নির্দেশ ছিল- পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত (Ambassador Plenipotentiary) হিসেবে বাহির্বিশ্বের আন্দোলনে বিচারপতি চৌধুরী নেতৃত্ব দেবেন। দু'টি জরুরী দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। প্রথমতঃ বাংলাদেশের জীবনমরণ সংগ্রামকে বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন হিসেবে তাঁকে তুলে ধরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের আহ্বান অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিদের যে যেখানে আছেন, সেখানেই কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কাজ করার কথা বিচারপতি চৌধুরী কখনও বলেননি। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুক্তরাজ্যে আন্দোলনের নেতৃত্ব এককভাবে আওয়ামী লীগের হাতে থাকেনি; অন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে থেকেছে। যেমন ঃ 'বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটি'র ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জনই আওয়ামী লীগ দলভূক্ত ছিল না। পরবর্তীকালে এ্যাকশন কমিটিগুলির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত 'স্টিয়ারিং কমিটি'র পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র আজিজুল হক ভূঁইয়া আওয়ামী লীগ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। আমি নিজে আওয়ামী লীগের আদি যুগে একজন সাধারণ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকে আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের জন্য দূরে সরে যাই; কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনও শিথিল হয়নি।

'মোদ্দা কথা হচ্ছে- 'মুজিবনগর' থেকে বিচারপতি চৌধুরী একটি সুচিন্তিত নির্দেশ পেয়েছেন। এই নির্দেশে বলা হয়, বাংলাদেশের যুদ্ধ আওয়ামী লীগের যুদ্ধ নয়, বাঙালি জাতির যুদ্ধ। বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য লড়াই করছে এবং তাঁরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাঁদের এই বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই হবে বিচারপতি চৌধুরীর প্রধান কর্তব্য। এই বাণীর কথা তিনি কখনও তোলেননি।

'বিচারপতি চৌধুরী 'মুজিবনগর' সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেন। তাঁরা বলেন, বহির্বিশ্বে স্বাধীনতার আন্দোলন যেন দলীয় রাজনীতির গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। কিন্তু তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে, আওয়ামী লীগ ৬-দফা দিয়েছে, স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। কাজেই তার প্রধান্য থাকবেই কিন্তু বহির্বিশ্বে জাতীয় ঐক্যের কথা জোর দিয়ে বলতে হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চরিত্রের নিম্নরূপ কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছেঃ

ক) তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ-এর প্রতি চরম আস্থাশীল এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান ছিলেন (কারণ তাঁর পিতা আবদুল হামিদ চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সাবেক স্পিকার)।

খ) তিনি তৎকালীন পকিস্তান সরকারের অধীনেই ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মাত্র এক টাকা সম্মানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন।

গ) তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য জেনেভায় গমন করেন।

এখানে একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পান। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে জেনেভার একটি পত্রিকা থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন ছাত্র নিহত হওয়ার সংবাদ পান। এর প্রতিবাদে তিনি ১৫ মার্চ (২৬ মার্চ তারিখের ১০ দিন আগে, ৭মার্চের ৮দিন পরে এবং বিয়ের বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের তিন মাসের মধ্যে, ১৯৭০ সালের পর থেকে ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে) তারিখে প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবকে লিখিত এক পত্রে জানান, "আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালনার পর আমার ভাইস্-চ্যান্সেলর থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।"

এর অর্থ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় পাকিস্তানের সাথে মাত্র দু'জন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন যিঁনি; ২৫ মার্চের পাকহানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যার সংবাদ পাওয়ার পরে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার প্রশ্ন যাঁরা তোলেন তাঁরা বোধ হয় এতোদিনে এ বিষয়টি একটুও খতিয়ে দেখেন নি। সম্ভবত তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বা তার পরেও পাকিস্তানের সাথে প্রকাশ্য বা গোপনে যোগসাজোস থাকার কোন প্রমাণও দাঁড় করাতে পারবেন না। তাহলে অতি সংক্ষেপে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে কারো প্ররোচণায় নয় (চাইলে যিনি মুক্তিযুদ্ধকালে হেনরি কিসিংগারে প্রস্তাব মেনে নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন, অথবা মুক্তিযুদ্ধত্তোরকালে জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাবও প্রত্যাখান করতেন না), নিজের বোধ থেকেই দ্বিধাহীন চিত্তেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-১।

২। প্রগুক্ত।

৩। প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-২।

৪। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-৩।

৫। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-৪।

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪। এরূপ দৃষ্টান্ত উপমহাদেশের ইতিহাসে আরও পাওয়া যায়। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সরকারের নির্মমতম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। আর বাংলার গভর্ণর জন হার্বার্টের চক্রান্তে মন্ত্রিসভার অবসান ঘটলে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বলেছিলেন, "আমি গ্রাম থেকে গ্রামে, ঘর থেকে ঘরে যেয়ে এই অন্যায়ের কথা দেশবাসীকে জানাব।"

৭। মুহম্মদ নূরুল কাদির, 'দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা', মুক্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৫৯।

৮। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', পৃষ্ঠা-১৬-১৭; তপন কুমার দে-'মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল', পৃষ্ঠা-১৩৭।

৯। শেখ আব্দুল মন্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-২০-২১ এবং সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী।

১০। শেখ আব্দুল মন্নান, 'মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', পৃষ্ঠা-২১-২৫ এবং সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ মুক্তিযুদ্ধে তৎপরতা ও ভূমিকা ঃ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধকালীন সার্বিক কর্মকান্ড বিশ্ব জনমত গঠনে এ্যাকশন কমিটির তৎপরতাসহ গবেষণাপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি শিরোণামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ অধ্যায়ে তাঁর সার্বিক কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো; যা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের গতি বর্ধণে সহায়ক হয়েছে সে সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যায়।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এপ্রিল মাসে প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন। মুজিবনগর সরকার এ ঘোষণায় অভিভূত হয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উপলব্দি করে বহির্বিশ্বের একমাত্র দূত মনোনীত করেন এবং লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। ইতোমধ্যে তিনি কেন্দ্রীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের যুক্তরাজ্য আন্দোলন পরিচালিত করার লক্ষ্যে কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং বাংলাদেশ ফান্ড গঠন করেন। ব্রিটিশ সরকার, পার্লামেন্ট, সাংবাদিক, বেসরকারী ও মানবতাবাদী সংগঠন সহ লন্ডনস্থ ভারতীয় নাগরিক এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ও ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে প্রচার-প্রচারণা ও লবিং তাঁর সার্বিক কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের নেতা রূপে মার্কিন মূলুকে তাঁর পদচারণা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভের সংগ্রাম, গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয় লাভের পেছনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সার্বিক কর্মকান্ড তাঁকে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

৫.৫ চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চরিত্র ও মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক; যা ইতোমধ্যে গবেষণাপত্রের ছত্রে ছত্রে আলোচিত হয়েছে। তথাপি এখানে কিছু বিষয় বিশেষ করে ১৯৭১ সালে লন্ডনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের পুণঃউল্লেখ প্রয়োজন। আবার স্বাধীনতাত্তোরকালের কয়েকটি বিষয় যেমন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরকালের ঘটনাবলী ও সাক্ষাৎকার এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিমন্ত্রণে তাঁর (বিচারপতির) ভারত সফরকালের ঘটনাবলী ও সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যকও যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। এর মাধ্যমে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ব্যক্তি চরিত্রের কিছু বিশেষ দিক যেমন তাঁর জীবন ও কর্মের সততা, নির্লোভ মানসিকতা, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ়তা ও অবিচল আস্থা, ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর অতুলনীয় হৃদ্যতা, গভীর মমত্ববোধ, ব্যক্তিগত বোঝাপড়া, তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) নেতৃত্বের প্রতি বিচারপতির অকুণ্ঠ সমর্থন ও দ্বিধাহীন আকর্ষণ-সমর্থন; যে সমস্ত গুণের কারণে তিনি বহুধা বিভক্ত প্রবাসী বাঙালিদেরকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে একই ছাতার নীচে ও আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলনে নামিয়ে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত লন্ডন আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন তা' পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই বাংলাদেশ আন্দোলনে তাঁর (বিচারপতির) অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন বিধায় তিনি (মিসেস গান্ধী) বাংলাদেশ আন্দোলনে আরও বেশী সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন এবং উল্লেখিত সাক্ষাৎকারকালে মিসেস গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক' ধারণা ভারতের সংবিধান প্রবর্তনের ২৬ বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরীর ব্যক্তিগত অবদান বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 'দি বার্থ অব বাংলাদেশ' আলোচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিসেস গান্ধী ও ভারতের ভূমিকা আরও বেশি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং তিনি (বিচারপতি চৌধুরী) মিসেস গান্ধী ও ভারতের প্রতি যে কৃতজ্ঞা দেখিয়েছেন যা বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহসে তাঁকে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার করে তুলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আবদুল মতিনের 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিল' গ্রন্থদ্বয়ের সহায়তা নিয়ে এবং প্রয়াত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পুত্রদ্বয় আবুল হাসান চৌধুরী ও আবুল কাশেম চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা যায়।

(i) ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ঃ

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দন্ডিত হয়ে অনিবার্য মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। পূর্ব বঙ্গ থেকে ৯০ লক্ষ বাস্তুত্যাগী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে ভারত সরকারের জন্য এক অসহনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তখন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে তিন-সপ্তাহব্যাপী সফরকালে তিনটি বিষয়ের প্রতি সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত বিষয়গুলি হলো: (ক) ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাস্তুত্যাগীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতকে অবিলম্বে পর্যাপ্ত সাহায্য দিতে হবে, (খ) বিদ্যমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের জন্য পাশ্চাত্যের

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যদানকারী দেশগুলি কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং (গ) সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি ক্ষুণ্ন হয়নি।

উল্লিখিত সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৯ অক্টোবর (শুক্রবার) ভিয়েনা থেকে লন্ডনে পৌছান। লন্ডনে পৌছাবার কয়েক ঘন্টা পর যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ মিশনের প্রধানের এবং 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মেফ্লাওয়ার এলাকায় অবস্থিত ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে গিয়ে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোপনীয়তা রক্ষা এবং নিরাপত্তার খাতিরে রাত দু'টার সময় এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয় এবং তা' ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়।

২০০৬ সালে প্রকাশিত এক গ্রন্থে ভারতের প্রাক্তন কূটনৈতিক অফিসার শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জী বলেন, মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনে নিয়োজিত ভারতীয় হাই কমিশনার আপা বি.পন্থ-কে (Apa B. Pant) অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আলোচনাকালে বিচারপতি চৌধুরী মিসেস গান্ধীকে বলেন, তাড়াহুড়ো করে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী অব স্টেট জোসেফ সিসকো (Joseph Sisco) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিহার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। মি. সিসকোর স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলে তিনি (বিচারপতি) আশাতীতভাবে পুরস্কৃত হবেন। এই পুরস্কারটি হবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাঝারি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এ ধরনের একটি প্রস্তাব পেশ করায় বিচারপতি চৌধুরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন।[১] তখনকার "শীতল যুদ্ধের" (Cold War) যুগে মরিয়া হয়ে যে-কোনো উপায়ে সর্বনাশের আশঙ্কা দূর করা প্রয়োজন ছিল। এই ঘটনা থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গভীরতা প্রমাণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের কাছ থেকে বিচারপতি চৌধুরী যা' শুনেছেন তা' যদি সঠিক হয়, তা হলে উল্লিখিত প্রস্তাব পাকিস্তানকে সমূলে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের তখনকার পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে শেষ রক্ষার চেষ্টা বলে গণ্য করা যায়।

বিচারপতি চৌধুরীকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে টলানো সম্ভব ছিল না। তিনি অবিচলিত থেকে বিনা দ্বিধায় উল্লিখিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের প্ররোচনামূলক প্রস্তাব তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। তাঁকে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করে উল্লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য প্রকাশ করে অফিসারদের ধন্যবাদ জানান।

বিচারপতি চৌধুরী মিসেস গান্ধীকে বলেন, মার্কিন অফিসারদের তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, আরামদায়ক পদ প্রাপ্তির আশা না করেই তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জড়িত রয়েছেন এবং এ পথ থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলমান-অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা বজায় রাখার ব্যাপারে হিন্দু-প্রধান ভারত কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে বলে মার্কিন অফিসাররা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর কণ্ঠে সৌজন্যের রেশ বজায় রেখে অফিসারদের বলেন, পাকিস্তানের নিপীড়নকারী সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যে-জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবস্থান নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে, তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যাপারে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হবে না।[২]

বিচারপতি চৌধুরী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম-এর (Sir Alec Douglas-Hume) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা মিসেস গান্ধীকে বলেন, এই সাক্ষাতের ব্যাপারটি বিশেষ গোপনীয় বলে বিবেচিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের অঙ্গ এবং দেশটির সঙ্গে ব্রিটেনের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। স্যার আলেক জানতে চান, হিন্দু-প্রধান ভারত ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ ঘিরে থাকার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অস্বস্তির মনোভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনার কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ ভেবে দেখেছেন কি-না। বিচারপতি চৌধুরী একই ধরনের প্রশ্নের যে-উত্তর জোসেফ সিসকো-কে দিয়েছিলেন, তা' পুনরাবৃত্তি করেন। স্যার আলেক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতিশীল বলে ইঙ্গিত দেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সমর্থনসূচক কোনো মন্ত ব্য করেননি। বিচারপতি চৌধুরী মিসেস গান্ধীকে বলেন, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি খুব উৎফুল্লবোধ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন, বাংলাদেশের জনগণের চরম দুর্দিনে তাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিক সহানুভূতির জন্য তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সুবিবেচনাপূর্ণ অবস্থান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশংসনীয় বলে বিবেচনা করেন।

মিসেস গান্ধী তাঁর পরবর্তী গন্তব্যস্থান ওয়াশিংটনে জোসেফ সিসকোর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর আলোচনার কথা প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা হেনরী কিসিংগারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে উল্লেখ করার ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরীর অনুমতি চান। বিনা দ্বিধায় তিনি রাজী হন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত ডঃ কিসিংগারের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে মিসেস গান্ধীর সাক্ষাৎকার প্রচন্ড কোলাহলপূর্ণ (Stromy) বলে উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মিসেস গান্ধী কখন স্বীকৃতি দেবেন, তা' জানার জন্যই বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি পাওয়া গেলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই অনতিবিলম্বে ভারতের স্বীকৃতি লাভের জন্য তিনি উদগ্রীব ছিলেন।

মিসেস গান্ধী বিচারপতি চৌধুরীর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন: বাংলাদেশ যখন স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তিনি (বিচারপতি) যদি সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তা'হলে তিনি কি এ সম্পর্কে কোনো রকম আশ্বাস দিতে পারেন? স্বাধীনতা লাভের আগেই তাঁর পক্ষে যা' বলা সম্ভব, তা' তাঁর কাছ থেকেই মিসেস গান্ধী শুনতে চান।

স্বাধীনতা অর্জনের কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জনগণের সামরিক নির্যাতন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বিপ্লবের পতাকা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা মনে রেখে মিসেস গান্ধী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সুচিন্তিত ধারণাগুলি রাজনৈতিক দলিল (Political Testament) হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের কাছ থেকে মিসেস গান্ধী আশা করেন এবং (১) জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে বাধাদানকারী সামরিক একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, (২) পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে জোট-নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করবে এবং (৩) বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পরের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে উভয় দেশের পক্ষে কল্যাণজনক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে মিসেস গান্ধী দেশটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন জানতে পেরে বিচারপতি চৌধুরী অত্যন্ত খুশী হন। মিসেস গান্ধীর ধারণাগুলি সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় উত্তর দান উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতির ব্যাপারে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ইতঃপূর্বে একাধিক বার প্রকাশ্যে তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। বিচারপতি চৌধুরী মনে করেন, স্বাধীনাত অর্জনের পর শেখ মুজিব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাঁর অঙ্গীকার তিনি পালন করবেন না বলে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে প্রাণদণ্ড দানের আশঙ্কার কথা তিনি মিসেস গান্ধীর কাছে প্রকাশ করেন। আশঙ্কা সত্য হলে শেখ মুজিবকে বাদ দিয়েই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিসেস গান্ধী উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যে-ভাবে আশ্বাস পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তা' থেকে বিচারপতি চৌধুরী মনে করেন, শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও একই ধরণের পরিণতি আশঙ্কা করছেন। তাঁর আশ্বাসের "মূল্য যা'ই হোক না কেন" শব্দগুলি উল্লেখ করে বিচারপতি চৌধুরী মিসেস গান্ধীর দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্য প্রত্যাশিত আশ্বাস দেন।

সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার আগে বিচারপতি চৌধুরী মিসেস গান্ধীর কাছে জানতে চান, ভারতের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দু'টি অনুপস্থিত বলে তিনি লক্ষ্য করছেন কি-না। বুদ্ধিতে বিচারপতি চৌধুরীর কাছে মিসেস গান্ধী পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। তিনি বলেন, এটা তাঁর অজানা নয় এবং যথাসম্ভব শীঘ্রই ভারতের পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের নিয়মকানুনের আওতায় পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা হবে। প্রায় পাঁচ বছর সচেষ্ট থেকে ভারতের লোকসভায় সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন সম্পর্কিত আইন পাশ করে মিসেস গান্ধী 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দু'টি যোগ করতে সমর্থ হন। ১৯৭৭ সালে এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দু'টির কার্যকারিতা সূচিত হয়। বিচারপতি চৌধুরীর অনুসন্ধিৎসুমূলক প্রশ্নের ফলে তা' সম্ভব হয়। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান প্রবর্তনের ২৬ বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক' ধারণা বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরীর ব্যক্তিগত অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিসেস গান্ধীর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকারকালে উভয়ের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করার জন্য মি. ব্যানার্জীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে মি. ব্যানার্জী বলেন, উল্লিখিত সাক্ষাৎকার ভবিষ্যতে ইতিহাসের অঙ্গে পরিণত হবে বলে তিনি তখন নিশ্চিত ছিলেন না।

২০০৯ সালের আগস্ট মাসে আবদুল মতিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মি. ব্যানার্জী বলেন, ডঃ কামাল হোসেন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিসেস গান্ধীকে জানাবার কথা বিচারপতি চৌধুরী ভুলে গিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর (সম্ভবতঃ অগাস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে) প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সেক্রেটারী অব স্টেট (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ডঃ হেনরী কিসিংগার এক সফর উপলক্ষ্যে লন্ডনে আসেন। বিচারপতি চৌধুরীর টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে ডঃ কিসিংগার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর হোটেলে আলোচনাকালে ডঃ কিসিংগার বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন: "ডঃ কামাল হোসেন আমার বন্ধু। অনুগ্রহ করে তাঁকে সুনজরে দেখবেন"। ("Dr. Kamal Hussain is my friend.

Dhaka University Institutional Repository

Please look after him.") ডঃ কিসিংগারের কথাবার্তা থেকে বিচারপতি চৌধুরীর মনে হয়েছিল, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে বলে তিনি (ডঃ কিসিংগার) বুঝতে পেরেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ডঃ কামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাবেন বলে ডঃ কিসিংগার আশা করেছিলেন।

২৯ অগাস্ট (১৯৭১) মিসেস গান্ধী লন্ডনে পৌঁছানোর আগেই বিচারপতি চৌধুরী ডঃ কিসিংগারের উল্লিখিত গোপন আলোচনার কথা মি. ব্যানার্জীকে অবহিত করেছিলেন।

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. "Justice Chaudhury disclosed (to Mrs. Gandhi) that Joseph Sisco, the U.S.Assistant Secretary of State, who was accompanied by another official, pleaded with him in a hurriedly called meeting in Washington to withdraw the Bangladesh liberation movement. In return, he would be richly rewarded. The prize was that he would be made the president of Pakistan. Justice Chaudhury was quite puzzled that such a suggestion could be made by 'almost a middle ranking officer of the U.S.State Department' on behalf of the State of Pakistan. But then those were the days of the Cold War and the moment was anxious and there was the need for desperate remedies."
[সূত্রঃ 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh, Sashanka S. Banerjee, p.132.' এবং 'দি ইকোনমিস্ট', লন্ডন, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭১-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-৬২-৬৩, ৭২-৭৩।]

২. "Justice Chaudhury told Mrs. Gandhi that he made a categorical statement to the U.S.Officials asserting that he was not seeking the comfort of office but wanted a sovereign Independent State of Bangladesh and nothing could distract him from his determination to achieve it. He added that the State Department official also took the line that Hindu-majority India could make it pretty difficult for a break away Muslim East Pakistan to securely maintain its independence. Justice Chaudhury politely reminded his interlocutor that if the people of Bangladesh could display so much grit and determination in taking on the might of such a repressive military dictatorship like Pakistan, they should have little difficulty in dealing with India, a secular democracy."
[সূত্রঃ 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh, Sashanka S. Banerjee, p.131-135.'-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-৬৩-৬৭, ৭২-৭৩।]

(ii) ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের পর বিচারপতি চৌধুরী ঃ

১৯৭১ সালে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের পর দিন (১৭ ডিসেম্বর) ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম রণাঙ্গনে একতরফাভাবে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তখন লাহোর থেকে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থান নিয়ে চূড়ান্ত আক্রমণের অপেক্ষা করছিল। দূরপাল্লার কামান ব্যবহার করে লাহোর এবং আশপাশের শিল্পাঞ্চলগুলিকে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া তখন দিল্লীর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছিল। অনেকেই অনুমান করেছিলেন, ভারতের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে পশ্চিমাঞ্চলে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সুযোগ তারা গ্রহণ করবে।

১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) ঢাকায় পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন ও সর্বভৌম বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে গৌরবজনক স্থান গ্রহণ করে। উপনিবেশবাদ-বিরোধী ও সফল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই সাফল্য দুনিয়া-কাঁপানো একটি ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়। শীতল যুদ্ধের কড়াইতে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী শেষ-রক্ষা করতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক ও বহির্বিশ্বের 'মুজিবনগর' সরকারের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন লন্ডন ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাঁর তখনকার

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অধীর আগ্রহে তার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তা' সত্ত্বেও বিপুল ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে অর্জিত স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কিত আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশ তাঁর কাছে ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হয়েছিল।

ভারতের প্রাক্তন কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জী তাঁর একটি গ্রন্থে বলেন, পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত মিসেস গান্ধীর একতরফাভাবে প্রদত্ত ঘোষণা বিচারপতি চৌধুরী খুশিমনে গ্রহণ করতে পারেননি বলে মনে হয়েছিল।

লাহোরের দ্বারপ্রান্তে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণকারী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আক্রমণ অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্তে অটল ছিল এবং পাকিস্তানের আকাশে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও ভারতীয় বিমানবাহিনী ভূমিতে অবতরণ না করার জন্য সচেতনভবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ঢাকায় পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী আত্মসমর্পণের পর পশ্চিম পাকিস্তানকে ধ্বংস এবং অপমাণিত না করার উদ্দেশ্যে গৃহীত মিসেস গান্ধীর সিদ্ধান্ত সামরিক-কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রান্তিজনক বলে বিচারপতি চৌধুরী বিবেচনা করেন। এর ফলে ভবিষ্যতে দিল্লী ও ঢাকাকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের কয়েক দিন পর (২২ কিংবা ২৩ ডিসেম্বর) বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনের উত্তর-পশ্চিম এলাকার হেন্‌ডনে (Hendon) তার নিজের বাড়িতে মি. ব্যানার্জীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে উল্লিখিত মনোভাব প্রকাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পশুসুলভ পাঞ্জাবী সদস্যরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় সমন্বিত জাতিগোষ্ঠির প্রতি যে অমানবিক আচরণ করে, সে সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরী সচেতন ছিলেন। পাঞ্জাবী সৈন্যরা বাঙালিদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। গণহত্যায় জড়িত পাস্তানী সৈন্যদের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল পাঞ্জাবী। বাকি ২০ শতাংশ ছিল পাঠান।

পাকিস্তানবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পরিখাগুলি (Trench) থেকে হাজার হাজার যুবতীকে উদ্ধার করা হয়। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিরোধিতা করার জন্য গণশাস্তি হিসেবে উল্লিখিত যুবতীদের বলপ্রয়োগ করে পরিখার মধ্যে আটক রাখা হয়। একটি বিশ্বাসযোগ্য হিসেব অনুযায়ী, ধর্ষিত ও লাঞ্ছিত মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ধর্ষণের ফলে যারা সন্তানসম্ভবা হন, তাদের সামাজিকভাবে পুণঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যা অর্থনৈতিকভাবে বিপদগ্রস্থ বাংলাদেশ সরকারের জন্য এক গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে ধর্ষিত মহিলা ও তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাকিস্তানী বর্বরতার বিবরণ সভ্য মানুষকে শিহরিত করে।[১]

মি. ব্যানার্জী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের উপর মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পকিস্তানবাহিনী বাঙালি মহিলাদের ক্ষেত্রে যে অমানবিক ও অসম্মানজনক আত্যাচারের কৌশল প্রয়োগ করে, তার নজির মানব ইতিহাসে নেই। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে উল্লেখিত দুর্বৃত্তদের বিচার করার দাবি তথাকথিত 'সভ্য জগৎ' কখনো উত্থাপন করেনি। তাদের এই নিষ্ক্রীয়তা ঘোরতর নীতিবিরুদ্ধ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। ভারত কিংবা বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘ কিংবা অন্য কোনো অন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে দাবি উত্থাপন করেনি বলে মি. ব্যানার্জী উল্লেখ করেন।

মি. ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, পাঞ্জাবী সৈন্যদের অমানবিক আচরণ ও দুর্বৃত্তপনার ফলে পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র হিসেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মর্মবেদনা অনুভব করেন। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতি এর বিকল্প ছিল না বলে তিনি স্বীকার করেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য পাকিস্তানের ধ্বংসপ্রাপ্তি একমাত্র উপায় ছিল বলে তিনি মনে করেন।

বিচারপতি চৌধুরী আরো বলেন, সিন্ধুদেশ, পাখতুনিস্তান ও বালুচিস্তান সংঘবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানী শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শুরু করার সুর্বণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ থাকলে উপমহাদেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অবিলম্বে মিসেস গান্ধীর কাছে লিখিত এক বিচারপতি চৌধুরী তাঁর বিবেচনায় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করে একতরফাভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাকে তিনি সামরিক কৌশল সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুতর ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেন। পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি যা করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে বিষধর "কিং কোব্‌রা" নামে পরিচিত সাপের শুধু লেজ কেটে মাথাকে অক্ষত রাখার সঙ্গে তুলনা করে বিচারপতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি আরো বলেন, এর ফলে আহত সাপটি কয়েকগুণ বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ এবং অধিকতর বিষময় হয়ে উঠবে। ঠিক তেমনি পাকিস্তান নিজেকে অন্যায্য আচরণের শিকার বলে বিবেচনা করে চরম ঘৃণার বশবর্তী হয়ে পূর্বের তুলনায় অধিকতর হিংস্র শত্রুতে পরিণত হবে।

বিচারপতি চৌধুরীর চিঠিখানি মি. ব্যানার্জী প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর হাতে পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিচারপতি চৌধুরী তাঁর চিঠির উত্তর পাবেন বলে আশা করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যানার্জী আরো বলেন, পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়, সামরিক-কৌশলগত ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরীর আশঙ্কা সঠিক ছিল এবং মিসেস গান্ধীর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ছিল না। তা' সত্ত্বেও মিসেস গান্ধীর প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় হবে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে তিনি পাকিস্তানকে সমূলে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকেন।

বিদ্যমান সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার-বিশেষণ করে মিসেস গান্ধী পশ্চিম রণাঙ্গণে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক কারণ এক্ষেত্রে গৌণ ছিল। পাকিস্তানের প্রতীক ও প্রাণকেন্দ্র লাহোরকে ধ্বংস করা হলে পাকিস্তানী জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সে সম্পর্কে মিসেস গান্ধী ও তাঁর যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন বলে অনুমান করা হয়। লাহোর আক্রমণ করা হলে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঞ্জাবীদের মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। লাহোরের ঘুটন্ত কড়াইতে আক্রমণ চালানো হলে ১০ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিহত হবে অনুমান করা হয়। লাহোরকে কয়েক মাসের বেশি ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতো না। তা' ছাড়া লাহোর থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য ভারতের উপর গুরুতর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পকালস্থায়ী সামরিক সাফল্য অর্থহীন হবে বলে বিবেচিত হয়। একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে মিসেস গান্ধীর ঘোষণা জারীর পক্ষে যে সব যুক্তি ছিল, তার মধ্যে উল্লেখিত কারণগুলি ছিল অন্যতম।

সামরিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন, ভারতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ান পশ্চিম রণাঙ্গণে ভারতের আক্রমণ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'সল্ট' চুক্তি (Strategic Arms Limitation Treaty) সম্পাদন সম্পর্কিত আলোচনায় জড়িত ছিল। মার্কিন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত 'সেন্টো'-র (Central Treaty Organisation) সদস্য-দেশ পাকিস্তানকে আক্রমণ করা হলে তারা নিশ্চয় এই অনুযায়ী সাহায্যের দাবি জানাবে। এর ফলে পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হবে। অতএব, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে।

১৯৭১-এ পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের অব্যবহিত পর লন্ডনে সংঘটিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত আবদুস সামাদ আজাদ ১৬ ডিসেম্বর লন্ডনে পৌঁছান। ঢাকায় পাকিস্তান-বাহিনী আত্মসমর্পণের খবর পাওয়ার আগেই দিল্লী থেকে রওয়ানা হওয়ার ফলে তিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর পর বিজয় দিবসের খবর জানতে পারেন।

লন্ডনে পৌঁছানোর পর কালক্ষেপন না করে মি. আজাদ ট্রাফালগার স্কোয়ারের নিকটবর্তী চেরিংক্রস্ হোটেলের একটি কক্ষে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির কয়েকজন নেতার সঙ্গে এক গোপন বৈঠক মিলিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পাঠান নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান (Kham Abdul Wali Khan) এবং বালুচীস্তানের নেতা নওয়াব আকবর খান বুগতি (Nawab Akbar Khan Bugti)। তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ প্রদেশের বঞ্চিত জনসাধারণের পক্ষে আন্দোলন সম্পর্কিত প্রচারণা চালাবার জন্য লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সমর্থন নিয়ে অবিলম্বে পাঞ্জাবী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে একটি যুক্ত-ফ্রন্ট গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মি. আজাদ তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। প্রস্তাবিত যুক্ত-ফ্রন্টের প্রতি ভারত সরকারের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার সম্ভবনা ছিল এই পরিকল্পনার ভিত্তি। যুদ্ধজনিত বিশৃঙ্খলা এবং পাঞ্জাবী শাসকদের প্রতি ঘৃণার সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু প্রদেশগুলি নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল প্রধানতঃ পাঞ্জাবীদের অপশাসন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠিকে নিপীড়ন-বিরোধী সংগ্রাম। অতএব, বাঙালিদের বিজয় সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির জনগণকে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে বলে ঢাকার কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন। তা' ছাড়া পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির জনসাধারণের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশ ও সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির প্রধান শত্রু পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার ব্যাপারে সাহায্য চাইলে বাংলাদেশ সহানুভূতির সঙ্গে তা' বিবেচনা করবে বলে নেতৃদ্বয়কে আশ্বাস দেওয়া হয়।

উল্লেখিত আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি। বলা বাহুল্য, আলোচনা সফল হলে পশ্চিম পাকিস্তান খন্ড হয়ে রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

উল্লিখিত গোপন আলোচনা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ঢাকার কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল বলে মি. ব্যানার্জী প্রকাশ করেন।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিকিৎসার জন্য লন্ডনে আসেন। তখন তিনি পাকিস্তানের সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির কয়েকজন নেতার সঙ্গে গোপন আলোচনাকালে তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত সহায়তার প্রস্তাব পুণরায় উত্থাপন করেন। এই আলোচনাও ফলপ্রসু হয়নি।

পরবর্তী কালে মি. ব্যানার্জীর সঙ্গে আলোচনা উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান সম্পর্কে বলেন, পাকিস্তানের জাতিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বাঙালিরাই পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদের সবচেয়ে সাহসী জনগোষ্ঠী বলে প্রমাণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাসের একটি গৌরবজনক অধ্যায়। সঠিক তথ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ যাবৎ লেখা না হলেও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বেশকিছু সংখ্যাক বই লেখা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপরিমেয় সাহস, আত্মপ্রত্যয় এমন কি আত্মত্যাগ সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি বলে মনে হয় না। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মহিলাদের গৌরবজনক ভূমিকা, বিশেষ করে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিতা মহিলাদের কথা উল্লিখিত বইপত্রে অনুপস্থিত বললেই চলে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্ষিত মহিলাদের "বীরাঙ্গণা" আখ্যা দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের পরোক্ষ অবদান সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ধর্ষিত মহিলাদের সম্পর্কে আমাদের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা নারী-বিদ্বেষপ্রসূত ও মানবতা-বিরোধী। বেশি দিনের কথা নয়। এই শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু-ধর্মাবলম্বী ধর্ষিত নারীর জন্য আত্মহত্যার বিকল্প হিসেবে বাকি জীবন কাশী-বাস অবধারিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে-যুগ অতীত হলেও যৌন-নির্যাতনে নারীর আকাঙ্খিত সদগুণ থাকা সত্বেও স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন যাপনের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই মুক্তিযুদ্ধাকালে নির্যাতিত নারীদের নিজের মা, বোন ও কন্যার মতো বিবেচনা করে তাঁদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। বাঙালি মহিলাদের দুর্ভোগ, অবমাননা ও ধর্ষণের হৃদয়বিদারক বিবরণ পাওয়া যায় ড. নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' (দু'খন্ড) গ্রন্থে। ধর্ষিত ও লাঞ্ছিত মাহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। [প্রকাশকঃ জাগৃতী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪।]

২. Sashanka S. Banerjee, 'A Long Jorney Together : India, Pakistan and Bangladesh', pp. 225-229; 'India's Security Dilemmas: Pakistan and Bangladesh, Sashanka S. Banerjee, pp. 125-128'. -এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-১৭-২৩।]

(iii) প্রসঙ্গ 'দি বার্থ অব বাংলাদেশ' ঃ

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'ইন্দিরা গান্ধী স্মারকগ্রন্থে'[১] সংযোজিত 'দি বার্থ অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক নিবন্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন:

"১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে শেষ দিন আমি লন্ডনে ছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় টেলিফোনের ঘন্টা বাজতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শেখ আবদুল মান্নান টেলিফোন লাইনের অপর প্রান্তে ছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেন, আততায়ীদের গুলির আঘাতে মিসেস গান্ধী নিহত হয়েছেন। এই খবর শোনার সময় আমার মনে হলো, সময় থেমে গিয়েছে। কী ঘটেছে আমি তা' ক্রমে ক্রমে বুঝতে শুরু করলাম। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা দুনিয়া এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বহুকাল যাবৎ তিনি শুধু একজন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন না; তিনি ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনেরও প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তিনি। মানব ঐক্যের একত্বের প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল।"

"আমি নীরবে বসে পড়লাম। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের বিয়োগান্ত রাতের কথা আমার মনে পড়লো। একমাত্র ঢাকা শহরেই হাজার হাজার লোকজন প্রাণ হারায়। সেই রাতে কী ঘটেছিল তা' বিশ্ববাসী আতঙ্কের সঙ্গে জানতে পারলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করা হয়েছে। অগ্রিম খবর না দিয়ে বিনা আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের আশ্রয় দেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রবাসী সরকারকে সহায়তা দান করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের উদগাতা বলে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা সারা বিশ্বে প্রচার করে। আমি বলেছিলাম: 'মিসেস গান্ধীর নির্দেশ অনুযায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া খান যদি গণহত্যা শুরু করে থাকে, তবে তাই হয়েছিল।' এই হত্যাকান্ডের ফলে আমাদের জাতির প্রত্যেকেই স্বাধীনতার দাবি উথাপন করেছিল।"

"পরদিন আমি শোকজ্ঞাপক বইতে দস্তখত করার জন্য লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশানে গিয়েছিলাম। শোকগ্রস্থ দুনিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিসেস গান্ধীর স্মৃতির প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেছি। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমার ইউরোপ অবস্থানকালে সত্যাগ্রহের অপ্রতিদ্বন্দী ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী নিহত হন। ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে আমি যে দৃশ্য দেখেছি তা' আমাকে ৩৭ বছর আগেকার ঘটনাবলী কথা মনে করিয়ে দেয়।"

"মিসেস গান্ধীর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে ১৯৭১ সালে লন্ডনের ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে সাক্ষাৎকার কালে হৃদয়গ্রাহী আলোচনার কথা আমার মনে পড়লো। এই আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল অক্টোবর মাসে।"

"মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর লন্ডন পৌছানোর অল্প কয়েক ঘন্টা পর আমি ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে গিয়েছিলাম। 'লিফট'-এর কাছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর (পুলিশের সদর দপ্তর) একজন

Dhaka University Institutional Repository

অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাকে অপহরণ করার একটি চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি কিছুকাল আগে আমাকে অবহিত করেছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আপা পন্থ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসার অনুরোধ জানিয়ে মিসেস গান্ধীকে খবর দেওয়ার জন্য যান। মিনিটখানেক পর তিনি এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে এই প্রথমবার আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার সঙ্গে পুরানো বন্ধুর মতো কথা বলতে শুরু করেন। ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে আমার সফরের অভিজ্ঞতা এবং মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়াশিংটনে আমেরিকান কংগ্রেস ও সিনেটের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল তিনি জানতে চান। সেদিন (৩০ অক্টোবর) বিকেল বেলা প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা থাকায় আমার সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমাকে যথেষ্ট সময় না দিয়ে এই সাক্ষাতের আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়েছেন বলে মিসেস গান্ধী উল্লেখ করেন।"

"আমি তাঁকে বললাম, বিভিন্ন দেশের জনগণ ও সরকার আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে তারা বলেন, ভারত কর্তৃক স্বীকৃতিদানের পর তাদের পক্ষে স্বীকৃতিদান সম্ভব হবে। কিছুটা আবেগপূর্ণ স্বরে আমি আরো বললাম, 'আপনার পিতা জীবিত থাকলে শুধু বাস্তত্যাগীদের আশ্রয় দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না।' তাঁর চেহারায় বিষন্নতা লক্ষ্য করে আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম। আমি আরো বললাম, 'সব কিছুর পর' প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছুই আমার নেই।"

"বাংলাদেশ কখনও ভারতের করদরাজ্যে পরিণত হবে না, কিন্তু স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারতের বন্ধু-রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করবে, যদি এর কিছু মূল্য থাকে।"

"এসব কথোপকথন স্মরণ করে আমি তৎকালে এর অপ্রাসঙ্গিকতার কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। কিন্তু আমি তখন বিদ্রোহোন্মুখ ছিলাম। সর্বত্র আমি পাকিস্তানের প্রচারণার বিরোধিতা করছিলাম। তাঁর চেহারায় বিরক্তির আভাসও দেখা গেল না। তিনি আমার উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে মৃদু হাসির সঙ্গে স্থির ও শান্ত থেকে প্রায় সলজ্জভাবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি অদ্রভজনোচিত স্বরে বললেন: 'বিচারপতি চৌধুরী, বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে আপনি আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' তিনি আরো বলেন: 'আপনি প্রতিদানের কথা বলছেন; প্রতিদান হিসেবে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের কাছ থেকে শুধু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আশা করবো। আমি একটি প্রতিবেশী দেশে সামরিক শাসন পছন্দ করি না।' পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সফরকালে তাঁর সম্মানার্থে আমার উদ্যোগে আয়োজিত ভোজসভায় আমি উল্লিখিত কথাগুলি স্মরণ করিয়া দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেছিলাম।"

"লন্ডনে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারকালে আমি মিসেস গান্ধীকে আরো বলেছিলাম, জয়প্রকাশ নারায়নের (সর্বোদয় নেতা) সাম্প্রতিক লন্ডন সফরকালে আয়োজিত এক জনসভায় বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদান বিলম্বিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, আমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। স্বীকৃতিদানের অধিকারী হলে আমি বহু আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করতাম।' ঈষৎ হেসে তিনি (মিসেস গান্ধী) বলেন: 'সরকারী দায়িত্বমুক্ত নাগরিকের অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত।' এরপর তিনি বলেন: 'বিচারপতি চৌধুরী, মানবতার খাতিরে আমি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে সর্বোতভাবে সাহায্য করছি, কিন্তু অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের জনগণের স্বার্থের প্রতি নজর রাখা আমার প্রাথমিক কর্তব্য। ভারতের উপর আমি একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারি না। বিনা প্ররোচণায় আমাদের দেশকে আক্রমণ করা হলে, কী ভাবে আমরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো, তা' আমরা জানি।' তাঁর সেই সফরকালে লন্ডনের সাংবাদিকদের তিনি নিজেই বলেন, একটি আগ্নেয়গিরির উপর তিনি অবস্থান করছেন। বাংলাদেশকে উপযুক্ত মুহূর্তে বিনা দ্বিধায় স্বীকৃতিদান করবেন বলে তিনি আমাকে আশ্বাস দেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাই করেছিলেন।"

"সরকার-প্রধানদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নবগঠিত জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সফরকালে বঙ্গভবনে (রাষ্ট্রপতির সরকারী ভবন) আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। জাতির জনক শেখ মুজিব তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বঙ্গভবনে নিয়ে আসেন। আমার স্ত্রী ও আমি তাঁকে প্রীতিসম্ভাষণ জানাবার সময় তাঁর চোখেমুখে দুর্লভদর্শন হাসি ও শান্ত-সমাহিত ভাব লক্ষ্য করলাম। কী সাহসের সঙ্গে তিনি দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবেশীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ অনুযায়ী কত তাড়াতাড়ি তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করলেন! এখন তিনি বন্ধু হিসেবে এসেছেন। ইতিহাসে এ ধরণের গৌরবজনক অর্জনের ঘটনা বিরল। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে যা-কিছু প্রচারণা চালানো হোক না কেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর ভূমিকা পালন করেছে, অন্য কিছু নয়।"

"তাঁর তিন দিনব্যাপী সফরকালে তিনি অনবরত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শুধু যুদ্ধের সময় সহায়তাদান যথেষ্ট নয় বলে তিনি মনে করেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ন্যায্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

"রাষ্ট্রপতি গিরির (President Giri) আমন্ত্রণে আমার স্ত্রী ও আমি ১৯৭২ সালের শেষ দিকে যখন ভারত সফরে গিয়েছিলাম, তখন একই ধরণের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করেছি। ভারতীয় পার্লামেন্টে বক্তৃতাদানকালে আমি

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলাম: 'আমার দৃষ্টিতে তিনি (মিসেস গান্ধী) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও অনেক বড়; তিনি নেহরুর কন্যা এবং নেহরুর পৌত্রী।' আমি বলতে চেয়েছিলাম, তিনি শুধু দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহদাকার গণতান্ত্রিক দেশের পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার-প্রধান ছিলেন না, মতিলাল নেহরু এবং জহরলাল নেহরুর মতো দু'জন মহান নেতার গুণাবলীর উত্তরাধিকারিণীও ছিলেন। আমি যখন বললাম: 'আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী,' তখন পার্লামেন্ট সদস্যরা হাততালি দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে আনন্দ প্রকাশ করেন। মিসেস গান্ধীও তাই করেন। এ ব্যাপারে ভারতের রাজধানীতে আমি প্রকৃত উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছিলাম। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানের ৯০ হাজার আত্মসমর্পণকারী সৈনিক ও অফিসারদের বিচার না করে ফেরৎ পাঠাবার ব্যাপারে বাংলাদেশকে উৎসাহ দেন।"

"আমাকে বলতেই হবে, দু'টি দেশের সরকার-প্রধানদের মধ্যকার সম্পর্ক অনন্য ছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসার সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে তাঁদের সাক্ষাতের আগেই তাঁর জনগণ ও নিজের দেশের প্রতি শেখ মুজিবের আনুগত্য এবং দু'যুগেরও অধিক কালব্যাপী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ফলে মিসেস গান্ধীর মনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়েছিল। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ছিল এই বন্ধুত্বের ভিত্তি।"

"ভারতের রাজধানীতে প্রায় তিন দিন কাটিয়ে আমি অন্যান্য জায়গায় সফর করেছি। দিল্লী থেকে আমি শান্তি নিকেতনে গিয়েছি। সেখানে পৌঁছানো মাত্র 'হেলিপোর্ট' থেকে সরাসরি একটি অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। উপাচার্য আমাকে অভ্যর্থনা জানান। আমি বক্তৃতাদানের জন্য দাঁড়ালে আমার এ. ডি. সি ইতোপূর্বে লিখিত বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে আসে। মিসেস গান্ধী তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে কানে কানে বলেন, এই অনুষ্ঠানে আমাকে শুধু অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে এবং আমার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পেশ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত মতো বক্তব্য পেশ করলাম। এ থেকে বোঝা যায় তিনি কত সতর্ক ছিলেন। আমি বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবন যে আদর্শের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, তার বিজয় সূচীত হয় বাংলাদেশের জয়লাভের মধ্য দিয়ে। বহু স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনে মিসেস গান্ধী আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত সময় কাটিয়ে ছিলেন।"

"মিস্ পদ্মজা নাইডু (Miss Padmaja Naidu-পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল) আমাকে বলেন, ১৯৭১ সালের যে দিন (পাকিস্তান কর্তৃক) ভারত আক্রান্ত হয় সেদিন মিসেস গান্ধী কোলকাতায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী ফিরে গিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক শেষে সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। মিসেস গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মিস্ নাইডু সেই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গদান করার জন্য তাঁর বাসভবনে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, একটি সাময়িকপত্রিকা হাতে নিয়ে তিনি গভীর ঘুমে অচেতন অবস্থায় রয়েছেন। মিস্ নাইডু বলেন: "মি. প্রেসিডেন্ট, অনুমান করেন, এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কেমন নিরাবেগ থাকতে পারেন। তিনি সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁর স্বাভাবিক প্রশান্তির কারণে সহজেই গভীর ঘুমে চোখ বুজতে পারেন।' মিস্ নাইডু তাঁর অতি প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নীরবে চলে আসেন।"

"আমার আজীবন বন্ধু ও পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। এ থেকে বোঝা যাবে, তিনি জনগণের হৃদয়ের কত কাছাকাছি ছিলেন। একবার তাঁর কোলকাতা সফরকালে একটি হেলিকপ্টার তাঁকে রাজভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দমদম বিমানবন্দরে অপেক্ষমান ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেন, একটি খোলা মোটরগাড়িতে রাজভবনে যাওয়ার সময় তাঁকে একনজর দেখে জনগণ যে আনন্দ উপভোগ করবে, তা' থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত হবে না। সিদ্ধার্থ আমাকে বলেন, যে-জনগণের তিনি সেবা করছেন, তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা তাঁর নিজের জীবনের নিরাপত্তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দমদম থেকে রাজভবনে যাওয়ার পথে তিনি গাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে জনগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেন। পরিহাসের বিষয় হলো, হত্যাকারীরা যখন তাঁর দিকে এগিয়ে যায়, তখন তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসভরে একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে প্রকাশ।"

"ঠিক এক বছর আগে, মিসেস গান্ধীর নিজের দেশের ৭০ কোটি জনগণের দৃষ্টি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে জেলখানা থেকে তাঁর পিতা লিখেছিলেন: 'প্রিয়দর্শিনী দৃষ্টিনন্দিনী, কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে অধিকতর দৃষ্টিনন্দিনী!'[১] তিনি তাই থাকবেন।"

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১. ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নয়া দিল্লীতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীর নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন লন্ডনে ছিলেন।
[সূত্রঃ মিসেস গান্ধীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" কর্তৃক প্রকাশিত "ইন্দিরা গান্ধী: স্টেট্সমেন্, স্কলার্স এ্যান্ড ফ্রেন্ডস্ রিমেমবার" শীর্ষক স্মারকগ্রন্থে বিচারপতি চৌধুরীর "দি বার্থ অব বাংলাদেশ" শিরোণাম সংবলিত এই লেখাটি সংযোজিত হয়। লেখাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-৬৭-৭৮, ৭৩ এবং পরিশিষ্ট (ii) সংযুক্ত।]

Dhaka University Institutional Repository

২. "Prijadarshini-dear to the sight, but dearer still when sight is denied!"
[সূত্রঃ "Letter from Pandit Nehru to his daughter Indira Priyadarshini". 'Indira Gandhi-Statemen, Scholars and Friends Remember, pp.131-134.'-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-৭২,৭৩।]

৫.৬ কৃতিত্ব মূল্যায়ন ঃ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধরী একজন বীর বাঙালি, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী, নিষ্ঠাবান, অবিচল আস্থায় বিশ্বাসী, সদালাপী, মিষ্টভাষী, অনুপম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন সাহসী বীর পুরুষ ও অদম্য স্পৃহাধারী একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক। তিনি একই সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমে বিলেতে ছাত্র অবস্থায় অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন'-এর সভাপতি হিসেবে, আবার সুদীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানী দুঃশাসন বঞ্চনা তাঁকে কুকড়ে কুকড়ে খেয়েছে। আজীবন মুসলিম সেন্টিমেন্টে বিশ্বাসী একজন বাঙালি বীরের পক্ষে তাই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ এর ১০ দিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ ত্যাগ করতে দ্বিধাগ্রস্ততা আসেনি। আবার ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বর্বরতা শুরু হলে সংবাদ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন "আজ থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। আমি এর প্রতিবিধান চাই।" আর লন্ডন আন্দোলনে নেতৃত্বদান কালে জীবন নাশের হুমকীর জবাবে তিনি বলেছেন, 'লন্ডনের রাস্তায় আমার সবদেহ পড়ে থাকবে, তবু দেশ স্বাধীন না করে ফিরবো না।' একই সাথে দু'টি ভিন্ন আদর্শের আন্দোলনে নিজেকে শামিল ও উজাড় করে দেয়া চরিত্রের সংখ্যা ইতিহাসে বিরল। নিঃসন্দেহে এ তাঁর চরিত্রের অনুপম বিরচিত দিক ঃ যার জন্য তিনি বাঙালি হৃদয় ও ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন যতোকাল ধরে বাংলার আলো-বাতাস, মাটি-জল থাকবে ততো কালধরে বিচারপতি চৌধুরীরা স্মরণীয় ও বরণীয় হবেন বাংলার ঘরে ঘরে।[১]

মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে কেউ কেউ দাবি করেন বিশেষ করে তৎকালীন বি. বি. সি. বাংলা বিভাগে কর্মরত সিরাজুর রহমান (সূত্র পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) তাঁরাই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে নামিয়েছেন। অবশ্যই সত্য কথা । এর দ্বারা একটি কথা পরিস্কার হয়ে ওঠে বিচারপতি এ, এইচ, এম, শামসুউদ্দিন চৌধুরী (মানিক)-এর ভাষায় তাঁর মতো প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বল্প এবং মৃদুভাষী, দৃঢ় চেতা অথচ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, চূড়ান্ত সিধান্ত গ্রহণে সক্ষম, কর্মে অবিচল হৃদয়ে মানবতাবাদী, নুরুল ইসলামের ভাষায় নির্লোভ, নিরঃহঙ্কার, সদা গুরুগম্ভীর অথচ হাস্যোজ্জ্বল, জাকারিয়া খান চৌধুরীর ভাষায় অকুতোভয় বীর সৈনিক, মহিউদ্দিন আহম্মদ এর ভাষায় সন্মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ভাষায় আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলামের ভাষায় সহজ-সরল-প্রাঞ্জল, অথচ মুক্তিযুদ্ধে বিলাত আন্দোলনে প্রবসী বাঙালিদের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রামকার্ড, প্রফেসর ডঃ এম. মোকাখখারুল ইসলামের ভাষায় তেজোদ্দিপ্ত-প্রাজ্ঞ-বিলাত আন্দোলনের পুরোধা, প্রফেসর ডঃ শরীফউদ্দিন আহমদ এর ভাষায় বিনয়ী ও ভদ্রোচিত চরিত্রের অধিকারী, এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু)'র ভাষায় বহুদাবিভক্ত প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধনের মূল মন্ত্রক, হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাসের ভাষায় জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ, রাজনীতি না করেও অভিজ্ঞ রাজনীতিক, অধ্যাপক এম. এ. আজিজের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধে বিলাত আন্দোলনের অভিভাবক, আনোয়ারুল হক ভূঁইয়ার ভাষায় নীতিবান ও সদালাপি, শেখ রাফকুল ইসলামের ভাষায় বিলাত প্রবাসীদের প্রিয়পাত্র, শেখ মাহমুদুল হাসানের ভাষায় মানবতাবাদী, শহীদুল হক ভূঁইয়ার ভাষায় গভীর হৃদয়ের অধিকারী, এ. এম. এ. মুহিতের ভাষায় নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ('স্মৃতি অম্লান'৭১), আবুল কাসেম চৌধুরীর ভাষায় আমার পিতা, রবিউল হাসান (রঞ্জু)'র ভাষায় মুক্তিযুদ্ধে বিলাত আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ, আবুল হাসান চৌধুরীর ভাষায় স্নেহবৎসল যোগ্য পিতাকে মুক্তযুদ্ধকালীন সময়ে বা মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত বিলাত আন্দোলনে অবশ্যই ভীষণ প্রয়োজন ছিল বিধায় তাঁকে আন্দোলনে নামানোর জন্য এতো পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল।[২]

তাই আমরা লক্ষ্য করি মি. ব্যারিংটন যখন তাঁকে পাকিস্তানীদের অপহরণ ও প্রাণ-নাশের হুমকীর কথা উল্লেখ করেন তখন তিনি বলে ওঠেন, "লন্ডনের রাস্তায় আমার শবদেহ পড়ে থাকবে, তবু পাকিস্তানীদের সাথে আপোশ করে দেশে ফিরবো না।" আবার হেনরি কিসিঞ্জার যখন তাঁকে পাকিস্তানের রাষ্টপতি হবার লোভ দেখান তখন তিনি তাঁকে স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে বলেন "অশেষ ধন্যবাদ"।[৩]

বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুউদ্দিন চৌধুরী (মানিক) তাই যথার্থই বলেছেন ঃ

"মুক্তিযুদ্ধে বিলাত আন্দোলনে ষাটের দশকের তরুণ ছাত্র সমাজ ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদরা যেমন একটা প্লাটফরম সুদীর্ঘ এক দশক ধরে তৈরী করে রেখেছিলেন; ঠিক তেমনি উক্ত আন্দোলন সফল করার জন্য জলন্ত অগ্নি শিখায় ঘৃতাহুতি দেওয়ার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মতো গণতন্ত্রমনা, দৃঢ়চেতা, সুযোগ্য নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্বের অবশ্যই আয়োজন ছিল।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে রাজিউল হাসান (রঞ্জু)'র একটা উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনা সমাপ্ত করা যায়। তিনি বলেনঃ

"বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে যেমন বাংলাদেশের জন্ম হতো না, ঠিক তেমনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম না হলে মুক্তিযুদ্ধের বিলাত আন্দোলনও সম্ভব ছিল না। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নাম একই সূত্রে গাঁথা।"[৫]

এভাবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিশ্বজনমত সংগ্রহ করার জন্য তৎকালীন প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ মুসলিম বিশ্বের সমর্থন আদায়ের জন্য একটি সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলেন- যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী 'প্রবাসী মুজিবনগর সরকার'-এর কার্যাবলীসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর এই ভূমিকার কারণেই মুজিবনগর সরকারের তথ্য বিভাগ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, পররাষ্ট্র দপ্তর, পার্লামেন্ট ভবনে অবস্থানরত সংসদ সদ্যবর্গ, সংবাদসংস্থা, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় এবং অসংখ্য জনসভা ও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন যোগাতে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত বিচারপতি চৌধুরীর বিবৃতি, বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার মুক্তিকামী দেশবাসীকে গর্বিত করেছে।[৬]

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যিনি এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সেই বিচারপতি চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁকে স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত এবং সর্বাগ্রে ২৪ জানুয়ারী ১৯৭২ ঢাকার বাইরে মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষ্যে মিঃ চৌধুরীর জেলা টাঙ্গাইল সফর করেন।[৭]

বিচারপতি চৌধুরী একদিকে যেমন একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন; অপরদিকে তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য বুৎপত্তি, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও জ্ঞান তাঁকে এক দুর্লভ শ্রদ্ধার আসনে স্থিত করেছে। তদুপরি অসাধারণ সৌজন্যবোধ, অতুলনীয় বন্ধু বাৎসল এবং অনুপম অথচ নিরহঙ্কার আভিজাত্য ছিল তাঁর চরিত্রের বর্ণময় অলঙ্কার।[৮] তিনি যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে বিশ্বজনমতকে যেভাবে সুসংবদ্ধ করেছিলেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। সাক্ষ্যাৎকারে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র আবুল কাশেম চৌধুরী।
২। পরিশিষ্ট ঃ (i)-এ সংযোজিত সাক্ষাৎকারদাতা বৃন্দ।
৩। সূত্র পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুউদ্দিন চৌধুরী (মানিক)
৫। ঢাকায় সাক্ষাৎকারে রাজিউল হাসান (রঞ্জু)।
৬। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, 'স্বাধীনতা-৭১', পৃষ্ঠা-৭৪১।
৭। সাক্ষাৎকারে আবুল হাসান চৌধুরী।
৮। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ছ) উপসংহার ঃ

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশ্লেষণে কয়েকটি বিষয়ে পরিস্কার ধারণা জন্যে-

ক) শতাব্দী কাল পূর্ব থেকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি নামে মূলতঃ সিলেটের অধিবাসীরা প্রথম দিকে জাহাজের লস্কর (নুরুল ইসলামের ভাষায় 'পূর্ব সুরী') অর্থনৈতিক অভিবাসী নামে কলকাতার খিদিরপুরে (ডক এলাকা) আস্তানা গড়ে তোলেন। সেখানে 'বাড়িওয়ালাদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগই (নুরুল ইসলামের মতে) ছিলেন বাংলাদেশের সিলেট জেলায় অধিবাসী। সেখান থেকে জীবনের তাগিদে ও সময়ের প্রয়োজনে তাঁরা জাহাজের 'লস্কর' হিসাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এক যুক্তরাজ্যেই এঁদের সংখ্যা দাড়ায় নব্বই হাজারে; অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন লক্ষাধিক যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই ছিলেন বাংলাদেশের সিলেট জেলার অধিবাসী। বাকি দশ ভাগ ছিলেন অন্যান্য এলাকার।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত লক্ষাধিক প্রবাসী বাঙালির জীবণ-পণ সংগ্রাম, অতলান্ত নীল সাগরের আত্মাহুতি দিয়ে নুরুল ইসলামের ভাষায় আমাদের 'পূর্ব সুরী'রা যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সেই পথে বর্তমানে যুক্তরাজ্যে প্রায় তিন লক্ষ বাঙালি প্রবাস জীবন-যাপন করে আমাদের অর্থনীতিকে করে চলেছেন সমৃদ্ধশালী, আমাদের সংস্কৃত-কৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়। এক সময়কার 'অশিক্ষিত' ও 'স্বল্প শিক্ষিত' বাঙালি এখন সুসভ্য সভ্যতার দাবিদার ইংরেজ সমাজের সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষা-দিক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, জীবনাচার, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিতে সমান অবদান রাখার সংগ্রামে লিপ্ত। অন্যদিকে আবহমান বাংলার রূপ-সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়। বাঙালির অস্তিত্ব, বাঙালির জীবন-মান, সামাজিক রীতি, পারিবারিক বন্ধন, ধর্মীয় অনুশাসন, স্বজাতিবোধ (বাঙালি জাতীয়তা) আলোচিত হচ্ছে বিশ্ব সংস্কৃতিতে। আদান-প্রদান চলছে জীবন চিত্রের। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা বহির্বিশ্বে এগিয়ে চলেছেন স্ব-মহিমা বজায় রেখেই। শতাব্দী কাল পরেও প্রবাসী বাঙালিরা ভুলে যান নি তাঁদের নাড়ির টান; মহাকালও আর পারবে না বাঙালির অস্তিত্বকে বিলীন করতে।

খ) ১৯৭১ সালের বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধকাল পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালি বিলাতে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন তাঁদের সংখ্যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে লক্ষাধিক।

তৎকালীন কলকাতা আমাদের এই 'পূর্ববঙ্গ'কে পশ্চাদভূমি করে রেখেছিল; তারই প্রতিশোধ নিতে, তাঁদেরই পশ্চাতে রেখে 'পূর্ববঙ্গ' ভূমির বীর সন্তানেরা প্রথমে বেঁচে থাকার তাগিদে, পরবর্তীকালে উন্নততর জীবন সাধনায় যুক্তরাজ্যে উপণিত হন, 'বিলেত ফেরত' মর্যাদা লাভ করেন যোগ্যতা দেখিয়েই, বসতি গড়ে তুলেন উত্তর পুরুষ (পরবর্তী প্রজন্ম) এর কথা মাথায় রেখেই। এ কারণে আমরা লক্ষ্য করি কলকাতায় সম্প্রদায় গড়ে না ওঠে সুদূর বিলাতে আজ 'সিলেটি পাড়া'র সন্ধান মিলে। এই প্রবাসীদের সিলেটে পরিচয় 'লন্ডনী', বাংলাদেশে এঁরা 'সিলেটী'; লন্ডনে এঁদের পরিচয় শুধুই 'বাঙালি'।

একটা সমাজ ব্যবস্থা অন্য একটা সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে টিকে থাকতে হলে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আঞ্চলিকভাবে দৃঢ় থাকতে হয়, সময় (অতিবাহিত হওয়া অর্থে) এখনে একটা বড়ো ব্যপার। তারপরে সমগ্র জাতি, সমাজ ব্যবস্থাকে আমন্ত্রণ ও আকর্ষণ করা যায়। যেমন আমরা প্রাচিন কালের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখি উত্তর ভারতে আর্যদের আগমনের সূত্রপাত থেকে একই ভারত বর্ষের পূর্ব প্রান্তে আসতে সময় লেগেছিল বার'শত বছর। তাই সিলেটিরা যদি যুক্তরাজ্যে বসে প্রথম প্রথম নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান একটু বেশী করেন (গোলাম মুরশিদের ভাষায়); নুরুল ইসলামের ভাষায় তা দোষের নয়।

আর এটাকে অন্য দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে এমন দাঁড়ায় যে, যাদের সংখ্যা শতকরা নব্বই ভাগ ; তাঁরা তাহলে মেলামেশা করবেন কাঁদের সাথে, অবশ্যই নিজেদের সাথেই। গোলাম মুরশিদের গ্রন্থ 'কালা পানির হাত ছানি ঃ বিলেতে বাঙালির ইতিহাস'-এর সমালোচনা করে তাই অধ্যাপক এম. এ. আজিজ বলেন ঃ 'বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই, শুধু কাগজে-কলমে প্রবাসী বাঙালিদের আঞ্চলিক চরিত্র দান সুবিবেচনাপ্রসুত নয়; জাতি হিসেবে বাঙালির (প্রকৃত অর্থে) জন্যও তা শুভকর নয়।' উল্লেখ্য গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিদের সংখ্যালঘু 'পশ্চিম বঙ্গ' ও 'ঢাকাই' এবং সংখ্যাগুরু 'সিলেটী' হিসেবে বিভাজন করে দেখিয়েছেন।

গ) সিলেটি অভিবাসীরা শতাব্দী কাল ধরে যুক্তরাজ্যের আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে মিলে-মিশে, একদিকে যেমন বৃটেনের উচু স্তরের মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন; অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধকালীন সময়ে 'পূর্ববঙ্গ'-এর অনেক বিত্তশালী বাঙালির চেয়ে বেশী অর্থ তাঁদের হাতে ছিল। প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম ও ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন-এর ভাষায় ঃ "সিলেটী ভাইদের অর্থদান, আর আমরা যাঁরা বিলাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছিলাম

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের ভাষ্যজ্ঞান (ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা) খুব সহজেই মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ গঠনে সক্ষম হয়েছিল।"

এ প্রসঙ্গে বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুউদ্দিন চৌধুরী (মানিক) এবং রাজিউল হাসান (রঞ্জু) বলেন ঃ

"বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী না হলে যেমন বিলাত আন্দোলন অসম্ভব ছিল; তেমনি সিলেটের অধিবাসীদের অর্থ ও জনবলের সহায়তা না হলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পক্ষে (যদিও তিনি নিজের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করেনি) সফল আন্দোলন পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। 'বাংলাদেশ ফান্ড'ই যার প্রমাণ। তাঁরা একদিকে যেমন নিজেরা অর্থ সাহায্য দিয়েছেন, অন্যদিকে জাকারিয়া খান চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, আবদুল মান্নান (ছানু) মিয়ারা ফান্ড সংগ্রহ করেছেন এবং মিছিল মিটিং হলেই জনবল হাজির করেছেন।"

ঘ) আরও একটা বিষয় গবেষণায় ফুটে উঠেছে তা হলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, ষাটের দশক জুড়ে যে সমস্ত ছাত্র বিলাতে গিয়েছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে মেধাবী ও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিলাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তৎকালে কাঁরা যান ঃ

(১) অন্তত মেধাবী ছাত্ররা;
(২) যাঁদের পারিবারিক পটভূমিতে উচ্চ শিক্ষার ধারা আছে ;
(৩) যাঁদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণত স্বচ্ছল ;
(৪) এবং যাঁরা মেধা, মননে (একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়) প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী।

ষাটের দশকের এই সব ছাত্রদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো ঃ

এঁরা ছাত্র নামে বিলাতে গিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এঁরা কাঁরা ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মেধাস্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রী; আবার কেউ কেউ ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রভাষক'সহ তৎকালিন পাকিস্তান সরকারের প্রথম শ্রেণীর সরকারী-বেসরকারী পদে ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। কেউ কেউ আইনে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করে জজ কোর্ট, হাইকোর্টে ইত্যাদি উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় বিলেতে গিয়েছিলেন 'ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল' সম্পন্ন করতে। অর্থাৎ শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, ডাক্তার এক কথায় এঁদের পরিচয় এঁরা মধ্যেবিত্ত শ্রেণী; যাঁরা ফরাসী বিল্পব থেকে আমেরিকা বিল্পব পর্যন্ত সবই সফল করেছেন।

অন্য দিকে বয়সে এঁরা তরুণ, পূর্ব বঙ্গে এঁরা শিক্ষা সমাপ্তকারী, চাকুরিজীবী, আমলা শ্রেণী; আবার বিলেতে এঁরা ছাত্র নামধারী। অর্থাৎ যুগান্তকারী আন্দোলন, প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার ভেঙ্গে নতুনের জয়গান করার এঁরা ধজাধারী, আন্দোলন করার মতো সবগুলো প্রপঞ্চ ও গুণ এঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

যে কোন আন্দোলন (স্বাধীনতা আন্দোলন হলে তো প্রশ্নই নেই) করার মতো, প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের গুণ, দৃঢ় প্রত্যয়ী, স্বাধীন চেতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, আপোসহীনতা, উদারনৈতিক মানসিকতা, গণতান্ত্রিক রীতির প্রতি আস্থাশীল, হৃদয়ে মানবতাবাদী, কণ্ঠে বজ্রস্বর, জ্ঞানে অতুলনীয়, মানে শ্রেষ্ঠ, সব শ্রেণীর মানুষের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম এবং বয়সের ভারের প্রয়োজনও আছে যা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী; শেখ আবদুল মান্নান, আজিজুল হক ভূঁইয়া, তাসাদ্দুক আহমদ, নুরুল ইসলাম, জাকারিয়া খান চৌধুরী ও আবদুল মান্নান (ছানু) মিয়াদের মধ্যে সন্দেহাতীত ভাবেই বিদ্যমান ছিল।

আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত বিলাত আন্দোলনের পুরোভাগে তাই এই তিন শ্রেণীকেই খুঁজে পাই; যাঁদের অবদান বাংলাদেশ মনে রাখবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সংযোজিত পরিশিষ্ট (i) -এ উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার।

আব্দুল মন্নান ওরফে ছানু মিয়া (ডানে)
ও তাজ মোহাম্মদ, সিলেট, ১৯৮৭

উপরে : মরহুম [illegible] আলী, সিলেট, ১৯৮৮। নীচে : শেখ মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮

উপরে : জাহাজী জীবনের [illegible] 'বহি' বা কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট। এই বহির অধিকারী ছিলেন [illegible] মিয়া ([illegible])। নীচে : [illegible] জাহাজী [illegible] আলী।

আয়ুব আলী মাস্টার(মাঝে) ডানে সমুজ মিয়া (বামে) ও [illegible] মজম্মল হসেন, লন্ডন ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পরেই যে জনসভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়

একান্ত পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিলেত-প্রবাসী বাঙালি নেতৃবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বঙ্গবন্ধুর প্লাকার্ড হাতে জনাব রমজান আলী ও মরহুম আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী

বার্মিংহামের জনসভা-শেষে বেরিয়ে আসছেন বঙ্গবন্ধু, সাথে (বাম থেকে) আবদুল আজিজ বাগমার, সুলতান মাহমুদ শরীফ, অজ্ঞাত, জামশেদ মিয়া, অজ্ঞাত, গৌস খান

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করে প্রবাসে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের কয়েক জন

Dhaka University Institutional Repository

উপরে : আগরতলা মামলা শেষে লন্ডন সফররত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সঙ্গে কন্যা শেখ হাসিনা । শেখ হাসিনার পাশে প্রবাসী নেতা তৈয়বুর রহমান (১৯৬৯) নীচে : গণভবনে প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনারত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। বাম থেকে দ্বিতীয় দেওয়ান ফরিদ গাজী, তৃতীয় সিঙ্গাপুর প্রবাসী মজলিস খান ; বঙ্গবন্ধুর পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ (১৯৭৩). সর্বডানে লেখক।

Dhaka University Institutional Repository

(বাঁ থেকে) মরহুম আবদুল মতালিব চৌধুরী, মরহুম বদরুল হোসেন তালুকদার, সাংসদ আনোয়ার জং, আলহাজ্ব এম এ রকিব, অজ্ঞাত, অজ্ঞাত, আলহাজ্ব হাফিজ মজিরউদ্দিন, রমজান আলী, অজ্ঞাত

আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থনকারী ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার থমাস উইলিয়ামস কিউসি এমপি, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা সন ম্যাকব্রাইট ও প্রবাসী বাঙালিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে আসেন ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে, তাঁদের উদ্দেশে বক্তব্যরত বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে গণহত্যা

Dhaka University Institutional Repository

রাতের অন্ধকারে শিয়ালে খাচ্ছে পাকিস্তানি হায়েনার ফেলে যাওয়া এক অত্যাচিনীর লাশ

পাকিস্তানি হানাদারদের দ্বারা ধর্ষিত [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

[Message embodying declaration of independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e., early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার অব্যবহিত পরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডীর বাড়ি থেকে বন্দী করে নিয়ে যায়

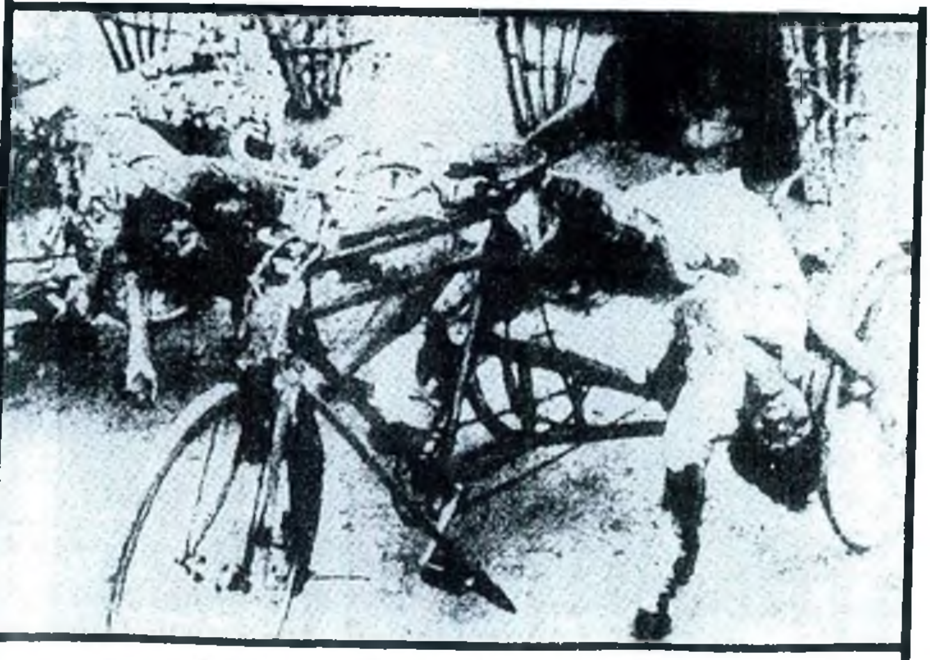

বাংলাদেশে পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞ। (সাপ্তাহিক "নিউজউইক", ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭১)

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন থেকে [illegible]

কলকাতার উপকণ্ঠে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য তৈরি
করা পাইপের মধ্যে শরণার্থীদের জীবন-যাপন

কৃষকের ছদ্মবেশে বাংলার মুক্তিপাগল
মুক্তিযোদ্ধারা শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরেছে।
পিঠে বাঁধা হয়েছে অস্ত্র

বাংলাদেশ [illegible]

ছবিটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Guardian
পত্রিকায় [illegible] ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের [illegible]

[illegible] মার্চ ১৯৭১, শিশু-কিশোরদের মিছিলে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার আহ্বান

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও তাঁর অবর্তমানে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারী বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ চার সহযোগী ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঘাতকের বুলেটের নির্মম শিকারে পরিণত হন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমদ

এম মনসুর আলী

এ এইচ এম কামরুজ্জামান

মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানগণ

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটি। সভাপতিত্ব করছেন মহান নেতা মওলানা ভাসানী। পরে, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, মুজাফফর হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ নিচ্ছেন মহকুমা পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম গ্রহণের পর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন। গার্ড অব অনারের নেতৃত্ব

পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা বাংলাদেশ ভূখণ্ড পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তৎকালীন ইপি আর, নৌ ও
বিমান বাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচার ও মুক্তির দাবিতে অনশনরত বাঙালি ছাত্র শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও আফরোজ আফগান চৌধুরী, পাশে বিক্ষোভকারীগণ

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে জন স্টোনহাউস এমপি, মিসেস স্টোনহাউস, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, একজন বিশপ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন

Dhaka University Institutional Repository

৩ এপ্রিল ১৯৭১ লন্ডনের হোয়াইট হলের সামনে বিক্ষোভরত মহিলা সমাবেশ, বক্তব্য রাখছেন মাইক হাতে প্রয়াত লুলু বিলকিস বানু

পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করার দাবিতে ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে মহিলাদের মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাফালগার স্কোয়ারে সমবেত স্বাধীনতাকামী জনতার একাংশ

লন্ডনের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু
একটি জনসভায় ভাষণরত

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে মতিউর রহমান চৌধুরী,
জাকারিয়া খান চৌধুরী ও আজিজুল হক ভূঁইয়া

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে লিবারাল পার্টির চেয়ারম্যান লর্ড বোমন্টের সঙ্গে দেখা করেন সুলতান মাহমুদ শরীফ

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে তৈয়বুর রহমান, গৌস খান, ভি. কে. মেননকে দেখা যাচ্ছে

প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের কয়েক জন সৈনিক

মহীউদ্দিন আহমদ

লুৎফুল মতীন

সিরাজুর রহমান

শামসুদ্দিন চৌধুরী

আনিসুর রহমান

টিপু সুলতান

Dhaka University Institutional Repository

১ আগস্ট ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভার আর একটি দৃশ্য, এই জনসভাতেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বাংলাদেশের সাথে আনুষ্ঠানিক একাত্মতা ঘোষণা করেন মহীউদ্দিন আহমদ, আবদুর রউফ ও লুৎফুল মতীন

ইয়াহিয়া খানের পতন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে লন্ডনের প্রবাসী বাঙালি যুবকদের বিক্ষোভ মিছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে বাঙ্গালী ছাত্র ও যুবকদের বিক্ষোভ
(লন্ডন ১৯৭১)।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সহযোদ্ধাদের নিয়ে লন্ডনে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে ছবিতে যাঁদের দেখা যাচ্ছে তাঁরা হলেন– (বাঁ থেকে) লুৎফুল মতীন, মহিউদ্দিন আহমদ, নূরুল হুদা, সুলতান মাহমুদ শরীফ, হাবিবুর রহমান, আবুল ফাতেহ, আবদুর রউফ, ফজলুল হক চৌধুরী, মহীউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আবদুস সালাম ও শামসুল আলম চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

Postage Stamps Issued in September 1971 in the midst of the Bangladesh Liberation Struggle. Designed by Biman Mullick, a London-based artist, these Postage Stamps were released immediately thereafter by Justice Abu Sayeed Choudhury, the Special Representative of the Peoples Republic of Bangladesh in exile in London. Justice Choudhury presented these Postage Stamps to the Indian Prime Minister Indira Gandhi when he met her in the Autumn of 1971 in London. The Indian Prime Minister handed over these Stamps to the Author for personal safekeeping as historic documents of the Bangladesh Liberation Struggle.

১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই "মুজিবনগর" সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট সিরিজ লন্ডনে প্রকাশিত হয়। ডাকটিকেটগুলির নক্সা তৈরি করেন পশ্চিম বঙ্গের গ্রাফিক-শিল্পী বিমান মল্লিক। ১৯৭১ সালের ২৯ অক্টোবর মিসেস গান্ধীর ব্রিটেন সফর কালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডাকটিকেটগুলির একটি 'সেট' তাঁকে উপহার হিসেবে দেন। মিসেস গান্ধী টিকেটগুলি সংরক্ষণের জন্য শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জীর কাছে হস্তান্তর করেন।

(ইংরেজী ক্যাপশনে উল্লিখিত লেখক হলেন মি. শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জী।)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Lt Gen Amir Abdullah Khan Niazi, GOC Eastern Command, Pakistan Army, signing the Instrument of Surrender in the presence of Lt Gen Jagjit Singh Aurora, GOC in Chief, Eastern Command, Indian Army in Dhaka 16 December 1971.

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল লে. জেনারেল নিয়াজী দস্তখত করেন। ছবির বাম দিকে : লে.জে.অরোরা।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালে লন্ডনে হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্নারে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবিতে
অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করছেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাশে দণ্ডায়মান
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক-২ খন্দকার মোশাররফ হোসেন (আগস্ট ১৯৭১)।

[illegible] (১৯৭১)।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(লন্ডন, জানুয়ারী, ১৯৭২)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক...

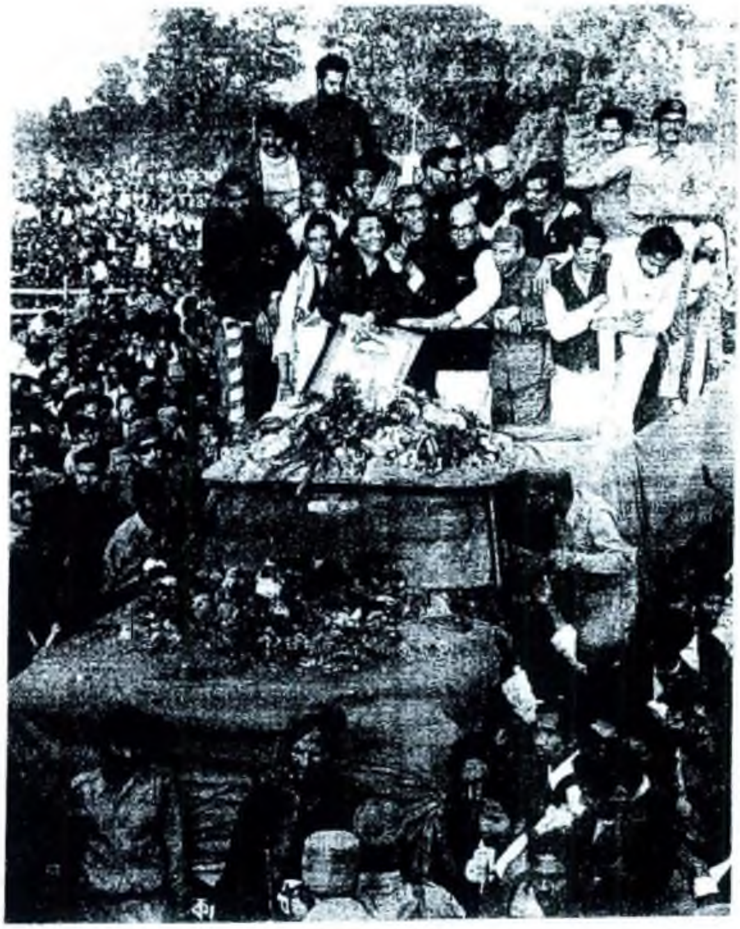

বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ পাঠ করাচ্ছেন

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ইন্দিরা গান্ধী, বেগম চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

(জ) একনজরে সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

(১) সরকারি রেকর্ড ও প্রকাশনা ঃ

(i) পূর্ব বাংলা/ পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঃ

Government of East Bengal B. Proceedings. (1) Home (Police) (2) Home (Political). National Archives of Bangladesh

Government of East Pakistan. The Dacca Gazette, 1958-1966.

-------------. A Handbok of Comparative Statistics of East and West Pakistan. Dhaka: Planning and Development, 1968.

-------------. Statistical Abstract for East Pakistan Containing Statistical Data on Variour Subjects for the Years 1949-50 to 1953-54 Vol. III (Dacca: The Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, (Planning Department).

(ii) পাকিস্তান সরকার (কেন্দ্রীয়) ঃ

Government of Pakistan, Ministry of Economic Afairs, 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-67, Karachi: Central Statistical Office, 1968.

----------------. Ministry of Law, Report of the Franchise Commission 1963 An Analysis, Rawalpindi: 1964.

------------------. Second Five Year Plan 1960-65, Karachi: Government of Pakistan Press, 1960.

-----------------. Third Five Year Plan 1965-70, Karachi: Government of Pakistan Press, 1965.

(iii) বাংলাদেশ সরকার ঃ

Election Commission of Bangladesh. Report on the Election to Bast Bengla Legislative Assembly, 1954, Dhaka: Secretary, Bangladesh Election Commission, May, 1977.

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র (চতুর্থ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খন্ড- প্রয়োজনীয় অংশ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুণমুদ্রণ, ২০০৩, ঢাকা।

বজ্রকণ্ঠ, তথ্য দফতর, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২।

মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়), তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৮।

(iv) পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সরকার ঃ

মুক্তির সংগ্রামে ভারত, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯।

(v) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ঃ

Sheelendra Kumar Singh and Others (ed.), Bangladesh Documents, Vol I, Dhaka: University Press Limited, 1999.

সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর ডঃ (প্রধান সম্পাদক), বাংলা পিডিয়া ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, (প্রাসঙ্গিক খন্ড), ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ ।

২. (i) পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ঃ

Asian Survey
Far Eastern Survey.
Pacific Affairs
The Middle East Journal
The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা
বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা

(ii) দৈনিক পত্রিকা ঃ

The Times (London), 1971
The Daily Telegraph (London), 1971
The Evening Standard (London), 1971
The Financial Times (London), 1971
The Sunday Times (London), 1971
The Morning Star (London), 1971

Dhaka University Institutional Repository

The Guardian (London), 1971
The Observer (London), 1971
(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ উল্লেখিত পত্রিকাগুলোর মূলকপি সরাসরি আমার পক্ষে দেখা সম্ভপর হয়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলো বিভিন্ন বইপুস্তক ঘেটে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।)

৩. ইংরেজি বই ঃ

Abedin, Nazmul. Liberty of the people: Britain and Bangladesh, Dhaka: Institute of Human Rights and Legal Affairs, 1987.

Adams, Caroline. Across Seven Seas and Thirteen Rivers, London: Thap Books, 1987. Ali, Jamil. "Changing Identity Constructions among Bangladeshi Muslims in Britain", Occasional Papers, No.6, February, 2000, Department of Theology, Birmingham University.

Ahmed, A. F. Salahuddin. Bengail Nationalism and The Emergence of Bangladesh An Introductory Outline. Dhaka: International Central for Bengal Studies, 1994.

Ahmed, Kazi Kamal. Sheikh Mujibur Rahman: Man and Politician, Dhaka, 1970.

Ahmed, Sharif Uddin (ed.). Dhaka Past Present Future, Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Ali, Aftab. Adress to Bengal Cabinet, Indian Seanen's Union, Calcutta: 1937.

Ali, Monica. Brick Lane, London: Black Swan, 2007. (1st ed.2003)

Ali, Syed Ameer. Memoirs and Other Writings. ed. by Syed Razi Waste, Lahore: People's Publishing House, 1968.

Ali, Tariq. Pakistan: Military Rule or People's Power, Delhi: Vikas Publications, 1970.

-----------. Can Pakistan Survive? London: Penguin Books, 1983.

Azad, Moulana Abul Kalam. India Wins Freedom. (অনুবাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ), ওরিয়েন্টাল লংম্যান প্রাঃ লিঃ, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০৪।

Ballard, Roger, ed. Desh Pardesh, The south Asian Presence in Britain, London: Hurst & Co.,1994.(বিশেষ করে একটি অধ্যায় উল্লেখযোগ্যঃ I'm Bengali, I'm Asian, and I'm Living Here, The Changing Identity of British Bengalis, by Katy Gradner & Abdus Shakur.).

Banton, Michael. Race Relations, Tavistock, 1967.

Banerjea, Surendranath. A Nation in the Making, London: Oxford University Press, 1925.

Banarjee Sahanka S. A Long Journey Together: India, Pakistan and Bangladesh, Published in the U. S. A. 2008, ISBN: 97814196-9763-0.

Behrens, C.B.A. Merchant Shipping & the Demands of War, HMSO, London: 1955.

Bethnal Green & Stepney Trades Council: Blood on the Streets, A Report on Racial Attacks. London, 1978.

Bhuiyan, Md. Abdul Wadud. Emergence of Bangladesh and Role of Awami League, Delhi: Vikas Publishing House Pvt, Ltd., 1982.

Blood, Archer K. The Cruel Birth of Bangladesh.

Borthwick, Meredith. Changing Roles of Bengali Women: Priceton: Princeton University Press, 1984.

Brown, F. H. "Indian Students in Great Britain", Edinburgh Review, January, 1913.

Brown, Judith M. Global South Asians: Introducing the Modern Diaspora. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Carras, Mary C. Indira Gandhi: In the Crucible of Leadership, Boston: Beacon Press, U.S.A.

Chakrabarti, Pratik. Western Science in Modern India: Metropolitan Choudhury, Yusuf. The Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers.

Chandra, Probodh. Blood bath in Bangladesh, New Delhi: Adarsh Publications, 1971.

Chakrabarti, S. K. The Evolution of Politics in Bangladesh, New Delhi: Associated Publishers, 1978.

Choudhury, G. W. The last Days of United Pakistan, London: C. Hurst & Company, 1974.

Dabydeen, David, John Gilmore & Cecily Jones, eds. Black British History. London: Oxford University Press, 2007.

Daniel, W. W. Racial Discrimination in England, Penguin Books, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

Das, Harihar. "The Early Indian Visitors to England", Calcutta Review, 3rd Series, Vol. 13(1924).

-----, Life and Letters of Toru Dutt. Oxford: Oxford University Press, 1921.

Dasgupta, Sukharanjan. Midnight Massacre in Dacca, New Delhi: Vikas Publishing House, 1987

Dass, I. A. Brief Account of a Voyage to England and America, Allahabad: Presbyterian Press, 1851.

Day, L. Recollections of Alexander Duff, DD, LLD and the Mission College which he founded in Caclutta. London: T.Nelson & Sons, 1879.

Desai, Rashmi. Indian Immigrants in Britain, Institute of Race Relations, 1963.

De, Brajendranath. Reminiscences of an Indian Member of the Indian Civil Service, Calcutta Review, April 1953-Aug. 1955.

Dixon, Conrad. Lascars: The Forgotten Seamen, University of Newfoundland, 1980.

Dummet, A. A Portrait of English Racism, London 1973.

--------------. Towards A Just Immigration Policy, Cobden trust, 1986.

Dutt, Ramesh C. Three Years in Europe. 4th ed., Calcutta: S.K.Lahiri, 1896.

Dutta, K. & Robinson, A. Rabindranath Tagore: A Myriad Minded Man. London: Bloomsbury, 1995.

Edwards, Michael, British India (1772-1947), Calcutta: Rupa and Co. , 1993.

Eade, John. "Identity, Nation and Religion: Educated Young Bangladeshi Muslims in London's East End, International Sociology, Vol.9, No.3, 1994.

-------------. Ansar Ahmed Ullah, Jamil Iqbal & Marissa Hey. Tales of Three Generations of Bengalis in Britain, London: Nirmul Committee, 2006.

-------------. And Garbin, D. 'Competing Visitors of Identity and Space: Bangladeshi Muslims in Britain', History Compass, Volume 3 Issue 1 January 2005.

East India Company. Minutes of the Court of Directors, B85-89 (5th April 1759 to 13th April 1774, BL

------------------------. D/27

Committee of Correspondence, April 1771 to March 1773, D/27.

-------------------. D/155

-------------------. Z/D/28

-------------------. L/F/2/111.

-------------------. Minutes of the Court of Directors, L/P & J/2-125, 1847.

File, N. & Power, C. Black Settlers in Britain, 1955-195, London, 1981.

Fisher, Michael H. Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain 1600-1857, Delhi: Permanent Black, 2004.

----------------------. 'From India to England and Back: Early Indian Travel Narratives for Indian Reader's, no publication details available, but based mainly on Counterflows to Colonialism etc.

----------------------. Migration to Britain from south Asia, 1600s-1850s. London: 2005.

----------------------. 'Persian Professor in Britain: Mirza Muhammad Ibrahim at the East India Company's College, 1826-44', in Comparative Study of South Asia, Africa and the Middle East, Vol.XX! Nox.1-2(2001).

----------------------. 'Representing "His"Women: Mirza Abu Talib Khan's 1801 "Vindication of the Liberties of Asiatic Women", Indian Economic and Social History Review, 37/2 (2000).

----------------------. The Travels of Dean Mahomet: An Eighteenth Century Journey through India. Berkeley: University of California Press, 1997.

---------------------. Lahiri, S, & Thandi, S., A South-Asian History of Britain: Four Centuries of Peoples from the Indian Subcontinent. Oxford: Greenwood World Publishing, 2007.

Forbes, Geraldine. Women in Modern India, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Frayer, Staying in Power. The History of Black People in Britain. London: Pluto Press, 1987.

Gardner, Katy. Global Migrants, Local Lives: Travel and Transformation in Rural Bangladesh, Oxford University Press. 1995.

Dhaka University Institutional Repository

------------------. "Mullahs, Migrants, Miracles: Travel and Transformation in Sylhet", Contributions to Indian Sociology, Vol. 27, No. 2 (1993).

Garbin, David. "Bangladeshi diaspora in the UK: some observations on socio-cultural dynamics, religious trends and transnational politics", (June, 2005), University of Surrey.

Gardezi, Hassan & Jamil Rashid (ed.). Pakistan: The Roots of Dictatorship The Political Economy of a Praetorian State, Delhi: Oxford University Press, 1983.

Ghose, Nagendra Nath. The Effects of Observation of England, Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1877.

Grant, Joanne. Black Protest, Ballantine Books, 1983.

Grove, Peter & Colleen. Curry, Spice and All Things Nice, Surrey: Grove Publications, n.d (বিশেষ করে দু'টি অধ্যায় প্রাসঙ্গিক: The History of the 'Eithnic' Restaurant in Britain; & Origins of 'Curry').

Gupta, Jyoti Sen. History of Freedon Movement in Bangladesh, Calcutta: Naya Prakash, India, 1974.

Haldar, Rakhaldas. The English Diary of an Indian Student, Dacca: Ashutosh Library, 1903.

Haque, Azizul. Trends in Pakistan's External Policy 1947-1972, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1985.

Hiro, Dilip. Black British-White British, Monthly Review Press, 1973.

Home Affairs Sub-committee on Race Relations & Immigration: The Bangladeshis in Britain, HMSO, 1987.

House of Commons, Sessional Papers: Vol. 135, Fifth Report from the Committee Appointed to enquire into the Nature, State, and Condition of the East India Company, and the British Affairs in the East Indies, 18th of June 1773.

Hour of Commons, Sessional Papers: Vol. 138. Reports on the Administration of Justice, etc, in the East Indies, 8th May 1781.

Hunter, Sir William. The Annals of Rural Bengal, Smith, London, 1868.

Humayun, Syed. Sheikh Mujib's 6-Point Formula: An Analytical Study of the Breaking of Pakistan, Karachi: Royal Book Company, 1955.

H. V. Hodron. The Great Divide, Karachi: Oxford University Press, 1985.

Inayatullah, Basic Democracies. District Administration and Development, Pewhawar: Pakistan Academy for Rural Development, 1964.

Impey, Sir Elijah. Memoirs of Sir Elijah Impey, London: 1846.

I'teshamuddin, Mirza Sheikh. The Wonders of Vilayet: Being the Memoir, originally in Persian, of a visit to France and Britain in 1765. tr. by Kaiser Haq. Leeds: Peepal Tree Prees, 2001.

Islam, M. Mufakharul. Bengal Agriculture 1920-1946: A Quanitative Study, Cambridge: Cambridge University Press & New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt.) Ltd., 1978.

Islam, Nurul. Making of a Nation Bangladesh An Economist's Tale, Dhaka: The University Press Limited, 1973.

Jagmohon. The Black Book of Genocide in Bangladesh, New Delhi: 1971.

Kopf, David. The Shaping of the Modern Indian Mind: A history of the Brahmo Samaj, Princeton: Princeton University Press, 1981.

Kripalani, K. Dwarkanath Tagore: A Forgotten Pioneer. New Delhi: National Book Trust, 1980.

---------------, Rabindranath Tagore: A biography, Calcutta: Visva-Bharati, 1980.

Khatib, A. L. Who Killed Mujib? New Delhi: Vikash Publishing House, India. , 1981.

Kling, B. B. Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India. Berkeley: University of California Press, 1876. (তথ্যপূর্ণ চমৎকার লেখা।)

Kling, B. B. and Pearson, M. N. The Age of Partnership: Europeans in Asia before Dominion. Honolulu: The Univ. Press of Hawaii, 1979.

Lahiri, Shompa. Indians in Britain: Anglo-Indian Encounters, Race and Identity. 1880-1930. London: Frank Cass, 2000.

Lambert, S.ed. House of Commons Sessional Papers of the Eighteenth Century, Vol. 147 (Wilmington: Scholarly Resources, 1975).

Dhaka University Institutional Repository

Llewellyn-Jones, Rosie. "Indian Travellers in Nineteenth Century England," The Indo-British Review, Vol.18.No.1.

Lichtenstein, Rachel. On Brick Lone. London: Hamish Hamilton, 2007.

Lifschulta, Lawrence. Bangladesh: The Unfinished Revolution, London: Zed Press, 1979.

Lindsay, R. The Lives of the Lindsays, Wigan Publishers, 1840.

Mascarenhas, Anthony. Bangladesh: A Legacy of Blood, London: Hodder & Stoughton, 1986.

Mascarenhas, Anthony. The Rape of Bangladesh, New Delhi: Publishing House, 1971.

Mallick, Azizur Rahman. British Policy and the Muslim Bengal, 1756-1857, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Maniruzzaman, Talikdar. The Politics of Development The Case of Pakistan (1947-1958), Dhaka: Green Book House Ltd., 1971.

-------------------------------. The Bangladesh Revolution and its Aftermath, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd., 1982.

MacMillan, Margaret. Women of the Raj. London: Thames and Hudson. First Paperback ed., 1996.

Malkani, Gautam. Londonstani. London: Fourth Estate, 2006.

Mann, Bashir. The New Scots: The Story of Asians in Scotland. Edinburgh: John Donald Publishers, 1992.

Mayhew, Henry. London Labour and the London Poor, 4 Vols. London: Griffin, Bohn and Co, 1861-62.

Minoritiy Rights Groups. Race & Law in Britain & USA, 1979.

Mittra, Kissory Chand. Memoir of Dwarknath Tagore. Calcutta: Thacker, 1870.

Monsarrat, N.: The Cruel Sea, Penguin, 1970.

Moon, Penderel Divide and Quit, London: Chatto & Windus, 1961.

Mozoomdar, P. C. Tour Round the World. Calcutta, 1884.

Mujib's Revenge Form the grave. by Thomas (Guardian London 1975, August 28).

Mukherji. T. A Visit to Europe. Calcutta, 1889.

Murshid, Ghulam. Lured by hope: A biography of Michael Madhusudan Dutt. tr. by Gopa Majumdar. New Delhi: Oxford University Press. 2004.

---------------------. The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

-------------------. Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization. Rajshahi: Sahitya Samsad, 1983.

Mullard, C. Black Britain,Allen & Unwin, 1973.

Payne, Robert. The Tortured and the Dawned, London: Vigward Ltd, 1979.

Rashid, Harun-or. The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

Salter, Joseph. The Asiatics in England, London 1873.

Sinha, Kamalshwar. Zulfikar Ali Bhutto-Six Steps to Summit (Delhi: Indian School Supply Depot, 1972), pp. 151-152.

Slatter, J. The Asiatic in England. London: Seeley, Kackson and Halliday, 1873.

Sobhan, Rehman. Basic Democracies, Work Programme and Rural Development in East Pakistan, Dhaka: Oxford University Press, 1968.

Stanley, Wolpert. Jinnah of Pakistan, Dhaka Oxford University Press, 1989.

Talukdar, Mohammad H. R. (ed.). Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy, Dacca: University Press Limited, 1987.

Talib, Mirza A. Westward Bound: Travels of Mirza Abu Talib, ed. by Mushirul Hasan. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Thacker's Indian Directroy, 1875, 1881 & 1898. Calcutta, 1881, 1898.

Umar, Badurnddin. Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh. Dacca: Mowla Brothers, 1973.

Vadgam, Kusoom. India in Britain. London: Robert Royce Lt, 1984.

Visram, Rozina. Asians in Britain: 400 Years of History, London: Pluto Press, 2002.

Dhaka University Institutional Repository

------------------. Indians in Britain. London: B.T.Batsford, 1987.

------------------. The History of the Asian Community in Britain. London: Wayland, 2007.

Wallace, B. 'A Study of Bangladeshi women's entrepreneurship in East London: developing a gender-sensitive and culturally-appropriate notion of personhood'. London: Business School, University of East London, 2007.

Walvin, J. Passage to Britain, Penguin, 1984.

Wolpert, Stanley. Zulfi Bhutto of Pakistan: His Life and Times, London: Oxford University Press, 1993.

Yatindra. Mujib: The Architect of Bangladesh, New Delhi: Indian School Supply Depol, Bhatnagar, 1971.

৪. ইংরেজি প্রবন্ধ ও রিপোর্ট ঃ

"Are We in for One System?" Ahmad, Abul Mansur. The pakistan Observer. 14 Augst 1965.

"An Appeal to the Teachers and Students of Great Britain"-23 April, 1971, Members of Staff of the University of Dacca, Rajshahi, Chittagong and affiliated Colleges now on higher Studies in Scotland, Bangladesh Association, 20 South George Street (2nd Floor), Dundee. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ২৭, (মূল সূত্র: বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ড্যান্ডির বিজ্ঞাপন)।

"An Open Letter to the Delegates of the American Bar Association from the People of Bangladesh", Advertisement: [Picture: Sheikh Mujibur Rahman]. The Guardian (London), Tuesday, 20 July, 1971.

"Bangladesh: A Glimps of History", Dewan Gous Sultan; "Memoir of 1971 Liberation War", M. A. L. Matin; "Anthology of Personal Recollections", Rashid Suhrawardhy;

"Bangabandhu and Bangladesh", Dr. Belal Husain Joy; "Henry Kissinger on Bangladesh", Anis Rahman, JP; একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি এঁরা গেয়েছেন শিকল ভাঙার গান ঃ প্রবন্ধ সংকলন ঃ [সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-১৬১-১৯৩।]

"Bangladesh Men in World Peace Conference.", Fact Sheet-9, -May, 1971. -Issued and distributed by Bangladesh Student's Action Committee, 35, Gamages Building, 120 Holborn, London. E.C.I. Tel: 405-5916, 673-5720 (Office hours).

"Bangladesh: Civil War-International Conflict", Published by Action Committee, London; April, 1971, For the Poeple's Republic of Bangladesh in U.K.58, Berwick Street, London WI. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৪৬-৪৭, (মূল সূত্র: বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র)।

"Bangladesh –A Land of a Thousand "My-Lais", -Issued on April.1971 by the Action Committee for Bangladesh in North and North West London, 33, Dagmar Road, N.22.Tel: 485-2379, 8894474. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৫২, (মূল সূত্র: লন্ডন এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র)।

"Bangladesh Today! Bangladesh Taday!, Bangladesh Taday!'', -Issued on 5 May, 1971. by the Action Committee for Bangladesh in North and North West London, 33, Dagmar Road, London, N.22.Tel: 485-2379, 889-4474. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৫৩, (মূল সূত্র: লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র)।

"Burning Bodies of Students Still Lie in Their Beds: The Death Horror in East Pakistan", From Laurent, Michel. Evening Standard (London), 29 March, 1971.

"Bangladesh News, (Organ of Aid Bangladesh Committee, Europe)", "People's Republic of Bangladesh", -Issued on 5 July, 1971. by Aid Bangladesh Committee, Europe. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৭০-৭৪, (মূল সূত্র: 'বাংলাদেশ নিউজ')।

"Bangladesh Now has the Stamps of Independence", Morning Star Reporter. Morning Star (London), 27 July, 1971.

"Bangladesh wins Consul Defector", By Ezard, John. The Guardian (London), 2 August, 1971.

"Bangladesh Demands: Free Sheikh Mujib!", Justice Abu Sayeed Chowdhury, Special representative of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Interviewed by Chris Myant on the military trial of Awami League Leader Sheikh Mujibur Rahman, which opens today. Morning Stary (London), 11 August, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

"Bangladesh Mission Opened in Britain", [Picture: Justice Abu Sayeed Chowdhury], Morning Star (London), 28 August, 1971.

"Bangladesh Recognised India Makes it Official", By Loshak, David in New Delhi. Daily Telegraph, 7 December, 1971.

"Bangladesh Cabinet Stands Ready to Take Over in Dhaka", New Delhi: December, 20. The Guardian, Tuesday, 21 December, 1971.

"Bengal Clashes Raise the Spectre of Big-Power Conflict. [Picture: Refugees line the bank of the Ganges in East Pakistan at Kushtia waiting boats on makes them across to safety in Indian Bengal]. From Hazelhurst, Peter. Calcutta, 12 April, The Times (London), 13 April, 1971.

"Bengal Rebels Send UN Evedence of Terror Attack on Dacca." From Hazelhurst Petter, Calcutta, June 1), The Times (London), 2 June, 1971.

"Chain Back Pakistan's Defence", Peking 7 November, 1971.

"Conflict in East Pakistan: Background and Prospects" - Prepared on 11 April, 1971 by Harvard University Professors (U.S.A) Edward, S.Mason, Robert Darfan and Stpehen A. Marglin. সূত্রঃ আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালীঃ বাংলাদেশঃ ১৯৭১, পৃষ্ঠাঃ ২২৭-২২৮।

"Conference on People's Culture of Bangladesh"- Munir Rahman (Mrs.), - General Secretary, -Bangladesh Peoples Cultural Society, 59, Seymour House Tavistock, Place, London WCI, Phone: 837-4542, September, 1971. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৬২৯-৬৩০। (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র।)

"Collapse of Parliamentary Democracy in Pakistan". Sayeed, Khalid. B. The Middle East Journal, Autumn. 1959.

"Collapse of Parliamentary Democracy in Pakistan" Sayeed, Khalid. B. (1959) 13 Middle East Journal, 389.

"Dacca: "An Appeal to the Vice-Chancellors", Vice-Chancellor on Massacre of His Students, The Sunday Telegraph, 18th April, 1971. From Members of Stuff of the University of Dacca, Rajshahi, Chittagong and the Affiliated College now on higher Studies in Scotland, Bangladesh Association, Scotland, 15, Eldon Street, Glasgow, C.3.19.4.1971, সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ২৩-২৪, (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ডের প্রকাশিত প্রচার পত্র)।

"Democracy on Trail in Pakist". Chowdhury. G. W. Middle East Journal.Winter-Spring.1963.

"Democracy with Distrust". Singhal, D. P. 8 (1962) the Australian Journal of Politics and History, 211.

"Death of A Nation", World Exclusive: The Mirror's Pilger, First Western Reporter in Bangladesh, returns with a horrific story of atrocities and mass starvation. Daily Mirror, 16 June, 1971.

"Economic Aid or Bullets?", Published by Action Committee, London; April, 1971, For the Poeple's Republic of Bangladesh in U.K.58, Berwick Street, London WI. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৪৮, (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটির প্রচার পত্র)।

"East Pakistan Leader Could Declare UDI", by Hazelhurst, Peter, Karachi. The Sunday Times: (London) 7 March, 1971.

"East Pakistan Governor Resigns", by Grahman, Robert. Financial Times, 15 December, 1971.

"Fedaralism and Provincialism". Huq, Mahfuzul. The Pakistan Observer. March 28, 1965.

"Failure of Parliamentary Democracy in Pakistan". Chowdhury. G. W. "Parlimentary Affairs. Vol.12 (1).Winter, 1959,

"Federalism and Pakistan". Sayeed, Khalid. B. Far Eastern Survey. September, 1954.

"Forging Fighting Unity to Win Independence" Bangladesh Close –up –6. Assistant Editor Wainwright, William, 11 November, 1971.

"Former Govornor of East Pakistan Killed by Gunmen", By Loshak, David in Karachi, Daily Telegraph (London), 15 October, 1971.

"Genocide in Bangladesh" - Sakhawat Husain, Barrister-at-law - Published by Ameer Ali and Shamsul Morshed form 29 Rupert Street, London WI. 1971. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ২০০-২০৪। (মূল সূত্রঃ ব্যারিষ্টার শাখাওয়াত হোসেন)।

Dhaka University Institutional Repository

"Genocide in Bengal" [Picture: Demonstration in London bringing the placard "Stop Genocide"]. Independence Leader. Workers Press, 19 April, 1971.

"Grim Horror that is East Pakistan", From Rosenblum, Mort. Evening Standard, 12 May, 1971.

"Guerrillas hide –and seek." From Lescaze, Lee in Dacca. [Piture: East Pakistan Guerrillas in training]. The Guardian (London), 23 July, 1971.

"Heave Fighting after UDI by East Pakistan" Our foreign staff, The Guardian: (London) 27 March, 1971.

"Heavy Fighting as Sheikh Mujibur Declares E Pakistan Independent", The Times: (London) 27 March, 1971.

"Heavy Battles Continue for Control of Main Cities of East Pakistan", The Times (London): 29 March, 1971.

"How Can You Help The Freedom Movement of Bangladesh –A. Guideline". -Tasadduq Ahmed. - October, 1971. - Issued on behalf of Bangladesh Freedom Movement Overseas, 40, Gerrard Street, London Wi.Tel: 01-437-8705, সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ১৬৫-১৬৮, (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীজ-এর দলিল পত্র)।

"Huge Rally for Bangladesh", [Picture: Thousands of Bengalis and their supporters packing Trafalgar Square to Deman World Action in Support of Bangladesh.]. Morning Star (London), 2 August, 1971.

"India's Guard up, Says Mrs Gandhi", By our Diplomatic Staff. The Guardian (London), 2 November, 1971.

"India and Pakistan Go out Canvassing", Editorial, The Times, 8 November, 1971.

"Indians Claim Frontier Town Still Under Pakistani Fire", From Jackson Harold. New Delhi, December 1, The Guardian (London), 2 December, 1971.

"India Grimly Presses on", International Heralo Tribune, Friday, 3 December, 1971.

"Indian Forces Drive into East Pakistan", The Observer, 5 December, 1971.

"India and Pakistan: Pakistanis Falling Back on Port of Khulna After Abandoning Jessore without Majore Battle," From Stanhop, Henry, Defence. Correspondent, Jessore, Dec. 8. The Times (London), 9 December, 1971.

"India Demands Full Surrender in East Bengal", From Jackson, Harold: New Delhi, Dec, 15. The Guardian (London), 16 December, 1971.

"Inside Bengal: The Terror with Two Faces", The Sunday Times (London), 31 October, 1971.

"Imbalance in Economic Development in Pakistan". Sobhan, Rehman. Asian Survey. July. 1962.

"Is Parity a Practical Proposition?" Ahmad, Abul Mansur. The Pakistan Observer. 25 December 1963.

"It's War, Says Mrs. Gandhi: 16 Indian Divisions poised on Strike", Pakistan Jets Hit Airfields. Daily Telegraph, 4 December, 1971.

"John Stonehouse: A True Friend of Bangladesh" -Abdul Matin, London, 12 May, 1988. সূত্রঃ আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালীঃ বাংলাদেশঃ ১৯৭১, পৃষ্ঠাঃ ২৩২-২৩৪; অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯১।

"Kennedy Hits Pakistan Genocide", After Visiting Refugees in India, by Sydney H. Schanberg New Delhi, Aug. 16. and "Bengali Rebels Permitted To use India, Envoy Admits", Sanctuary for fighters by Klaidman, Stephen. International Herald Tribune, 17 August, 1971.

"Mrs. Gandhi Gives a Warning but Advises Restraint", (Overseas News: New Delhi: 4 April). And "MPs Push for Bengal Action" by Aitken, Lan. The Guardian (London), Monday, 5 April, 1971.

"Mrs. Gandhi Receives East Pakistan Leaders." (New Delhi June-1). The Financial Times (London), Wednesday, 2 June, 1971. "Mrs. Gandhi Receives East Pakistan Leaders." (New Delhi June-1). The Financial Times (London), Wednesday, 2 June, 1971.

"M.P.s Tell of Child Victims in Pakistan Atrocities". By Michael, John, Commonwealth Correspondent. Sunday Telegraph, (London), 4 July, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

"Mrs. Gandhi Calls for Pakistan Troops to Leave East Bengal", From Hazelhurst, Peter. Delhi, November.30. The Times, 1 December, 1971.

"Mrs. Gandhi: Mujib must be Freed", Exclusive Interview by Carroll, Nicholas [Picture: Mrs. India Gandhi]. Sunday Times, 19 December, 1971.

"Mujib Well as Trail Opens", By a special correspondent in Karachi. Sunday Telegraph (London), 15 August, 1971.

"Mujib's Release will Ease Tension, says Chancellor Kreisky", Indian News. 6 November, 1971.

"Operation Omega", Peas News, 11 June, 1971. "Genocide", "Full Report", "Stop Killing". The Sunday Times (London), 13 June, 1971.

"Pakistan's Presidential Elections". Al-Mujahid, Sharif. Asian Survey.Vol. 5(6). June, 1963.

"Pakistan: New Challenges of the Political Sysrem." Bahadur, Kalim. (1968), Asian Survey.

"Pakistan's Economic Development (1949-58)". Huq, A.M. Pacific Affairs. June. 1959.

"Pakistan's Basic Democracy". Sayeed, Khalid. B. The Middle East Journal. Summer, 1961.

"Pakistan's Constitutional Autocracy". Sayeed, Khalid. B. Pacific Affairs. Winter 1963-64.

"Pakistan: New Challenge to the Political System". Sayeed, Khalid. B. Asian Survey. February, 1968.

"Pakistan Plungs in to Civil War", [Picture: Map of the subcontinent; Yahya; Sheikh Mujibur Rahman]. Newsweek (London), 5 April, 1971.

"Pakistan: Toppling Over the Brink", and "Raise Your Hands and Join Me". Time (London): 5 April, 1971.

"Pakistan: Bengalis were being killed in their thousands. The Army was rounding up people and machine-gunning them....they were shot down from behind like dogs, Massacre of the Children", Evening Standard (London): Thursday, 8 April, 1971.

"Pakistan: Vultures and Wild Dogs." [Picture: Bengali Victims and Photo Purporting to Show Mujib in Captivity], Newsweek, 26 April, 1971.

"Pakistan Visit Shocks MPs", From Mackenzie, Ian: Bangaon, 29 June. "Bengali Seamen Ask for Asylum", By Campbell Page. "UN Team Planned for East Pakistan". By Our Diplomatic Correspondent. The Guardian (London), 30 June, 1971.

"Pakistan is Renounced by Envoy in London", [Picture: Mr. Mohiuddin Ahmed, a Pakistani diplomat, denouncing his Gevernment in Trafalgar Square], By Fixk, Robert. and "Madison Square Ovation for Two Beatles", From our own Correspondent, New York, August 1. The Times (London), 2 August, 1971.

"Pakistan Remains Silent on Sheikh Mujib's Trail", Overseas News, by our Foreign Staff. The Guardian, (London), Friday, 13 August, 1971.

"Pakistan on Trail", Comments. The Observer (London), 15 August, 1971.

"Pakistan Hint that China will not Join in war", From Hourego, David. Rawalpindi, November, 8. and "Mrs. Gandhi Speaks out in Paris", From our own Correspondent, Paris, 8 November. The Times (London), 9 November, 1971.

"Pakistan Accepts Cease-fire Dacca Governor Threatened", Daily Telegraph, 18 December, 1971.

"Please Speak up For Bangladesh", -April, 1971. - An Appeal to the Delegates at the 1971, Annual Party Conference of the Conservative and Unionist Party.
-Published by the Streering Committee of the Action Committees for the People's Republic of Bangladesh, 11. Goring Street. E.C.3, Tel: 2835526 and 2853623. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৩৫-৩৬। (মূল সূত্রঃ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র)।

"Press Conspiracy Aids Yaha Khan", - 6 May, 1971. Bangladesh Association, Scotland.15, Eldon Street, (Ground Left), Clasgow. C.3. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৫৪, (মূল সূত্রঃ প্রচার পত্র)।

"President Yahya Khan's Latest Formula for Restoration of Civilion Rule in Pakistan: An Analysis." - Bangladesh Associaton of New England, 14 July, 1971. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৮২-৮৪। (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ নিউ ইংল্যান্ডের পুস্তিকা)।

"President Says Traitore must be Punished", (Delhi: March, 26). The Times: (London) 27 March, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

"Political Developmet vis-a-vis National Integration". Ahmad, Abul Mansur. The Pakistan Observer, 14 August, 1966.

''Resolution on Genocide in Bangladesh''. -25th June, 1971. -Issued by International Friends of Bangladesh. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ১৬৯, (মূল সূত্রঃ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস্ অব বাংলাদেশ)।

"Rebel Leader Arrested", Evening News (London) 26 March, 1971.

"Recognise and Support Bangladesh.", Published by Bangladesh Action Committes, 52, Wordsworth Road, Small Heath, Birmingham 10, 021-7731456, April, 1971. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৪৯-৫০, (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র)।

"Rogers Confers with Thant on India-Pakistan situation". Humanitarian Aspects Stressed. and "Awami League Chief to be Tried by Army", Rawalpindi, August, 9 (AP), President Yahya Announce. International Herald Tribune, 10 August, 1971.

"Sincere Respect?"- by Aire Kuiper. Fact Sheet -18, 30 September, 1971. - Bangladesh Students Action Committee in Great Britain, 35, Gamage Building, 120 Holborn, London ECI, Phone: 01-405-5917. -নেদারল্যান্ডের দৈনিক 'DE TIJD'-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর নিবন্ধের অনুবাদ সম্বলিত 'ফ্যাক্টসীট-১৮'।

"Sheikh Sends Envoy to Frontier", From Hazelhurst, Peter, (Calcutta, March 28), The Times (London): 29 March, 1971.

"Sheikh Mujib Trial Opens Tomorrow", By M.F.H. Beg in Karachi. The Daily Telegraph (London), Tuesday, 10 August, 1971.

"Secure Release of the President of the People's Republic of Bangladesh." Advertisement: Wake up World Please Act Immediately to stop Camera Trial. [Picture: The President of the People's Republic of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman]. The Times (London), 16 August, 1971.

"Settlement within Framework of Pakistan not possible Bangladesh Premier's Interview". [Picture: Tajuddin Ahmed], Mainstream, 19 August, 1971.

"Solidarity With Bangladesh Liberation Struggles: A Call for Support." -1971, - Signed by Bangladesh Solidarity Campaign, 70 Harcourt Road, Sheffield S10 1DJ. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ২০৭-২১০। (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ সলিডারিটি ক্যাম্পেন)।

"Stop Genocide in East Bengal and Recognise Bangladesh." - 1st August, 1971. - Copy of Letter to be delivered to Mr. Heath Today by Action Bangladesh 34, Stratford Villas, London, N.W.I. Tel: 485-2889 and 267-4200. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৬২০-৬২২। (মূল সূত্রঃ এ্যাকশন বাংলাদেশ, লন্ডন, প্রকাশিত পুস্তিকা)।

"Support The Movement for The Liberation of Bangladesh; 24 Years of Exploitation of Bangladesh by West Pakistan.", April, 1971, Bangladesh Association Scotland, 15, Eldon St.Glasgo C.3. Tl: 041-339-6579. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৪১-৪২, (মূল সূত্রঃ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কট্যান্ড-এর প্রচারপত্র)।

"Support Bangladesh Liberation Struggle", - April, 1971. - Morning Star News Service, - Published by People's Democratic Front of Bangladesh. সূত্রঃ আবদুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালীঃ বাংলাদেশঃ ১৯৭১, পৃষ্ঠাঃ ৩৭-৩৮। মূল সূত্রঃ পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বাংলাদেশ-প্রচারপত্র)।

"Supply Ship Sabotage Shatters Confidence of W.Pakistan", By Hollingworth, and "Rehictant Candidates in Dacca", By our Staff Correspondent in Dacca. Clare in Dacca. Daily Telegraph, 23 August, 1971.

"Tanks Crush Revolt in Pakistan Telegraph Reporter Slips Net", The Daily Telegraph (London): 30 March, 1971.

"Talk of India-Pakistan War", By Fafferty, Kevin. Financial Times, 2 November, 1971.

"The National Language Issue: Potent Force for Transforming East Pakistani Regionalism into Bengali Nationalism". Akanda, S. A. The Journal of the Institute of Bangladesh Studies (IBS). Vol-1.no.1 1976.PP1-29.

"The 1962 Constitution of Pakistan and the Reaction of the People of Bangladesh." Akanda, S. A. The Journal of the Institute of Bagladesh Studies (IBS).Vol-III. 1978.71-86.

Dhaka University Institutional Repository

"The Working of the Ayub Conistitution and the People of Bangladesh". Akanda, S. A. The Kournal of the Institute of Bangladesh Studies (IBS). Vol-IV. 1979-80.

"The Assembly Elections in Pakistan". Al-Mujahid, Sharif. Asian Survey. Vol. 5(11).November. 1965.

"The Political Stability of Pakistan". Callard, Keith. Paciffic Affairs.Vol.XXIX.March, 1956.

"The East Pakistan Political Scene". Chowdhury. G. W. Pacific Affairs. December, 1957.

"The Problem of National Integration in Pakistan". Hussain, Syed Sujjad. The Pakistan Observer. June 17, 1967.

"The Awami League in Political Development of Pakistan". Hussain, Syed Sujjad. Asian Survey Vol-X Bo. 7. July, 1970.

"The Political Role of Pakistan's Civil Service". Sayeed, Khalid. B. Pacific Affairs. June. 1958.

"Theory and Practice of Controlled Democracy in Pakistan." Singh, Biswanath. (1968) 8 Modern Review, 375.

"The Indivisibility of the National Economy". Sobhan, Rehman. The Pakistan Ovserver, Oct. 23 and 25, 1961.

"The Challenge of Inequality". Sobhan, Rehman. The Pakistan Observer. 12-15 July. 1965.

"The Blood of Bangladesh", New Statesman, 16 April, 1971.

"The Life and Death of Millions in Everyone's Problem" (Advertisement: This is the Moment to show that Man is More than "An Internal Problem." The Times (London), Thursday, 13 May, 1971.

"The Forlorn Guerrillas Who Fight in a Monsoon". The World This Week: Pakistan, Smith, Colin describes a visit to Bangladesh's freedom fighters. The Observer (London), 20 June, 1971.

"The Emergence of Bangladesh", International Herald Tribune, 10 December, 1971.

"US Task Force to stand by", From Raphael, Adam: Washington, Dec.13.The Guardian (London), December 14, 1971.

"Wake up World Please Act Immediately to Stop Camera Trial." Advertisement: Secure release of the People's Republic of Bangladesh. - 16 August, 1971. The Sponsorship for this Advertisement has been Organised by: Bangladesh Students Action Committee, 35 Gamages Building, 120 Halborn, London E.C.I. Tel: 01-405-5917. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৯৯-১০০, (মূল সূত্র: বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির বিজ্ঞাপন)।

"Warning by India as Yahya Suggests 'Mutual Withdrawal", by our foreign staff, and Dacca Guerrillas Start Offensive", From Martin Woolacott: Dacca, October, 17. The Guardian (London), 18 October, 1971.

"Warning in Gueerrilla Vengeance", From Stanhope, Henry, Calcutta, Dec. 7. The Times (London), 8 December, 1971.

"Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan. A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan During Martial Law 1958-62". Akanda, S. A. The Journal of the Institute of Bangladesh Studis (IBS).Vol-VI.1982-83.

"We have Achieved Unity in Purpose: Let us Now Achive Unity in Action". A Call to Bangladesh Action Committees in the United Kingdom, (A memo from the Bangladesh Action Committes, Westminister-London: 7 July, 1971), -On behalf of Bangladesh Action Committee (Westminister –London), A.Rahim Chowdhury, Sharful Islam, Joint Convieners, 23, Minford Gardens, London WI. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৭৫-৭৯, (মূল সূত্র: ওয়েষ্টমিনিস্টার এ্যাকশন কমিটির প্রকাশিত প্রচারপত্র)।

"Why Bangladesh: Statistical Analysis of Disparity between East and West Pakistan." - R. Alam, - 1971. - Published on behalf of the Bangladesh Relief Committee, 11 Goring Street, London, E.C.3 Phone: 01-283-362/3 by R. Alam (Press and Publicity Unit.) On behalf of the Central Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in U.K. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ২১৩-২২০। (মূল সূত্র: বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি, লন্ডন)।

"Yahya's Istaeli –Styly Push was Bungled", From Jackson, Harold in Pathankot, Kashmir Border, and " India Hands Her Gains to Bangladesh. The Guardian 7 December, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

"1965-An Epoch Making Year in Pakistan General Elections and War with India". Sayeed, Khalid. B. Asian Survey February.1966.
"10,000 Die as Tanks Blast Rebels", (New Delhi), Evening Standard (London): 27 March, 1971.
"7,000 Slaughtered: Homes Burned", by Dring, Simon in Bankok, who was in Dacca during the fighting. The Daily Telegraph (London): 30 March, 1971.

৫. বাংলা বই ঃ

আনিসুজ্জামান, এম., স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু, ঢাকা: ফাল্গুনী প্রকাশনী, ১৯৯১।
আনোয়ার, কবির বিন, বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১ম খন্ড)।
আহাদ, আবীর, বঙ্গবন্ধু: দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন, ঢাকা: ফাতেমা খায়রুন্নেছা, ১৯৯১।
আসাদ, আসাদুজ্জামান, স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
আলম, জগলুল, বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনী, ১৯৯০।
আলী, রাও ফরমান, বাংলাদেশের জন্ম (অনূদিত)।
আজাদ, কুতুব, মন্তাজ, সাহেদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঃ পত্রিকাপঞ্জী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮।
আউয়াল, মওলানা আব্দুল, জামাতের আসল চেহারা, ঢাকা: বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা পরিষদ, ১৯৮৮ ।
আহমদ, সালাহউদ্দীন, বাংলাদেশ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।
আহমদ, মওদুদ, বাংলাদেশঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি লিমিটেড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৬।
আহমদ, সালাহ উদ্দীন (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
আহমদ, প্রফেসর সালাহউদ্দিন, সরকার, মোনায়েম এবং মঞ্জুর, ডঃ নুরুল ইসলাম, (সম্পাদনা), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস।
আহমেদ, বদরুদ্দীন, উপমহাদেশের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৯৯।
আহমেদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।
আহমেদ, কামাল, কালের কল্লোল বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০, ২য় সংস্করণ, ঢাকাঃ মৌলি প্রকাশনী, ২০০২।
আব্দুল মান্নান, শেখ, মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।
ইকবাল, কাজী জাহেদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ ইতিহাস চর্চার গতিধারা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০০।
ইতিসামউদ্দিন, মির্জা শেখ: বিলায়েতনামা।
ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ, এম. ডি, বিলাত-ভ্রমণ: বিলাতের পথে, প্রথম ভাগ, কলিকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১০।
ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খন্ডঃ রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ডঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস, তৃতীয় খন্ডঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।
ইসলাম, রফিকুল, লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৬।
ইসলাম, মাযহারুল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।
ইসলাম, সাইফুল, স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, ঢাকা: অয়ন প্রকাশনী, ১৯৮৭।
ইসলাম, নূরুল (সম্পাদিত), ছয়দফা, ঢাকা, ১৯৬৬।
ইসলাম, নূরুল, প্রবাসীর কথা, প্রবাসী পাবলিকেশন্স, সিলেট, ১৯৮৯।
ইমাম, এইচ, টি, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১।
ইব্রাহিম, নীলিমা, আমি বীরাঙ্গণা বলছি, প্রথম খন্ড, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৪।
উমর, বদরুদ্দীন, পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড, ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০; দ্বিতীয় খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫; তৃতীয় খন্ড, চট্টগ্রাম বইঘর, ১৯৮৫।
উল্লাহ, মাহফুজ, অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩।
এবনে মা-জ, বিলাতি মোসলমান অর্থাৎ ইংল্যন্ডের অন্তর্গত লিভারপুল নগরীর নব-দীক্ষিত মোসলমানগণের বিশেষ বিবরণ, কলিকাতা: রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৯০৯।
ওঝা কৃত্তিবাস, আমি মুজিব বলছি, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৫।
কাদির, মুহাম্মদ নূরুল, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭।
করিম, জাওয়াদুল, মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।
কামাল, মেসবাহ, আসাদ ও উনসত্তরের গণআন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৫।
কৃষ্ণ কৃপালনী, দ্বারকানাথ ঠাকুর: বিস্মৃত পথিকৃৎ। ক্ষিতীশ রায় অনূদিত। নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৪।
কৃষ্ণভাবিনী দাস, ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা। কলিকাতা: ব্যানার্জি অ্যান্ড সন্স, ১৮৮৫।
খান, মুহাম্মদ আইয়ুব, প্রভু নয় বন্ধু, ঢাকা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮। (অনূদিত)
গিরিশচন্দ্র বসু, বিলাতের পত্র, প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: বঙ্গবাসী প্রেস, ১৮৮৭।
-------------, বিলাতের পত্র, দ্বিতীয় ভাগ। সন ১২৯৩।
-------------, ইউরোপ-ভ্রমণ। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: বঙ্গবাসী প্রেস, ১২৯২।
গোলাম মুরশিদ, আশায় ছলনে ভুলি। তৃতীয় সংস্করণ:, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬।

--------------, 'রবীন্দ্রনাথ ও তিন নারী', দেশ, নভেম্বর ২০০৪?
--------------, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারীপ্রগতির এক শো বছর। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সং, ১৯৯৯।
--------------, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। ঢাকা: অবসর, ২০০৫।
ঘোষ, বিনয়: কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত।
ঘোষ, শ্যামলী, আওয়ামী লীগঃ ১৯৪৯-১৯৭১ (অনুবাদঃ আলম, হাবীব-উল) দি ইউনিভার্সিটি লিমিটেড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭।
চৌধুরী, অচ্যুতচরণ: শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।
চৌধুরী, আব্দুল গাফফার, আমরা বাংলাদেশী না বাঙ্গালী, ঢাকা: অক্ষরবৃত্ত প্রকাশনী, ১৯৯৩।
চৌধুরী, আবু সাঈদ, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, দি ইউনিভার্সিটি লিমিটেড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭।
চৌধুরী, মাহবুবুল আজাদ (সম্পাদিত), স্মৃতি সত্তায় আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি সংসদ, মুদ্রণেঃ ব্রাক প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালি, ঢাকা, ১৯৮৮।
চৌধুরী, কবীর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধির চর্চা, র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭।
চৌধুরী, নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত: শ্রীহট্টে প্রতিভা।
জগৎমোহিনী চৌধুরী, ইংলণ্ডে সাত মাস। কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯০২।
জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, ইতিহাস নির্মাণের ধারা।
জাহান, মোঃ এমরান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংবাদপত্র।
জেকব, লেঃ জেনারেল জে. এফ. আর, সারেন্ডার অ্যাট ঢাকাঃ একটি জাতির জন্ম (অনূদিত)।
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও ইন্দিরা দেবী, পুরাতনী। কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭।
নুরুল্লাহ ডঃ মোঃ (সম্পাদিত), যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতমঃ সংগঠক শেখ আবদুল মান্নান স্মারক গ্রন্থ, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৩।
দাশ, দেবেশ, ইয়োরোপা। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৬২।
দ্বিজেন্দ্রনাথ, রায় এম. এ., এমআরএএস: একঘরে অর্থাৎ বিলাতফেরতদিগকে একঘরে করিবার বিষয়ে কোন বিলাতফেরতার পূর্ণব্যক্তমত; যাহা জানিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। কলিকাতা: এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৮৮৯। (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১০।)
দে, তপন কুমার, মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল, জাগৃতি প্রকাশনী, নীলক্ষেত রোড, ঢাকা, ১৯৯৬।
দেবেন্দ্রনাথ রায়, পাগলের কথা। কলিকাতা: দাস প্রেস, ১৯১০।
প্রশান্ত পাল, রবি-জীবনী। প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: ভূর্জপত্র, ১৯৮২ ও ১৯৮৪।
ফায়েকুজ্জামান, মুহাম্মদ, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮।
বাংলাদেশ চর্চা প্রকাশিত, গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (৩ খন্ড)।
বাংলাদেশের সমাজ-বিপ্লব বঙ্গবন্ধুর দর্শন (বক্তৃতা সঙ্কলন), বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা: ১৯৭৯।
বাহার, মোঃ হাবিবউল্লাহ, টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯।
ব্যানার্জী, শশাঙ্ক এস. ইন্ডিয়া'স সিকিউরিটি ডিলেমাস ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ, Anthaem Press, Published in the U.K. & U. S. A. 2006.
বিবেকানন্দ, স্বামী, পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ। দ্বিতীয় সং; কলিকাতা: স্বামী সত্যকাম, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
----------------------, শিবনাথ শাস্ত্রী। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি। কলিকাতা: সমাজপতি ও বসু, ১৯০৬।
ভাট্টি, মাসুদা, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধঃ বৃটিশ দলিল পত্র, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৩।
মর্তুজা আলী, সৈয়দ: হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস
মতিন, আবদুল, জেনেভায় বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৮৪।
-------------, মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯।
-------------, জেনেভায় বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।
-------------, মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিঃ যুক্তরাজ্য। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৫।
-------------, স্মৃতিচারণ: পাঁচ অধ্যায়। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭।
-------------, দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০১।
-------------, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিল। ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৯।
মান্নান, শেখ আবদুল, মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান। ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
মামুন, মুনতাসীর ও জয়ন্তকুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ঢাকা: অবসর প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৯৫।
মামুন, মুনতাসীর, আহমেদ, হাসিনা, মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি (১-৬) খন্ড, বাংলাদেশ চর্চা, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মামুন, মুনতাসীর, ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।
---------------, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৪।
---------------, মজিবরের বাড়ি। ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৫।
---------------, পাঠ্যবই ইতিহাস দখলের ইতিহাস। ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ২০০২।
মিয়া, এম. এ. ওয়াজেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ। ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৩।
মুকুল, এম. আর. আখতার, আমি বিজয় দেখেছি। ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৫।
মুরশিদ, গোলাম, কালাপানির হাতছানিঃ বিলেতে বাঙালির ইতিহাস, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা, সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮।
মুচেবিকে, একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়? ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র (মুচেবিকে), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭।
মুহিত, আবুল মাল আবদুল, স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৯।
-----------------------, বাংলাদেশ ঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০০।
মোহাম্মদ, তাজুল, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানাপল্টন, ঢাকা, ২০০১।
---------------, সিলেটে গণহত্যা, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
---------------, মুক্তিযুদ্ধের গাথা , উৎস প্রকাশন, শাহাবাগ, ঢাকা, ২০০৩।
---------------, সিলেটের যুদ্ধ কথা, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানাপল্টন, ঢাকা, ১৯৯৩।
---------------, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০১।
---------------, (সম্পাদিত), একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানাপল্টন, ঢাকা, ১৯৯৮।
মোহাম্মদ, বেলাল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (দ্বিতীয় প্রকাশ)। ঢাকা: ফুলদল প্রকাশনী, ১৯৮৮।
মোর্শেদ, এম, সারওয়ার, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সংকট, বাংলা প্রকাশ, কাঁটাবন, ঢাকা, ২০০৯।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইউরোপযাত্রীর পত্র। জীবনস্মৃতি।
[রমেশচন্দ্র দত্ত], ইয়ুরোপে তিন বৎসর। কলিকাতা: স্ট্যানহোপ প্রেস, ১৮৭৩।
রহমান, উর্মি, ব্রিকলেনঃ বিলেতের বাঙালিটোলা, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানাপল্টন, ঢাকা, ১৯৯৩।
-----------, বিলেতে বাঙালি সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানাপল্টন, ঢাকা, ২০১০।
রহমান, আতিকুর, জাতির পিতা ও পতাকা কাহিনী, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।
রহমান, মুহাম্মদ ফয়জুর, বৃটেনে বাংলাদেশী (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড রিসার্চ সিলেট (সিআইআরএস), জিন্দাবাজার, সিলেট, ১৯৯৯।
রহমান, ফজলুল, বাংলাদেশে গণহত্যা। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭২।
রহিম, খন্দকার আবদুর, টাংগাইলের ইতিহাস।
রশীদ, আসিফ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকার গোপন দলিল, সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪।
রায়, ভবেশ, বাংলাদেশে গণহত্যার প্রামাণ্য দলিল। ঢাকা: নন্দিতা, ১৯৯০।
সরকার, ব্যারিস্টার মুহাম্মাদ জমির উদ্দিন, বৃটিশ ভারতে গণতন্ত্রের উন্মেষ, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ২০০৮।
---------------------------------------, লন্ডনে ছাত্র আন্দোলন।
---------------------------------------, লন্ডনে শিক্ষা জীবন।
---------------------------------------, লন্ডনে বন্ধুবান্ধব।
সাঈদ, আবু আল, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
সিংহ, যশোবন্ত, জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, (অনূদিত) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বাদিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৯।
সিংহ, মণি, জীবন সংগ্রাম। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৩।
সোবহান, রেহমান, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮২।
----------------, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য , মওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৮।
হক, মজনু-নুল, বিলেতে বাংলার যুদ্ধ।
হান্নান, ড. মোহাম্মদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়ে, ১৯৯২ভ।
হাসান, সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০।
হায়দার, রশীদ (সম্পাদিত), স্মৃতি ১৯৭১ (১-১৩) খন্ড।
হোসেন, প্রফেসর ডঃ এম. দেলওয়ার, ইতিহাসতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুণর্মুদ্রণ, ১৯৯৬।
হোসেন, প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।
হোসেন, ডঃ খন্দকার মোশাররফ, একাত্তরের স্মৃতি ঃ মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮।
হোসেন, ডঃ আশফাক, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ।
হোসেন, প্রফেসর ডঃ আবু মোহাম্মদ, দেলোয়ার, বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী, মূলধারা, ঢাকা, ১৯৯১।
--------------------------------, ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধঃ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।
--------------------------------, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।
হোসেন, প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাংলা প্রবন্ধ ও রিপোর্ট ঃ

"অস্ত্র হাতে তুলে নাও।" নৃত্যনাট্য: রচনা ও সুরারোপ: এনামুল হক। -রচনা কাল: আগস্ট, ১৯৭১। যুদ্ধকালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে মঞ্চায়িত। সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৬৪৪-৬৪৯। (মূল সূত্র: বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র।)

"আপোশ না সংগ্রাম" (সম্পাদকীয়)

- আজি আল মোজাহিদ-'সবুজ বাংলা লাল হলো'
- 'হত্যার প্রতিবাদে'
- 'লন্ডনে বাঙালীদের বিক্ষোভ'

-Bidrohi Bangla: Fortnightly Newspaper: 3rd Issed: Birmingham –Sunday, 21st March, 1971. সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৪-৭।

"গণহত্যার সম্পূর্ণ প্রতিবেদন", অ্যান্থনি মাসকারেনহাস, (ভাষান্তর: মাহবুব কামাল), সূত্র: হাসান, সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৪।

"চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন", মেনন, রাশেদ খান, ঈদসংখ্যা বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

"ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা", রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৩-২৪।

"ছাত্র ইউনিয়নঃ বায়ান্ন থেকে বাষট্টি-একটি পর্যায়ের উত্তরণ", হোসেন, কাজী আকরাম,গৌরবের সমাচার, ঢাকাঃ ছাত্র ইউনিয়ন রজতজয়ন্তী প্রকাশন, ১৯৭৭।

"জরুরী বিজ্ঞপ্তি" -১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। -ষ্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডন ইসি-৩, সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ১৯৭-১৯৮। (মূল সূত্র: বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি লন্ডন।)

"জয় বাংলা" -শপথ সভা, ২৮ মার্চ, রবিবার, ১৯৭১ ইং, স্মলহীথ পার্ক, বার্মিংহোক, বেলা: ২ ঘটিকা, আহবায়ক, বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি। সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৮।

"জাতীয় সংগীত-আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।"-১৯৭১, বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, গ্রেট বৃটেন, ৩৫, গমেজ বিল্ডিং, ১২০ হর্বন, লন্ডন ই সি আই, ফোন: ০১-৪০৫-৫৯১৭। সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৬৪। (মূল সূত্র: বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, যুক্তরাজ্য।)

"জামাত-রাজাকার: স্বদেশ প্রবাসে" -আফান্দস আলী (পূর্ব লন্ডনে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন)। স সূত্র: তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা: দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ: ২০৯-২১২।

"দু' অংশের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে", শোর, পিটার, সূত্র: হাসান, সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-১০৮।

"নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস প্রসঙ্গে", ইসলাম, এম.মোফাখখারুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, ১৯৮২।

"পঁচিশ ও ছাব্বিশে মার্চের ঢাকা", ড্রিং, সাইমন, (ভাষান্তর: আহমেদ, আলমগীর), সূত্র: হাসান, সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৭২।

"পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগজনক", হিউম, স্যার ডগলাস, (ভাষান্তর: হোসেন, দিলওয়ার) সূত্র: হাসান,সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-২০২।

"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও যুব আন্দোলন", তোয়াহা, বিচিত্রা, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

"পাকিস্তানের শবদাফন" -এপ্রিল, ১৯৭১। -পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ-কে, বেজওয়াটার ব্রাঞ্চ-এর সৌজন্যে। সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৫৯৮। (মূল সূত্র: এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র।)

"পাকিস্তানকে আর কোন সাহায্য নয়", উইলসন, হেরাল্ড, (ভাষান্তর: রহমান, আজাদুর), সূত্র: হাসান,সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-২০৫।

"পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসনের প্রথম অধ্যায়", উমর, বদরুদ্দীন, ঈদসংখ্যা বিচিত্রা, ১৯৮০।

"পূবের আকাশে উঠেছে সূর্য-, আলোকে আলোকময়, জয় জয় জয় জয় বাংলার জয়।" -অক্টোবর ১৯৭১। আওয়ামী লীগ লন্ডন শাখার একটি প্রচারপত্র। সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ১৪২। (মূল সূত্র: লন্ডন আওয়ামী লীগের 'প্রচারপত্র-১'।)

"প্রহসনের উপনির্বাচন", টালি, মার্ক, (ভাষান্তর: হোসেন, সাদেক), সূত্র: হাসান, সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-১২৩।

"ফজলুল হক ও বাঙালী মুসলমানঃ দুই দশকের সমীক্ষা", মোহসীন, কে. এম., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৭৬।

"বাংলাদেশের কবি গান- চিল শকুনে মানুষ খায়; হায়রে সোনার বাংলায়" -কবি আবদুর রহমান খান রচিত। -মে, ১৯৭১। -লেখক বৃটেনে কর্মরত একজন সাধারণ শ্রমিক। ১৯৭১ সালের ৮ মে ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত জনসভায় গানটি পরিবেশিত হয়। এই সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃ: ৬০০-৬০৫। (মূল সূত্র: বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন (ল্যাংকাশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) প্রকাশিত পুস্তিকা।)

"বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি-একটি পর্যালোচনা", কাশেম, আবুল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-১, খন্ড ২৩-২৪, ১৯৯৫-১৯৯৬।

"বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনঃ প্রকৃতি ও পরিধি", ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২৪।

Dhaka University Institutional Repository

"বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন", আহমদ, কাজী জাফর, ঈদসংখ্যা বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

"বিলেতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম" -ইসমাইল আজাদ (ষাটের দশকে বিলেতে (ইস্টপাকিস্তানে লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর সাথে সম্পর্কিত। ফ্রন্টের মুখপত্র 'বিদ্রোহী' বাংলা'র অন্যতম সম্পাদক, 'বার্মিংহোম এ্যাকশন কমিটি'র কোষাধ্যক্ষ। বর্তমানে বৃটেনে খ্যাতিমান বাঙালি ব্যবসায়ী)। সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকাঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃঃ ২১৯-২২৬।

"দ্বিতীয়বিবাময় অভিজ্ঞতা" -তারা মিয়া খান (বৃটেন প্রবাসী ব্যবসায় এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'নতুন দিন'-এর চেয়ারম্যান), সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকাঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃঃ ১৯৮-২০৩।

"মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী", কবির চৌধুরী: "স্মৃতিচারণ ঃ প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি", আবু সাঈদ চৌধুরী: "মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস এবং প্রবাসে সাপ্তাহিক জনমত", এর ভূমিকা-আনিস আহমদ: "প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি", নুরুল ইসলাম। [সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-১৬১-১৯৩।]

"মুক্তিসংগ্রামে শরণার্থীদের ভূমিকা" -গোলাম মুরশিদ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যাপক, বহু তাৎপর্যময় মৌলিক গবেষণা গ্রন্থের প্রণেতা। বর্তমানে লন্ডনে শিক্ষকতা করছেন এবং বিবিসি বাংলা বিভাগের কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন)। সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকাঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৮৩-১৯৭।

"মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার" -মোস্তাক কোরেশী (ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি সংগ্রামে ছিলেন সামনের সারিতে। দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন বাম রাজনীতির সাথে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা এবং ওয়েস্ট মিনিস্টার কাউন্সিলের কাউন্সিলর।) সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকাঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃঃ ২১৩-২১৮।

"মুক্তিযুদ্ধে বৃটেন প্রবাসী বাম প্রগতিশীলদের ভূমিকা' -মাহমুদ এ রউফ (বর্তমানে লন্ডনে এ্যাকাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বহু ধরণের কমিউনিটি কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত)। সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকাঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃঃ ২২৭-২৩১।

"শত্রুর কবলে" -জমশেদ আলী (বিলেত প্রবাসী, বর্তমানে ইংল্যান্ডের লুটন শহরে বসবাস করছেন)। সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকাঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃঃ ২০৪-২০৮।

"সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ", হাশমী, ন. আ. তাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৪।

"সামরিক বাহিনী ও রাজনীতিঃ তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ", মামুন, মুনতাসীর ও জয়ন্ত কুমার রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৪২, ১৯৯২।

"সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই স্বাধীনতা চায়", স্টোনহাউজ, রাসেলজন, সূত্রঃ হাসান,সোহরাব (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মূদ্রন, ২০০০, পৃষ্ঠা-৯০।

"স্বাধীন বাংলা" (সংক্ষিপ্ত সংবাদ) -৩ এপ্রিল, মঙ্গলবার, ১৯৭১, প্রচার দফতর, বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি, ৫২ ওয়ার্ডওয়ার্থ রোড, স্মলহীথ বার্মিংহাম। সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৯।

"স্বাধীনতা সংগ্রামের গান-এসো দেশের ভাই একসাথে সবাই, সব ভেদাভেদ ভুলে এবার করব যে লড়াই।"
-জুন, ১৯৭১। -কথা ও সুরারোপ- এনামুল হক। বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রচারিত। সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৬০৮, (মুল সূত্রঃ বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের প্রচারপত্র)।

"ষাটের দশকে বাঙালী জাতীয়তার বিকাশ", চৌধুরী, মীজানুর রহমান, ঈদসংখ্যা বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

"ষাটের দশকে উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্তের ভূমিকা", শেলী, মীজানুর রহমান, ঈদসংখ্যা বিচিত্রা, ৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

"ষাটের দশকের ছাত্র-রাজনীতি", উল্লাহ, মাহবুব, ঈদসংখ্যা বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

"১৯৪৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান পক্ষে সিলেটে গণভোট ও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ", আকন্দ, সফর আলী, আই. বি. এস. জার্নাল, ১৪০১ঃ২।

"১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনঃ নির্বাচনী কর্মকান্ডের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", রহমান, মোঃ মাহবুবুর, আই. বি. এস. জার্নাল, ১৪০১-২।

"১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়", ইসলাম, মো. আনোয়ারুল, আই.বি.এস.জার্নাল, ১৪০৪ঃ৫।

ড. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

আক্তার, দিল আরা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন -১৯৭১ সনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

চৌধুরী, সুলতানা নিগার, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭১), পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

জাহান, সৈয়দা খালেদা, বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা (১৯৫২-১৯৭২), পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

সাহা, ভবানী, দলয় রাজনীতিঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে-এর প্রভাব (১৯৪৭-১৯৮৫), এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

সিদ্দিকা, নাজমুন নাহার, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সামাজিক অবস্থা, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯।

হোসেন, দেলোয়ার আবু মোঃ, বাংলাদেশে-পাকিস্তান সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

সিদ্দিকী, মোঃ খায়রুল হাসান, বাংলাদেশের রাজনীতি- ১৯৫৩-১৯৬৩, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

কামরুজ্জামান, এস, এম, বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা- ১৯০০-১৯৪৭, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

বেগম মোস্তারী, বেগম পত্রিকা ও পূর্ব বাংলার নারী সমাজ (১৯৪৭-৫৮) এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,) সেশন ১৯৯৪-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ) পরিশিষ্ট ঃ

(i) সাক্ষাৎকার ঃ

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারকে প্রাথমিক উপদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; যা এ গবেষণার পরিসর বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িত উত্তরদাতাদের ষাটের দশকের তরুণ ছাত্র-নেতাদের মাধ্যমে নমুনায়ন করা হয়েছে। একটি বিষয় উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের নিকট-আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব; ১৯৭১ সালে বৃটেনে উপস্থিত ছিলেন না অথচ সেখানকার অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবগত আছেন এরকম কয়েক জন বাংলাদেশী নাগরিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকাসহ মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য বের হয়ে আসে; যা এ গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তায় প্রথমে বিভিন্ন বই পুস্তক ঘেটে এবং বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে সাক্ষাৎকারদাতাদের নিম্নলিখিত ছকে প্রশ্ন করা হয়ঃ

১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম
২. সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান
৩. সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও সময়
৪. সাক্ষাৎকারদাতার জন্ম তারিখ
৫. সাক্ষাৎকারদাতার বয়স ঃ
   ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন
   খ) বর্তমান
৬. সাক্ষাৎকারদাতার পেশা ঃ
   ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন
   খ) বর্তমান
৭. যুক্তরাজ্যের কোন এলাকায় আপনি বসবাস করতেন?
৮. যুক্তরাজ্যে প্রবাসের সময়কাল
৯. আপনার অবদানের বিশেষ দিক ঃ
   ক) অর্থ সংগ্রহ
   খ) সভা, সমিতি, সংগঠন
   গ) ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ
   ঘ) প্রচার
১০. আপনাদের প্রচেষ্টায় কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি না ? হয়ে থাকলে কী ধরণের?
১১. সে সময়ে কোন প্রবাসী বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে থাকলে তাঁদের যুক্তিগুলি কী ছিল?
১২. আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তায় গৃহীত সাক্ষাৎকার দাতাগণের তালিকা নিম্ন রূপ ঃ

ক্রঃ নং	সাক্ষাৎকার দাতার নাম	সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার পেশা ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন ঃ খ) বর্তমান ঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও সময়
১	আবুল হাসান চৌধুরী	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র, এ' লেভেল, লন্ডন, যুক্তরাজ্য। খ) বর্তমানঃ সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী, কনসালট্যান্ট, নিটলগ্রুপ, ঢাকা।।	তারিখ ঃ ২৩/০৫/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ বেলাঃ ১২:০০ঘটিকা
২	ডঃ এনামুল হক	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন ঃ পিএইচ. ডি. গবেষক লন্ডন, যুক্তরাজ্য। খ) বর্তমান ঃ জাতীয় যাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক, ঢাকা।	তারিখ ঃ ২২/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ সকাল ৯:০০ ঘটিকা।
৩	ডঃ খন্দকার মোশররফ হোসেন	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক অবস্থায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইম্পেরিয়াল কলেজে পিএইচ. ডি. গবেষক, যুক্তরাজ্য। খ) বর্তমানে ঃ ব্যবসা ও রাজনীতি।	তারিখ ঃ ২২/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা। এবং ২৩/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা।
৪	জাকারিয়া খান চৌধুরী	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল পড়ার জন্য লন্ডনে অবস্থান খ) বর্তমান ঃ অবসর জীবন যাপন।	তারিখ ঃ ১৯/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃসন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৫	প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন ঃ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষক। খ) বর্তমান ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।	তারিখ ঃ ১৫/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় বেলা ১২:০০ ঘটিকা।
৬	প্রফেসর ডঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ পিএইচ. ডি.গবেষক লন্ডন, যুক্তরাজ্য খ) বর্তমান ঃ অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	তারিখ ২১/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ বেলা ১২:০০ ঘটিকা।
৭	প্রফেসর ডঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ পিএইচ. ডি. গবেষক, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন, যুক্তরাজ্য। খ) প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	তারিখ ঃ ১৫/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা। এবং ২১/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
৮	মাহিউদ্দিন আহমদ	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ যুক্তরাজ্যস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি, যুক্তরাজ্যে আনুগত্য প্রকাশকারী প্রথম কূটনীতিক খ) বর্তমান ঃ অবসরপ্রাপ্ত সচিব।	তারিখ ঃ ২০/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
৯	আনোয়ারুল হক ভূইয়া (আজিজুল হক ভূঁইয়ার ছোট ভাই)	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র খ) বর্তমান ঃ কার্যনির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক চরমপত্র, ঢাকা।	তারিখ ঃ ১৫/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ বিকাল ৩:০০ ঘটিকা।
১০	আবুল কাশেম চৌধুরী (বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র)	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন ঃ ছাত্র (৮ম শ্রেণী) খ) বর্তমান ঃ ব্যবসা	তারিখ ঃ ১৪/০৫/২০১১ইং সময়ঃ বিকাল ৩:০০ ঘটিকা এবং ২৩/০৫/২০১১খ্রিঃ সময়ঃ বেলা ২:০০ ঘটিকা
১১	নূরুল ইসলাম	সিলেট	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র, ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল, লন্ডন। খ) বর্তমান ঃ অবসর জীবন যাপন	তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা ও বিকাল ৩:০০ ঘটিকা। এবং তারিখ ঃ ১৮/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা ও বেলা ২:০০ ঘটিকা।
১২	এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন (মঞ্জু)	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন ঃ ব্যারিস্টার-এ্যাটল-এর ছাত্র হিসেবে লন্ডন, যুক্তরাজ্য। খ) বর্তমানঃ এম, ডি, চন্দ্রা স্পিনিং মিল, ঢাকা।	তারিখ ঃ ২৫/০৫/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ বিকাল ৩:০০ঘটিকা
১৩	বিচারপতি এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন চৌধুরী (মানিক)	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র, লন্ডন, যুক্তরাজ্য। খ) বর্তমানঃ বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।	তারিখ ঃ ২২/০৫/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ বিকালঃ ৫:০০ ঘটিকা
১৪	রাজিউল হাসান(রঞ্জু)	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র, ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল, লন্ডন, যুক্তরাজ্য। খ) বর্তমানঃ অবসরপ্রাপ্ত কূটনৈতিক।	তারিখ ঃ ২৩/০৫/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ সকাল ৯:০০ঘটিকা
১৫	আবুল মাল আবদুল মুহিত	সিলেট	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ অর্থনৈতিক কাউন্সিলর, আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিক,যুক্তরাষ্ট্র খ) বর্তমান ঃ মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	তারিখ ঃ ১৮/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
১৬	ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম	ঢাকা	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ব্যারিস্টার, খ) বর্তমান ঃ সাবেক মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যারিস্টার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	তারিখ ঃ ১৯/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ বিকাল ৩:০০ ঘটিকা।
১৭	মোঃ শহীদুল হক ভুঁইয়া	ঢাকা।	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র। খ) বর্তমানঃ ডেপুটি সেক্রেটারি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	তারিখ ঃ ২৩/০৫/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ রাতঃ ৯:০০ ঘটিকা
১৮	প্রফেসর এম.এ. আজিজ	সিলেট	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীনঃ ছাত্র খ) বর্তমান ঃ ভাইস-চ্যান্সেলর, মেট্রপলিটন ইউনিভার্সিটি, আলহামরা মার্কেট, সিলেট।	তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০১১খ্রিঃ সময় ঃ সকাল ৯:০০ ঘটিকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯	হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস	টুংগীপাড়া	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন: চিফ পার্সেজার ম্যানেজার, আদমজি জুট মিল, ঢাকা। খ) বর্তমান: অবসর জীবন যাপন।	তারিখ ঃ ১২/০৬/২০১১খ্রীঃ সময়ঃ সকাল: ৮:০০ঘটিকা
২০	মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ রফিকুল ইসলাম	টুংগীপাড়া	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন: এস.এস.সি পরীক্ষার্থী অবস্থান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। খ) বর্তমান ঃ ব্যবসা	তারিখ ঃ ১৪/০৬/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ সকাল: ৭:৩০ ঘটিকা
২১	শেখ মাহমুদুল হক	টুংগীপাড়া	ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন: এস.এস.সি পরীক্ষার্থী খ) বর্তমান ঃ ব্যবসা	তারিখ ঃ ১৫/০৬/২০১১খ্রীঃ সময় ঃ সকাল: ৭:০০ ঘটিকা

তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে উল্লেখিত সাক্ষাৎকারদাতাদের নিম্নলিখিত ছকে প্রশ্ন করা হয়ঃ

১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম
২. সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান
৩. সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও সময়
৪. সাক্ষাৎকারদাতার জন্ম তারিখ
৫. সাক্ষাৎকারদাতার বয়স ঃ
    ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন
    খ) বর্তমান
৬. সাক্ষাৎকারদাতার পেশা ঃ
    ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন
    খ) বর্তমান
৭. যুক্তরাজ্যের কোন এলাকায় আপনি বসবাস করতেন?
৮. যুক্তরাজ্যে প্রবাসের সময়কাল
৯. আপনার অবদানের বিশেষ দিক ঃ
    ক) অর্থ সংগ্রহ
    খ) সভা, সমিতি, সংগঠন
    গ) ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ
    ঘ) প্রচার
১০. আপনাদের প্রচেষ্টায় কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি না ? হয়ে থাকলে কী ধরণের?
১১. সে সময়ে কোন প্রবাসী বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে থাকলে তাঁদের যুক্তিগুলি কী ছিল?
১২. আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

Dhaka University Institutional Repository

(ii) প্রকাশিত দলিল-পত্রাদি ঃ

১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে গঠিত 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট' কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান	'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নিউজ'	নভেম্বর ১৯৭০

EAST PAKISTAN LIBERATION FRONT NEWS

A meeting of the East Pakistan Liberation Front was held at Digbeth Civic Hall in Sunday 29th November 1970, at 2.00 p.m. with about two thousand Bengalis from the Midlands attending the meeting.

The former student leader Mr. Tariq Ali addressed the meeting and said that "the steps taken by the East Pakistan Liberation Front will be an example to the whole of Asia". He also said that during British rule in India, it was commonly said that" What Bengal thinks today. India thinks tomorrow".

The convenor of the meeting, Mr. Azizul Hoque Bhuia, called for the immediate and complete independence of East Pakistan; and the following resolutions were put to the meeting and carried without dissent.

This meeting of the East Pakistan Liberation Front:

1. Condemns strongly the indifference and deliberate ineffectiveness shown by President Yahya and his military Government in handling the relief work and also for trying to play down the death toll. In view of this, we hold President Yahya directly responsible for the death of 100,000 people of after the disaster. These people could have been saved if prompt action had been taken by the Pakistan Government. We demand Yahya's immediate resignation.

2. Demands that in view of the recent disasterous cyclone, and International committee be set up which includes the International Red Cross, the Red Crescent and similar agencies from China and the soviet Union, to actively supervise the relief and rehabilitation work and also to make sure that the responsibility of the relief work is not left alone to the Pakistan army which cannot be trusted and does not enjoy the confidence of the Bengali nation.

3. Immediate steps are taken to negotiate with friendly Governments to execute a Flood Control Programme and permanent measures (like Evacuation and early warning system shelters) against cyclone and Tidal waves. Such a programme was offered, without strings by the Chinese Government several years ago, but was rejected.

4. That, Dacca Airport be declared and International Airport so that in times of emergency it can be used more efficiently.

5. Recognised that East Pakistan is being exploited by the Capitalist Government from West Pakistan. The 75 million Bengalis betrayed for the last 23 years are no longer willing to rely on a 1100 mile away Government for their protection. This Government which cannot the Benglais and does not even want to do so, has been exposed clearly in this disaster and therefore the Bengalis declare their ULTIMATE DEMAND FOR INDEPENDENCE

"LONG LIVE PEOPLE'S EAST PAKISTAN"

EAST PAKISTAN LIBERATION FRONT

East Pakistan Liberation Front is a revolutionary organisation formed by a group of students and workers from East Pakistan with a motto of liberating people of East Pakistan from ruthless exploitation and domination by the Capitalist dominated Government which happens to be from West Pakistan. They also feel in the same way for the ordinary people of West Pakistan being exploited by the same Capitalist class and that liberation for them should come from themselves.

They firmly believe that East Pakistan should be an entirely independent country with a people's government and the economic system should be adopted to suit the needs of people in

Dhaka University Institutional Repository

East Pakistan and develop the country's agriculture and industry in such a way that the resources of the country can best be used for the welfare of the country in all aspects of life. Working class and the peasants should enjoy the freedom to the full extent. The front will fight with all its strength against any sort of discrimination by the ruling class.

The front believes that East Pakistan has long been betrayed in the name of religion. 75 million Bengalis are quite capable of looking after their own interests and are united in their voice to have their country free from the domination by the colonialist government in West Pakistan.

The front has with them the blessings and support in carrying the wishes of all the' 75 million Bengalis for an Independent East Bengal. Each and every Bengali has, in his or her heart, the wish for an Independent East Bengali.

The front will keep its struggle for Independence to liberate the people of East Pakistan fro the Capitalist Exploitation and colonial domination. LONG LIVE R\FREE EAST PAKISTAN.

"LONG LIVE PEOPLE'S EAST PAKISTAN"

Published by M. A. H BHUIA, Convenor & M. AHMAD. Deputy Convenor,
Printed by The Reprographic Center, 129 Soho Hall, Birmingham 19

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য বৃটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ডের আহবান	প্রচার পত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE BRITISH PUBLIC

As you all know that Pakistan in two parts separated by thousand miles was created out of the former British India in 1947 in accordance with the Lahore resolution of 1940 which states ".... the areas in which Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute Independent States in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

The 75 million Bengalees in East Pakistan out of a total of 120 million of Pakistanis had all along been denied of these fundamental right by West Pakistani based Governments civil or military in order to continue the economic and political exploitation of the East.

Sheikh Mujib who emerged as leader of the majority party in the national assembly after last December general election was not allowed to form Government by the West Pakistani military dictator as Mujib's 6-point programme consistent with the ideological basis of Pakistan was designed to bring an end to the West Pakistani exploitation. Instead of respecting the democratic verdict of 75 million people the savage military dictatorship sent guns, tanks, artillery and aircrafts to Bengal to kill thousands of children, women and men in their houses, patients in hospitals and students in their hostels.

The genocide that is now being committed in Bengal is a crime against humanity and human aspirations and we appeal to the people from this seat of democracy to support the people of BANGLADESH in their struggle for the democratic way of life.

BANGLADESH ASSOCIATION
SCOTLAND.

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মার্কিন সিনেটরদের প্রতি বৃটেনের বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের আহবান	বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতির চিঠি	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

BANGLADESH LIBERATION FRONT,
10, LEICESTER GROVE,
LEEDS-7,
UNITED KINGDOM.
THE 16TH APRIL, 1971.

Honourable Senator,

We acknowledge with gratitude the concern that the Government of the U.S.A. has expressed about the situation in BANGLADESH (previously) know as East Pakistan). But with great regret we inform you that the West Pakistani barbarians are using the weapons including TANKS and JETS supplied by you against our innocent and unarmed civilians. We have always considered U.S.A. as the champion of FREEDOM and DEMOCRACY, but we are disappointed with the extent of you OFFICIAL support, we have received so far for our cause.

We, however, appreciate the DIPLOMATIC difficulties that usually arise in such a situation, but we would like to point out that the case of BANGLADESH is not only different but also exceptional. We presume that you know that the basis of Pakistan Movement had been LAHORE RESOLUTION of 1940 which stated:-

"Resolved, that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that on constitution plan would be workable in this country or acceptable to the Muslim unless it is designed on the following basic principles, Viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute INDEPENDENT STATES in which the constituent units shall be AUTONOMOUS and SOVEREIGN".

After partition of British India West Pakistan arbitrarily assumed the provision of TWO STATES in the Lahore Resolution as typographical error and imposed its colonial rule over BANGLADESH. We, however, expected that the issue could be settled through democratic process. But for the last 23 years the Punjabi-dominated civil and military bureaucracies conspired against us and when we ultimately forced a GENERAL LELECTION in the country they came out with their ugly faces-it is now clear that although these Westernised elites apparently look more ENGLISH than the ENGLISH themselves, they have never believed in democracy nor in the right of the majority in a democratic government (see Appendix A).

There should be, therefore, no more illusion about the existence of Pakistan in the OLD FORM. The Lahore Resolution envisaged two satate; the psychological basis of Pakistan has ended with the Punjabi Genocide of the BENGALIS and there is no possibility of expecting democratic norms from people who are by BIRTH, TRADITION, and UPBRINGING FEUDAL and AUTOCRATIC.

We will fight Yahya's barbarious troops till death. We know we will come out victorious. We are also confident that sooner or later we will get the support of your government, but we are afraid many of our people may be dead if the support comes late. Unable to strangulate our voice for SELF-DETERMINATION, Yahya has gone mad. He is now burning and bombing our people and villages and threatening us with famine and epidemic. Your timely support can help thousands of lives and give us the precious time to build up our country on the basis of the values we cherish: DEMOCRACY, EQUALITY and RELIGIOUS TOLERATION.

Dhaka University Institutional Repository

Permit us to enclose a few editorial comments from the British press in support of our appeal to you for early effective action (see Appendix C.D.E.F). We trust the voice of 75 million people of BANGLADESH will touch your heart and we will hear you before we are DEAD.

In case you find the immediate RECOGNITION of BANGLADESH Diplomatically difficult kindly at least try to insure that the AWAMI LEAGUE Leader SHEIKH MUJIBUR RAHMAN is not killed and please press Yahya Khan for political settlement through the AWAMI LEAGUE which holds people's verdict. Also kindly ensure that all military and economic assistance to West Pakistan is immediately stopped and relief supplies are sent to BANGLADESH.

Yours sincerely,
(M.M.HAQ)
On behalf of
BANGLADESH LIBERATION FRONT

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গণহত্যা বন্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনদানের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানদের প্রতি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আবেদন	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চিঠি	এপ্রিল, ১৯৭১

To: ALL THE HEADS OF STATE IN THE WORLD

Dear Sir,

The Carnage this is taking place in Dacca and indeed in Bangladesh is too well-known to be detailed. Burning bodies on beds of students and professors of Dacca University, destruction of cramped residential areas with rocket, gunning down unarmed individuals inside houses are open testimonies to premeditated murder tantamount to genocide.

Machine-guns, tanks, bayonets, artillery, aircraft and whipped up racial hatred in the West Pakistan soldiers are being used to suppress the will of 76 million people of Bangladesh so unanimously expressed in the general election, the first one, in Pakistan in December 1970. Yahya Khan's 11 days talk has now been proved a conspiratorial trick to buy time and complete preparations for sudden thrust. The talks continued till half-past six in the evening. By half-past one the cities were put to blaze. The nature, purpose and magnitude of the thrust invokes the application of genocide convention (Article I-IV).

Pakistan was created on the basis of Lahore Resolution (1940), which envisage independent, sovereign status to the federating units. But a united structure was clamped jettisoning the federal scheme. The concept of Pakistan is by gone.

The Bengalis 55% of Pakistan population manifestly endorsed through admitted -hundreds percent response the de-facto Government of Sheikh Mujibur Rahman since March 2nd Mujibur Rahman commanded an absolute majority in the National Assembly. These members were elected on a declared positive mandate. This provides the de-jure basis of Mujibur Rahman de-facto government. The declaration of independence on March 25th has made West Pakistani troop and occupation army.

Despite hearing loss of life and property, the Liberation Army is controlling most parts of Bangladesh. Fighting is on in all the four cantonment cities. The people in Bangladesh shall continue this unfailing resolute struggle until the last soldier of this occupation army is ousted.

We appeal to all Governments to recognise immediately the Peoples Republic of Bangladesh in accordance with article I (i) of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights 1966.

We appeal to all Governments of arms-supplying countries to impose immediate embargo on the use of their arms and artilleries against unarmed innocent civilians of independent Bangladesh and thus discharge this moral responsibility.

We appeal to all people to strengthen their support and recognise the Republic of Bangladesh and stop the systematic decimation of a nation—the Bengalis.

Action Committee, London, for the Peoples Republic of Bangladesh in the U.K.
58 BERWICK STREET, WI.
Telephone: 437 71 I 1

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা প্রসংগে নীতিগত সম্মতি জানিয়ে মুজিবনগর থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সহযোগীর চিঠি	ডঃ এনামুল হককে লিখিত চিঠি	৮ জুন, ১৯৭১

D.O. No. 210

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Mujibnagar.
July 8, 1971.

Mr. Enamul Huq,
33 Abbey Road,
Oxford, U. K.

Dear Mr. Huq,

I received your letter dated 18th May '71 which you kindly sent through Mr. Chesworth. I have carefully gone through your various proposals. The Govt. have no objection in principle with regard to opening of Bangladesh Centre or Bangladesh Mission in England. We are sending necessary instructions and advise to Mr. Justice Chowdhury and his Steering Committee. This indeed will help to exchange our news and views. I personally feel that the need is too greet for such an office and if this be agreed by the Steering Committee, certainly we will welcome such effort.

With regard to Mr. Pasha, I have never met him I don't know if he has come to Calcutta. As far as we are concerned we would like to coordinate all our activities through the Steering Committee. At this moment we are discussing the details with Mr. Bhuia who is now on his visit here.

With regard to the. Philatelic, the designs have been approved. If you have other designs in hand please go ahead and send them for our approval. There is no harm in having .more. With regard to-publications our Calcutta `fission has not been able tc publish any news bulletin as yet. We very much look towards our London Office for bringing out a good publication immediately, at least in form of a News Bulletin.

Please show this letter to Mr. Justice Chowdhury and have his concurrence in all your activities which you propose to do. Convey my best regards to Mr. Justice Chowdhury and other friends in Britain.

With kindest regards,

I remain,
Yours sincerely,
(Rahmat Ali)
Principle Aide to the Prime Minister

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনের হাইডপার্কের সমাবেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাষণের বিবরণী	লন্ডনস্থ এ্যাকশন কমিটির কমিটির দলিলপত্র	১৮ জুন, ১৯৭১

"Joy Bangla-Joy Bangla"

We have assembled here to put an appeal to the people of Great Britain and to the people of the world to convey our message to them that Butcher Yahya Khan of West Pakistan is continuing an unabatted programme of genocide on Bangladesh. And it is the duty of all the freedom loving people of the world to condemn him and to stop him continuing with his programme of genocide. Today, we have here we are going with a procession after this meeting is over to the Chinese Embassy and to the American Embassy with our appeal to them to stop their Aid to Yahya Khan and his brutal regime. I will request you all to raise your voice against this tyrranian oppression and to raise your voice with us so that the government of the world particularly Govt. of the Peoples Republic of China and America stop aid and recognize Bangladesh. And I can only say to you that to stop this genocide is the only way to recognise Bangladesh and there is no other way out. So, I would request you to raise your slogan with me, "Recognise, Recognise"-"Bangladesh, Bangladesh." "Recognise, Recognise" -"Bangladesh, Bangladesh." "Love live, Long live"-"Bangladesh, Bangladesh." "Long live, Long live" - "Bangladesh, Bangladesh." Thank you, I would now request our special representative of the Govt. of Bangladesh Hon'ble Mr. Justice Choudhury to come upon the stage and-to say few words to you. Thank you very much.

Clapping and Slogans: Joy Bangla!

Justice Abu Sayeed Chowdhury

"Friends and fellow citizens of independent Bangladesh, I convey to you on behalf of the Govt. of Bangladesh, their sense of gratitude and the warm Sympathy and support at this hour of our grim struggle.

Clapping.....

You are aware, ladies and gentlemen, that we have been trying by constitutional means to put an end to the political domination and economic exploitation which we have suffered in silence for the last twenty three years. But you are also aware, ladies and gentlemen, how the army junta of Yahya Khan stopped the attainment of our goal by constitutional means. And on the twenty-fifth March a. midnight they let loose the army on the unarmed civil population of Bangladesh and committed and are still committing genocide on the people of Bangladesh. In the wake of this massacre, went up the spontaneous cry of independence (Shame! Shame...) and the seventy five million people declared themselves independent of Yahya Khan's administration.

—Clapping..........

We are now engage in grim struggle to thwart the invading army of Yahya Khan. (Clapping...........Joy Bangla).

In that grief........... (Mike failed) grim struggle, we expect the support and sympathy of the peoples of the world. The agony in one part of the world must reach the peoples of all other parts. And we are particularly grateful to the British nation, to the British Press, Radio and Television for their profound sympathy with us at this hour of our peril. (Clapping..........)

We have only one part of the work today that is to thwart this invading army of Yahya Khan. (Clapping ....) and to make the lives of the people of the seventyfive million Bengalees free from their attack, free from their rape-(Slogan....... Joy Bangla.....) you are aware that their troops burning the villages, committing rapes, killing children, and the genocide is going on. Will not the conscience of the world rise even at this! (appeal to the people and its governments of the world to condemn in most unmistakable term that the Yahya Khan's -administration. I appeal to the

Dhaka University Institutional Repository

governments of the world that no economic aid should be given to the government of West Pakistan. (Clapping..............)

You must all realise that there is no government of Pakistan to whom you can give aid. Yahya Khan himself has killed Pakistan. What exists today is only the government of West Pakistan. (Shame! Shame!) And that government should not be given any economic aid to kill the unarmed population of Bangladesh. That is my one, prayer to the government of the world. No arms supply should be given to kill the children, men and women of Bangladesh-who are determined to achieve independence and thwart the invading army. They rely on their own strength but at the same time they appeal to the people and to the government of the world that no aid should be given nor arms supply should be made available to Yahya Khan for killing the unarmed population of Bangladesh. Now, ladies and gentlemen, another false propaganda is being carried that the people of Bangladesh do not want independence. My fellow citizens of Bangladesh, I will request you, those of you who are determined to thwart the invading army and those of you who want independence of Bangladesh to raise your hands in support of the demands of Bangladesh. (Slogan: Joy Bangla.........................)

It is known to every body that England is a land of free thinking and free expression. It is therefore, clear to everybody that you have raised your hands willingly and nobody could compel you to raise your hand. You are the representative of Bangladesh abroad. Each one of you is a representative. And to your Bangladesh has made it known that the demand for independence is a demand of the seventyfive million people of Bangladesh (Clapping). It is not this demand of the miscreants as Yahya Khan uses to call the people of" Bangladesh. We are, Ladies and gentlemen, determined to face the invading army. We are determined to establish the rule of law in Bangladesh. And in that struggle we want the support, sympathy and cooperation of all concerned

Now, my fellow citizens of Bangladesh, I have a special direction to communicate to you in the name of the Government of Bangladesh.

(Joy Bangla............)

This procession—which will be taken immediately after this meeting, is not a procession of protest. It is a mark with an appeal to the few great powers the People's Republic of China, our closest neighbour and to the United States of America. Our appeal to them is to stop arms supply to Yahya Khan. Our appeal to them is to stop economic aid to Yahya Khan's army administration. The Govt. of Bangladesh, requests the citizens of Bangladesh to maintain peace and discipline in this appeal-march and make it plain to the People of Great Britain who have been very hospitable as that we are a disciplined nation. (Clapping..........)

Our march should be a very peaceful one. There should not be any offensive slogans. There should not be any different sect shall to be two embassies of the to great countries. We fervently hope that the people of the United States of America and China will rise in our favour and stop giving any arms supply to Yahya Khan. (Clapping...............)

With that prayer, with that appeal the citizens of Bangladesh will go to the two nations of the two great countries in London. (Clapping ....)

I am told that our enemies are also active and they might send some people who will get mixed up with the people who are going on behalf of the Govt. of Bangladesh and shall be prostrate to these missions. I make it plain that those who engage themselves in there activities, they are enemies to the cause of ' Bangladesh, And that for their mischievous activities the Govt. of Bangladesh will have no responsibility and they will have no protection from the Govt. of Bangladesh. (Clapping ....)

I will, therefore, again appeal to you, my fellow countrymen, that at all costs you will maintain peace and discipline. You know, we are continuing in this liberation movement, here in a foreign country and the British Govt. has been very hospitable to us, the British Govt. has allowed as continue with this movement as I have told you it is a land where freedom of speech, freedom of movement is there. (Clapping ....).

In this march of appeal you will also exhibit that you appreciate the great hospitality of the British Govt. and the British nation and do not by your action abuse that great hospitality. I, therefore, appeal to you, my fellow countrymen, in the name of the Govt. of Bangladesh and fellow countrymen of Bangladesh within Bangladesh that you and by your conduct demonstrate to

Dhaka University Institutional Repository

the people of Great Britain that we are a disciplined honourable nation. (Clapping and Slogan I Joy Bangla ....)

I thank you, ladies & gentlemen, who have assembled here to how your sympathy and support for our great cause, I convey to all of you the gratitude of the Govt. of Bangladesh. That day is not far off when Her majesty's Govt and the Head of the Commonwealth will recognise the reality and give recognition to the Govt. of Bangladesh. (Clapping)

I am firmly convinced in my mind that days are not far off when Bangladesh will sit in the Commonwealth of nations as a happy member of the Commonwealth. (Clapping)

I appeal to you, my fellow countrymen, to maintain your determination, your courage, your sacrifice and your unity: Success must be ours. Inshallah, we shall march forward in the path of peace and progress arid an achievement. We shall frame a Constitution which will guarantee freedom of thought, freedom of speech, freedom of expression-we will look forward to a democratic socialist Govt. in which all men will be equal. Hindus and Muslims, Christians and Buddhists and members of our other religions-we shall all live in peace and amity. (Clapping)

Our accredited leader Sheikh Mujib has been the harbinger of a new faith, ambassador of a new hope and that hope is to create state in which all will be equal-all will be free and nobody will be oppressed. (Clapping and Slogan)

Ladies and Gentlemen, Sheikh Mujib is still in prison and many other political leaders who have refused to sign the most dishonourable document that has been forced on them. We want release of Sheikh Mujib. We want release of all political prisoners. We are prepared for all sacrifices; nobody can stop us from getting the release of the political prisoners. (Clapping & Slogans: Joy Bangla .....)

Ladies and Gentlemen, There are other distinguished speakers. They will address you briefly. But before you start on your march of appeal, I will address again a few words in Bengali. After which, I shall request you to proceed with your procession. I shall come back to speak to you in Bengali at the conclusion of this meeting.

Thank you ladies and gentlcmen. (Clapping)

বক্তৃতার শেষাংশ -

ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি মুক্তকণ্ঠে একতাবদ্ধভাবে ঘোষণা করতে যে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইয়াহিয়া খানের হানাদার সৈন্যদের হাটিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

-Clapping-

আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সমস্ত দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে, আমরা একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ইনশাআল্লাহ সেই স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করবো। -Clapping and Slogan : Joy Bangla.

আজকের এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমর সরাসরি কথা হয়েছে। বাংলাদেশের মন্ত্রীমন্ডলী আমাদের জানিয়েছেন যে, আমি যেন তাদের হয়ে আপনাদের অনুরোধ করি যে, সর্ব অবস্থায় আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্মান বৃদ্ধি করবেন। - Clapping-

আপনারা চীনা দূতাবাস এবং অ্যামেরিকান দূতাবাসে যাবেন এই আবেদন নিয়ে যেন তারা ইয়াহিয়া খানকে কোনরূপ সাহায্য না করেন; কিন্তু কোনরূপ শ্লোগানের দ্বারা বা কোনরূপ ব্যবহারের দ্বারা আপনারা তাদের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করবেন না। - Clapping-

পাকিস্তান হাই কমিশনের লোক আমাদের প্রসাশনের মধ্যে যোগ দিয়ে তাদের প্রতি অশোভন এবং অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে আমাদের দায়ী করবার, দোষী করবার চেষ্টা করবে। তাদের থেকে আপনারা হুশিয়ার থাকবেন। - Clapping-

এবং তাদের এই কাজের জন্য আমরা কোনরূপ দায়ী থাকবো না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন সাহেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাকে বলেছেন - "Our aim is goodwill for everybody, ill will for none."

-Clapping-

আপনারা এই কথাটি মনে রাখবেন। আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা এই শোভাযাত্রায় যাবার সময় আমরা যে কয়েকটি শ্লোগান অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি, আশা করি, মাত্র সেই কয়েকটি শ্লোগানই দেবেন এবং অন্য কোনরূপ শ্লোগান দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন না। আমি সেই শ্লোগান কয়েকটি বলে যাচ্ছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলেবন- "Recognise, Recognise."

আপনারা বলবেন - "Bangladesh, Bangladesh"

আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন "Long live, Long live"

আপনারা বলবেন - "Sheikh Mujib, Sheikh Mujib"

আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন "Long live, Mukti Fouz"
আপনারা বলবেন - "Long live Mukti Fouz"
তারপরে আর একটা শ্লোগান হবে "Stop, Stop"
আপনারা বলবেন - "Genocide, Genocide"
আর একটা হবে "Stop aid to"
আপনারা বলবেন "ইয়াহিয়া খান"
ঃ আপনাদের মনে থাকবে, আপনাদের সকলের?
ঃ হ্যা
ঃ আচ্ছা।
আমি আর একবার বলছি " Recognise, Recognise."
জবাব ঃ "বাংলাদেশ, বাংলাদেশ"
জনাব চৌধুরী ঃ "বাংলাদেশ"
জনাব চৌধুরী ঃ "Long live, Long live"
জনাব ঃ "Sheikh Mujib, Sheikh Mujib"
জনাব চৌধুরী ঃ"Long live Mukti Fouz"
জনাব ঃ"Long live Mukti Fouz"
জনাব চৌধুরী ঃ "Stop, Stop"
জনাব ঃ "Genocide, Genocide"
জনাব চৌধুরী ঃ "Stop aid to"
জনাব ঃ 'ইয়াহিয়া খান'

জনাব চৌধুরী ঃ আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা যে কষ্ট করে এখানে সমবেত হয়েছেন তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আপনাদের ভাই ও বোনদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। এখন আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে মিছিলে যোগ দিন। আসসালামো আলায়কুম।

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক যাত্রার বার্তাসহ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রতি মুজিবনগর থেকে প্রেরিত টেলিগ্রাম	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

TS 15/101 LN B0104 YR0436X
CKA242 CS313/0 GBLB BU INCA 023
CALCUTTA 23 20 1940
URGENT BANGLADESH LONDON 2W

FOR JUSTICE ABU SAYEED CHOWDHURY FOREIGN MINISTER UNABLE TO COME. KINDLY PROCEED TO NEW YORK TO LEAD DELEGATION.

-ALAM

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৩৪।

৮

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ই আগষ্ট প্রতিরোধ দিবস পালনের আহবান	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	১০ আগষ্ট ১৯৭১

১১ই আগষ্ট ঃ প্রতিরোধ দিবস

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপনে সামরিক আদালতে বিচারের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

এই ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে হবে। একে রুখে দাঁড়াতে হবে। আসুন, হাজারে হাজারে এসে আগামী বুধবার, ১১ই আগষ্ট, বেলা ২টায় হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্ণারে জমায়েত হয়ে এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।

বাংলাদেশের সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই জরুরী গণ-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এতে যোগদানের জন্য আমরা আপনাদের সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।
জয় বাংলা

আহবায়ক
কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি।

কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ১১ গোরিং ষ্ট্রীট, লন্ডন, ইসি-৩ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন ঃ ০১-২৮৩ ৩৬২৩, ২৮৩৫৫২৬।

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডন সফর উপলক্ষে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে ৩০ অক্টোবর আয়োজিত একটি গণমিছিলের প্রচারপত্র	বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি	অক্টোবর, ১৯৭১

মিসেস গান্ধীর লন্ডন আগমন উপলক্ষে
বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে
বিরাট গণ-মিছিল

স্থান ঃ হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্ণার
সময় ঃ বেলা দেড় ঘটিকা (১-৩০মিঃ)
তারিখ ঃ শনিবার ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭১
গণমিছিল ঃ হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্ণার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রুক ষ্ট্রীট ক্লারিজেস হোটেল হইয়া হ্যানোভার স্কোয়ারে শেষ হইবে।

সভায় বক্তৃতা করিবেন ঃ

বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ও বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের ৪ জন এম-এন-এ ও এম-পি-এ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিটি বাংগালী ভাইকে উক্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিনীত
আহবায়ক, বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি
১১নং গোরিং ষ্ট্রীট, লন্ডন, ই সি ৩।

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১০

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঈদের ফেতরাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য সাহায্যের জন্য বাংলাদেশ মহিলা সমিতির আবেদন	বৃটেনে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রচারপত্র	১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH WOMEN'S ASSOCIATION IN GREAT BRITAIN

103 Ledbury Road, London, W. 11.
Telephone : 01 727 6578
Ref : 2/R
Date : ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭১

সুধী,

পবিত্র ঈদ সমাগমে প্রতিটি দেশপ্রাণ বাংগালীর মন স্বভাবতঃই ভারাক্রান্ত। দেশ ও জাতি আজ ঘোরতর দুর্যোগের সম্মুখীন। ইয়াহিয়ার নীতি ও ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত নৃশংস সেনাবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত। অত্যাচারী এজিদ বাহিনী বাংগালী জাতির নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। দেশের এই সঙ্কটে আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল মরণজয়ী জেহাদেরত মুক্তিবাহিনীর ভাইরা। বাংলা ও বাংগালীকে তারা বাঁচাবেই প্রয়োজন হলে তাদের জীবনের বিনিময়ে। আমাদের ঈদ ব্যর্থ হবে যদি এই পবিত্র দিনে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য ভুলে যাই।

তাই যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতরার পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস খরিদ করার জন্য পাঠিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা।

আসুন ভাই-বোনেরা, এবারের ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর নামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জেহাদে শরীক হোন। দানের দ্বারা দেশের প্রতি আপনার গুরুদায়িত্বের ভার কিছুটা লাঘব করুন। আপনার ঈদ সার্থক ও পবিত্রতর হোক।

জয় বাংলা।

নিবেদিকা
মিসেস বকশ
(কনভেনর)

একটি জরুরী আবেদন

সোনার বাংলার মানুষ আজ হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যালীলার শিকার। তারা আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন। এখন শীতকাল। মুক্তিবাহিনীরা খোলা জায়গায় কাজে ব্যস্ত। শরণার্থীরা শীতবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। তাদের সাহায্যার্থে শীতবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এগিয়ে আসুন। দেশ স্বাধীন যারা করছেন তাদের সাহায্যে করাই দেশের কাজ করা। যে যা পারেন নতুন বা পুরানো কিন্তু পরিস্কার জাম্পার, সোয়েটার, কার্ডিগান, পুলওভার, প্যান্ট ও গলাবন্দ দিয়ে সাহায্য করুন। এর আগে মে মাসে আমরা ওয়ার অন ওয়ান্ট এর মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীদের জন্য ৪০০ সার্ট ও প্যান্ট পাঠিয়েছি। আপনাদের সাহায্য পেলে এবারও পারব ইনশাআল্লাহ। আপনার সংগ্রহ করা কাপড়গুলি নীচের ঠিকানায় আগামী ১৩ ও ২০শে নভেম্বর শনিবার বেলা ২-৪ টার মধ্যে পৌঁছে দিন।

1. World Service Trust,
27 Delancey St.
London N. W. 1
(Off Camden High Street,
Camdon Town).

2. 58 Berwick Street,
London W.1,
Oxford Circus.

বাংলাদেশের মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতরার পয়সা সংগ্রহ করে সেটা মুক্তি বাহিনীর জন্যে খরচ করবে। এই সংকল্প রূপায়নের জন্য চাই আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা।

দেশ আজ ইয়াহিয়া-সৈন্যের অত্যাচারে ধ্বংস কবলিত। বাংলাদেশে আজ জীবন ধারন করাই দুর্বিষহ। জাতি আজ জীবন-মরণ সমস্যায় সম্মুখীন। আপনার-আমার ভাই বোনেরা জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে। আপনারা কি মনে করেন না যে যারা মানুষ বাঁচানোর ব্রতে নেমেছেন তাঁদের সাহায্য করাই ধর্মের কাজ ও বাংলার মানুষকে বাঁচানোই আজ বাংলার মানুষের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব?

আপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে বলুন এবারের ফেতরার পয়সা মুক্তি বাহিনীর জন্য খরচ করতে এবং নিজেরাও ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর নামে বাংলাদেশ সমিতিতে জমা দিন।

-জয় বাংলা-

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ১০৩ লেডবেরী রোড, লন্ডন পশ্চিম ১১।

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৮-৬৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১১

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আমেরিকান বার এসোসিয়েশন - এর সদস্যদের প্রতি আবেদন।

July 14, 1971.

To the Members of the American Bar Association

Dear Delegates,

We appeal to you because you are lawyers and because laws are being deliberately and brutally violated. Overwhelming evidence emerging from East Bengal indicate; that the Pakistan 'authorities are wantonly violating the Unitei Nations Genocide Convention. In Particular we would draw you attention to the reports which have appeared in the Sunda} Times of June 13, June 20 and July 11. These and other report, clearly indicate that articles IIa. IIb and IIe are being contravened.

Yet despite all these evidences, and the evidence of 7 million witnesses who have fled the scene of the crime, not one single Govenmemt has brought the charge of genocide before any of the organs of the U. N.

We earnestly hope that you, as lawyers, will not allow the rather delicate international laws, which have been so painstakingly formulated to protect fundamental and human rights, to be destroyed along with this cynical attempt to recolonise the 76 million people of East Bengal.

We urge you therefore, individually and collectively, to approach your government to bring this matter before the U.N. without further delay.

Yours faithfully.

BANGLADESH STUDENTS
ACTION COMMITTEE
35 Gamages Building. 120
High Holborn.
London, E.C. 1.
01--405-5917
o 1-405-5917

ACTION BANGLADESH
34 Stratford Villas.
London, N. W. 1.
01-285-2889
01-267-4200
01-267-4200

সূত্রঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন- "মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান", আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- পৃষ্ঠা-২৩৫-২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১২

আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর আবেদন।

From
Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, Barrister-at-Law
SPECIAL REPRESENTATIVE OF
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF
BANGLADESH.

1 1 GORING STREET
LONDON EC 3
TEL :- 01.283 5526/3623
19th July, 1971 .

Friends & Fellow Mcnibcrs of the Bar,

I convey to you greetings of the Government of Bangladesh and say that it is firmly dedicated to the establishment of a "Government of Laws".

You are aware that Army Junta of Yahya Khan has completely ignored appeal to reason. They have thrown Sk. Mujibur Rahman, accredited leader of 75 million Bengalees to prison, outlawed his party and let loose the monster of suppression on the peace loving Bengalees.

The unequivocal Declaration of Indepenece is being gagged by genocide. The crack down of the army on the unarmed population on the midnight of the 25th March was a preplanned one. A calculated process of extermination by rape, loot, arson and murder is still going on.

It is high time for the world to realise that an invading army cannot rule by tyranny. It is for the custodians of law to stand by the Bangalee nation which has not forsaken its principle in the face of grave peril.

As a member of your fraternity, I appeal to you to support the righteous fight for our liberation. The Government of Bangladesh fervently hopes that you will urge upon the Governments of the world including your own Government to recognise the Independent Government of Bangladesh and stop all supply of arms and economic aid to the Government. of West Pakistan and demand release of Sk. Mujibur Rahman and all other political prisoners and thus pave the way for establishment of Rule of Law in East Bengal, now Bangladesh.

Yours in fraternity.
A. S. Chowdhury,
Special Representative of the
Government of Bangladesh.

সূত্রঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন- ঐ, পৃষ্ঠা-২৩৬-২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৩

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস এর দৃষ্টিভঙ্গি।

NATIONAL UNION OF STUDENTS

Of the Universities and Colleges of the United Kingdom. 3, Endsleigh Street, London

11th October, 1971

The Executive of the National Union passed the following resolution at its meeting of 10th October:

The National Executive, taking note of:

1. The desperate Il mfl ion facing millions of Beagal refugees who have eutei I liidla from Pakistan and who are facing disease and sI,u vaI ioii;
2. The enormous rhortrt -fall in crops that is forecast for East Pakistan;
3. The numerous appleals for money and other assistance received from licugal organizations and other groups, (such as OXFAM) working to provide relief;
4. The absence of any conference policy concerning the Situation;

RESOLVES:

1. To refer all appeals for help to specific COs which make it Known to NUS that they wish to be, or are, actively involved in relief work for Bengal;
2. To request through Main. Mail that such COs contact the International Department;
3. To continue to call for donations to be sent: to the NUS Bengal Disaster Fund;
4. To allocaFe money received from that fund on the basis of IPG recommendations to he made to the executive meeting on 12th December;
5. To refer all requests for assistance received in NUS to the International Departumnt; and
6. To publicize this resolution via the Student Press Service and the Main Mail.

Dhaka University Institutional Repository

১৪

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখার জন্য ৪৫ জনকে সম্মাননা প্রদান।

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ৩৩ তম ও ৩৪ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখার জন্য দুই দফায় ৪৫ জন বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধের সংগঠককে সম্মাননা প্রদান করেন। ২০০৪ সালে ১৫ জনকে এবং ২০০৫ সালে ৩০ জনকে সম্মননা এওয়ার্ড ক্রেষ্ট এবং সম্মননা পত্র প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে যারা জীবিত ও বৃটেনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই নিজ হাতে এবং যারা পরলোকগত ও অনুপস্থিতদের পক্ষ থেকে তাদের আত্মীয়রা সম্মাননা এওয়ার্ড গ্রহণ করেন। ২৮ মার্চ, ২০০৫ ইং তারিখে সোমবার সন্ধ্যায় কেনজিংটন টাউন হলে আয়োজিত ২০০৫ এর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তৎকালে যুক্তরাজ্যে নিয়োজিত হাই কমিশনার এ. এইচ. মোফাজ্জল করিম বলেন, প্রবাসের কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার পরও বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে যারা অপরিসীম অবদান রেখেছেন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন বীর সন্তানকে সম্মান জানাতে পেরে নিজেদের গর্বিত মনে করছি (মাসিক সময়, এপ্রিল, ইসু-৬)। সম্মাননা প্রাপ্তদের এওয়ার্ড প্রদান করেন হাই কমিশনার এ. এইচ মোফাজ্জল করিম, বেগম মমতাজ জাহান করিম, ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন, টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র কাউন্সিলোর মনির উদ্দিন এম. এ. সালাম, বীরপ্রতিক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখার জন্য সম্মাননা প্রাপ্ত ৪৫ জন বিশিষ্ট সংগঠকরা হলেনঃ

সম্মাননা - ২০০৪

আবু সাঈদ চৌধুরী, আবদুল মতিন, এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, গাউস খান, নিখিলেশ চক্রবর্তী, নিসার আলী, পিটার শোর, বদরুন্নেছা পাশা, বদরুল হোসেন তালুকদার, মঈন উদ্দিন আহমদ, মিম্বর আলী, শামসুর রহমান, শেখ আবদুল মান্নান, সিরাজুর রহমান ও সুলতান মাহমুদ শরীফ।

সম্মাননা-২০০৫ ঃ

আজিজুল হক ভূইয়া, আতাউর রহমান খান, আফরোজ মিয়া, আবদুল ওহাব এম. বি. ই., আহমদ কুতুব, আবদুল মতিন, এ. জেড. মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, ইউসুফ চৌধুরী, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, জেবুন্নেসা বখত, তাসাদ্দুক আহম্মদ, তোজাম্মেল হক এম. বি. ই., ফখরুদ্দিন আহমদ, ফেরদৌস রহমান, মনোয়ার হোসেইন, মিনহাজ উদ্দিন আহমদ, মিয়া মনিবুল আলম, মুন্নী রহমান, মোঃ জিল্লুল হক, মিছির আলী, মোহাম্মদ ইসরাইল মিয়া, মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন, মুন্তাহির আলী সিতু মিয়া, রজার গোয়েন, এস, এ. রেজাউল করিম, লুলু বিলকিস বানু, শামসুল আলম চৌধুরী, সবুর চৌধুরী ও হাফিজ নজির উদ্দিন।

সূত্রঃ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন- "মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান", আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- পৃষ্ঠা- ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৫

ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি স্যার আলেক ডগলাস-হিউম এমপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

তারিখ ঃ ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১; সময় ঃ বিকাল ৩-১৫

স্থান ঃ ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস, লন্ডন এস ডব্লিউ১

উপস্থিত ব্যক্তিগণ ঃ

১. দি রাইট অনারেবল স্যার আলেক ডগলাস-হিউম এমপি

২. বিচারপতি চৌধুরী

৩. আই. সাদারল্যান্ড

৪. এন.জে. ব্যারিংটন

সাক্ষাৎকাররের বিবরণ ঃ

১. বিচারপতি চৌধুরীকে স্বাগতঃ জানিয়ে স্যার আলেক ডগলাস-হিউম দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এরকম দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি নিয়ে তাদের সাক্ষাতে মিলিত হতে হচ্ছে। তিনি জাস্টিস চৌধুরীকে আরও জানান যে, ওভারসিজ ডেভেলাপমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সঙ্গে বৈঠকে তিনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে মিঃ রিচার্ড উড (Mr. Pichard Wood) তাঁকে অবহিত করেছেন। তিনি জাস্টিস চৌধুরীর কাছে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চান।

২. পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত সমস্যাবলীতে ব্রিটিশ জনসাধারণ ও সংবাদ মাধ্যমের সমব্যাথি মনোভাবের জন্য স্যার ডগলাস-হিউমকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাস্টিস চৌধুরী তার বক্তব্য আরম্ভ করেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ছাড়া তিনি এর পেছনে সংঘটিত বিষয়াদি সম্পর্কে অল্পই জানেন বলে জানান কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ফেরৎ কয়েকজন প্রতিনিধি ও জানাশোনা মানুষের কাছ থেকে সেখানকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হয়েছেন বলেও জানান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ অতর্কিত এবং নজিরবিহীন। তারা ঘুমন্ত ছাত্রদেরকে তাদের বিছানাতেই 'ঘাস কাটার' মতো করে হত্যা করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা সজ্ঞানেই বাঙালি আইনজীবী, শিক্ষক ও উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বকে হত্যা করছে। এই মাত্র কিছুদিন আগে গত বছরের (১৯৭০) আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনসভায় তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রে হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে এবং ছাত্ররা তাঁর এই বক্তব্য হাততালি দিয়ে সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যা ঘটেছে তাতে তিনি আর মনে করেন না যে, বাঙালিরা আর কখনও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন মেনে নেবে। ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি অন্তর্ঘাতমূলক পরিস্থিতি ও গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতার ভেতর দিয়ে আমাদের বর্তমান দূরবস্থার দীর্ঘায়িত পরিণতিই দেখতে পাচ্ছি। "আর এই অবস্থা পূর্বপ্রান্তে 'এক্সট্রিমিস্ট'-দের জন্য সুযোগ এনে দেবে এবং পরিশেষে সেখানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে বলে তিনি বলেন।

৩. স্যার ডগলাস-হিউম বলেন, তিনি মনে করেন যে, পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এসব কিছু করতে বাধ্য হয়েছেন। স্যার ডগলাস হিউম প্রশ্ন করেন, "দেশটির অখন্ডতা রক্ষায় এখনও কি সেরকম কোনও সাংবিধানিক সুযোগ রয়েছে?" জাস্টিস চৌধুরী বলেন, গত সপ্তাহখানেক যাবত পূর্ব পাকিস্তানে কী হচ্ছে সেটা সকলকে খতিয়ে দেখতে হবে; মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে ভারত ভাগ হয়ে দু'টি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা একত্রিত হয়েছিল কি এই কারণে? মিঃ জিন্নার সফল উদ্দেশ্যকে এখন বিকৃত করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে বিদেশের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের মাত্র ১৩% পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাট রপ্তানী থেকে অর্জিত অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য খরচ হয়েছে। তাছাড়া তাঁর মতো মানুষেরা (যিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনও সম্পৃক্ত ছিলেন না) সব সময়ই পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি বিশ্বাস রাখেন (তিনি এ সময় তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণের কথা উল্লেখ করেন)। এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেই অখন্ডতাকে ধ্বংস করছেন বলে তিনি মনে করেন।

৪. স্যার আলেক ডগলাস-হিউম প্রশ্ন করেন, এটা কি সত্য নয় যে, নির্বাচনের পর শেখ মুজিবুর রহমানের অখন্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব জেদের জন্য এই সুযোগটি নষ্ট করেছেন? তিনি মনে করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সত্যিকার অর্থেই আগ্রহী ছিলেন। উত্তরে জাস্টিস চৌধুরী বলেন, তিনি নিজেও মনে করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী ছিলেন; (পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্ণর এ্যাডমিরাল আহসানের সঙ্গে এ ব্যাপারে জাস্টিস চৌধুরী একমতও পোষণ করতেন, মিঃ আহসানের সঙ্গে জাস্টিস চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে) কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীর ভেতরকার বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। হার্ড-লাইনার্সরা নির্বাচন স্থগিত করার চেষ্টা পর্যন্ত চালিয়েছিল। সকল বিরোধীরা একত্রিত হয়ে যায়, যখন দেখা গেল তাদের দু'টি বা তিনটি রাজনৈতিক দল নয়, মাত্র একটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে; কেননা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর পরেই সেনাবাহিনীর মধ্যে মতামত সুদৃঢ় হতে শুরু করে যে, শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া কোনও মতেই উচিত হবে না। তারা মনে করে যে, শেখ মুজিব তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করবে এবং তাদের ক্ষমতা খর্ব করা হবে। তারা ভুট্টোকে তাদের মিত্র মনে করে।

স্যার ডগলাস-হিউম জানতে চান, আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার দায়-দায়িত্ব এককভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার, নাকি গোটা সেনাবাহিনীর? উত্তরে জাস্টিস চৌধুরী বলেন, তিনি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং তিনি 'পাঞ্জাবী বাজ'-দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করেন।

৫. জাস্টিস চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেনাবাহিনী তান্ডব চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও বাঙালি নেতৃত্বকে হত্যার বিবরণ দেওয়ার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, যে সময় এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছিল তিনি সে সময় জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্ত

Dhaka University Institutional Repository

র্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এখন তিনি একটি ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে পাকিস্তানে আর ফিরে যেতে চান না। একজন বিচারপতি হিসেবে আইনের শাসনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, যেখানে আইনের শাসনের প্রতি সম্মান নেই সেখানে যাওয়া তাঁর উচিত নয়।

৬. বিস্ময়ে চেতনার উন্মেষ ঘটেছে এবং তিনি আশা করেন ব্রিটেনও এটা মনে করে যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব চরমপন্থায় বিশ্বাসী নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক ও গণতন্ত্রমনা জনগণের প্রতিনিধি যাঁরা কমনওয়েলথ-এর উপর আস্থাশীল ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী সিস্টেমের অনুসারী। যদি এসব পশ্চিম ও আধুনিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী নেতৃত্বকে শেষ করে দেওয়া হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট বিশেষ করে চীনপন্থীদের হাতে চলে যাবে বলে তিনি মনে করেন। চীনপন্থীরা ভেতর থেকেই দেশের নেতৃত্বতার নিয়ে নিতে পারবে বলেও তিনি জানান।

৭. স্যার ডগলাস-হিউম প্রশ্ন করেন, যদি পুনরায় শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় বসতে হয় তাহলে এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে কার সঙ্গে সেই আলোচনায় বসা উচিত? কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে জাস্টিস চৌধুরী বলেন, 'সেরকম কেউ-ই নেই।" যদি কোনও রাজনৈতিক আলোচনার প্রশ্ন হয় তাহলে প্রথমেই প্রেসিডেন্টের উচিত শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া, জাতীয় পরিষদ আহবান করা এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। যদিও তিনি এ ব্যাপারে তেমন একটা আশাবাদী নন কিন্তু তিনি মনে করেন যে, প্রেসিডেন্ট যদি এরকম কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তবে তা এখনও পর্যন্ত সম্ভব।

৮. স্যার আলেক ডগলাস-হিউম প্রশ্ন করেন, এখন শেখ মুজিবের মতামত কী হতে পারে? তিনি কি দলচ্যুত হতে চাইবেন? জাস্টিস চৌধুরী বলেন, অতীত ইতিহাস প্রমাণ দেয় না যে, শেখ মুজিব কোনও দিন দলের মতামতের বাইরে গেছেন। জাস্টিস চৌধুরী নিজেও কোনও দিন পূর্ব বাংলাকে কমনওয়েলথ-এর কার্যকর স্বাধীন সদস্য হিসেবে ভাবতে পারেননি। কিন্তু ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতে পুনর্মিলনের কথা চিন্তা করাটা অত্যন্ত দুষ্কর বলে তিনি মনে করেন।

৯. স্যার আলেক ডগলাস-হিউম প্রশ্ন করেন, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার একত্রিত হওয়ার কি কোনও সম্ভাবনা রয়েছে? জাস্টিস চৌধুরী দৃঢ় উত্তর, "নেভার।" তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, "যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে এটি হবে একটি কমিউনিস্ট স্টেট।"

১০. সবশেষে জাস্টিস চৌধুরী বলেন , তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানাতে চান শুধু আইনগত অবস্থানে অনড় না থাকার জন্য। যে কোনও পরিস্থিতিতেই ইসলামাবাদের সরকারের চেয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের একটি বৈধ সরকার গঠনের বেশি অধিকার রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারকে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করার অনুরোধ জানান তিনি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করবে, হয়তো এতে পূর্ব পাকিস্তানের ভোগান্তি কিছুটা হলেও কমবে, কারণ প্রাপ্ত সাহায্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অস্ত্র কিনে সেই অস্ত্র দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

সূত্র ঃ মাসুদা ভাট্টি, 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃটিশ দলিলপত্র', জ্যোৎস্না পাবলিসার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৮৩-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৬

The Birth of Bangladesh

Abu Sayeed Chowdhury
Former President, People's Republic of Bangladesh

It was the last day of October 1984. I was in London. As I woke up in the morning, the telephone bell was ringing. It was Sheikh Abdul Mannan, who was my close colleague during the Bangladesh independence movement in 1971. In a trembling voice he told me that Shrimati Indira Candhi had fallen victim to the bullets of assassins. As I heard the news, it seemed that time stopped moving. I gradually started realizing what happened. With agony in my heart, I could at once see that the loss was not to India alone but to the world as a whole. She had long ceased to be only an Indian. She spoke for the Third World. She was the guiding inspiration of the Movement of Nonalignment. She stood for human solidarity.

I sat down in silence. I recalled the tragic night of 25 March 1971. Thousands lost their lives in the city of Dhaka alone. With horror, the world learnt what happened. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was taken into custody. The leaders of the Awami League crossed into Indian terriory without notice, without invitation. Indira Gandhi gave them shelter. She later helped the government in exile. Military rulers of Pakistan told the world that she engineered the independence movement. I said, "Certainly yes, if General Yahya started the mass killing on her instrucion." It is this killing which made our nation to a man demands independence.

Next day I went to the Indian High Commission in London to sign the condolence book. Along with a mouring world, I offered my humble tribute to her memory and said how much our independence movement owed to her. When Mahatma Gandhi, prince of nonviolence, was assassinated in January 1984, reminded me of the scenes I witnessed thirty-seven years earlier.

On the occasion to the observance of the first anniversary of Mrs. Gandhi's death, my mind turns to the interestin conversation I had with her at Claridges Hotel in London, in 1971. That was also in the month of October.

In response to a request from the Indian High Commission to see Mrs Gandhi, I reached the hotel a few hours after her arrival in London. Near the lift, I met the officer of the Scotland Yard who had informed me some time before that there was a plan to kidnap me. The scholarly High Commissioner, Mr. Apa Pant, took me to a drawing room and went to inform Mrs Gandhi, who came in a minute later. That was, in fact, our first meeting. She began talking to me as if we were old friends. She asked me about my visits of France, the Netherlands, Norway, Denmark, Sweden, Finland and Switzerland, and to the different universities of the United States of America as well as my meetings with the leaders of the American Congress and Senate in Washington. She said that she had requested me to see her at such short notice because she would be meeting Prime Minister Edward Heath that afternoon.

I toled her that the Governments and the peoples of the various countries were full of sympathy for us. On the question of recognition, they had told me that recognition would be possible only when India recognized Bangladesh. I also said with some emotion: "Had your revered father been alive, he could not have remained satisfied by merely giving shelter to the refugees." Her pensive mood gave me full opportunity to express my sentiments. I added: "After all, I have nothing to offer by way of reward. Bangladesh will never be a vassal kingdom of India, but a free and sovereign Bangladesh will be a freind of the close neighbour India, if that is of any value."

In recalling those words, I am struck by their irrelevance, But I was then in a rebellious mood. It was propaganda of Pakistan I was denying everywhere. She did not give even the apperance of irritation. She watched my agitated mood with a flicker of smile, calm, quiet and gazing at the carpet almost with shyness. Then she gently said; "Justice Chowdhury, it is kind of you to have mentioned friendship. I think even that should be left to the people of Bangladesh to decide when they are free." She proceeded to say, "You have spoken about reward: the only reward I would expect from a free Bangladesh is democracy. I do not like military rule in a neighbouring country." When later she visited Dhaka, I recalled those words and referred to her expectation of democracy in a free Bangladesh at a banquet hosted by me in her honour.

At the same meeting in London, I also told Mrs Gandhi that, during his recent visit to London, Mr Jayaprakash Narayan was asked at a meeting about the delay in recognition of Bangladesh. He replied, "It is no use asking me. I would have recognized Bangladesh long ago had I the authority to do so." She again said with a pleasant smile, "I do not have his advantage of being a private groudns, I am giving every help

Dhaka University Institutional Repository

to Bangladesh leaders but you will kindly appreciate that as Prime Minister of India, my primary responsibility is to the people of India. I cannot provoke a war on India. If we are attacked even without provocation, we will know how to meet the situation." She herself told the Press in London during that visit, she was sitting on a volcano. She assured me that she would recognize Bangladesh at an appropriate moment without any hesitation. In fact, she did so.

She was the first Head of Government to visit the newly born People's Republic of Bangladesh and to stay at Bangabhavan (President's House) as my guest. She arrived there accompanide by Sheikh Mujib, Father of the Nation, who received her at the airport. As my wife and I greeted her at Bangabhavan, we saw a smile of rare happiness, sincere and serene. How gallantly she had stood by a neighbour in distress, how swiftly she had withdrawn the Indian army from Bangladesh in immediate response to Bangabandhu's request. Now she came as a friend. Seldon has such a rare glory been earned in history. Whatever be the propaganda by interested quarters, India's role in our independence movement was that of a friend and ally and nothing else.

During her three-day stay, she made constant inquiries about the difficulties of a war-torn Bangladesh. She revealed her anxiety. She felt that it was not enough to help during the war. After victory Bangladesh must take its rithtful place in the international community.

I noticed the same friendly attitude when my wife and I went to India on a state visit at the end of 1972 in response to an invitation by President Giri. In my address to the Inidan Parliament, I said, "To me she is much more that the Prime Minister of India; she is Nehru's daughter and Nehru's grand daughter." I meant she was not only holding the high and exalted office in a parliamentary form of Government in the largest democracy of the world but she truly inherited also the qualities of two of the gratest leaders of India, Motilal Nehru and Jawaharal Nehru. When I said, "We want friendship with Pakistan," the Members of Parliament clapped their hands with spontaneous joy. So did Mrs Gandhi. That was realy the spirit I found in the Indian capital. Later, she encouraged Bangladesh to release 90,000 soldiers and officers of Pakistan without trial.

I should say that relationship between the two Heads of Government was something unique. She met Bangabandu for the first time when he was returning from a Pakistan prison. But Sheikh Mujub's dovotion to his people and his country, and his struggle for democracy for over two decades had created a sense of sincere regard in her mind long before they met at Delhi in January 1972. Sheikh Mujib too had high esteem and regard for her patriotism and love for democracy. It was a friendship founded on adherence to democracy.

After spending about three days in the Indian capital, I visited other places. Then I went to Santiniketan. On arrival there, we were taken to a function straight from the heliport. The Vice-Chancellor welcomed me. As I stood up to reply, my ADC came forward with my written speech on a tray. Mrs Gandhi jumped to her feet and whispered in my ear that it was merely a welcom address and that my formal speech would be more appropriate for the special convocation. I thanked her and spoke extempore. This shows how alert she always was. I said that the victory of Bangladesh was the triumph of the principles Tagore had stood for throughout his life. Mrs. Gandhi was happy and relaxed at Santiniketan, full of so many memories for her.

Miss Padmaja Naidu tole me that on the day India was attacked in 1971, Mrs Gandhi was in Calcutta. She at once left for Delhi, held a Cabinet meeting, declared emergency and addressed the nation. Miss Naidu, as a close friend went to the residence of the Prime Minister, to be with her at that moment of tension. But she found her fast asleep with a magazine in her hand. Miss Naidu said, "Mr President, imagine how cool our Prime Minister can remain even in a moment like this. She took every necessary step and with her natural calmness she could have sound sleep." Miss Naidu came away without distrubing her mcuh needed rest.

Another incident that was recounted to me by my lifelong friend, Mr Siddhartha Shankar Roy, the then Chief Minister of West Bengal, would indicate how close her heart was to her people. In one of Mrs Gandhi's visits to Calcutta, the helicopter was ready to take her from Dum Dum to Raj Bhawan. But she told the Chief Minister that the small pleasure the people would derive by her travel in an open car should not be denied to them. Siddhartha told me that the wishes of the people she served was more important to her than the security of her life. From Dum Dum to Raj Bhawan, she stood with folded hands responding to greetings. Ironically, she is reported to have stood-too trustfully-in the same way when her assassins approached her.

Dhaka University Institutional Repository

Exactly a year ago, Indira Gandhi was removed from the sight of the 700 milion of her fellow countrymen. In 1931 her father wrote to her from prison: "Priyadarshini-dear to the sight, but dearer still when sight is denied!" So she will remain.*

[সূত্রঃ ***This article was incorporated in an anthology, 'Indira Gandhi-Statesmen, Scholars and Friends Remember', published by Indira Gandhi Memorial Trust, New Delhi on 31 October, 1985-the first anniversary of her death.**-এর সূত্র উল্লেখ করে আবদুল মতিন, 'বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশ', পৃষ্ঠা-৭৪-৭৮।]

Dhaka University Institutional Repository

১৭

The times: Thursday May 13, 1971

Advertisement

Pakistan

This is the Moment to Show That Man is More than "An Internal Problem"

Tomorrow May 14th 1971 the House of Commons will debate the events taking place in Pakistan.

Please cut this out sign it and send it to your M.P today at: House of Commons, S.W.I. Get your friends to do the same.

The Life and Death of Millions is Everyone's Problem

On March 25 the Pakistan army began the systematic and brutal killing of the people of East Bengal, whose only offence was to win a majority in the country's national elections.

The army's suppression has not only left thousands dead from hideous massacre, but by disrupting planting, harvesting and food imports it has threatened millions more with starvation.

When the British Government says that this is an "internal problem" they are saying, in effect, that a government has the right to murder and strave its own citizens when they vote the wrong way.

We the undersigned, call upon the British Government to suspend all aid to West Pakistan Until its rulers remove their troops from East Bengal

We further call upon the British Government to join other nations in mounting massive international relief efforts to reach all the areas of East Bengal affected by famine.

Brian Abel-Smith
Frank Alluan M.P
Stanley Alderson
G.H.Akins
Mark Amory
C.N.Ascherson
Ray Aufield
Diana Athill
Geoffrey Austin
Keith Baines
Hannah Baneth
Robin Baker
Roger Barnard
Alan Beattie
Ray Bellisario
Hercules Belville
Terence Bendixson
Harold F.Bing
Noami Birnberg
Rachel Blake
W.H.Boore
Melvyn Bragg
Nacy Brien
Ann Broadbent
Bugh Brock
Lord Brockway
Brigid Brophy
M.F. Burnyeat
William S.Burroughs
John Bursnall
Peter Cadogan
J.A.Camilleri
Susan Campbell
LewisCarter-jones, M.P
Mrs. G. Edsall
I. Flowe Elis
P.Berresford Ellis
Peter Eyre
Fred Evans, M.P
Peter H.Evans
Andrew Faulds.M.P
Paul Foot
Kl. B.Forge
Roger Franklin
Rog Freeson. M.P
Margaret Gardner
R.Garratt
Lord Gifford
G.Gilchrist
David Gillett
Jeffrey Gold
M.S.Golding
Geoffrey Gorer
Nigel Gowland
A.P.Gray
John Gross
Nicholas Guppy
Peter Hain
Richard Hall
EstherSalaman Hamburget
Prof.Harold G.Hanbury
David J.Harding
David Head
Dr.S.W.Hawking
Francis Hewlett
Richard Hamilton
Wilfrid Hodges
John Hodgson
Aurel Kolnai
Bernard kops
Mark Lancaster
Harry Landis
Nigel Lawson
Dr. P.M.Lee
Richard Le Page
Arthur Lewis, M.P
Norman Lewis
Peter Lienhardt
M.R Lloyd
Diana Lodge
Iris Macfarlarc
N.B.K.Mansergh
Dominick Martelli
Tom Maschler
R.K.Mathew
R.Meager
Sylbia & Robert Mehta
Dr.J.B Mercer
Jonathan Miller
Prof.James A.Mirrlees
Noami Mitchison
Neil Mitchison
Roger Moody
Deborah. J. Moore
Dudicy Moore
V.S.Naipaul
Dr. Joseph Needham
John Newbigin
H.G.Nicholas
Susan O'Brian
John Patrick O'Connor
Paul Oliver
Martin Quick
Piers Paul Read
Dereck P.Reeve
Maurice B.Reckitt
Hywel Roberts
Toby Robertson
William Rushton
H.N.Rutherford
Dora Russel
Chrys Salt
Ronald Sampson
D.S.Savage
Anthony Savile
Gerald Scrafe
Steve Sherlock
Rt.Hon,JohnSilkinMP
A.A.Sinclair
Peggy Smith
C.P.Snodgrass
Ruth Speyer
Sara Stabb
Adrian Stokes
Tom Stoppard
P.M.Strange
Hope Stuart
P.G.Taylor
Hallam Tennyson
George Thomson
Prof.M.W.Thring
Anne Tibble
Kenneth Tynan
DR.U.U.Uche
Stephen Vizinczey
Anne Vogel

Dhaka University Institutional Repository

Imtiaz A.Choonara
G.A.Cohen
John Coleman
Paul & Ellen Connett
P.P.Colomb
Prof.Maurice Cranston
T.F.Cripps
Roland Curram
Ivor Cutler
Owen Davies
Cynog Davies
John Warren Davis
Cecil Dixon
Ian Dougall
Malcolm Douglas
Bruce Douglas Mann. M.P
Jim Ede
Keith Edkins
David Hoggett
James Hopkins
Caroline Humphrey
R.Hutchinson
Islington Committee for Bangladesh
Hugh Jenkins, M.P
Rev.John Johansen-Berg
Daniel Jones M.P
Gay Jones
Gay Jones
Peter D.Jones
Tim Jones
Brigid Keenan
Mrs.W.P.Kennedy
Monsignor Bruce Kent
Morris Kestelman
Ernest Knight
Ignatius Kogbara
Jimoh Omo-Fadaka
J.J.Ormiston
Sonia Orwell
Robert Parry, M.P
P.J.Payne
Pamels Pellegrini
Tom Pendry, M.P
Michael Pickett
Malcolm & Joan Pittock
David Plante
Angela Pleasence
Prof.D.E.G Plowman
J.F.Procope
John Plumb
Marietta Procope
Denise Pyle
H.H.Pyle
A.G.Vogt
Chloe Vulliamy
Will & Nellie Warren
Dr. John Watling
Auberon Waugh
David Wiggins
Angus Wilson
Olive M.Wilson O.B.E
G.G.Wilton
Michael Wolf
E.W.&P.A Woodrow
Alasdair Wylie
Francis Wyndham
and Name.........
Address............

This advertisement has been sponsored by Action Bangladesh, 34 Stratford Villas, London, N .W. I. (01-485-2889) Volunteers, offers of help and donations for this Campaign are urgently needed. Enquiries to the above address.

সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮

The Times: Wednesday 30 June 1971

Advertisement

Over 200 Members of Parliament have signed the following motion in the House of Commons. They include 11 Privy Councillor and over 30 former Ministers.

Genocide in East Bengal and
The Recognition of Bangladesh

"That this house believes that the widespread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan Army in East Bengal, contrary to the United Nations Convention of Genocide signed by Pakistan inself, confirms that the military Government of Pakistan has forfeited all rights to rule East Bengal, following its wanton refusal to accept the democratic will of the people expressed in the election of December 1970: therefore believes that the United Nations Security Council must be called urgently to consider the situation both as a threat to international peace and as a contravention of the Genocide Convention; and further believes that until order is restored under United Nations supervision the provisional Gevernment of Bangladesh should be recognised as the vehicle for the expression of self-determination by the people of East Bengal."

Signatories to the Motion:

Rt. Hon. John Stonehouse, *Wednesbury*
Rt. Hon. Geg Prentice, *East Ham, North*
Rt. Hon. Richard Crossman, *Coventry, East*
Rt. Hon. Roy mason, *Barnisley*
Rt. Hon. John Silkin, *Deptford*
Rt. Hon. Federick Willey, *Sunderland, North*
Mr. Leo Abse, *Pontypool*
Mr Peter Archer, Q.C. *Rowley Regis and Tipton*
Mr Norman Atkinson, *Tottenham*
Mr Sydney Bidwell, *Southall*
Mr Albert Booth, *Barrow in Furness*
Mr Richard Buchanan, *Glasgow, Springburn*
Mr Ray Carter, *Birmingham, Northfield*

Mr Bernard Conlan, Gateshead East
Mr Tam Dalyeel, West Lothian
Mr. S.Clinton Davis, Hackeny, Central
Mr James Dempsey, Coatbridge and Airdrie
Mr Dick Douglas, Srirlingshire, East & Clackmannan
Mr Duffy Sheffield, Attercliffe
Mr William Edwards, Merionethshire
Mr Fred Evans, Caerphilly
Mrs Doris Fisher Birmingham, Ladywood
Mr Reginald Freeson, Willesden, Fast
Mr Reginald Freeson, Willesden, East
Mr Reginald Freeson, Willesden, East
Mr John D. Grant, Islington, East
Mr W.W.Hamilton, Fife, West
Mr John Horam, Gateshead, West
Mr Hugh jenkins, Wandsworth, Putney
Mr W.H.Johnson, Derby, South
Mr James Lamond, Oldhan, East
Mr Dick Leonard, Romford
Mr Chartes Loughlin, Gloucestershire, West
Mr Gregor Mackenize, Rutheglen
Mr Klenneth Marks, Manchester, Gorton
Mr Michael Meacher, Oldham, West
Mr Edward Milne Blyth
Mr Michael O'Hallora, Islington, North
Mr Stanley Orme, Salford, West
Mr Lauric Pavitt, Willesden, West
Mr John Prescott, Kingston upon Hull, East
Mr Merlyn Ress, Leeds, South
Mr Hohn Roper, Farnworth
Mr Frank Alllaun, Salford, East
Mr Jack Ashely, Stoke-on-Trent, South
Mr Gordon A.T.Bagier, Sunderland, South
Mr Michael Barnes Brentford and Chiswick
Mr Edward Bishop, Newark
Mr Tom Bardley, Leicester, North East
Mr Ian Campbell, Dunbartonshire, West
Mr Lewis Carter-Jones, Dccles
Mr Thomas Cox,Wandsworth,Center
Mr G. Elfed Davies, Rhondda,East
Mr Dric Deakins, Walthamstow, West
Mr Peter Doig, Dundee
Mr Brucc Douglas-Mann, Kessington, North
Mr Maurice Edelman, Coventry,North
Mr Ellis , Wrexham
Mr Andrew Faulds Smathwick
Mr John Forrester, Stoke-on Trent, North
Mr Garrett, Wallsend
Mr Eddie Griffiths, Sheffield, Brightside
Mr Peter Hardy, Rother Valley
Mr Foy Hughes, Newport
Mr Edyustan morgan, cardiganshire
Mr Mert Oram, East Ham South
Mr Thomas Oswald, Edinburgh, Central
Mr Tom Pendry, Stalybridge And Hyde
Mr William Price Rugby
Mr Scholeld Allen, Q,C.Crewe
Mr joc ashton, bassetlaw
Mr Alan Beancy, Hemsworth
Mr Arthur Blank Inshop, South Sheilds
Mr Hugh D.Brown, Glasgow,Provan
Mr Cant,Stoke-On-Trent, Central
Mr David Clark, Colne Valley
Mr Richard Crawasaw,Liverpool,Toxteth
Mr S.O.Davies, Merthyr Tydfil
Mr Hugh Delargy,Thurrock
Mr Jack Mormond, Easington
Mr Tom Driberg, Barking
Mr Robert Edwards, Bilston
Mr Brynmor John, Pontypridd
Mr Gwynoro Jones, Carmarthen
Mr Arthur Latham, Paddington, North
Mr Ron Lewis, Carlisle
Mr John Mackie, Enfield East
Mr Frank McElthonc, Glasgow, Gorbals
Mr David Marquand, Ashfield
Mr Kevin McNamara, Kingston upon Hull, North
Mr Ian mikardo, Poplar
Mr Elystan Morgan, Cardiaganshire
Mr Adam Hunter, Dunfermline Burghs
Mr Michael English,Nottingham,West
Mr Fernyhough, Jarrow
Mr John Jraser, Lambeth, Narwood
Dr John Gilbert, Dudley
Mr Will Griffiths, Manchester, Exchange
Mr Eric S.Heffer, Liverpool, Walton
Mr Greville Janner, Icicester, North-West
Mr James Johnson, Kingstonupon Iiull, West
Mr Russell Kerr, Feltham
Mr Ted Leadbitter, Harlepools, The
Mr Arthur Lewis, West Ham, Torth
Mr Kenncth Lomas,Huddersfield,West
Mrj.P.W.Mallalieu, Iiuddersfield, East
Mr Edmund Marshall,Goole
Mr John Golding,Newcastle-Under-Lyme
Mr Bruce Millan,Glasgow,Craigton
Mr Alfred Morris, Manchester Wythenshawa
Mr Maurice Orbach,Stockport,Shout
Dr.David Owen, Plymouth, Sutton
Mr Noprman Pentland,Chester-Le-Street
Mr John Rankin, Glasgow, Gowan
Mr John Roertstn, Paisley
Mr Robert Sheldon,Ashton-Under-Lyne
Mr S.C.Silkin,Camberwell,Kulwich
Mr Dennis Skinner,Bolsover
Mr David Stoddart, Swindon
Mr Dick Taverne, Lincoln
Mr Eric G. Varley Chesterfield
Mr Geroge Wallace,Noewich, North
Mr David Watkins,Consett
Mr Edwin Wainwright, Dearne Valley
Mr James White, Glasgow Pollok
Mr Georffrey Rhodes, Newcastle Upon Tyne,East
Mr Paul B.Rose, Manchester, Blackley
Mr James Sillars, Ayrshire, South
Mr John Smith, Lanarkshire, North
Dr Gavin Strang, Edinburgh, East
Mr Raphael Tuck,Watfor
Mr Phillip Whitegead, Derby, Norht
Mr Alan Williams, Swansea West
Mr Julius Silverman Birmingham, Aston
Mr Leslic Spriggs, St.Helens
Mr Thoms Swain, Derbyshire, North-East
Mr Urwin, Houghton-Le-Spring
Mr Brian Walden, Birmingham, All Saints
Mr W.T.Williams Q.C.Warrington
Mr William Whitlock, Nottingham, North
Mr Ted Fletcher, Darlington
Mr Alec Jones, Rhondda,West
Mr Arthur Palmer, Bristol Central
Mr William Hamling,Woolwich,West
Mr Robert Parry, Liverpool Exchange
Mr Ivor Richard, Barons Court
Mr Robert Woof Blaydon
Dr.Shirley Summerskill, Halifax
Mr Stallard, St.Pancras.Borth
Mr Joel Barbett, Iieywood And Royton
Mr Alan Fitch,Wigan

Dhaka University Institutional Repository

Rt. Hon.Edmund Dell, Birkenhead
Mr Nbeil Mcbride, Swansea,East
Mrs Joyee Butler,Wood Green
Mr Norman Buchan, Renfrewshire, West
Mrs Rence Short, Wolverhampton, North-East
Mr William Rodgers, Shtchton-On-Tees
Mr George Grant,Morpeth
Mr Roland Moyle, Lewisham,North
Mr Jack Dunnett, Nottingham, Central
Mr Mareus Lipton,Brixton, Lambeth
Mr William Hannan, Glasgow, Maryhill
Mr David Redd, Sedgifield
Mr Michael Coicks, Bristol South
Mr Harry Gourlay, Kirkcaldy
Rt.Hon.Cledway Hughes, Anglesey
Mr Robert Hughes, Aberdeen, North
Mr Simon Mahon, Bootle
Mr Donald Stewart, Western Isles
Mr Ifor Davies, Gower
Mr Beil Carmichael, Glasgow, Woodside
Rtb Hon. John Morris, Aberavon
Mr Carol Johnson, Lewisham, South
Rt.Hon.George Darling, Sheffeild Llillsborough
Mr William Molloy, Ealing, North
Mr Denzil Davies, Llanelly
Mr Denis Howell, Birmingham, Small Heath
Mr James Hamilton, Bothwell
Mr Frank Judd, Portsmouth, West
Mr J. Dickson Mabon, Greenock
Mr Alex Eadic, Midlothian
Miss Joan Lestor, Eton And Stough
Mr John Mp Mackingosh, Berwick And East Lothian
Mr Roy Hattersley, Birmingham Sparkbrook
Mr Concannom, Mansfiel
Mr Ernest Perry, Battersea South
Rl. Hon Frederick Lee, Newton
Mr Ronald Brown, Shoreditch And Finsbury
Mr Me Cann, Rochdale
Mr Marsden, Liverpool, Scotland Road
Mr Nigel, Spearing, Acton
Mr William Wilson, Covertry, South
Mr Alexander Wilson, Hamilton
Mr Joseph Harper, Pontefract
Mr Jeffrey Thomas, Abertillery
Mr Sandelson, Hayes And Harlington
Sir Myer Galpern, Glasgow, Shettleston
Mr Terry Davis, Bromsgrove
Mr James Boyden, Bisthop Auchlsnd
Mr Richard Kelley, Don Valley
Mr Tom Torney, Bradford, South
Mr Neil Kinnock, Bedwellty
Mr Caerwyn Roderick, Brecon And Radnor
Mrs Lean Jeger, Holborn And St. Pancras, South
Mr Alexander Lyon, York
Mr Albert Roberts, Normanton
Mr John Parker, Dagenham
Mr Mark Hughes, Durham
Mr Dan Jones, Burnley
Mr John Pardoe, Nborth Cornwall
Mr Hugh Mc Cartney, East Dundartonshire
Mr Donald Coleman, Neath

সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ উদ্‌যাপন কমিটি, ৩৯, ফর্নিয়া স্ট্রীট, লন্ডন ই-১, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-২৬৭।